মৃ গ য়া

দ্বিতীয় খণ্ড

মৃগয়া

দ্বিতীয় খণ্ড

ভগীরথ মিশ্র

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিণ্টার্স
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
সুধীর মৈত্র

অগ্রজপ্রতিম
শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে
অপরিসীম শ্রদ্ধায়

এই লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

তস্কর

আড়কাঠি

চারণভূমি

জ্ঞানগুরু

মৃগয়া/১

অন্তর্গত নীলস্রোত

কিশোর উপন্যাস

ছড়াক গোয়েন্দা

গল্পগ্রন্থ

জাইগেনসিয়া ও অন্যান্য গল্প

লেবারণ বাদ্যিগর

কাকচরিত্র

চিকনবাবু

নির্বাচিত গল্প

ভগীরথ মিশ্রর ছোটগল্প

ভগীরথ মিশ্রের গল্প

বিবিধ

বনসাই চর্চা

খনন পর্ব

জিয়োনগাছ মরণ-গাছ

সে বড় আশ্চর্য বৃক্ষ।

খোঁজ দিয়েছিল পাগল শিকারি। দুনিয়ার যত আশ্চর্য, রহস্যময় বস্তু, তার খোঁজ রাখে পাগল শিকারি। বলেছিল, সে গাছের তলায় বসলে মানুষের মনে বাঁচবার ইচ্ছা প্রবল হয়। অষ্টপ্রহর নিজের মৃত্যুকামনা করে, এমন মানুষও মরবার কথা বিস্মরণ হয়। তার বুকের মধ্যেকার যত বিষ, বেবাক শুষে নেয় ঐ গাছ। হালকুচ তিতা মনও গুড়ের পারা মিঠা হইয়েঁ যায়। পাগল শিকারি বলেছিল, জিয়োন গাছ।

গাছটা জাতে কুসুম। ফাগুন-চৈতে যখন কচি পাতা বেরোয়, পুরো গাছখানা যেন জ্বলন্ত আগুনের গাছ। এমনই রক্তবর্ণ তার কচি পাতা। পাগল শিকারি বলেছিল, জিয়োন গাছ হইল্যাক সন্নিসী গাছ।

মানুষের মধ্যেও যেমন, লাখে লাখে চোর-ছ্যাঁচড়, লোভী-গেরস্থ মানুষের মধ্যে অকস্মাৎ এক-একজন সাধু, মহাত্মা, গাছের বেলায়ও তেমনই। লাখে লাখে গেরস্থ-গাছের মধ্যে আচমকা এক-আধটা মহাত্মা গাছ। কেমন করে হয়? ঐ যেমন করে, মানুষের বেলায়, বিশেষ তিথি-নক্ষত্রে, বিশেষ বিশেষ গ্রহের সন্ধিক্ষণে ভূমিষ্ঠ হয় এক-আধজন ক্ষণজন্মা মানুষ, গাছের বেলায়ও তাই। সাধু-মহাত্মার কাছে গেলে যেমন করে মানুষ তার দুঃখ-শোক, জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে যায়, জিয়োন গাছের তলায় গেলেও, তেমনি, মুহূর্তে জুড়িয়ে যায় বুক। মানুষ ভাবতে শুরু করে, আরও দু'দিন বাঁচি। বাঁচি, বাঁচি।

বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা কইরে দেখুন একদিন। পাগল শিকারি বাচ্চা ছেলেকে নাড়ু-বাতাসার লোভ দেখিয়েছিল।

শুধু গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগের মধ্যেই আটকে থাকেনি পাগল শিকারি। সে আরও কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও পেশ করেছিল তার নিজের মতো করে। হতে পারে, বহু যুগ আগে ঐখানে কোনও মহাত্মা মানুষ মরেছিলেন। তখন তো এসব অঞ্চল জুড়ে গহীন জঙ্গল। বাঘ-বরা, সাপ-খোপ, ঠ্যাঙাড়ে-ডাকাতের লীলাভূমি। আর, নীলাচল যাবার প্রাচীন পথটি তো এই এলাকা দিয়েই চলে গিয়েছে। পানাগড় থেকে রাঙামাটি ঘাট। ঐখানে পেরোনো হল দামোদর। সেখান থেকে সোনামুখী, জয়রামপুর, রাধানগরের ভেতর দিয়ে অবন্তিকা। অবন্তিকার কাছে দ্বারকেশ্বর হেঁটে, সাঁতরে, কিংবা নৌকোয় পেরিয়ে বিষ্টুপুর। সেখানেই মিলবেক অহল্যাবাঈ রোড। ঐ সড়ক ধরে নীলাচল। উত্তরবঙ্গ থেকে নীলাচল যাওয়ার এটাই তো পথ ছিল প্রাচীন কালে। কত তীর্থযাত্রী, সাধু-সন্ত ঐ পথ ধরে জগন্নাথ দর্শনে গিয়েছেন যুগ যুগ ধরে। তখনকার কালে, দুর্গম বিপদসঙ্কুল সেই পথ, বলা নাই যায়, কোনও মহাত্মা হিংস্র চারপেয়ে অথবা দু'পেয়ে জানোয়ারের পাল্লায় পড়ে দেহ রাখলেন ঐখানে। কালক্রমে তাঁর হাড়-গোড়, শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ, মাটির সাথে মাটি হয়ে গেল। ঐ মাটিতে পড়ল একটি কুসুমের বীজ। বীজ থেকে বৃক্ষ। মহীরুহ। অমন সাধন-থানের মাটিতে জন্মানো গাছ, সে কি সাধারণ গিরস্ত-গাছের তুল্য হতে পারে? দেহটা মাটি হয়ে গেছে, আত্মা তো হয় নাই। সাধন সাঙ্গ না হলে সে আত্মা তো লীন হবেক নাই। মাটিকে ঘিরে ঐ সাধক-আত্মা পীঠ জাগাবে যুগ যুগ ধরে। কাজেই, সেখানের মাটিতে অমৃত, জলে অমৃত, বায়ুতে অমৃত...। পাগল শিকারির বিশ্বাস তেমনটাই। ওর মতে, সাধকটি উইখানে পীঠ জাগছে যুগযুগ ধরে। কোনও দেহকে আধার

করে বেঁচে রয়েছে। এর পরেই পাগল শিকারি এক বিস্ফোরক কথা বলে। বলে, বলা নাই যায়, উই গাছটাই সেই আধার কিনা! উই গাছটার মধ্যেই হয়ত বা বসবাস কচ্ছে সাধক মানুষটির আত্মা। ওর মতে, কেবল প্রাণীদেহ নয়, বৃক্ষও আত্মার আধার হতে পারে। পাগল শিকারি গভীরভাবে বিশ্বাস করে, গাছের মধ্যেও হরেক জাতের আত্মার বসবাস। বলে, গাছের নড়ন, চড়ন, ফুল-ফল ধারণ, তার ডালে-পালায় পক্ষী-পাখাল, পশু-প্রাণীর বসবাস থেকেই মালুম করা যায় গাছের অন্তর্গত আত্মার জাত। বলে, আশথ গাছে, তাল গাছে কেন শাগনার বাসা? আশথ গাছ তো পাপী গাছ, সকলেই জানে। সীতার বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছিল রামচন্দ্রের কাছে। কোনও গিরস্তই সেই কারণে ভিটার মধ্যে ঠাঁই দেয় না সেই গাছকে। তালগাছও কোনও যুগে কোনও পাপ করেছিল নির্ঘাৎ।

জিয়োন-গাছের তলায় বসে এই সব অসংলগ্ন ভাবনায় বুঁদ বুদ্ধদেব। মহাত্মা-গাছ কিনা জানে না, কিন্তু গাছটার তলায় বসলে সব মনখারাপ-রোগ সেরে যায়। অস্থির চিত্ত শান্ত হয়ে আসে। গাছটার তলায় ফুরফুরিয়ে হাওয়া বয়। চারপাশের বিশাল নিসর্গ, দৃষ্টির ফ্রেমে ধরা পড়ে ছবি হয়ে যায়। সামনে শালকাঁকির বিশাল লাল কাঁকুরে ডাঙা, তার ওপারে হরিণমুড়ি নন্দী, নদীর দুধারে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত, এখন মকমকে সবুজ। দিগন্তের গায়ে রাধানগর গাঁ, দাপানজুড়ি, বৈদ্যা আর গামিরতলার জঙ্গল..., এক অনাবৃত মুক্ত প্রকৃতি...দেখতে দেখতে দু'চোখে গাঢ় নেশা জমে।

স্থান-মাহাত্ম্য, বৃক্ষ-মাহাত্ম্য, প্রাণী-মাহাত্ম্য,—এসব খুব মানে রাঢের মানুষ। যেমন নাকি আলোচালের ডাঙার ঈশান কোণের আশথ গাছটার তলায় ঘুমোলে মানুষ সোনাদানা, মতি-মোহরের স্বপ্ন দেখে। দেখবেই। হরিণমুড়ির বাঁকের ওপর বাজেপোড়া তালগাছটার তলায় গিয়ে বসলে মৃত্যুবাসনা জাগে। জাগবেই। হেড়ে পর্বতের কোটরের মধ্যেকার প্রাচীন পেঁচাটা ডানা ঝাপটালে চারপাশে যে কোনও গাঁয়ে একটা হলেও গরু মরবে। মরবেই। না হলে, কোথাও ঝগড়া হবে, অশান্তি হবে। মানুষে-মানুষে কোন্দল লাগবে, অসূয়া বাড়বে মানুষের মনে। গাছের সবুজ পাতা হলুদ হয়ে যাবে। মাছের আঁশের তলায় পোকা হবে। হবেই।

রাঢভূমিতে জিয়োনগাছও রয়েছে, মরণগাছও রয়েছে। সুখস্বপ্ন দেখবার মতো আলোচালের ডাঙা, আবার মানুষের মাংস শিয়াল, শকুন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, এমন কি মানুষও, এমন স্বপ্ন দেখাবার মতো কানশিকড়্যার শ্মশানও রয়েছে। কানশিকড়্যার শ্মশানের ঐ ঝুরিবেষ্টিত প্রাচীন বটের তলা, সেখানে ঘুমুলেই মানুষ এমনতরো স্বপ্ন দেখবে, দেখবেই। গরীবের বাড়িতে কাজকর্ম লেগেছে, মেয়ের বিয়া, বাপের শ্রাদ্ধ, কিছু লোকজন খাবে, তার জন্য হাঁড়ি-কড়াই বাসনপত্তর চাই? গরীব মানুষকে তো এসব দেবে না বড়লোকেরা, কেনারও তো ক্ষমতা নেই, তবে? তার কাজটা হবেক নাই? কেন হবেক নাই? চলে যাও ঠাকরাণ পুকুরের পাড়ে। একটা ফোকরওয়ালা কুচলা গাছ আছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে মানত কর, মা, মা গো, ভীষ্মমাতা গঙ্গা, সর্বত্রই তুমার অবস্থান, দুনিয়ার সব জলেই তুমার রাজত্ব, আমি অতি দীন-হীন, অতি অভাগা, মেয়াটার বিয়া লাইগ্ছে, বাসনপত্র বলতে কিছুই নাই, এই রইল তুমার তরে তিনটি ছাঁচিপান, তিনটি গোটা সুপারি আর প্রণামী বাবদ পাঁচ-সিকা, আমার কাজটি তুলে দাও মা, অভাগাকে কন্যাদায় থেকে (কিংবা পিতৃ/মাতৃদায় থেকে) উদ্ধার কর। পানসুপারি আর পয়সা, একটা শালপাতায় আচ্ছা করে মুড়ে, রেখে দিয়ে এস কোটরের মধ্যে,

পবের দিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে চলে যাও, দেখতে পাবে কুচলাগাছের তলায় বাজপুত্তুরের মতো শুয়ে বয়েছে পিতলের হাঁড়ি-কড়াই, গাগরা, প্রয়োজনীয় যাবতীয় বাসন। শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। তুলে এনে কাজ সাঙ্গ কর, ধুয়ে মেজে ফেরৎ দিয়ে এসো কুচলাতলায়। কে দেয? জলের মধ্যে এক ঠাকরুন থাকে যে। ঐ তরে তো দীঘির নাম ঠাকরাণদীঘি। একদা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণপুত্তুর বিয়ে করে ফিরছিলেন। হেঁটেহেঁটেই ফিরছিলেন বধূকে নিয়ে। খুবই পিয়াস পেয়েছিল নতুন বউয়ের। ঝামরে যাচ্ছিল ওপড়ানো লতার মতো। সামনেই একটা দীঘি পেয়ে ওব পাড়েই একটা কুচলা গাছের তলায় বসল দু'জনে। বধূটি গেল দীঘিতে জল খেতে। যেই না দীঘির জলে গোড়ালি অবধি ডুবেছে, অমনি সরসর করে নেমে যেতে লাগল। ব্রাহ্মণ কিছু দেখে-বুঝে ওঠার আগেই জলের মধ্যে ডুবে তলিয়ে গেল। মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে কুচলা গাছের তলাতেই আত্মঘাতী হল ব্রাহ্মণ।

নিশান বাউরির বয়েসের গাছপাথর নেই। নব্বইয়ের ওপর বয়েস। সারা শরীরে শুকনো কেঁদ গাছের মতো খসখসে চামড়া, ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়েছে। সারা মুখেব কোঁচকানো চামড়ায় অজস্র আঁকিবুকি, কারুকার্য। আর চোখদুটি যেন সিংহগড়ে বাতভর জ্বলতে থাকা ক্লান্ত-অবসন্ন হ্যাচাকবাতি, তাব কাচেব ডুমে কালচে ছোপ, তাব ম্যান্টেলের শরীরে লাল আভা, সে মাঝে মাঝে হেঁচকি তোলে, পালাগানেব আসরে কুম্ভকর্ণ কিংবা ঘটোৎকচের পবাক্রমে কণ্টকিত তাবৎ দর্শককূল 'গেল গেল' বব তোলে, আর গোমস্তা রতিকান্ত অথবা গ্রামসেবক মুৎসুদ্দিবাবু এসে খচাখচ পাম্প দেন হ্যাচাকে, পিন ফোটান তার ঘাড়ে, তখনকার মতো চাঙ্গা হয়ে ওঠে হ্যাচাক, ঠিক তেমনি চোখদুটি নিশানের, তেমনি হেঁচকি তুলে 'যাই, গেলাম' ভাব করে, তখন অগ্নিরই যত ভোগান্তি, দিগদাবি, জলজমানি লতার পাতা চটকে তার জলটুকু খাওয়ায, বনচিনির সরবত বানিয়ে ধরে দেয়, চোঁ-চাঁ দৌড়োয় তিলক বাউরির কাছে, তিলক রে, জলদি ছুইটে যা অনাথ কাকার পাশ, ওষুধ লিআয় দাদুব তরে। তিলক না থাকলে নিজেই দৌড়ে যায় বাধানগরে। অনাথবন্ধুর ডিসপেনসারিব বারান্দায় গিয়ে হাওয়া লাগা কলাপাতাব মতো দুলে দুলে হাঁফাতে থাকে। নিশান বাউরি ইদানীং চোখে দ্যাখে না, কানে শোনে না, কোনও কথাই তেমন করে ঢুকতে চায় না স্মৃতিতে। আজ ঢোকালে কাল বেরিয়ে যায়। কিন্তু যা ঢুকে গেছে তার শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, তার সঞ্চয় কিন্তু এখনও অবধি অটুট। প্রাচীন দিনেব কাহিনীমালা সব, গল্প গাথা, কিংবদন্তী, যত শুনতে পার নিশানের থেকে। আর ওতেই অগ্নিব ব্যাটা গোরাচাঁদেব মতো উড়নচণ্ডী পাখীটি একেবারে বশ। নিশান বাউরি গোপন কথা ফাঁস করবার ভঙ্গিতে বলে, আসলে ব্রাহ্মণ-কইন্যা ছিল নাই উ। উ ছিল শাপভষ্টা কুনো দেবী; ছল কইবে বামুনেব ছেইলাকে বিয়া কইরেছিলেন, ছল কইরে টেনে এইনেছিলেন দীঘিব পাড়ে, কেন কি, দীঘির জলে পা না দিলে উয়াব শাপমুক্তি ঘটবেক নাই। বলে, জলের তলায় তাঁব তিন মহলা প্রাসাদ রইয়েছে। তিনি দেবী রাণী। কিন্তু কিছোদিন গরীব বামনের ঘবে বসবাস করে তিনি তো বুঝে গেছেন গরীবের কী দুঃখ। তাঁর মর্তের বাপটিই তো বাসন-কোসনের অভাবে মেয়াব বিয়াতে লোকজন খাবাতে পারে নাই। বরযাত্রীরা না খেতে পেয়ে বরকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছে। পালকি বেহারারা পালিয়ে গিয়েছে, বাদ্যি-বাজনাও খাদ্য বিহনে উধাও। সেইতরেই না বউকে নিয়ে একলাটি বর ফিবছিল ঘরে। ত, গরীবেব সেই কষ্টটি বুকে লিয়ে শাপমুক্তি ঘটলেক দেবীর। তিনি পণ করলেন, গরীব-গুরবোদের কাজঘরে সব্বাইকে বাসন-কোসন যোগাবেন তিনি, যাতে কুনো

কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ কিংবা পিতৃ-মাতৃদায়গ্রস্ত ছেলেকে বাসনকোসনের অভাবে ঠেকায় পড়তে না হয়। সেই ধারা চলছে। নিশান বাউরি পাশাপাশি দানার বাঁধের প্রসঙ্গও তোলে, যেখানে বাঁধের ঈশান কোণে একটি মাত্তর লাল পদ্ম ফুটে থাকে। পদ্মটি তুলবার লালসায় কেউ নামলেই, সে যত এগোয় ফুলটি তত পেছোয়। মানুষটির গোড়ালি ডোবে, হাঁটু ডোবে, কোমর ডোবে, ততক্ষণে পদ্মফুলটি টুপ করে ডুব মেরেছে জলের তলায়। আর, একখানা জ্যান্ত শিকল ঠিক সাপের মতো এঁকেবেঁকে এসে জড়িয়ে ধরেছে ওর পা। সে মানুষ আর জীবনে উঠতে লারবেক। আসলে, পদ্ম ফুলটিও এক শাপভষ্টা দেবী। শাপমুক্তি না হওয়া ইস্তক সে এইভাবেই মাইন্‌ষের জীবন লিব্যাক।

কাজেই সব আছে এই রাঢ়ভূমিতে, সব আছে এই দুনিয়ায়। কেউ বাঁচানোর জন্য রয়েছে, কেউ মারবার জন্য। এইভাবে নিশান বাউরি তার বক্তব্যে ইতি টানে সাধারণত।

এই যে, জিয়োন গাছের তলায় বসে রয়েছে বুদ্ধদেব, তার হাতে একখানা ভাঁজ করা কাগজ, কাগজের বুকে একটা বিচারের রায় লেখা রয়েছে, এক বিশেষ আদালত অনেক দিন যাবৎ অনেক বিচার-বিবেচনা, সাক্ষী-শুনানি করবার পর এমন রায় দিয়েছে, বুদ্ধদেব সম্পর্কেই এই রায়, রাঢ়ের মানুষ এখনো কেউ বিন্দুবিসর্গ জানে না এই রায়টা সম্পর্কে। কেবল বুদ্ধদেবই জানে সেটা। বুদ্ধদেব এও জানে, রায়টা জানা মাত্তর এই রাঢ়ভূমির এক অংশ আনন্দে উদ্বেল হবে। অন্য অংশ হবে বিস্মিত, মর্মাহত, বিহ্বল। তারা এমন রায়ের সমালোচনায় সরব হবে। তারা এমন রায়কে ধিক্কার জানাবে। তারা বলবে, এই রায়ের মধ্যে আবেগ এবং হটকারিতা যতখানি, বিচার বিবেচনা সেই তুলনায় অনুপস্থিত। তারা রায় লেখা কাগজখানিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবার পরামর্শ দেবে। সুকুমার আচার্য, দীপমালা, মল্লিকা, অনাথ বন্ধু, বুদ্ধদেবের ব্যাপারে এদের এক একজনের এক এক মূল্যায়ন। কিন্তু একটা বিষয়ে তিনজনেই একমত যে, বুদ্ধদেবের মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো 'স্বাভাবিক' নয়। এই স্বাভাবিক শব্দটাকে বদলে নিয়ে কেউ বলেছে 'সাধারণ'। অর্থাৎ কিনা বুদ্ধদেবের আচার-আচরণ, জীবন-দর্শন, এক দলের মতে, অস্বাভাবিক, অন্যদলের মতে, অসাধারণ। এমন কি বিডিও অবিনাশ ভৌমিক, চুয়ামসিনার হরবল্লভ সিংহবাবু, প্রাণের বন্ধু ত্রিভঙ্গ, এরাও বুদ্ধদেব সম্পর্কে এমনতরো মূল্যায়নেব অংশীদাব। শুধু 'অস্বাভাবিক' আর 'অসাধারণ' এই শব্দ দুটিতেই জনে জনে যা কিছু হেরফের।

বুদ্ধদেবের ব্যাপারে যে-ই জেনেছে, যে-ই শুনেছে, অবাক হয়ে গেছে। বড়লোকের একমাত্র ছেলে, স্কুল-ফাইন্যালে তিনটে লেটাব, আই-এ তে ফার্স্ট ডিভিশন, ইংরাজিতে অনার্স পড়ছিল। এই অবস্থায় কেউ লেখাপড়া ছেড়ে চাকরি নিয়ে চলে আসে! তাও এমন একটা চাকরি যার তিন-তিনটে নাম! ত্রিভঙ্গ পুরকায়েত, পঞ্চায়েত অফিসার কৃষ্ণনাগ যাকে বলে, আধা নয়, একেবারে পুরো কায়েত। মরে জলে ভাসলেও কাকেরা ভয়ে ঠোকরায না। কায়েত মরে জলে ভাসে, কাক ভাবে কোন্ ছলে ভাসে! এসব কথা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো সাবালকত্ব অর্জন করেছে ত্রিভঙ্গ। চাকরির প্রথম দিনটিতে বুদ্ধদেবকে বলেছিল, এমন এক চাকবি করতে এসেছেন, যার তিনটে নাম। কেউ বলে ভি-এল-ডব্লু, কেউ বলে গ্রামসেবক, কেউ বলে রামসেবক অর্থাৎ কিনা হনুমান। তো, এমনি একটা চাকরিতেই সবার অমতে যোগ দিয়ে বসল বুদ্ধদেব। বিডিও সাহেব, হরবল্লভ, সুকুমার, ত্রিভঙ্গ, এমন কি মল্লিকাও, সকলেই যে যার মতো করে ব্যাখ্যা করেছে বুদ্ধদেবের এই অস্বাভাবিক আচরণকে। বিডিও সাহেব

বলেছেন, মাথায় শিট আসে পোলার। হরবল্লভের মতে, ভিতরে ভিতরে হাড়-বজ্জাত। বাপের তাড়নায় গৃহত্যাগ। ত্রিভঙ্গ বলে, তোমাদের মেদিনীপুরের লোকগুলোর মাইরি একটা দেশোদ্ধারের বাতিক রয়েছে। চোদ্দ বছরের বাচ্চা ক্ষুদিরাম থেকে সত্তর বছরের বুড়ি মাতঙ্গিনী অবধি দেশোদ্ধারের নেশায় পাগল। আরে, তোমার মতো রেজাল্ট থাকলে আমি কি এম-এ-র আগে থামি হে! মল্লিকা একান্তে বলে, চেহারাটি তো বেশ নধরকান্তি, সত্যি করে বল তো, কোনও ধরনের চোট-আঘাত নেই তো বুকে! মল্লিকার ধাতটাই এমন। সময়ে সময়ে বড়ই প্রগলভা। মেয়েরা সাধারণত একটু মুখচোরা হয়। ও ঠিক তার উল্টো। আবার সিরিয়াস কাজকর্মের সময় সামান্যতম তারল্য সহ্য করে না।

সুকুমার আচার্য প্রশ্রয়ের হাসি হেসেছিল । বলেছিল, সিদ্ধান্তটায় আবেগ যতখানি, প্রস্তুতি ততটা নাই। বুদ্ধদেব বলে, এমন বলছেন কেন? সুকুমার বলে, ঠিকই বইল্‌ছি। চিকিৎসা কইর্‌তে হইলে রোগ নির্ণয় কইর্‌তে হয়। রোগ নির্ণয় কইর্‌তে হইলে, রোগীকে দীর্ঘ সময় অনুপুঙ্খ দেইখ্‌তে হয়। নানাভাবে পরীক্ষা কইর্‌তে হয় উয়াকে। আপনি আজীবনকাল শহরবাসী। গ্রামকে দেখেন নাই। উয়ার রোগগুলানকে চিনেন না। কী সেবা কইর্‌বেন? কুন ওষুধে উয়ার উপশম হব্যেক আপনি কী কইরে জানবেন? আপনার তো শুধুই আবেগ। আবেগের বশবর্তী হইয়ে জলে ঝাপাঁই পড়া চলে, তবে নদী পারাতে হইলে সাঁতারটাও শিখতে হয়, নদীর ভাব-গতিককে চিনতে হয়। শুধু আবেগ দিয়ে নদী পারানো যাবেক নাই। খুব দার্শনিক কণ্ঠে বলে সুকুমার, আবেগ হইল্যাক উথলানো দুধের মতন। সামান্য তাপে ফুইল্যে-ফাঁইপ্যে কড়াই থিকে উপ্‌চাই পইড়্‌তে চায়। আবার সামান্য জলছিটা দিলেই চুপসাই যায়। বিবেকানন্দের 'হে ভারত ভুলিও না' পড়ে, মুকুন্দ দাসের স্বদেশী গান শুনে, আর কলেজ-মাঠে জহরলাল নেহেরুর বক্তৃতা শুনে আপনার মনে হইল্যাক, গেরাম গইড়্‌তে হব্যেক! অত সোজা লয়। গাঁগুলা সব হাঙ্গর-কুমীরের পেটে। সিখ্যেনে ঢুকতে হইলে বুকের পাটা চাই। অনাথবন্ধু বলেন, সুকুমার পোড় খাওয়া ছোকরা। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গ্রামটাকে চিনেছে সে। তার কাছে আবেগের কোনও মূল্য নাই। কিন্তু জীবনে আবেগের মূল্যও কিছু কম নয়। বরং আবেগই সৃজনশীল মানুষের মূল চালিকাশক্তি। আবেগই তো জীবনে আনে সেই মহার্ঘ বেগ, যার টানে ব্যক্তিগত সুখ, আরাম, নিরাপত্তাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে ঝাঁপ দেওয়া চলে আগুনের নদীতে। হিসেবি মানুষদের হিসেব কষতে কষতেই জীবন কাবার হয়ে যায়। জীবনে আবেগ না থাকলে ব্যক্তিস্বার্থহীন ঝুঁকি নিতে পারে না কোনও মানুষ। নইলে, আই-সি-এস পরীক্ষায় পাশ করেও নিশ্চিন্ত বিলাসবহুল জীবনের হাতছানিকে অগ্রাহ্য করে কাঁটা বিছানো পথকে বেছে নেবার শক্তি পান কিভাবে নেতাজীর মতো মানুষেরা।

দীপমালার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তিনি পুরো বিষয়টিকে একেবারে স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলেছিলেন, দেশের প্রতি যদি তোমার কোনও আবেগ নাও থাকে, তবুও, একেবারে বাস্তব প্রয়োজনে এবং তোমার নিজের স্বার্থেই তোমাকে দেশ গড়বার কাজে নামতে হবে। ধর, উন্নত প্রথায় চাষবাস শুরু হয়েছে দেশে। উন্নত জাতের বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশকের ব্যবহার.. । উন্নত পদ্ধতি । ঐসব নিয়ে কৃষিদপ্তর পুস্তিকা ছাপাচ্ছে, বিলি করছে চাষীদের মধ্যে। কিন্তু দেশের চোদ্দআনা চাষী যদি নিরক্ষর থেকে যায়, কে পড়বে ঐসব পুস্তিকা? কে ব্যবহার করবে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক আর উন্নত প্রক্রিয়া? দেশে হু-হু করে মানুষ বেড়ে যাবে, অথচ ফসল বাড়বে না, খাদ্যভাণ্ডারে টান

তো পড়বেই। ফলে, ধান-চাল, শাক-সবজির দাম যাবে বেড়ে। মূল্যবৃদ্ধির সেই আঁচ তোমাকে পোহাতে হবে না? হু-হু করে মানুষ বেড়ে যাচ্ছে দেশে, অথচ সংস্কারবশত জন্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াগুলো কিছুতেই নিতে চাইছে না দেশের নিরক্ষর মানুষ, এ তোমার ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়? চালের দোকানে যখন দ্বিগুণ-তিনগুণ মানুষ লাইন দেবে তখন তোমার ভাগে টান পড়বে না? শত শত বিঘে জমির দখল নিয়ে বসে রয়েছে মুষ্টিমেয় মানুষ। তারা অত জমি বছরে একবারও ভালভাবে চাষ করে উঠতে পারে না। পাশাপাশি, হাজার হাজার মানুষ ভূমিহীন। তাদের প্রত্যেকে দু'বিঘে করে জমি পেলে সারাক্ষণ ঐ জমিতে পড়ে থাকত না? হাজার বিঘে জমি একজনের মালিকানায় থেকে অনাদরে যে ফসল দেয়, পাঁচশো মানুষের হাতে পড়লে তাদের বাৎসল্যস্নেহে আরও অনেক ফসল ফলত কিনা? সেই ফসল তো দেশের খাদ্যভাণ্ডারেরই অন্তর্ভুক্ত হত। তাতে কি তোমারও সুবিধে হত না? কিন্তু দেশব্যাপী নিরক্ষর মানুষের দল, চেতনার সবচেয়ে নিচু স্তরে থাকলে, আজীবন অদৃষ্টবাদী হয়ে বাঁচলে, কারা এই সম্পত্তির পাহাড়গুলোকে ধ্বসিয়ে সমতল করবে? দেশের চোদ্দআনা মানুষ ডুবে রয়েছে কুসংস্কারে। ঠাকুর-দ্যাবতা, ভূত-প্রেত, ডাইনী-ওঝা, বাবা-ঠাকুর, তাবিচ-কবচ, ঝাড়ফুঁকের খপ্পর থেকে তাদের মুক্তি নেই। জাত-পাত, ধর্ম-সম্প্রদায় নিয়ে অবিরাম রক্তগঙ্গা বইছে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষ তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োগ ঘটাবে কোথায়? চারপাশের অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের এতখানি চাপ কতদিন সইতে পারবে তুমি? কতদিন নিজেকে শিক্ষিত, আলোকিত রাখতে পারবে? একটা দুর্গন্ধময় ঘরে দীর্ঘ সময় বাস করলে তোমার শরীরেও লেপটে যাবে দুর্গন্ধ। তারপরই দীপাদি আবৃত্তি করেন সেই কবিতার পংক্তিগুলি ঃ যারে তুমি নিচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে/ পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে/ অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে, তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান. ।

কর্মচারী সংগঠনের বিষ্ণুপুর শাখাটি তখন বেশ নড়বড়ে। প্রণয়দা, প্রণয় দাশগুপ্ত, হুগলির মানুষ, প্রাণপণে গড়ে তুলছেন সংগঠনটিকে। বলেছিলেন, কাজের মানুষের বড়ই অভাব এদেশে। দাসবৃত্তিও প্রবল। তোমাদের মতো ছেলেরা যত আসে ততই মঙ্গল। তবে দৃষ্টিভঙ্গিটা পরিষ্কার থাকা চাই। সেটাই আসল। তোমরা এসে এই সংগঠনের দায়িত্ব নাও। প্রণয়দা যে গোপনে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য এটা বুদ্ধদেব জেনেছে অনেক পরে। সংগঠনে যেহেতু সব রাজনৈতিক মতবাদের মানুষই রয়েছে, বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, কে কংগ্রেস, কে কম্যুনিস্ট। প্রাণকৃষ্ণ সাহা, বিষ্ণুপুর শাখার সভাপতি, মনে প্রাণে কংগ্রেসের সমর্থক, রামকমল চক্রবর্তীর ভাবি বশংবদ সে। প্রণয়দা একান্তে বলেছিল, সংগঠনের যা রাজনৈতিক চেহারা, কোনই স্বপ্নকেই সফল করা সম্ভব নয়। দু'নৌকোয় পা দিয়ে এ দুনিয়ায় কিছুই করা যায় না। তোমরা এসে পরিস্থিতিটা বদলাও।

বুদ্ধদেবকে নিয়ে এত মানুষের এত ব্যাখ্যা, গবেষণা, কিন্তু বুদ্ধদেব তো জানে, সব কিছুর মূলে ঐ স্বপ্নটা, যা ওর দু'চোখে কাজলের মতো এঁকে দিয়েছিলেন ঐ হিরণ্ময় মানুষটি, যাঁর বুকে সদাসর্বদা থাকত একটি রক্ত গোলাপের কুঁড়ি।

সেই পুরোনো স্বপ্নটাতে একটু একটু করে আক্রান্ত হচ্ছিল বুদ্ধদেব, হাতে ভাঁজ করা কাগজটি থাকা সত্ত্বেও ঐ হিরণ্ময় মানুষটির ছবি ভেসে বেড়াচ্ছিল রাতের আকাশে, মাঠে, নদীতে. ., সর্বত্র একখানি মুখ, হাওয়ায় কেবল একটি মাত্র কণ্ঠস্বর, এসো, এসো, তোমরা এসো, তোমরা সবাই এসো. । বত্রিশভাগীর জঙ্গলের ভেতর থেকে ধেয়ে আসছে হাওয়ার দল।

হাওয়া, হাওয়া। মিহি সুরেলা আওয়াজ তুলেছে অবিরাম। রিঁ রিঁ..। সেই মিহি, তীক্ষ্ম সুর বুদ্ধদেবের মগজের মধ্যে ঢুকে তোলপাড় তুলছিল, আয়, আয়, আয়.। মগজের মধ্যে নেশা নেশা ভাব। মগ্ন, আচ্ছন্ন যাবতীয় অনুভূতি...। একেবারে ডুবে যাচ্ছিল বুদ্ধদেব। নিঃশেষে তলিয়ে যাচ্ছিল একটু একটু করে। ঠিক সেই মুহূর্তে আচমকা পেছন থেকে কেউ বলে ওঠে, রামসেবকবাবু যে!

তন্দ্রাখানি ভেঙে যায় বুদ্ধদেবের। সে দেখে, তার সামনে ভাদ্রের সবুজ মাঠ, কচি ধান গাছের ডগায় হাওয়াদের তৈরি সবুজ ঢেউ, হরিণমুড়ির পাশে আধফোটা কাশফুলের ঝাড়, গাঢ় কমলালেবুর মতো পড়ন্ত বিকেলের নরম রোদ্দুর। ডাইনে, গামিরতলার জঙ্গলের মাথায় সূর্য ডুবছে। রক্তবর্ণ ধারণ করেছে পশ্চিম আকাশ। পাখিপাখালের দল ঘরে ফিরছে, আর সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে পাগল শিকারি হলুদ দাঁত বের করে হাসছে। তার সারা শরীরে দিনভর পরিশ্রমের ঘাম ও অবসাদ, মুখে দিনান্তের ফুরিয়ে আসা হাসি। বুদ্ধদেব তাকে দেখামাত্র স্বভাবে ফিরে আসে। আচমকা স্থান-কাল-পাত্রজ্ঞান ফিরে আসে তার মধ্যে। তার মনে পড়ে যায়, গেল দু'দিন তার ওপর দিয়ে অবিশ্রাম ঝড় বয়ে চলেছে। মনে পড়ে যায়, সব ঠিকঠাক চললে এতক্ষণে হরিণমুড়ির দু'পাড়ে একটা রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু পাগল শিকারি পাশটিতে দাঁড়িয়ে দাঁত গিজুড়ে হাসছে।

পাগল শিকারি নিঃশব্দে হাসছিল। বুদ্ধদেবের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, এই গাছের তলায় ঝোড়ের মধ্যে বুইসে বুইসে স্বপন দেখছেন নাকি? উদিগে যে আপনাকে খুইজে খুইজে সবাই আলা। কারা বুদ্ধদেবকে খুঁজে চলেছে, তা ওর জানাই। কেন যে খুঁজছে, তাও বুঝতে বাকি নেই। ওদেরই চোখ এড়িয়ে আজ দু'দিন প্রকৃতপক্ষে আত্মগোপন করে রয়েছে সে। তবুও শুধোয়, কে খুঁজছে আমাকে? কে আবার? বিডিও সাহেব, এস-ডি-ও সাহেব, থানার বড়বাবু..। বুদ্ধদেব সামান্য বিস্মিত, হরবল্লভ সিংহবাবু খুঁজছেন না? পাগল শিকারি হতচকিত। ধন্দে পড়ে যায়। বলে, শুনি নাই তো। খুইজতেও পারে। কিন্তু আপনি এই সাঁঝের বেলায় এই খাঁ-খাঁ জঙ্গলের ধারে একলাটি বুইসে কচ্ছেন কি?

মনের ভেতরে অস্থির ঝড়টাকে প্রাণপণে গোপন করে বুদ্ধদেব। ঠোঁটের ডগায় বহুকষ্টে হাসি ফুটিয়ে বলে, একটা স্বপ্নই দেখছিলাম পাগলদা। তুমি এসে ওটা ভাঙিয়ে দিলে। তোমরা সবাই মিলে ভাঙিয়ে দিলে। সে এমন একটা স্বপ্ন.'

—বইল্বেন নাই। পাগল শিকারি হাঁ-হাঁ করে ওঠে, রামসেবকদা, বইল্লে স্বপন নাই ফলে। তারপর মুখে একপ্রস্থ যষ্টিমধু-হাসি ফুটিয়ে বলে, আমিও যা একখান স্বপন দেইখেছি না! যদি বইল্তে পারথ্যাম, বুঝতেন।

কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না বুদ্ধদেবের। তাও গলায় 'কথার কথা' জাতীয় পলকাভাব আনে, বলই না, শুনি।

—কী বইল্ল্যাম তেবে আপনাকে? মুখে বইল্লে স্বপন মিছা হইয়ে যায়। অধর ঝারমুনিয়ার সাথ ভেট্ হইল্যাক, উয়াকে বইলল্যাম নাই। পরীক্ষিতদার সাথ ভেট হইল্যাক, উয়াকেও বইল্ল্যাম নাই। বলতে বলতে ঘাড় থেকে কোদালখানা নামিয়ে আনে পাগল শিকারি। বাঁটখানা নিজের পাছায় ঠেক্না দিয়ে চেয়ারে বসবার মুদ্রায় স্থিত হয়। বুকের মধ্যে বুঝি গুছিয়ে নেয় স্বপ্নটাকে। বসবার জন্য প্রস্তুত হয় মনে মনে। আর সেই মুহূর্তে বুদ্ধদেব দেখতে পায় হরিণমুড়ির বাঁকের ওপর বাজ্জেপোড়া ঐ ছন্নছাড়া তালগাছটার মাথা বরাবর সূর্যটা

রক্তকুণ্ডলি পাকিয়ে ডুবছে। কেমন যেন ফ্যাকাসে লাগছে সূর্যটাকে। সস্তা কাগজে ছাপানো মনীষীদের ছবিতে, মাথার ঠিক পেছনে যেমন কমলা-হলুদ রঙের চাকতি আঁকা থাকে...। পেছনে থালার মতো চাকতি ধারণ করে মূর্তিটির নিমীলিত চক্ষুদুটি, ধ্যানে মগ্ন, কিংবা অন্য এক স্বর্গধামের স্বপ্নে বিভোর। তালগাছের উসকোখুসকো মাথাটিকে, পেছনে কমলাটে হলুদ থালা সহকারে, মনে হচ্ছিল কোনও বিকারগ্রস্ত, স্বপ্নে বিভোর কাপালিক। মরণ-গাছ! মরণ-গাছও কী স্বপ্ন দেখে! বিশেষ করে যে গাছের তলায় বসলে আত্মঘাতী হতে চায় মানুষ, তেমন গাছের পক্ষে কি স্বপ্ন দেখা সম্ভব!

পাগল শিকারি সম্ভবত তাব নতুন স্বপ্নটা বলবার জন্য উশখুশ করছে। মরণ-গাছের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয় বুদ্ধদেব। বলে, তুমি যাও পাগলদা। ওদের বল, আমি আসছি।

পাগল শিকারি চলে যায়। বুদ্ধদেব পেছন থেকে ওর চলে যাওয়া দেখে। দু'পা এগিয়েই থমকে থেমে যায় পাগলের পা। ঘাড় ঘুরিয়ে বুদ্ধদেবকে দেখতে থাকে অপলক। সারা মুখে এক ধরনের ব্যাকুলতা। বুদ্ধদেব জানে, এমন রমনযোগ্য নির্জনতায় বুদ্ধদেবকে একলাটি পেয়ে পাগলের হৃৎপিণ্ডের ভেতর থেকে নিঃশব্দে উঠে এসেছে সুধন্য নামের এক মানুষ। সেই মানুষ এখন তাব পরিচয় জানতে চায়, অর্থও। পাগলের হৃদপিণ্ডের গুহায় আজীবনকাল বসবাসকাবী 'সুধন্য' নামের মানুষটি নিজের পরিচয় বাসনায় মাঝে মাঝে হিংস্র হয়ে ওঠে। পাগল শিকারি।

লোকটাকে ভারি আশ্চর্য লাগে বুদ্ধদেবের। বড়ই রহস্যময়। প্রথম যেদিন আলাপ হয়েছিল ওর সঙ্গে, সেদিনটার কথা মনে পড়ে। তখন সবেমাত্র লায়েকবাঁধ ইউনিয়নে পোস্টিং হয়েছে বুদ্ধদেবের। চুয়ামসিনার সিংহগড়ে থাকবার ব্যবস্থা। সিংহবাবুরা গরুরগাড়ি পাঠিয়েছেন বুদ্ধদেবের জন্য। গাড়ি নিয়ে গিয়েছে পাগল শিকারি। অযোধ্যার গ্রামসেবক ত্রিভঙ্গ পুরকায়েতও সঙ্গে এসেছিল, জয়কৃষ্ণপুরের মোড়ে নেমে চলে গিয়েছে অযোধ্যা। গাড়িতে কেবল বুদ্ধদেব আর পাগল শিকারি। দুপুর ছুঁই ছুঁই। রাঢ়ের গ্রীষ্মের দুপুর মানে আকাশ থেকে অগ্নিবর্ষণ, চারপাশে ঝলা বাতাসের হল্কা, রুখা-শুখা ডাঙা নিঃসাড়ে আগুন গিলছে, মাঝে মাঝে যখন দম ছেড়ে দিচ্ছে, আকাশে উঠে যাচ্ছে ধুলোর কুণ্ডলি। বুদ্ধদেব দরদরিয়ে ঘামছিল। পাগল শিকারি এমনিতেই কথা কয় কম, সেদিন আরও চুপচাপ ছিল। বুদ্ধদেবই এটা ওটা শুধোচ্ছিল হরেক বিষয়ে। পাগল শিকারির চোখ দিয়ে রাঢ়কে একটু একটু কবে চিনছিল।

আচমকা পাগল শিকারি বলে ওঠে, একটা কথা জিগাবো রামসেবকবাবু?

—কী কথা?

—বইল্‌তে পার, সুধন্য নামের মানে কি?

বুদ্ধদেব হকচকিয়ে যায়, সুধন্য? কোন্‌ সুধন্য?

—হাই দাখ, আমি জিগালাম্‌ তুমাকে, তুমি জিগালে আমাকে। ত, জবাব কে দিবেক বটে? ভূতে? পাগল শিকারি বুঝি সামান্য ক্ষুব্ধ। বুদ্ধদেবের গলা শুনেই সে বুঝে নিয়েছে সুধন্য নামটাব মানে লৈতন রামসেবকবাবুটির ঠিক ঠিক জানা নেই। বলে, হায় বাবুগ, কত জনকে জিগালাম, কোউ নাই জানে একটা নামের মানে!

বুদ্ধদেব উঠে দাঁড়ায়। পায়ে পায়ে হাঁটা দেয় হরিণমুড়ির দিকে। সবুজ ক্ষেতের মধ্য দিয়ে, আলপথ ধরে ধরে সে হাজির হয় হরিণমুড়ির বাঁকে। বাজে-পোড়া তালগাছখানা, যার

দিকে তাকিয়ে বুদ্ধদেব খানিক আগে দেখেছে ডুবতে থাকা রক্তকুণ্ডলি সূর্যকে, যাকে এলাকার মানুষ বলে মরণ-গাছ, এমন গাছের তলায় গেলে মানুষের মনে আত্মহত্যাব বাসনা জাগে, দাঁড়িয়ে রয়েছে জলের ধার ঘেঁসে। নদীর জলে তার ছায়া পড়েছে। বুদ্ধদেব গিয়ে মরণ-গাছের তলায় বসা মাত্রই নদীর জলে তার ছায়া ভেসে ওঠে। বুদ্ধদেব নিজের ছায়াখানিকে চারপাশের ঝোপঝাড়ের ছায়ার থেকে পৃথক করবার চেষ্টা চালায়। আর, তখনই তার মনে হয়, নদী এক আশ্চর্য দর্পণ।

নদী নামক এক মায়া-দর্পণে নিজের ভাঙাভাঙা প্রতিবিম্বখানি দেখতে দেখতে বুদ্ধদেব তার শেষতম স্বপ্নখানি দেখে নিতে পারে।

ইতিহাসের নায়ক ও খলনায়কগণ

সব মানুষই বুঝি সারা জীবন ধরে স্বপ্নই দেখে যায়। যে যাব নিজস্ব স্বপ্ন। কিস্তিতে কিস্তিতে ধারাবাহিক একটাই স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখতে দেখতেই বীজের অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। কচি পাতা খোলে। পরিণত হয়। সে পাতাও একদিন হলুদ হয়ে ঝরে যায়। তবুও তার স্বপ্ন দেখা ফুরোয না। তেমনই এক স্বপ্নের টানে ঘর ছাড়ল বুদ্ধদেব। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সবাইয়ের অনুনয়, সতর্কবাণীকে অগ্রাহ্য করে আচমকা নেমে পড়ল এক অচেনা দীঘির জলে। অচেনা জল আর চেনা শ্মশান, দুইই নিদারুণ শঙ্কাজনক। অনিশ্চিত। সেই অনিশ্চিত ভুবনে যখন পা রাখল বুদ্ধদেব, চোখে ছিল এক মায়াকাজল। সামনে ভাসছিল এক হিরণ্ময় মানুষের মুখ। গৌরবর্ণ, দিব্যকান্তি, বুকে তাঁর সর্বক্ষণ রক্তগোলাপের কুঁড়ি..। তিনি মুনাফাখোর আর ভেজালদারদের সবচেয়ে কাছের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেবার শপথ নিয়েছিলেন লিখিতভাবে। তিনি দেশের সমস্ত তরুণের কলিজার খুন দাবি করেছিলেন স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষকে গড়তে। তিনি দেশের যুবশক্তিকে দধীচি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কাঁথি কলেজের মাঠে, এক মন্থর অপরাহ্নে সেই হিরণ্ময় পুরুষের বক্তৃতা শুনতে শুনতে যে সোনার ডিমটিতে তা দেওয়া শুরু হল, ডিমখানি ফোটানোর মগ্নতায বুদ্ধদেব যা সব অলৌকিক স্বপ্নাদি দেখেছিল, তার জন্য একটা নিটোল জীবনকে আঙুলেব ফাঁক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঝরিয়ে দেওয়া ছিল বুদ্ধদেবের কাছে অতি সামান্য ব্যাপার। ফলে সে ঘর ছাড়ল। ইহকাল পরকাল বিস্মৃত হল। তাব চোখের মণিজোড়া মগ্নতায় ঘোলাটে হয়ে এল। এবং সেটা ছিল চৈত্র মাস, সে এসে দাঁড়াল এমন একটি মানুষেব মুখোমুখি, যাকে প্রথম দর্শনেই বুদ্ধদেবের মনে হল, এই মানুষটি ছেলেবেলায় হাঁসের পেটের তলা থেকে নিঃশব্দে ডিম সরিয়ে নেওয়ায় সিদ্ধহস্ত ছিল। সেটা ছিল চৈত্র মাসের ঝলা দুপুর। আকাশে সূর্যদেব বিষবাতি হয়ে জ্বলতে লেগেছিল। আর, রাঢ়ের প্রাচীন শহর বিষ্ণুপুরেব তামাটে আকাশে চক্কর মারছিল ডোমচিলেব দল। প্রায় দুপুরের গণ্ডী ছুঁয়ে ফেলেছিল দিন, কিন্তু পুরোদমে কাজ শুরু হয় নি অফিসেব কোনও টেবিলেই। এবং প্রৌঢ় গাঁট্টাগোট্টা ভাঙাপানা মানুষটি দরজার মুখে দাঁড়িয়ে এক মনে সিগারেট টানছিলেন। গাঢ় নীল ধোঁয়া ভেসে বেড়াচ্ছিল লোকটিব চারপাশে, কড়া তামাকের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে গিয়েছিল হাওয়ায়। নীল ধোঁয়া আভিজাত্যেব সঙ্কেত। সব তাম্রকূট থেকে তা বেরোয় না। সিগারেটের এক-প্রান্ত মুঠির মধ্যে চেপে, মুঠিখানা মুখের ওপর চেপে ধরে লম্বা টান মারছিলেন। প্রতিটি টানে সিড়িঙ্গে শরীরখানা পেছনের দিকে ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছিল। বুদ্ধদেব গলা দিয়ে শব্দ করায়, শরীরখানিকে একচুল না নড়িয়ে কেবল মণিজোড়া অল্প তির্যক করে দেখে নিয়েছিলেন অচেনা আগন্তুককে।

এবং 'বিডিও সাহেব আছেন?' এর জবাবে কফ-শ্লেষ্মায় ঘড়ঘড়ে গলায় বলেছিলেন, এটা খিরকি। বুদ্ধদেব দেখেছিল, মানুষটির মাথার তিনপাশে দু'চার গাছি চুল, কিন্তু পরিপাটি করে আঁচড়ানো। মাথার মাঝখানটি অনাবাদি জমির মতো খাঁ-খাঁ। এবং জনবহুল মন্দিরের সুমুখভাগের বহু ব্যবহৃত চাতালের মতো তেল চকচকে। এটা ভেবে বুদ্ধদেবের বুকের পাঁজরে বেশি-পোড়-খাওয়া-হাঁড়ি-কলসীর গায়ে পরীক্ষামূলক টোকা মারার আওয়াজ, টুং-টাং-টুং, এই কারণে যে, এই মানুষটিই দেশ-গড়বার সৈনিকদের প্রাথমিক স্তরের সেনাপতি। এবং পরীক্ষা দিতে বেরোবার মুহূর্তের টিকটিকির ডাক-সোনা জনিত মন-খারাপের-অনুভূতি এই কারণেই যে, বুদ্ধদেব প্রথম দিনই খিড়কিকে সদর বলে ভুল করল। খিড়কির পথ তো সদা-সর্বদাই সঙ্কীর্ণ, সংক্ষিপ্ত। সদরের মতো প্রশস্ত, আলোকিতও নয়। তাছাড়া তার শরীরে লেগে থাকে আঁশটে গন্ধের মতো, কিছু কলঙ্ক, গুপ্ত পদছাপ, অনেক গল্প-গাঁথা-রটনা। খিড়কি নিজেকে লুক্কায়িত করবার জায়গা। নিজেকে অনাবৃত করে দেবার উপযুক্ত আবৃত স্থান। অবশ্য পরে, অনাথবন্ধু, সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন বুদ্ধদেববাবু, তখনও অবধি অনাথবন্ধু বুদ্ধদেবকে 'আপনি' বলতেন, প্রাক-স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রায় পুরোটাই খিড়কি পথে হাঁটাহাঁটির ইতিহাস। তারপর থেকেই ঝোপ-জঙ্গল আগাছা জন্মাতে শুরু করেছে সদর পথে। দেখবেন, একদিন সদর পথখানি পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়ে যাবে। খিড়কি-পথই জনবহুল হবে। এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার ঘটবে যেটা, খিড়কির দিক থেকে, সদরপন্থী মানুষদেরই খিড়কিপথজীবী মনে করা হবে। বলেই অনাথবন্ধু, ইদানীং যা করে থাকেন, শুনিয়ে দিলেন এক গল্প। বুঝলেন বুদ্ধদেব বাবু, ছেলেবেলায় বিষ্টুপুর রথের মেলায় একটা সস্তাদরের ছবি কিনেছিলাম। হাতে-আঁকা ছবি, অতি মামুলি, খুব সাধারণ কাগজে ছাপা। ছবিখানা হল এক পাঞ্জাবী যুবকের মুখ। বলতে পারেন, এমন একখানা মামুলি ছবি কেন কিনলাম? তো বলি, কিনলাম একটি মাত্র কারণে, ভারি এক মজা ছিল সে ছবিতে। সে মুখের সদর-খিড়কি বোঝা মুশকিল। মাথার পাগড়ি আর চিবুকের দাড়িতে এমনই সেয়ানা প্যাঁচ, জোড়া ভুরু, জোড়া গোঁফে, চোখে, ঠোঁটে, এমনই কিছু চতুর সাধারণ-চিহ্ন যে, দু'দিক থেকেই ওটা পাঞ্জাবীর মুখ। একদিক থেকে যখন ওপরের দিকটা পাগড়ি, চিবুকের তলারটা তখন দাড়ি। কপালের বলিরেখা, কুঞ্চিত ভুরুজোড়া, নাক, টাঙির মতো বাঁকানো গোঁফজোড়া, তার তলায় একজোড়া ঠোঁট। উল্টে দিলেই দাড়ি হয়ে যায় পাগড়ি, এবং পাগড়ি পরিণত হয় দাড়িতে। আগের ঠোঁট জোড়া এখন কপালের বলিরেখা, গোঁফজোড়াটি এখন হল জোড়াভুরু। সাবেক জোড়াভুরু পরিণত হল গোঁফে। সব মিলিয়ে এটাও পাঞ্জাবির মুখ। বলুন দেখি, এমন মুখের কোন্‌টা সদর, কোনটা খিড়কি? একখ'না মজার গল্প বললেন, কিন্তু গল্পের শেষে অনাথবন্ধুর মুখখানি হল এমনই খ্রীয়মাণ, এমনই অপরাধ জমল তাঁর চোখের মণিতে, যেন তিনিই এঁকেছিলেন ঐ বিদ্‌ঘুটে ছবিখানি, যার সদর-খিড়কি একাকার। যেন তিনিই ঐ বিভ্রান্তিকর চিত্রশিল্পের মাননীয় স্রষ্টা। এমন করুণ চোখে তাকালেন বুদ্ধদেবের পানে, যেন এমন একটি ছবি আঁকবার জন্য নিঃশর্ত মার্জনা ভিক্ষা করছেন সবাইয়ের কাছে। সুকুমার আচার্য সঙ্গোপনে জানায়, কিছুদিন যাবৎ এই জাতীয় কিছু পরিবর্তন খুব দ্রুত ঘটে যাচ্ছে অনাথবন্ধুর মধ্যে। সে ভারি ভয়াল ভাঙন। আমাদ্যার ভয় লাগে, না জানি এক বড়-সড় ধ্বস নামে মনে। ভয় হয়, মনের মধ্যে না অকস্মাৎ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে মানুষটা। সেসব অনেক পরের কথা। পাগল শিকারি ধাঁধা শুনতে ভালবাসে, বলতে ভালবাসে, দেখা হলেই বলে, একটা ধাঁধা বলেন তো। দেখা হতেই শুধোলো, বলেন ত, রুপার টাকার কুন

দিগ্‌টা সদর? বুদ্ধদেব বুঝতে পারে নি, এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে বিতাং করে বোঝায়, ধরেন, টাকার একদিকটায় মহাত্মা মাইন্‌ষের মূর্তি, অন্য দিকটায় হিজিবিজি আঁকিবুকির মধ্যে ঢ্যাঙা খেজুর গাছের মতো এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত লম্বা কইরে ইনজিরিতে 'এক' লেখা, দু'দিকের মধ্যে কুন্‌ দিকটা সদর, কুন্‌ দিকটা খিড়কি? আর তখনই বুদ্ধদেবের মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে দ্বারকেশ্বরের দ'য়ের উল্টো দিকে ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে ফুঁড়ে ওঠা খেজুরগাছটির ছবি। হামলে পড়ে শুধোয় বটে, কিন্তু জবাবটা জানার তত চাড় নেই পাগল শিকারির। বলে, ধাঁধাটা কে বল্যেছে বলুন ত? কে? পাগল শিকারি রহস্যময় হাসে, নাম বইল্‌তে বারণ। ফাঁসি হইয়েঁ যাব্যেক।

সমস্ত অফিসবাড়িটা পাক দিয়ে সদর দরজায় ফিরে এসেছিল বুদ্ধদেব। ঢ্যাঙাপানা মানুষটি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন বুদ্ধদেবের দিকে। পুরোপুরি বদলে গিয়েছিল তাঁর শরীরের সদর আর খিড়কি।

কাছিমের পিঠের মতো সেই অনাবাদী ভূমিটি বুদ্ধদেবের দিকে ঈষৎ হেলিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কিটা চাই? বলতে বলতে পায়ে পায়ে এসে বসে পড়েছিলেন নিজের চেয়ারে। আলতো হাতে ফাইল টেনে নিয়ে আচমকা ডুবে যাবার ভান করেছিলেন। বুদ্ধদেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারা ঘরে বোলাতে থাকে কৌতূহলী দৃষ্টির তুলি।

একখানা রঙচটা বিশাল টেবিল জুড়ে পেনদানি, এ্যাসট্রে, পেতলের কলিং বেল। গোটা-কতক নানা রঙের পেনসিল। পেপারওয়েট। গ্লাসভর্তি জল। এবং একরাশ স্তূপাকার বিবর্ণ ফাইল। বিডিও সাহেবের পেছনের দেয়ালে জাতির জনকের সেই পরিচিত ভঙ্গিমায় ছবি, হাতে লাঠি, কোমরে ঘড়ি। খালি গা। সেই ছবির গা ঘেঁসে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো ভারতের 'প্রি-এম্বল্'। খুব দামি কাগজে, খুব আলংকারিক হরফে লেখা, উই দ্য পিপ্‌ল্ অব্ ইণ্ডিয়া...। ঘরের দেওয়ালে হরেক বছরের গোটাকয় ক্যালেণ্ডার হাওয়ায় উড়ছিল। ডানদিকে একটা ঢাউস আলমারি। বাঁ দিকের দেয়ালে একটা বিশাল ব্ল্যাকবোর্ড। তাতে ব্লকের নানান পরিসংখ্যান লেখা। তথ্যগুলো সবই অতীতের। মোছা হয় নি। নতুন পরিসংখ্যান লেখা হয় নি। বুদ্ধদেবের আচমকা মনে হয়েছিল, কোথাও কোথাও এমনি করে বুঝি হঠাতই থেমে যায় সময়।

ফাইলে সই করতে করতে আচমকা হাঁক পাড়েন বিডিও সাহেব, গদাধর—। একটা রোগা প্যাটকা বুড়োমানুষ ঘরে ঢুকতেই হুকুম করেন, হাওয়া দাও। গদাধর পাখার রশি তুলে নেয় হাতে। বিডিও সাহেবের মাথার ওপর লাল কাপড়ের বর্ডার দেওয়া মাদুরখানা দুলতে শুরু করে। মিহি হাওয়া বয়। সে হাওয়াতে শরীর তত ঠাণ্ডা হয় না। কিন্তু শীতল প্রসন্নতা জমে মানুষটির মুখে। সম্ভবত, একটা মানুষ তাঁকে হাওয়া করছে গতর খাটিয়ে, এটাই তাঁর কাছে এক পরিতৃপ্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

সেদিন অনেকক্ষণ বাদে বুদ্ধদেবের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন বিডিও সাহেব। পরিচয় দেবার পর, অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, মিড্‌নাপুরের পোলা তুমি, ক্ষুদিরাম-সইত্যেনের দ্যাশের লোক, মনে রাইখ্যো, দিস ইজ এ সারভিস। স্যাবা। কত কষ্টে, কত কৃস্যাসাধনে দ্যাশে স্বাধীনতা আইসে। অহন দ্যাশটারে গইরা তুলবার দায়িত্ব হক্কলের। তোমাদের মতো ইস্পিরিটেড পোলাপান চাই লাখে লাখে। বয়েজ অফ্ ইস্পিরিট, বয়েজ অফ্ উইল, বয়েজ অফ্ মাসল, ব্রেন এণ্ড পাউয়ার/ ফিট টু ডিল উইথ এভ্‌রিথিং, দোজ আর ওয়ান্টেড এভ্‌রি আওয়ার। একনাগাড়ে এতখানি ইংরেজি কবিতা মুখস্থ বলে দিতে পারায় মনে মনে চমৎকৃত হন বিডিও সাহেব। নিজেই নিজেকে সাবাস জানান। মাখনের মতো

থিকথিকে আত্মশ্লাঘা জমে মুখের খাঁজেভাঁজে। নিজের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করবার নেশায় বুঝি পেয়ে বসে ওঁকে, কপালে সারবন্দী ভাঁজ তুলে, গলায় সামান্য ওজস্বিতা যোগ করে বলে ওঠেন, নট দা উইক অ্যাজ হুইনিং ড্রোন্‌স্...। হু উইল ট্রাবুল মেগ্‌নিফাই...। মিটিমিটি হাসছেন বিডিও সাহেব। রোমাঞ্চিত। নিজের গন্ধে নিজেই পাগল অবস্থা। এলিয়ে পড়েন চেয়ারের পিঠে। ঐ অবস্থায় চোখদুটিকে কপালের ও টাকের বিস্তীর্ণ ডাঙাখানি পার করিয়ে সোজা ঠেলে দেন মাথার ওপরে, ঠিক পেছনে, দেয়ালে ঝুলতে থাকা কাচের ফ্রেমে বাঁধানো লেখাগুলোর দিকে। অই দ্যাহ, মাথার উপরে কি ল্যাখা? উই-ই-দা পিপুল অব ইণ্ডিয়া —হ্যাভিং সলম্‌ন্‌লি রিজল্‌ভ্‌ড্ টু কনস্টিচিউট ইণ্ডিয়া ইন-টু এ সোভারিন, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, এ্যা—শু টু—। ঠিক মন্ত্র পড়বার মতো দুলে দুলে পুরোটা আউড়ে তবেই থামেন তিনি। কপালের তাবৎ বলিরেখায় অজস্র ঢেউ খেলিয়ে বলেন, মনে রাইখ্যো, সিন্‌সিয়ারিটি কস্ট্‌স্ এ লিটিল, বাট পে'জ এ মোর। বরোবাবু—, এ পোলাডারে ভর্তি কইরা লন গা।

বড়বাবুর বয়েস পঞ্চাশের ওপর। কালো কুচকুচে নাদুসনুদুস শরীর। মুখভর্তি দোক্তাপান। অতিরিক্ত পানের পিক ধারণ করবার সুবাদে তলার ঠোঁটখানি ঝুলে পড়েছে। মনে হয়, ফুলেটুলে যেন এক হৃষ্টপুষ্ট জোঁক। বড় বড় চোখ, কপালে তুললে বিশাল আকার ধারণ করে। মাথায় ঢেউ খেলানো কাঁচাপাকা বাবরি চুল। জোড়া ভুরু। কানের ডগায় দু'গাছি করে উদ্ধত লোম। বিডিও সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের চেয়ারে বসেন বড়বাবু। এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারখানা ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নেন বুদ্ধদেবের হাত থেকে। পরমুহূর্তে ডান হাতের তর্জনী এবং অনামিকা ফাঁক করে এগিয়ে দেন ওর দিকে, দেখি, একখান সিগ্রেট ছাড়ুন দেখি। বুদ্ধদেব সিগারেট খায় না শুনে দু'চোখ জ্বলে উঠেছিল পলকের তরে। পরমুহূর্তে হাঁক পেড়েছিলেন, ওহে ত্রিভঙ্গ, ব্লকে আরও এক রামসেবক এলেন। ঐখানে যান। লম্ফ ঝম্পগুলা শিখে লিন। হলঘরের এককোণে বসেছিল দু'জন কর্মচারী। একজন সামান্য বয়স্ক। অন্যজন বুদ্ধদেবেরই বয়েসী। হয়ত বা সামান্য বেশি। ও-ই বুদ্ধদেবকে ইঙ্গিতে ডাকে। ত্রিভঙ্গ পুরকায়েত। বয়স্ক মানুষটির নাম শচীনন্দন শাউ।

ত্রিভঙ্গ প্রথম থেকেই খুব আন্তরিক ছিল। বলেছিল, আমরা দুজনেই গ্রামসেবক। বসুন।

হলঘরের এককোণে যে দুটি মেয়ে বসে গল্প করছিল তাদের বয়েস উনিশ-কুড়ির বেশি নয়। ওদের মধ্যে যে মেয়েটি বুদ্ধদেবের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিল তার নামই যে মল্লিকা, সেটা একটুবাদে টের পেয়েছিল বুদ্ধদেব। ত্রিভঙ্গ ঐ মেয়েটির দিকেই তাকিয়ে শুধিয়েছিল, মল্লিকা, স্বদেশদা আজ অফিসে আসবে কিনা জান? অতি সরল প্রশ্ন, কিন্তু, কিছু প্রশ্ন কোনও রহস্যময় কারণে কারও কারও কাছে যে জটিল হয়ে উঠতে পারে, সেটা সম্যক বোঝা গেল মল্লিকা নামের মেয়েটির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখে। তার চোখের তারা অতিমাত্রায় সচেতন হল। ভ্রূ-সঙ্গমে চকিত ভাঁজ। চিবুকে চাপা কাঠিন্য। যুগপৎ সবগুলি পরিবর্তন একসঙ্গে। তৎসহ গলায় উষ্মার সঙ্গে নিরাসক্তি মিশিয়ে মল্লিকা বলল, স্বদেশদার খোঁজ রাখা আমার কাজ নয়। ত্রিভঙ্গ মুখ টিপে হাসে। সম্ভবত মল্লিকার এমনতরো প্রতিক্রিয়াই তার কাম্য ছিল। তার মুখে তাই প্রত্যাশাপূরণের চাপা তৃপ্তি। বুদ্ধদেবের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিচু গলায় বলে, ব্যাপার আছে। পরে বলব। গলা চড়িয়ে বলে, এখন জয়েনিং রিপোর্টখানা লিখে জমা দিন বড়বাবুর কাছে। ইন পারসোয়্যান্স অফ মেমো নম্বর সাচ এণ্ড সাচ, ডেটেড সাচ এণ্ড সাচ... বলে শুরু করুন।

মেয়েরা সহজে স্বীকার করতে চায় না, তাদের নাকি বুক ফাটে, তবু মুখ ফোটে না, কিন্তু মল্লিকা, অনেকদিন বাদে, এমন কি একান্ত সম্পর্কের আনকোবা ভাবখানা কেটে যাওয়ার পব স্বীকার করেছিল, যেদিন বুদ্ধদেব প্রথম আসে ব্লক অফিসে, সেদিনই, প্রথম দর্শনেই ওকে ভাল লেগে গিয়েছিল মল্লিকার। সেদিন সকালটা কিছু শুভ লক্ষণ বয়ে এনেছিল। ঘুম থেকে উঠেই চোখের সামনে দুটো শালিখ। দুটো শালিখ দেখলে বাড়িতে অতিথি আসে। কেউ আসবে, কেউ আসবে...কিন্তু কে আসবে। এরপর মল্লিকার মুখখানি মাখনের মতো কমনীয়। চোখদুটিতে উজ্জ্বল আভা। সহসা নাটকীয় গলায় বলে ওঠে, মনে পড়ে, অস্ত্র পরীক্ষার দিন হস্তিনানগরে, তুমি ধীরে প্রবেশিলে তরুণ কুমার রঙ্গস্থলে। পূর্বাশার প্রান্তদেশে নবোদিত অরুণের মতো। বোকা বোকা মুখ করে দাঁড়ালে বড়বাবুর সামনে। বড়বাবু তোমাকে রামসেবক বলল। তুমি হাসলে। তারপর ঐ পাজি ত্রিভঙ্গটার পাশে গিয়ে বসলে। জয়েনিং লেটার লিখলে। গোমুখ্যুটা তোমায় একের পর এক জ্ঞান দিতে লাগল, আর তুমি, ইংরেজি অনার্সের ব্রিলিয়্যান্ট ছাত্র, দু'চোখ দিয়ে হাঁদার মতো গিলতে লাগলে ওর কথা। তখন, সেই হলঘরে নারী ছিল যত, তার মধ্যে বাক্যহীনা কে সে অভাগিনী...।

—থাক্, থাক। প্রায় হাঁ-হাঁ করে মল্লিকাকে থামিয়ে দেয় বুদ্ধদেব,—আর এগিয়ো না। মায়ের পার্ট আউড়ে যাচ্ছ তুমি।

মল্লিকা হাসে। চোখমুখের অভিব্যক্তিতে বুঝিয়ে দেয়, এটা যে 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'-এ কুন্তীর আক্ষেপ কর্ণের উদ্দেশ্যে, সেটা ওর বিলক্ষণ জানা। পংক্তিগুলো এমন ক্ষেত্রে ভারি জুতসই বলেই ব্যবহার করবার লোভ সামলাতে পারে নি। আবৃত্তির গলাটি ভারি ভাল মল্লিকার। কিন্তু প্রকাশ্যে আবৃত্তি করতে মোটেও দেখা যায় না ওকে। এক-দেড় বছর মেলামেশা করবার পরও বুদ্ধদেব জানত না ঐ গুণটির কথা। হয়ত কোনদিনও প্রকাশ পেত না, যদি না আচমকা একদিন দীপমালাদি হাটে হাঁড়িটা ভাঙতেন। দীপমালাদি এমনও বললেন, মল্লিকা নাকি ওঁকে নিয়মিত আবৃত্তি শুনিয়ে আসে।

সেদিন জয়েনিং রিপোর্ট দাখিল করা মাত্র ত্রিভঙ্গ ওকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর দু'জনে সটান দুঃখহরণের চায়ের দোকানে। পথচলতি ত্রিভঙ্গ শুধিয়েছিল, চোখ নাচিয়ে, 'বুড়ো কি বলল? কি জ্ঞান-ট্যান দিল?' বুদ্ধদেব বুঝতে পারে বিডিও সাহেবের কথাই বলছে ত্রিভঙ্গ। বলে, 'অনেক কিছুই তো বললেন।'

—দেশ গড়বাব কথা বলে নি? প্রি-অ্যাম্বল আওড়ায় নি?

—বলেছেন।

—বোনডাস্ট আর ইউরিয়া ডেমোনেস্ট্রেশনের কথা বলে নি? ইণ্ডিয়া লিভ্‌স্ ইন ভিলেজেস?

বুদ্ধদেব হেসে ফেলে, 'বোনমিল আর ইউরিয়াটা কী বস্তু?'

—ঐটাই তো আসল। ত্রিভঙ্গ চোখ নাচায়,—ক্রমশ প্রকাশ্য। এগ্রিকালচার শুড বি দ্য ওনলি কালচার অফ দিস কান্ট্রি। বলে নি? সিনসিয়ারিটি কস্ট্‌স্ এ লিটিল?

বুদ্ধদেব হাসতে থাকে। একজনকে কতখানি অনুকরণ করলে 'লিটল'টা অবধি হুবহু একই রকম উচ্চারণ করে মানুষ, বুঝতে কষ্ট হয় না। বলে, 'আপনাদেরও একই কথা বলেছেন বুঝি?'

—সব্বাইকে। ত্রিভঙ্গ মুখ দিয়ে তেতো ওগরায়, বুড়ো একটি আস্ত ঘুঘু। ক্রমশ প্রকাশ্য।

ত্রিভঙ্গদের মেসে সীট ছিল। জায়গা হয়ে যায় বুদ্ধদেবের।

—কিন্তু একটা শর্তে। দু'চোখ কপালে উঠে যায় ত্রিভঙ্গর।—আমাদের নতুন মেসের হদিশ বুড়ো জানে না। পুরোনো মেসে বড্ড জ্বালাত। বুড়োর কাছে মেসের হদিশ লিক করা চলবে না।

—যদি জিজ্ঞেস করেন।

—ভুল ঠিকানা দেবেন। উল্টোপাল্টা ডাইরেকশন দেবেন রাস্তার। আমরাও তাই দিই।

ত্রিভঙ্গদের মেসে জায়গা হয়েছে শুনে বিডিও সাহেব মহাখুশি। তবে তো হিল্লা হইয়া গেল গা। ও ভবানী, কই গেলা, রাইচরণরে কও, এ পোলারে ত্রিভঙ্গদের মেসে পৌঁছাইয়া দিয়া আসুক গা। আর, তুম্মো যাও। অর পারসুন্যাল ইফেক্ট তুইল্যা দিয়া আইস গা।

রাইচরণ ব্লক-জীপের ড্রাইভার। ভবানী আর কিশোরী বিডিওর দুই পিয়ন।

—আমরা বলি ডাকিনী আর যোগিনী। ত্রিভঙ্গ বলে,—মহাদেবের থাকে না?

মেসে বাক্স-বিছানা নামিয়ে দিয়ে ব্লকের জীপ ফিরে যায়। বিডিও সাহেবের এই আন্তরিক আচরণটি বুদ্ধদেবকে ছোঁয়। ত্রিভঙ্গ শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে যায়। বলেছিলাম না, বুড়ো একটি আস্ত ঘুঘু। কায়দা করে, ড্রাইভার আর পিয়নকে মেসের হদিশখানা চিনিয়ে রাখল। যাতে করে, রাতে-ভিতে দরকার হলেই পাঠিয়ে দিতে পারে পেয়াদা। কিংবা সন্দেহ হলেই টিকটিকি লাগিয়ে দিতে পারে। অ ভবানী, যাও, দেইখ্যা আইসো, অমুকবাবু ম্যাসে রইসেন, নাকি ভাগল্‌বা।

মেসে থাকাকালীন ত্রিভঙ্গ ওকে ছাত্রজ্ঞানে শিক্ষা দিয়েছিল অনেক কিছু। রামসেবক বলতে যে হনুমান বলতে চেয়েছেন বড়বাবু, এটা ত্রিভঙ্গর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরই বোধগম্য হয় বুদ্ধদেবের। গ্রামসেবক-অপভ্রংশে রামসেবক—অর্থাৎ কিনা রামের সেবক, সমান-সমান হনুমান।

এক অর্থে ত্রিভঙ্গই বুদ্ধদেবের চাকরিজীবনের প্রথম গুরু।

চাকরির সেই প্রথম দিনে, চৈত্রের সেই শেষ বেলায়, ধরিত্রী তখন লক্ষ মুখে ভাঁপ ওগরাচ্ছে, প্রাচীন শহরটির গলি-গলি ঘিঞ্জি রাস্তায় গেরুয়া রঙের তপ্ত ধুলো আবিরের মতো উড়ছিল হাওয়ায়, ত্রিভঙ্গর সঙ্গে তুরকীর ডাঙায় মেলা দেখতে গিয়েছিল বুদ্ধদেব। আর তার ফলেই, কতদিন আগে এসে সাময়িক ডেরা পাতা তুর্কীদের হদিশ না পেলেও, বুদ্ধদেব প্রত্যক্ষ করল একদল নব্য তুর্কীকে, চাকরির প্রথম দিন হিসেবে সে অভিজ্ঞতাও কিছু কম মূল্যবান নয়।

সেই বিকেলের শুরু থেকেই ত্রিভঙ্গ বারংবার বলছিল, চলুন, আপনাকে এই এলাকার একটা মেলা দেখিয়ে আনি। পাশেই। ময়রাপুকুরের লাগোয়া।

চৌকানের জঙ্গলের কিনার ঘেঁসে বিশাল ডাঙা। কৃষ্ণচূড়ারা আগুন জ্বেলে দিয়েছে প্রতিটি গাছের শরীরে। সারা ডাঙা জুড়ে অজস্র পলাশ গাছ নিঃশব্দে জ্বলছে। মেলায় তখনও ঢোকে নি। শুধু চারপাশ থেকে গাঁ-ঝেঁটিয়ে মানুষজনের পড়ি-কি-মরি হাঁটা দেখছিল। ত্রিভঙ্গ খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে বলেছিল. জমে গেছে মেলা। আর, সেই মুহূর্তে মেলার ভেতর থেকে নিদারুণ হল্লা। হাজার মানুষের উল্লাস নয়, ক্ষিপ্ত বাঘের গর্জন। অনেকগুলো ক্ষিপ্ত বাঘ। ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবছিল দু'জনেই, এমনই সময়ে গর্জনগুলি চলমান হয়। এবং পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে থাকে বুদ্ধদেবদের দিকে। জনা দশ-বারো ষণ্ডা ছোকরা, চোয়াড়ে মুখে হিংস্রতা। চোখগুলো টিকিয়ার মতো জ্বলছিল। একেবারে সামনে, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরণে চাপা-প্যান্ট, সূচোলো জুতো, লম্বা গাট্টাগোট্টা চেহারার যে ছোকরাটি ভারি ভারি পা ফেলে

হাঁটছিল তাকেই দলপতি মনে হয়। মুখে অশ্লীল খিস্তি করতে করতে এগিয়ে আসছিল ওরা। কাকে যেন 'বাপের বিয়া' দেখাবার সদম্ভ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল বারবার। ত্রিভঙ্গ ফিসফিস করে বলে, পল্টু হাজরা। ফ্রিডম-ফাইটার কামেশ্বর হাজরার ছেলে। এম-এল-এ-র ভাইপো।

পাগল শিকারির সঙ্গে তখনও আলাপ হয় নি বুদ্ধদেবের। হলে, এবং ঐ মুহূর্তে সে ঐখানে উপস্থিত থাকলে নির্ঘাৎ ছড়া কেটে বলত, কলিকালের ছড়া/ রঘু পণ্ডিত ঘুঁটিয়া দিচ্ছে, রঘুয়া চড়ে ঘোড়া। এক্ষেত্রে রঘু পণ্ডিত বলতে অনাথবন্ধু রায় এবং রঘুয়া বলতে বর্তমানের স্বীকৃত, অনুমোদিত ফ্রিডম-ফাইটার কামেশ্বর হাজরাকে বোঝাত। দু'জনের জীবনপঞ্জী পরে বুদ্ধদেব পৃথক পৃথকভাবে অধ্যয়ন করেছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে। মেলার বাইরে একটা রাধাচূড়ো গাছে প্রায় শতখানেক কাক কর্কশ গলায় কোরাস ডেকে চলেছে। কোনও কারণে ভীত কিংবা ক্রুদ্ধ। দুমদাম পা ফেলে তরুণ তুর্কীর দল এগিয়ে আসছে দেখে ত্রিভঙ্গ গলাখানি খাদে নামিয়ে বলে, সরে আসুন। পথ দিন।

ওদের পাশ দিয়েই পুরো দলটা খিস্তি দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। তাদের দৃষ্টিতে কোনও প্রশ্রয় নেই। হাঁটায় কোনও শৃঙ্খলা নেই। প্রতিটি পদক্ষেপই জানান দিচ্ছিল, কোনও একটা একতরফা লড়াই জিতে ফিরছে।

পায়ে পায়ে মেলায় ঢোকে ত্রিভঙ্গরা। দেখে, মেলার মধ্যে জমায়েত ছত্রাখান। হত-চকিত। ঠাসবুনোট ভাবখানা ঢিলেঢালা। ভয় জমেছে মানুষের চোখে। অচেনা ভয়।

ওরা গোলমালটা করে গেছে মূর্তি-মেলায়। একখানা প্রাচীন বটের তলায় গোলাকার খড়ের ছাউনি। সমগ্র বটগাছটিকে বৃত্তাকারে বেড় দিয়েছে ঐ ছাউনিখানা। তার তলায় সারবন্দী মাটির মূর্তি। ঠাকুর-দ্যাবতার মূর্তিই চোদ্দআনা। শাস্ত্র-পুরাণের কাহিনী থেকে এক-একটি মুহূর্ত বেছে নিয়ে সেই অনুযায়ী গড়া হয়েছে মূর্তিগুলো। জরাসন্ধ বধ, ব্যূহমধ্যে অভিমন্যু, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, সীতার পাতাল প্রবেশ, পাষাণী-অহল্যার শাপমুক্তি...। ইদানীং পৌরাণিক মূর্তির পাশাপাশি সামাজিক বিষয় নিয়েও মূর্তি গড়ছে কারিগররা। বেহুঁশ হয়ে মাতাল শুয়ে রয়েছে রাস্তার ওপর, কুকুর পেচ্ছাব করছে ওর মুখে। বউকে কাঁধে নিয়ে, মাকে দড়িতে বেঁধে টানতে টানতে পথ চলেছে আধুনিক যুবক। ফাঁসি হচ্ছে ক্ষুদিরামের। এবার একটা নতুন বিষয় নিয়ে মূর্তি গড়েছিল মন্মথ কারিগর। বাঁধগাবার লড়াই। তেভাগার লড়াই চলেছিল এ জেলায় ১৯৪৯-এ। খুব জোরদার হয়েছিল সে লড়াই। বাঁধগাবার ডাঙায় পুলিশ আর জোতদারের মিলিত শক্তির সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই বেঁধেছিল ভুখা মানুষের। পুলিশ একদিনেই গুলি করে বহু মানুষ মেরেছিল। লাশগুলোকে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরে গিয়েছিল বিষ্ণুপুরে। ঠিক যেমন করে জীবন্ত শুয়োরকে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে মূর্তি গড়েছে মন্মথ কারিগর। বন্দুক হাতে পুলিশ বাহিনী। সামনে গুলিবিদ্ধ মানুষ। শুয়োরের মতো বাঁশে ঝুলিয়ে লাশ নিয়ে চলেছে পুলিশ। পাশে পাশে ধুতি-পাঞ্জাবি ও গান্ধী-টুপি পরিহিত জোতদার। জোতদারের মুখগুলো নাকি অবিকল অন্নদা চক্রবর্তী আর কামেশ্বর হাজরার মতো। পল্টু হাজরার দল কিছুতেই সইতে পারে নি। গান্ধীর নামাঙ্কিত টুপিকে নিয়ে এমন কলঙ্ক রটনা ও আখ্যান রচনা! এত সাহস শালাদ্যার! গান্ধীজীর অপমান! সেই কারণেই সদলবলে এসেছিল। কাজ সেরে খেউড় করতে করতে ফিরে গেল।

বুদ্ধদেবরা পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ায় বিধ্বস্ত মূর্তিগুলোর সামনে। লাঠির ঘায়ে ভেঙে-চুরে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গিয়েছে মূর্তিগুলো। চালাঘরের তলা জুড়ে ভাঙা

মূর্তির প্রদর্শনী। বুদ্ধদেব লক্ষ করে, পুলিশ, জোতদারের সঙ্গে ভুখা মানুষ একই মহিমায় গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝের ওপর। ওদের শরীরের ভাঙা ভাঙা অংশগুলো মিলে মিশে একাকার।

মন্মথ কারিগর বিপদ বুঝে পালিয়েছিল তফাতে। এখন ফিরে এসেছে আবার। চালাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পলকহীন তাকিয়ে রয়েছে ধ্বংসস্তূপের দিকে। একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছে লোকটা।

বুদ্ধদেব ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। সামান্য সান্ত্বনা দিতে গিয়েই গুটিয়ে নেয় নিজেকে। সে একেবারেই অপরিচিত এই এলাকায়।

বাঁধগাবার লড়াইয়ের গল্পটা ফিরতি পথে ওকে বিতাং করে শোনায় ত্রিভঙ্গ। শুনতে শুনতে, যে সান্ত্বনাবাক্য প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতে পারে নি বুদ্ধদেব, অন্ধকার পথ ভাঙতে ভাঙতে শব্দহীন শুনিয়ে দেয় বারবার। বলে, ইতিহাসের ধারাবাহিক মূর্তিমেলায় পাকাপাকিভাবে স্থাপিত হয়ে গিয়েছে যে সব মূর্তি, গোটাকয় মাটির পুতুলকে ভাঙচুর করে এরা কী করেই বা ধ্বংস করবে তা। মন্মথ কারিগর, যারা ইতিহাসকে ভাঙচুর করে ধ্বংস করবার স্পর্ধা দেখায়, তুমি বরং আসছে-বছর তাদের নিয়েই আর একপ্রস্থ মূর্তি গড়ো। চালাঘরের তলায়, এক হাঁটু ধুলোর ওপর ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে পড়ে রয়েছে ইতিহাসের নায়ক ও খলনায়করা। পাশপাশি। মেশামেশি। আর, আজকের খলনায়কদের মূর্তিগুলিও গড়ে দিও ঐ ধ্বংসস্তূপের পাশেই।

দিন-দুই বাদে ত্রিভঙ্গ একান্তে জানায়, মন্মথ কারিগরকে যে এমন কাজে নাচিয়েছিল, তাকে সনাক্ত করা গেছে।

শালাকে নুন-জাম্‌রিয়া করা হব্যেক।

পাগল শিকারি ছবি আঁকে, স্বপ্ন বানায়

তার নাম পাগল শিকারি। কেন না, সে পাগল। কেন না, সে ছবি আঁকে। আর, ঝোপে-ঝাড়ে, আদাড়ে-বাদাড়ে এমন সব জন্তু-জানোয়ার, এমন সব দৃশ্যপট দেখে ফেলে, যা স্বাভাবিক মানুষজন কল্পনাও করতে পারে না। তার ছবি আঁকবার নির্দিষ্ট কোনও ক্যানভাস নেই। কেন না, সে নদীর বালুচরে, পোড়ো বাড়ির চুন-সুরকি খসা দেওয়ালে, অজস্র ছবি আঁকতে পারে। এমন কি আকাশ-অন্তরীক্ষকেও ক্যানভাস বানিয়ে ফেলতে পারে অবলীলায়। আর যেহেতু তার হাতে বাস্তবিক কোনও রঙ-তুলি থাকে না, সে ইচ্ছেমতো রঙ বুলিয়ে দিতে পারে ছবিগুলোর শরীরে। দ্বারকেশ্বরের দু'পাড়ে ধু-ধু বালির চর। নদীর জল কখনো বাড়ে, কখনো কমে। আর, তাতে করেই, হাওয়ায় যখন নদীর দু'কিনারে আহ্লাদী জল ছলাৎ ছলাৎ, তখন ঢেউ খেলানো বালির চরে কতই না আঁকিবুকি। আল্পনা, আল্পনা। নদীর পাড়ে বসে বসে সেই আঁকিবুকি আল্পনার মধ্যে পাগল শিকারি খুঁজে পায় এমন দুরন্ত সব ছবি! ছবি, ছবি। সিংহগড়ের সাবেক অট্টালিকার চুন-সুরকি খসে পড়া দেয়ালের এখানে ওখানে যে মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীদের ছবি খুঁজে পায়, বিচিত্র তাদের অভিব্যক্তি, দেহভঙ্গিমা। আকাশে তুলো-পেঁজা মেঘ। ফুলে ফেঁপে উঠেছে তুলোর পাহাড়, দিগন্তের গায়ে। কিংবা দিনান্তে পশ্চিম দিগন্তে রক্তিম ছানাকাটা আকাশ, তার বুকে কত শতসহস্র যে ছবি তার বুঝি কোনও ইয়ত্তা নেই। আর এমনই আশ্চর্য, কেবল পাগল শিকারিই খুঁজে পায় সেই সব ছবি। অন্যেরা হাজার মাথা খুঁড়েও সে সব ছবির নাগাল পায় না।

আসলে, পাগল শিকারি ছবিগুলোকে বানায়।

নদীর বালুচরে, প্রাচীন দেয়ালে, আকাশে-অন্তরীক্ষে যে সব ছবির আদল ফুটে ওঠে, সেগুলোকে খুঁজে খুঁজে একের সঙ্গে অন্যকে জোড়া দিয়ে সে বানিয়ে ফেলতে পারে অজস্র মূর্তি, চিত্র, দৃশ্যপট। পাগল শিকারি সেটা পারে। সেই ছেলেবেলা থেকেই চারপাশের সবকিছুর ভেতর থেকে ছবির আদল খুঁজে বের করবার এক দুর্লভ ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে সে। আসলে, পাগল যত না ছবি দেখে, তার চেয়ে বেশি বানায়। কেবল ছবি বানানোর বেলায় সে তিলকে তাল করতে সক্ষম।

রাঢ়ভূমিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ভূত পাগল শিকারিই দেখেছে। আর, এত জাতের ভূত সে এই তার এক জীবনে দেখে ফেলতে পেরেছে, যাদের নাম অন্যেরা কস্মিনকালেও শোনে নি। ভূত দেখতে পাগলের শ্মশান দরকার হয় না, নির্জন জায়গা, ফোকরওয়ালা প্রাচীন গাছও নয়। এমন সব লোকালয়ে, জনপদে, জনবহুল জায়গায় সে অবলীলায় ভূত দেখে ফেলতে পারে, যা অন্যরা কল্পনাও করতে পারে না। দুনিয়ার অসম্ভব সব জন্তু-জানোয়ার কেবল পাগল শিকারির চোখেই ধরা পড়ে। পাগল এমন করে তার বর্ণনা দেয়, এতখানি অনুপুঙ্খ সহকারে ব্যাখ্যা করে ওদের আকাব, আকৃতি, গায়ের রঙ, শরীরের গন্ধ এমন কি চোখের মণির রঙটি অবধি, শ্রোতাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যে পাগল ওগুলোকে বাস্তবিকই দেখেনি। কারণ, একেবারে স্বচক্ষে না দেখলে এমনটি বলা প্রায় অসম্ভব।

শুধু যে দৃশ্যপট নিয়ে চটপট ছবি বানিয়ে ফেলতে পারে পাগল শিকারি, তা নয়। সে সময়কে নিয়েও অজস্র ছবি আঁকে। ছবি বানায়। বিশেষ করে যে সময়কাল সাবেক সিংহগড়ের মতো অসংখ্য নির্মাণের শরীরে এঁকে দিয়েছে তার নিরন্তর প্রবাহের অজস্র ঘর্ষণচিহ্ন, যেমন করে হরিণমুড়ির বুকে কালো রঙের ব্যাসল্টের উঁচুনীচু হরেক আকারের উপলখণ্ডের ওপর দিযে বয়ে যেতে যেতে অবিরাম আছাড় খায় জল, নিঃশব্দে ক্ষয় করে পাথরের শরীর, সেই সব দষ্ট, ভ্রষ্ট সময়পুঞ্জই পাগল শিকারির ছবির বিষয় হয়ে ওঠে। ধ্বস্ত সময়কে নিয়ে তেমন অনেক ছবি এঁকে বুকের খোপে খোপে সাজিয়ে রেখেছে সে। সময়ের ঘর্ষণ-রেখাগুলিকে নিজের মতো বিচার-বিশ্লেষণ করে, সেই নিরীখে বানিয়ে নিয়েছে ছবিগুলো। তার নিজের মতো করে। সময়ের ছবি এবং সময়কে নিয়ে ছবি।

বত্রিশভাগীর জঙ্গলের গা ঘেঁসে জিয়োন-গাছের তলায় বসে তেমনই একখানা প্রাচীন বিবর্ণ ছবি বুকের খোপ থেকে বেব করে বুদ্ধদেবকে একান্তে উপহার দিয়েছিল পাগল শিকারি। তার বলবার কৌশলে, চোখের মণি চালনায়, ভুরুর তরোবারি-জোড়া ওঠানো নামানোয় সে এমনই এক পরিমণ্ডল সহজেই সৃষ্টি করতে পারে যাতে বুদ্ধদেব তার সময়কালে থেকেও অবলীলায় পিছিয়ে যেতে পারে যতখানি খুশি পেছনে। ছবিখানা আঁকতে আঁকতে একেবারে মশগুল হয়ে যায় পাগল শিকারি। একলাফে চড়ে বসে গরুর গাড়ির মগে, এবং গাড়ি চলতে শুরু করে।

বাহারি ছই বাঁধা গরুর গাড়িতে বসে হরবল্লভের মুখে আগের দিনের গল্প শুনতে শুনতে হেসে গড়িয়ে পড়ছিলেন স্ত্রী অরুন্ধতী, মেয়ে উমা, ছেলে দেবিদাস আর বড় শ্যালক কুমুদকান্ত। তারা সবাই সেই ছবিব ফ্রেমে এসে যায়। হববল্লভ বলেন, 'সেই কবেকার কথা সব, তখন আমারো বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়। কিন্তু আজও দৃশ্যখানা চোখের সুমুখে ভাসে।'

বড় শ্যালক কুমুদকান্ত চোখদুটোকে মার্বেল বানায়, 'তারপর , কি হইল্যাক?'

'তারপর আর কি, পূজার ঝামেলা মিটল্যে, সব শালাকে তলব করা হইল্যাক কাচারিতে। উয়ারা নাক মলল্যাক, কান মলল্যাক, জিভে খড় কাটল্যাক, এক-একজন নাকে খত দিল্যাক সদর উঠানের এ ধার থিকে উ ধার। বিচারে শেষমেষ রায় হল, সব পাড়ার সব শালাকে পাঁচটা করে বেগার মজুর দিতে হবেক, ধানকাটার টাইমে। আর উই পালের গোদাটি, পরীক্ষিত বাউরি, উয়ার তরে অন্য সাজা।'

'সাজাটা কী, শুনি?' কুমুদকান্তর ডাগর চোখে নাগালের মধ্যে শিকার পেয়ে যাওয়া কুমীরের মতো হিংস্র কৌতূহল।

'সে বড় জব্বর সাজা।' পা নাচানোর মতো অলস ভঙ্গিতে চোখ নাচান হরবল্লভ। বাখান করে বলতে যাচ্ছিলেন পরীক্ষিত বাউরির সাজার ধরনটা, তার আগেই অরুন্ধতী আর্তনাদ করে ওঠেন, 'ওগো, তত্ত্বের একটা বাস্‌কো গাড়িতে নাই।'

'এ্যাঁ!' চমকে ওঠেন হরবল্লভ, 'এই শালা পাগল, গাড়ি থামা।'

এইভাবে পাগল শিকারিও ছবির মধ্যে এসে পড়তে পারে। অকস্মাৎ দু'একটা খুচরো রেখাতেই সে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। অর্থাৎ নিজের আঁকা ছবির মধ্যে নিজেকেও এঁকে ফেলে সে।

পাগল শিকারি সতর ছিল। ঝটিতি এক লম্ফে নেমে পড়ে। ধরে ফেলে গাড়ির জুয়াল। অকস্মাৎ থেমে যায় গাড়ি। শোলকাঠি খুলে দিয়ে ঢিলে করে দেয় বলদের পাগা। তারপর বলদদুটোকে জুয়ালের বাইরে ঠেলে দিয়ে গাড়ির জিহ্বা নামিযে দেয় মাটিতে। হরবল্লভের স্ত্রী অরুন্ধতীর ভারি শরীরখানা মৃদু ঝাঁকুনি খায়। অঙ্গের তাবৎ অলঙ্কার সমবেত স্বরে আর্তনাদ করেই থেমে যায়। তখন বৈশাখের ঠা-ঠা- দুপুর। মাথার ওপর আগুনের ঢেলার মতো সূর্যটা ঝুলছে। রাঢ়ের টাঁড় জমিন টিকিয়ার মতো জ্বলছে। সামনে হরিণমুড়ি নদী। নদীর বুকে ঐ মধ্য-বৈশাখে ধু-ধু বালির সরা। মাঝ বরাবর তিরতিরে জলের সরু সোঁতা মুখ লুকিয়েছে বাঁকের আড়ালে। খালের ধারে বিস্তীর্ণ ভূঁই খাঁ-খাঁ। চারপাশের ডাঙা-ডিহি নিঃসাড়ে আগুন গিলছে শুয়ে শুয়ে। দূরে, রাধানগরের ডাঙায় সারবন্দী তালগাছ, যেন রুখা-সুখা ধরিত্রীর রোগাপানা অজস্র হাত অনুগ্রহ কামনায় উঠে গেছে আকাশের দিকে, যেমন করে অনুগ্রহপ্রার্থীর দল হাতদুটি উঁচু করে তুলে ধরে ভিক্ষা চায় উচ্চাসনে বসে থাকা অনুগ্রহকারীর কাছে। আকাশের থেকেই তো সব জাতের অনুগ্রহ আজও যাচঞা করে মানুষ। সবকিছু দাবি, আবদার, প্রার্থনা তো কায়মনোবাক্যে আকাশবিহারীদের উদ্দেশ্যে। একটা চাকোল্‌তা গাছ, নদীর ওপারে, বেশ মায়াজাগানো শরীরখানি তার। গাড়িতে বসে বসেই গাছটার দিকে লোভী লোভী চোখে তাকান হরবল্লভ।

নেমে দাঁড়াতেই গাড়িটা উলার হয়। পিছু পিছু নেমে আসে শ্যালক কুমুদকান্ত। গোড়ালি অবধি ডুবিয়ে নদীটা পার হন দু'জনে। চাকোল্‌তা গাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়ান। কুমুদকান্ত এমন চোখে তাকায় জামাইদার দিকে, যার অর্থ হল, আট আনার ফলার খেতে গিয়ে এই তেপান্তরের মাঠে মূল্যবান ঘটিখানিই হারিয়ে ফেলেছে সে। এখন কী হবে?

বাস্তবিক, ভরদুপুরে তেপান্তরে এমন ঘোর সঙ্কটে বহুদিন পড়েন নি হরবল্লভ। একা নয়, আজ সঙ্গে তাঁর পুরো পরিবার। আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়া, সঙ্গে শ্যালক কুমুদকান্ত। এখান থেকে চুয়ামসিনা না হলেও একক্রোশ পথ। যেতে আসতে একটি ঘন্টা লাগবেই। এমনিতেই বেরোতে দেরি হয়ে গিয়েছে। একটু ঝাপটে গেলে হয়ত বা দুপুর

গড়তির মুখে পৌঁছে যাওয়া যেত। সে আর হল না। অথচ সিদ্ধেশ্বর হাজরার মেয়ের বিয়েতে একটু জলদি-জলদি গিয়ে কাজকাম কিঞ্চিৎ সামাল দিতে পারলে আখেরে কাজ দিত। বিষ্টুপুরের হাজরাদের সঙ্গে চুয়ামসিনার সিংহবাবুদের বহুকালের ঘনিষ্ঠতা। সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছেন হরবল্লভ, পারিবারিক প্রতিটি কাজকর্মে বাবা প্রতাপলাল আলাদা করে নেমন্তন্ন করতেন কামেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বর হাজরার পুরো পরিবারকে। সেই কারণেই, হরবল্লভেরও ইচ্ছে ছিল, সিদ্ধেশ্বর হাজরার মেয়ের বিয়েতে অষ্টপ্রহর খাটাখাটি করে কিঞ্চিৎ স্নেহ, আশীর্বাদ ও কৃতজ্ঞতা ক্রয় করে সঞ্চয় করবেন ভবিষ্যতের জন্য। সুদে-আসলে বাড়াবেন। দুর্দিনের জন্য সঞ্চয়। আপনজনটির মতো পাশেপাশে থাকবেন ক'টা দিন। শুধু সিদ্ধেশ্বর হাজরা এম-এল-এ বলেই নয়, হরবল্লভের মনে হচ্ছে, এই জেলার রাজনীতিতে হাজরা-পরিবার ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। এক কালের ডাকসাইটে নেতা অন্নদা চক্রবর্তীর বয়েস হয়েছে। তাঁর ছেলে রামকমল অনেক ব্যাপারে বাপের চেয়ে বেজায় খাটো। অন্যদিকে, কামেশ্বর হাজরা কন্ট্রাক্টরী পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী মানুষটি একটু একটু করে এগোচ্ছেন, হিসেব করে করে পা ফেলছেন। সিদ্ধেশ্বর হাজরার এম-এল-এ হওয়ার পেছনেও তিনি। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের ছেলেকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলছেন, একেবারে বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে। আগামী দিনে পেশীশক্তিই রাজনীতির 'গোপন কথা' হয়ে উঠবে, এমন দূরদর্শিতা থেকে তিনি নিজের ছেলে পল্টুকে একটু একটু করে গড়ে তুলছেন, ঠিক যেমন করে একজন প্রতিমাশিল্পী মূর্তির মুখে চোখ আঁকে, নাক আঁকে, ঠোঁট আঁকে, চিবুকের ওপর তিল এঁকে শেষ ছোঁয়া লাগায়। বিষ্টুপুর সংস্কৃতি পরিষদ থেকে ওকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আলাদা একটা ক্লাব গড়ে দিয়েছেন রসিকগঞ্জের মোড়ে। নাম দিয়েছেন 'শক্তিসংঘ'। বিষ্টুপুরের বাছাবাছা পেশীগুলো ঐ সংঘে পল্টুর তত্বাবধানে শক্তপোক্ত হচ্ছে, অনুগতও। আশানুরূপ পুষ্টি পেয়ে গোকুলে বাড়ছে ওরা। পাশাপাশি, পল্টুকে দিয়ে দলের কাজও নিয়মিত করাচ্ছেন। সমস্ত বৈঠকে, শোভাযাত্রায়, জনসভায়, দলের তরুণ অংশটিকে নেতৃত্ব দেয় পল্টুই। এর ওপর কামেশ্বর ওকে কন্ট্রাক্টরীতেও ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ক্যানে ঢুকাল্যম? না, নিজের আয়-উপায় না থাকলে উ খাবেক কি? অভাবে স্বভাব নষ্ট। কুনোদিন শুনব, পার্টির ফাণ্ড ভেঙেছে। তখন তুমরাই টিটকারি দিবে। কিনা, কামেশ্বর হাজরা, যে কিনা রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা পয়সার থেকেও একটি ছ্যাদাম তুলে নাই কস্মিন কালে, তার ব্যাটা দলের তহবিল ভেঙেছে। কাজ করুক। কাজেই মাইন্‌ষের মুক্তি। কাজও করুক, দলও করুক। আমরাও তাই করেছি। কন্ট্রাক্টরীও করেছি, সত্যাগ্রহও করেছি। আর পকেটে অঢেল পয়সা ছিল বলে দলকে কত ঠেকায় যে টেনে তুইলেছি! অতুল্যদা তো আজ অবধি বলেন...। এই একটি জায়গায় অনেকখানি এগিয়ে রয়েছেন কামেশ্বর হাজরা। পল্টু। কেন না, তাঁর বিশ্বাস, মাটিতে কোঁছা লুটিয়ে রাজনীতি কইর্‌বার দিন চলে যাচ্ছে। আগামী দিনে পল্টুরাই দখল নেবে সবকিছুর। পল্টুতেই এগিয়ে আছেন তিনি। আর, একথা কে-ই বা অস্বীকার করবে যে নৌকা বাঁধতে হলে বড়ঘাটেই বাঁধা ভাল। তাই, হাজরা-পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কটা আরও আঁটোসাঁটো করে তুলতে চাইছেন হরবল্লভ। আরও জমাট। দুর্ভেদ্য। সিদ্ধেশ্বরের একমাত্র মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে তেমন একখানা সুযোগ পাওয়া গেছে। সিদ্ধেশ্বর হাজরাকে কিঞ্চিৎ তুষ্ট করবার সুযোগ। আর, সিদ্ধেশ্বর তুষ্ট

হলেই কামেশ্বরও তুষ্ট। গাছের গোড়ায় জল ঢাললেই পুরো গাছ পাবেক। গতকাল বিকেলে চলে গিয়েছে বড়ছেলে প্রভঞ্জন। পল্টুর সঙ্গে ইদানীং খুব ভাব হয়েছে। ঘনঘন বিষ্টুপুরে চলে যায়। রাত কাটায় কামেশ্বরের বাড়িতে। হরবল্লভ বাধা দেন না। বরং পরোক্ষে প্রশ্রয় দেন। সঠিক পথেই এগোচ্ছে ছেলে। ট্রেনিং নিচ্ছে আগামী দিনের রীতি-ঘরানায়। আসলে, কামেশ্বর হাজরার পরিকল্পনাটা খুব মনে লেগেছে হরবল্লভের। পথখানা খুব আকৃষ্ট করেছে ওঁকে।

আজ ভোর ভোর দু'টো গরুর গাড়ি সাজিয়ে ফল-ফুলারি, সিধেপাতি, ক্ষেতের পাকা ডিংলা, আখের গুড়, পদমপুকুরের পাকা রুই সহকারে রওনা হয়ে গেছে গোমস্তা রতিকান্ত। দুপুরের আগেই পৌঁছে যাবার কথা ছিল হরবল্লভদেরও। কিন্তু থাকলে কি হবে? সব ব্যাপার কি হরবল্লভের হাতে? এ হল গিয়ে মেয়েছেলেদের নিয়ে বেরোনো। বিয়োবার বেদ্না উঠেছে, উঠোনে গাড়ি মজুত, তার মধ্যেও গায়ে দু'থান চড়িয়ে নেওয়া চাই। আর, এ হল কিনা বিয়ে বাড়ি। যার-তার ঘরে নয়। খোদ সিদ্ধেশ্বর হাজরার মেয়ের বিয়ে। জেলার তাবৎ বড় ঘরের বউ-ঝি-রা সেজেগুজে আসবে। অমনথানে যাবার আগে কত ভাবনা! কত বিচার! এক এক থানেব জন্য কত ডিজাইনের গহনা আছে। কোন্‌টা ছেড়ে, কোন্‌টা পরি! সেই মীমাংসা করতে করতে সময় বয়ে যায়। সোনা যে নারীর কত বড় আশ্রয়! কত সান্ত্বনা আর অহঙ্কারের জায়গা! অন্যকে প্রাণ খুলে সোনা দেখাবার কী-যে সুখ!

সেই ননদ-ভাইবৌ'র গল্প।

ননদ খাচ্ছে, ভাইবৌ পরিবেশন করছে। দু'হাতা ভাত বেশি দিতেই থালার ওপর হামলে পড়লো ননদ। দু'হাত থালার ওপর সমানে ঝাঁকাতে লাগলো, আর দিয়ো না, বউ, আর দিয়ো না। সমানে ঝাঁকানোর দরুন দু'হাতের অজস্র বালা, বাউটি, চুড়ি, কঙ্কন ঝনঝনিয়ে উঠলো। ঝিকমিকিয়ে উঠলো দু'হাতের অন্তত পাঁচটা হীরে-মুক্তোর আংটি। ব্যাপারটা ভাইবৌয়ের নজর এড়ালো না। তারও সারা অঙ্গ অলঙ্কারে মোড়া। কিন্তু সবার চেয়ে মূল্যবান ছিল দু'বাহুতে গজমুক্তা বসানো দুটি আর্মলেট। দু'হাতে থালা বাগিয়ে ধরে ভাইবৌ তার বাহুদুটো ঝাঁকাতে লাগল ননদ ঠাকরুনের সুমুখে, আর দুটো দিই, ঠাকুর-ঝি, আর দুটো দিই।

অরুন্ধতী আবার এ বিষয়ে এককাঁটা সরেস। অম্বিকানগরের সিংহ-মহাপাত্র বংশের মেয়ে সে। তিন শরিকের মহলে একটিমাত্র কন্যারত্ন। তার চেয়ে তার সোনার ওজনই বুঝি বেশি হবে। তা, এমন একটা উপলক্ষে তার ছিটে-ফোঁটাও যদি না দেখাতে পারে, তাহলে আর সোনা থেকে লাভ কি? ফলটা হল কি? প্রায় দু'ঘন্টা দেরী হয়ে গেল বেরোতে। তাও সোনার স্বপ্নে মশগুল হয়ে, তত্ত্বের একটা বাক্সের কথা খেয়ালই রইলো না তাড়াহুড়োতে। অথচ তত্ত্ব-টত্ত্ব, এসব তো ঘরের মেয়েছেলেদেরই ব্যাপার। হরবল্লভ অতসবের খোঁজ রাখবেন কি করে? ধুত্‌মা মাঠের মধ্যিখানে পৌঁছে কিনা কথাটা মনে পড়লো তোর! ফিরে গিয়ে ওটা নিয়ে আসতে কমপক্ষে ঘন্টাখানেক লাগবে। যা, কেমন করে ঠিক সময়ে বিষ্টুপুরে যাবি, যা! দ্যাখ্‌, এই খালের পাড়ে বসে বসে বিয়াঘর দ্যাখ্‌!

দাঁতে দাঁত চেপে উদ্ধত ক্রোধটাকে সামলে নিচ্ছিলেন হরবল্লভ। চারপাশে জ্বলন্ত দৃষ্টি চারিয়ে যেন খুঁজছিলেন কাউকে। এ দৃষ্টির অর্থ পাগল শিকারি জানে। ক্ষুধার্ত বাঘ শিকার খুঁজছে। শিকার, শিকার!

অকস্মাৎ সমস্ত ক্রোধটা গিয়ে পড়ে পাগল শিকারির ওপর। 'শালা, দু'টা বাক্সো বার করা হুইল্যাক, দেখলি। তুইল্‌বার সময় একটা তুললি গাড়িতে! শালা, অধম!'

পাগল শিকারিব বুকের ভেতর ততক্ষণে কলাপাতার কাঁপন শুরু হয়েছে। তাও হলদে দাঁত বেব করে হাসে সে। 'আমি ত' আইজ্ঞা বাঞ্জোই দেখি নাই। ইঁদ্‌বাই ত' গাড়িতে তুইল্‌ছিল্যাক সব মাল-ঝাল . ।'

'থাম্ শালা।' হরবল্লভ গলা দিয়ে চাবুক কষান, 'কুনো দিকেই কি তুয়াদ্যার লজর থাকে? শুধু কাঁড়িকাঁড়ি গিলবার যম।' বলতে বলতে আড়চোখে তাকান ইন্দ্র বাগদির দিকে।

কথা বলতে বলতে গলগলিয়ে ঘামছিলেন হরবল্লভ। প্রবল ঘামে গলা-ঘাড়ের চাপচাপ পাউডার লেপটে একসা। ঝলমলে বিষ্টুপুরী সিল্কের পাঞ্জাবীর পিঠ, বগল ভিজে জবজবে। ঘাড়ের থাক্‌থাক্ মাংসের ভাঁজের মধ্যে সোনার চেন চিকচিক করছে রোদ্দুরে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দ্রুত পাল্‌টে যাচ্ছিলেন হরবল্লভ। চোখদুটো বারবার বিঁধিয়ে দিচ্ছিলেন দিগন্তের গায়ে। সেখানে সারবন্দী ধূসর শালজঙ্গল আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে ঝলা বাতাস গিলছে। লায়েকবাঁধ আর বৈদ্যার জঙ্গলও আগে হরবল্লভদের ছিল। এখন আর নেই।

উমা নেমে এসেছে গাড়ি থেকে। দামী ফ্রক দুলিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বাপের কাছে। বলে 'ও বাবা, মা বললেক্, যদি নাই যাবা হবেক তো ফিরে চল।'

অরুন্ধতী দূত মারফৎ হুমকি দিয়েছে। কথায় ঝড়েব পূর্বাভাষ। হরবল্লভ মনে মনে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। সারা দুনিয়ায় বোধ করি এই একজন মানুষকেই ভয় পান হরবল্লভ। অরুন্ধতী। তাঁর মেঘের মতো গমগমে গলা। হরবল্লভ জানেন, ক্ষেপে গেলে অরুন্ধতী এক মূর্তিমতী ঝড়।

আজ আবার সঙ্গে শ্যালক কুমুদকান্ত রয়েছে। অরুন্ধতীর সবচেয়ে ছোট ভাই। বাঁকুড়ায় কলেজে পড়ে। কুমুদকান্তর সুমুখেই আজ হরবল্লভের বেইজ্জত হওয়ার জোগাড়।

ভাবতে ভাবতে বাবার ওপব এক ধরণের অন্ধ রাগ উথলে ওঠে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে তিনি হরবল্লভের গলায় জড়িয়ে দিয়েছেন এই কালসাপ। সে এখন পেঁচিয়ে ফেলেছে হরবল্লভের সর্বাঙ্গ।

হরবল্লভ যখন অরুন্ধতীকে ঘরে তোলেন, তখন সিংহগড়ের রমরমা ছিল দেখবার মতো। সে আজ প্রায় বিশ বছর আগের কথা। তখন চুয়ামসিনাকে বেড় দিয়ে চারপাশের আঠারোখানা মৌজা ছিল সিংহবাবুদের খাস তালুক। শালুকা, বত্রিশভাগী, বৈদ্যা, লায়েকবাঁধ, দাপানজুড়ি, ভড়াব জঙ্গলগুলোও ছিল সিংহবাবুদের। তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয নি। উনপঞ্চাশেব বন্যা আব পঞ্চাশেব খাটাব্‌শাল দুর্ভিক্ষ ঝাঁপিযে পড়ে নি বাংলাদেশেব ওপব। তখন ইংরাজবা এ দেশটা ছেড়ে যাবাব কথাটা অত নিশ্চিত করে ভাবে নি। তখনও চুয়ামসিনাব সিংহবাবুদের দাপটে চাবপাশ কাঁপতো। খাজনা আদায়ের মবসুমে হাজাবো প্রক্রিযায় প্রজাপীড়ন তখন ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কুচিয়াকোলের রাজারা খাজনা আদায় না দিলে হাতী দিয়ে প্রজাদেব ঘর ভেঙে দিত। চুয়ামসিনাব সিংহবাবুদেব হাতী ছিল না। কিন্তু কৌশল ছিল বিস্তব। সে সব কৌশল মাথা খাটিযে বের করেছিলেন সিংহবাবুরা, দিনের পর দিন। প্রতাপলালেব দাদা সুদর্শন সিংহবাবু ছিলেন বড়তবফ। সবাই তাঁব গড়-টাকেই সিংহগড় চলত। প্রতাপলালের গড়কে বলত ছোটবাবুব গড়। সুদর্শনেব মৃত্যুব পব সাবেক সিংহগডেব মহিমা দ্রুত অস্তমিত হতে থাকে। এবং প্রতাপলালই হন এই এলাকাব সর্বেসর্বা, ভাগ্যনিযন্তা। হববল্লভেব কিঞ্চিৎ ভয় ছিল। হাজাব হোক অম্বিকানগবেব চেয়ে সিংহবাবুবা খাটো। বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। অসম বন্ধুত্ব টেঁকে না। একপক্ষেব অহঙ্কাব

অন্যপক্ষের হীনমন্যতাজাত গাত্রদাহের কারণ হয়। কাজেই, অত বড় ঘরের মেয়েকে সিংহগড়ে এনে তোলা উচিত হবে কিনা, সে বিষয়ে দ্বিধা ছিল হরবল্লভের। কিন্তু হরবল্লভের কোনও অজুহাতই ধোপে টেকে নি। কাজেই, হরবল্লভের বিয়ে হল অম্বিকানগরের সিংহমহাপাত্রদের মেয়ের সাথে।

শ্বশুর প্রতাপলাল যতদিন সবল ছিলেন, অরুন্ধতী একরকম ছিলেন। তিনি বসে যাবার পরই স্বমূর্তি ধরলেন অরুন্ধতী। তাঁকে কেবলমাত্র ঝড়ের সঙ্গেই তুলনা করা যায়।

এরই মধ্যে দেশ জুড়ে যুদ্ধ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং স্বাধীনতা এল। পিছু পিছু এল, হরবল্লভদের নিদারুণ দুর্দিন। জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশ হল।

কেমন দুর্দিন, পাগল শিকারিরা সেটা বুঝতে পারে না অতশত। তারা শুধু ভুলভুল চোখে দেখে, সিংহগড়ের অষ্টপ্রহরের চাকর-বাকর, মুনিশ-মাইন্দার, লগদী-গোমস্তা, আর বেগারদের সংখ্যা দিনদিন কমে আসছে। এবং বাবুরা আগের মতন কারণে-অকারণে অতখানি নির্মম হয়ে উঠছেন না।

খানিকক্ষণ চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকেন হরবল্লভ। তাকিয়ে থাকেন লগদী ইন্দ্র বাগদির দিকে। বলেন, 'খাড়া হয়ে মস্করা দেখা হচ্ছে? দৌড় মার্। বাক্সোটা লিয়ে আয়।'

ইন্দ্র বাগদি ততক্ষণে দৌড় মেরেছে চুয়ামসিনার দিকে। দেখতে দেখতে সে চলে যায় অনেক দূরে। হরবল্লভ পকেট থেকে তোয়ালা-রুমাল বের করে মুখ-ঘাড়-গলা মুছতে থাকেন পরিপাটি করে।

পাগল শিকারির বুকের মধ্যে কাঁপুনিটা থামছিল না তবু। আজ থেকে দশ-বিশ বছর আগে হলে, এইখানে, এই হরিণমুড়ি খালের পাড়েই পাগল শিকারি রক্তাক্ত পিঠে কাতরাতো তপ্ত বালির ওপর। বাবুরা কেন জানি ইদানিং বড় দয়ালু হয়ে উঠেছেন।

তবুও ভয় যায় না। আজও চুয়ামসিনার সিংহবাবুদের নামে ভয়ে আঁতকে ওঠে চারপাশের তাবৎ বাউরি-বাগ্দি-লোহার-মাদোড়। পূবে জয়রামপুর, উত্তরে লোখেশোল, পশ্চিমে মেটালতোড়া এবং শালকাঁকি। এবং ওগুলোর পাশাপাশি গাঁ-ঘর, ডাঙা-ডহর, জঙ্গল-পগার, জঙ্গলের তাবৎ প্রাণী অবধি সিংহবাবুদের সুমুখে ঝিম মেরে থাকে।

জয়রামপুরের সুখী লোহার যাচ্ছিল রাধানগর। পাগল শিকারি ওকে পাকড়াও করে লাগিয়ে দিয়েছে কাজে। হাতপাখা দিয়ে অরুন্ধতীকে হাওয়া করে চলেছে সে। পাগল শিকারি আর একখানা পাখা নিয়ে হরবল্লভকে হাওয়া করছে পেছনে দাঁড়িয়ে। সকাল থেকে কচি ছা'র গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। রাধানগরে অনাথ ডাক্তারের পাশ যাচ্ছিল সুখী, দু'গুলি ওষুধের আশায়। অরুন্ধতীকে হাওয়া করতে করতে কচি বাচ্চার মুখখানা চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

হরবল্লভ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন বৈদ্যার জঙ্গলের দিকে। দু'চোখে শিকারি বেড়ালের দৃষ্টি। বৈদ্যার জঙ্গলে অজস্র শিমুল গাছ। এই কিছুদিন আগে অবধি মোটা মোটা পটলের মতো শিমুল-ফল ঝুলছিল ডালে ডালে। এখন ফল ফেটে চৌচির। ফুরফুরে তুলো উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়।

আচমকা হরবল্লভ বলেন, 'পাগল, দ্যাখ্ ত রে। কে যেন আঁইছে উদিগ থেকে।'

পাগল শিকারি কপালের ওপর পড়্চালা বানায় বাঁ'হাত দিয়ে। রোদ্দুর সামলায়। চোখ চারিয়ে দেখে। আশঙ্কায় মুখখানা কালো হয়ে আসে তার।

কেবল লোহার আর শ্রীপতি মাদোড় আলপথ ভেঙে আসছিল। হরবল্লভের দৃষ্টিখানা সারাক্ষণ লেপটে ছিল ওদের গায়ে। কাছাকাছি আসতেই হরবল্লভ পাগল শিকারিকে বলেন, 'এই পাগলা, শালাদের আসত্যে বল্।'

পাগল শিকারি দু'পা এগিয়ে যায়। গলার শিরা ফুলিয়ে হাঁক পাড়ে কেবলদের। খাঁ-খাঁ দুপুরে সে ডাক দিগন্তে চক্কর মারতে থাকে বিপুল আওয়াজ তুলে।

বেশ খানিক দূরে হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে যায় কেবল লোহার আর শ্রীপতি মাদোড়। খালের পাড়ে, চাকোল্তা গাছের তলায় হরবল্লভকে দেখে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় ওরা।

শীর্ণকায় খাঁচার মতো দুটো ভাজাভাজা শরীর। মাথার ওপর ছেঁড়া বস্তা। বস্তার ছ্যাঁদা দিয়ে ফুরফুরে শিমুলতুলো বেরিয়ে পড়েছে। পাগলের দ্বিতীয় হাঁকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে দু'টি প্রাণী। কাছাকাছি আসতেই বাঘের ঝাপট নেন হরবল্লভ, 'জমিদারের জঙ্গল থেকে তুলা পাড়ছিস যে? হুকুম লিয়েছিস?'

লোকদুটো তিরতির করে কাঁপছিল। জবাব দেবার সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেছে ওরা।

'তুয়াদ্যার ছাতির পাটা ত' খোব বেড়েছে রে!'

হরবল্লভের অগ্নিমূর্তির সুমুখে কেন্নোর মত গুটিয়ে গেছে শ্রীপতিরা। কাছে এসে যে ভক্তিভরে একটি গড় করবে সে সাহসটুকুও নেই।

দেখতে দেখতে হরবল্লভের ফর্সা মুখখানা লাল টকটকে হয়ে ওঠে। 'তুয়াদ্যার কী সাজা হতে পারে, ভেবেছিস?'

ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে পুড়তে পুড়তেও যেন কম্প দিয়ে জ্বর আসে ওদের। হাজার প্রকারের শাস্তির দৃশ্য চোখের সুমুখে ভাসতে থাকে দুঃস্বপ্নের মতো। চোত-বোশেখ হলে তপ্ত বালিতে হাত-পা বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেলে রাখা। আর, শীতকাল হলে—? শ্রীপতি মাদোড়ের চকিতে মনে পড়ে যায় এক যুগ আগের একটি দৃশ্য।

না বলে বাবুদের মহল্লার একটা খেজুরগাছে চোখ কেটে, গুঁজি গুঁজে, খানিকটে রস মেরেছিল শ্রীপতির বাপ। গাছটা ছিল শ্রীপতিদের ভিটের মধ্যেই। ভিটেটা বাঁধা ছিল সিংহগড়ে। শ্রীপতির বোন তখন ন'মাসের পোয়াতি। তার সাধ হয়েছিল, খেজুর-রস খায়। বাপের কাছে তার ইচ্ছের কথাটা জানিয়েছিল লোক মারফৎ।

রাত পোহালেই খেজুর-রস নিয়ে বুড়ো রওনা দেবে মেয়ের বাড়ি। সে আর হল না। তার আগেই সিংহগড় থেকে লগদী গেল। সেই রাতেই শ্রীপতির বাপকে নিয়ে গেল চুয়ামসিনার সিংহগড়ে। শ্রীপতির বাপকে হাজির করা হল বৈঠকখানার সুমুখে।

মজলিশে আচমকা ছেদ পড়ায় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হন প্রতাপলাল। 'ইখেনে লিয়ে এলি কেন?' প্রতাপলাল বলেন লগদীদের হেড ভালুক শিকারিকে, 'লাট মণ্ডপে লিয়ে-গিয়ে বসা একে। জল, পাখা দে, খাতির-যত্ন কর্। আমি কি ইয়ার মুখ দেখবো বসে বসে?'

প্রতাপলালের ভ্রূকুঞ্চনে ভয় পেয়েছে লগদীর দল। তার চেয়েও বড় কথা, শ্রীপতি মাদোড়ের বাপকে খাতিরযত্ন করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেয়ে গেছে তারা। অতএব তারা ফিরে আসে নাটমণ্ডপের দিকে।

মাঘমাসের শীতে বুড়োকে বাঁধা হয় নাটমণ্ডপের থামের সাথে। তার সম্মানে আনা হয় খিড়কির পাঁক-পুকুরের কনকনে ঠাণ্ডা জল। এবং একজোড়া পাখা।

মাথায় ঘটিঘটি জল ঢালছে একজন। দু'পাশে দাঁড়িয়ে পাখা করে চলেছে দু'জন। প্রথমে হি-হি করে কাঁপুনি। তারপর ঠকঠকিয়ে। তারপর দাঁতকপাটি। চোখ উল্টে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। রাতভর এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে বুড়োর ওপর। শ্রীপতিকে ঐ টুকুন বয়েসে সারারাত খাড়া থেকে দেখতে হয়েছিল দৃশ্যটা।

খিচুনি শুরু হয় ঘন্টা দুই বাদে। রোম খাড়া হয়ে শজারু হয়ে গেছে সারা শরীর। তার ওপরও চলছে জল ঢালা আর পাখা করা।

রাতভর এভাবে চলে। শেষরাতে ওরা ছেড়ে দেয় বাপকে। বাপের অচৈতন্য দেহটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ফিরে আসে শ্রীপতি মাদোড়। দিন-দুই বাদে ঠিক ঐভাবে নিয়ে যায় শ্মশানে।

কোন্ যুগের কথা সব। কিন্তু মনে পড়লেই শ্রীপতি মাদোড়ের নাভির চারপাশ জুড়ে কেমন সুড়সুড় করতে থাকে ভয়ে। শরীরের কোষে কোষে চাপা আনচান ভাব।

আপাতত হরবল্লভ সিংহবাবুর সময় নেই ওদের সাজা দেবার। মাথার ওপর সূর্যদেব অগ্নি ওগরাচ্ছেন। ওদিকে সিদ্ধেশ্বর হাজরাও হয়ত বা চঞ্চল হয়ে ঘর-বার করছেন, হরবল্লভের জন্য।

ইন্দ্র বাগদি বাক্সখানা ঘাড়ে নিয়ে ফিরে আসছে। খানকয়েক জমির ওপারে রয়েছে সে। শ্রীপতিদের দিকে বার দুয়েক গনগনে চোখে তাকান হরবল্লভ। তারপর খুব ঠাণ্ডা গলায় উচ্চারণ করেন বিচারের রায় । 'তুয়াদের সব তুলা বাজেয়াপ্ত কল্যম্ আমি। আয় গাড়ির পিছু পিছু।'

হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছে কেবল লোহার আর শ্রীপতি মাদোড়। তুলোর বস্তা মাথায় চাপিয়ে তৈরী হয় ওরা।

হরবল্লভরা চড়ে বসেন গাড়িতে। হরিণমুড়ি খাল পেরিয়ে গরুর গাড়ি এগোতে থাকে বিষ্টুপুরের দিকে। গাড়ির পেছনে-পেছনে তুলোর বোঝা মাথায় হাঁটতে থাকে শ্রীপতিরা। সবার পিছে তেল-মাখানো, গাঁট-বাঁধানো লাঠি হাতে ইন্দ্র বাগদি।

মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড় মেরেছে সুখী লোহার। অনাথ ডাক্তারের কাছে জলদি পৌঁছুবার জন্য সে অপথে-বিপথে ছুটছে। তার কচি শিশুর গা আগুনের মতন পুড়তে লেগেছে সকাল থেকে। তার একমাত্র সন্তান।

লাল কাঁকুরে মাটির রাস্তা বরাবর গাড়িটা গড়গড়িয়ে চলছিল। মাথার ওপর কাঠফাটা রোদ্দুর। ধুলোর ঝড় কুণ্ডলি পাকিয়ে ওপরে উঠছে গরম হাওয়ার সঙ্গে। মাঠের মধ্যে কঙ্কালসার গরুগুলো পিঠ পুড়িয়ে চরছে।

গাড়িব গতিটা ক্রমশ মন্থর হয়ে পড়ছিল। শ্রীপতি মাদোড় আর কেবল লোহা' তুলোব বোঝা মাথায় কুঁজো হয়ে আসছিল ধীরে ধীরে। কুমুদকান্ত চাপা গলায় বলে, শালারা কি বিষ্ণুপুরতক্ক যাবেক নাকি?'

'দেখি।' হরবল্লভ বিড়বিড়িয়ে বলেন, 'কাঁকিলাতক্ক তো লিয়ে যাই।'

কাঁকিলায় ঢোকার মুখে ঠাকুরপুকুর। চৌকোণো বিশাল দীঘি। অসংখ্য শ্বেতপদ্ম ফুটে রয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন এক ঝাঁক সাদা বক ঘাড় গুঁজে বসে রয়েছে সারা দীঘি জুড়ে। দীঘিটাব পূব পাড়ে ভাঙাচোরা নীলকুঠি। চারপাশে ছত্রকার ইট-কাঠ-মশলা। নোনা ধরা ইটেব খোঁদলে খোঁদলে ছোট-বড় বট-অশথ-পাকুড়ের চারা, বেড়ে উঠেছে লোকচক্ষুব অন্তবালে। চারপাশে গজিয়ে উঠেছে কুকসীমা-সোঁদাল আর আকন্দের ঝোপ। ঘন

খয়েরী রঙ ধরেছে শম্বর গাছের কচি পাতায়। বেগুনি ফুল ফুটে রয়েছে লিউলি ঝোপের ডালে ডালে।

কুঠিটার দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকেন হরবল্লভ। এরাই এককালে স্বমহিমায় বিরাজ করেছে। অসংখ্য মানুষের ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে দাপটের সঙ্গে শাসন করেছে এলাকা। আজ কেমন দৈন্যদশা এদের। মানুষের দৃষ্টির আড়ালে নিঃশেষে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে সব। কেউ দিনান্তে একবার ফিরেও তাকায় না ওগুলোর দিকে। এই চিন্তাটাই হরবল্লভকে সর্বদা বিষণ্ণ করে রাখে ইদানিং। অতীতের স্তম্ভগুলিকে এমন অনাদরে অবজ্ঞায় ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে দেখলে বুকের মধ্যে এক ধরনের কাঁপন শুরু হয় অজান্তে। পেছনে যেন কার নিঃশব্দ পদচারণা অনুভব করেন। সিদ্ধেশ্বর হাজরার গুহ্য কথাগুলোও তখন পর্যাপ্ত ওম্ জুগিয়ে চাঙ্গা করে তুলতে পারে না।

একটা ছন্নছাড়া কাক নীলকুঠির ভাঙা দালানের চুড়োয় বসে রয়েছে। ঘাড় তুলে তুলে তাকাচ্ছে চারপাশে। কি যেন খুঁজছে আপন মনে। এক সময় কালচে, নোনাধরা ইটের গায়ে খানিকটা মলত্যাগ করে আচমকা উড়ে গেল। হরবল্লভ মুখ ফিরিয়ে নেন অন্যদিকে। নিঃশ্বাসটা সন্তর্পণে ছাড়েন। দিনকাল বুঝি সত্যিই বদলে যাচ্ছে দ্রুত। স্থান-কাল-পাত্র বদলাচ্ছে। কম্যুনিষ্টরা পাড়ায় পাড়ায় ঢুকে পড়ছে নিঃশব্দে। বাঁধগাবা আন্দোলনের সেই মাতব্বর ব্যক্তিটি, পবীক্ষিৎ বাউরি, নতুন করে নড়েচড়ে বসেছে, এমন খবর আছে হরবল্লভের কাছে। অনাথবন্ধু রায়েব মতিগতিও ঠিক ভাল ঠেকছে না। প্রতিদিন তিলতিল বদলে যাচ্ছে আকাশেব বঙ। খুব খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করলে টের পাওয়া যায় সেটা। কে জানে, আর কতদিন এভাবে চালান যাবে! সিদ্ধেশ্বর হাজরা আর রামকমল চক্রবর্তীরা আর কতদিন হাতের মুঠি শক্ত করে আগলে রাখতে পারবে মুঠির অন্তর্গত কড়িটি! কে জানে! ভরসা তো ওরা দিয়ে চলেছে অবিরাম। কিন্তু চারপাশের এইসব দেখেটেখে মন যে ইদানিং বড়ই উচাটন হয়ে থাকে।

রাস্তার ধারে জোড়হস্তে দাঁড়িয়েছিল অধর ঝারমুনিয়া। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়েছিল হরবল্লভের মুখের দিকে। হুজুর বুঝি দীঘির পদ্মফুল নিরীক্ষণ করছেন থিরপলকে! এই ভেবে হরবল্লভের একাগ্রতাটুকু ভেঙ্গে দিতে সাহস হয় নি তাব। একটু বাদে সামনের দিকে দৃষ্টি ফেরান হরবল্লভ। অধর ঝারমুনিয়া বুঝি তৈরি ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়খানাকে হাঁটু অবধি নুইয়ে দণ্ডবত কবে সে।

হরবল্লভ ঠোঁটের ফাঁকে হাসেন, 'কিরে, অধর, কাব উপকাব করে ফিরলি?'

এ ধরনের কথায় সদা-সর্বদাই মরমে মরে যায় অধর ঝারমুনিয়া। ভয়ে-ভক্তিতে গদগদ হয়ে কাঁচুমাচু গলায় বলে, 'লজ্জা দিবেন নাই হুজুর, মাইন্ষের টুকচান উপকার কবি সাধ্য মতন, উয়ার বেশি কিছো লয।'

অধর ঝারমুনিয়ার বয়েস বছর-পঞ্চান্নর বেশি হবে না। কিন্তু কাঁচা-পাকা চুলে, তোবড়ান গালে, মনে হয় ষাট পেরিয়ে গেছে। হাড্ডিসার শরীর, বেয়াড়া রকমের ঢ্যাঙাপানা গড়ন। ঘোড়ার মতো লম্বাটে মুখখানি। মাথার দশ-আনা জুড়ে ঘসা-মাজা টাক, গাঁটওয়ালা খাড়াই নাকের তলায় এক চিলতে প্রজাপতি-গোঁফ পরিপাটি করে ছাঁটা। গলার হনুকিখানা ঘনঘন ওঠে নামে। অত্যধিক ঢাঙাপানা গড়নের দরুন এবং সেই সঙ্গে মাত্রাধিক বিনয়বশত সর্বদাই সামনের দিকে নুয়ে থাকে ঊর্ধ্বাঙ্গ। সেই সুবাদে, ঘাড়ের ওপব একটা মোলায়েম কুঁজের আকার। রোজ ভোর বেলায় 'বরিয়ে পড়ে অধব, পবনে খাটো ধুতি, নীল হাফ-সার্ট,

পকেটে থাকে একটা ছোট্ট নোটবই, তার মধ্যে অসংখ্য কাগজের টুকরো। একটি ঘন বাদামী রঙের সস্তা কলম গোঁজা থাকে বুক-পকেটে। পকেট থেকে ক্রমাগত কালি লিক্ করবার দরুন পকেটের অর্ধেক জুড়ে গাঢ় কালির ছোপ।

অধর ঝারমুনিয়ার পেশার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। দুনিয়ার সব কিছু নিয়ে তার কারবার। সবকিছুতেই সে মিড্‌লম্যানের কাজ করে। গরু-কাড়া, গাছ-গাছালি, মাছ, বেচবে কেউ, কিনবে কেউ, অধর খদ্দের-বিক্রেতা জোগাড় করে দেয়। গঙ্গাস্নানে যাবে এলাকার বিধবাকুল, পুরীতে রথ দেখতে যাবে ভক্তবৃন্দ, অধর সেই দলের ম্যানেজার, অভিভাবক। জেলারো অফিসে পাট্টা পাচ্ছে না কেউ, ব্লক অফিসে তিরপল, লোন, অধরই ভরসা। কালো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, অধর ঘটক। কুমারী মেয়ে বাধিয়ে ফেলেছে, পাঁচকান হলে বিপদ, অধরই অগতির গতি, মেয়ের পেট নামাতে নিয়ে চলল কুম্ভস্থলীর ভরত কোবরাজের কাছে। সে গোপনে এসব কাজ করে এবং পেট নামাতে ওস্তাদ।

দিনভর গাঁয়ের বোকাসোকা মানুষগুলোকে নিয়ে অধর ঝারমুনিয়ার কাজ কারবার। ওদের শহরে নিয়ে যায়। হাসপাতালে, রেজিস্ট্রি অফিসে , এস-ডি-ও'র কোর্টে, এ কাচারি ও আপিসে হাজার রকমের তদারকি, তাগিদ সেরে, দুপুরবেলায় মক্কেলের পয়সায় মাংসভাত, পান-সিগারেট খেয়ে, সন্ধ্যেবেলায় ফিরে আসে। তল্লাটের তাবৎ মানুষ অধর ঝারমুনিয়াকে একডাকে চেনে। বাপ গগন ঝারমুনিয়া ছিল আলাভোলা মানুষ। মা ছিল দারুণ রূপসী। শোনা যায়, সাবেক সিংহগড়ের বড়কর্তা সুদর্শন সিংহবাবু তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন ঐ রমনীকে। নাগাড়ে তিনদিন সে মেয়ে ছিল জয়রামপুরের নৈতন কাচারিঘরে। তারপরই আচম্বিতে বাধানগরের ঝারমুনিয়াদের বাড়বাড়ন্ত। কিন্তু চঞ্চলা লক্ষ্মী বেশিদিন থাকেননি সে ঘরে। শেষের দিকে মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল গগন ঝারমুনিয়ার। বউটার দিকে ফিরেও তাকাত না। সংসারটাও দেখল না তেমন করে। অধর তখন ছোট। সংসারটা তার চোখের সুমুখে একটু একটু করে ধ্বসে গেল। যখন সাবালক হল অধর, তখন তাদের জরাজীর্ণ অবস্থা। কাচারিঘরে মায়ের দেহদানের কথা হাওয়ায় ভেসে ভেসে ঢুকেছে অধরের কানেও। অনেক টিপ্পনি শুনতে হয়েছে তাকে সেজন্য। অনেক অপমান। কিন্তু অবাক কাণ্ড, যতই দিন গেছে, অধর ঝারমুনিয়া একটু একটু করে সিংহগড়ের অনুগত হয়ে উঠেছে। এখন সে সব-অর্থেই সিংহগড়ের পোষা কুকুর একটি।

হরবল্লভ মুচকি মুচকি হাসছিলেন। বলেন, 'সত্যি বল্ তো অধর, আজ ক'জনের কী কী উপকার কইর্‌লি?'

অধর ঝারমুনিয়ার শরীরখানা সামনের দিকে আরও নুয়ে পড়ে। বলে 'আমরা হইল্যাম মাটির মানুষ, আমাদ্যার কতটুকু ক্ষ্যামতা হুজুর? উপরঅলা যা করান, লিরানন্দে তাই করি। উঁয়ার মহিমায় প্রত্যয় করি, সাধ্যি কি আইজ্ঞা? সবই তো উঁয়ার লীলা, আমরা তো সব উপলক্ষণ।' অধর ঝারমুনিয়ার কথা শুনতে বড়ই ভালবাসেন হরবল্লভ। বাক্যের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ এমন শব্দ বসিয়ে দেয়, মানেই বদলে যায়। অধর বুঝতেই পারে না।

গাড়িটা চলে যাচ্ছিল অধর ঝারমুনিয়ার পাশ দিয়ে। তুলোর বোঝা মাথায় নিয়ে হাঁসফাঁস করছিল কেবল লোহার আর শ্রীপতি মাদোড়। প্রবল রোদ্দুরে ভারি বোঝ্ মাথায় নিয়ে জিভ ঝুলে পড়েছে ওদের, কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। ঘনঘন কোৎ পাড়ছে দু'জনে। দেখতে দেখতে অধর ঝারমুনিয়ার সারা মুখ এক ধরনের পিচ্ছিল হাসিতে ভরে যায়।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'অত তুলা লিয়ে কুথায় চললেন হুজুর?'

'ভাল কথা—।' হরবল্লভ বলেন, 'তুলাগুলান লিয়ে গিয়ে রাখ্ তো তুয়ার ঘরে। কাল ক'ককে দিয়ে পাঠাই দিবি গড়ে। এই শালারা, অধরের সাথ যা।'

আচমকা স্বয়ং হরবল্লভের থেকে এই দায়িত্বটুকু পেয়ে আত্মপ্রসাদে পুলকিত হয়ে ওঠে অধর। কুঁজো ঘাড়খানি যথাসম্ভব সিধে করে বলে, 'আমি লিজেই ঘাড়ে বয়ে পৌঁছাই দিব, হুজুর।'

পাগল শিকারি ছবিটা শেষ করে। এইভাবেই শেষ করে। বিস্মিত, ব্যথিত বুদ্ধদেবের অস্থির জিজ্ঞাসা, 'তারপর?'

'তারপর আর কি? সেই তুলা জমা পড়ে অধর ঝারমুনিয়ার পাশ। তুলা থেকে বালিশ হয়। সেই বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে শুয়ে স্বপন দেখেন আপনি।'

'আমি!' বুদ্ধদেব হকচকিয়ে শুধোয়। আচমকা গভীর জলে পড়ে যাওয়া সাঁতার-না-জানা মানুষ যেন সে। 'আমি কেন?'

'কেন না, সেই তুলায় যে দু'খান বালিশ তিয়ার হয়েছিল, উগুলান বর্তমানে বেবহার করেন আপনিই।' বলতে বলতে ছবিখানার গায়ে একরাশ কালি ঢেলে দিয়ে অন্য একখানা ছবির ফ্রেমের মধ্যে ঢুকে পড়ে পাগল শিকারি।

চোর-পুলিশ মিলেঝুলে একটা প্রদর্শনী-ম্যাচ

বিষ্টুপুর ব্লক অফিসের লাগাও যে বিশাল বটগাছখানা চতুর্দিকে ডালপালা ছড়িয়ে, মোটামোটা থামের মতো ঝুরি নামিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনাদিকাল ধরে, তার নাম দুঃখহরণের বটতলা। কারণ, ওই বটের তলায় দুঃখহরণ রক্ষিতের চা-জিলাবির দোকান। দুঃখহরণ ব্লকের ড্রাইভার রাইচরণ রক্ষিতের ভাই। বিডিও সাহেবকে সেবা-পুজায় তুষ্ট করে সে ভাইকে এই গাছের তলায় থাপনা করেছে। প্রথম প্রথম ব্লক আপিসে লোকজনের আনাগোনা কম ছিল। দুঃখহরণ বসে বসে মাছি তাড়াত। ক্রমে ক্রমে মানুষজন যত আসছে, দুঃখহরণের রমরমা ততই বাড়ছে। আর, কী আশ্চর্য, ইতিমধ্যে সরকারি অফিসের চোহদ্দির মধ্যে থাকা একটি গাছের তলার স্থায়ী নামকরণও সম্পূর্ণ! দুঃখহরণের বটতলা। দুঃখহরণ মরে যাবে, চায়ের দোকানটাও উঠে যেতে পারে, কিন্তু 'দুঃখহরণের বটতলা' অমর হয়ে থাকবে। এমনও তো হতে পারে, চায়ের দোকানটা কোনও কারণে উঠে গেল, কোনও ধূর্ত মানুষ বটতলাটির এ হেন নামকরণের অন্যতর ব্যাখ্যা দিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নিতে পারে। 'এই বটের তলায়, পাতালপ্রদেশে, বাস করিতেছেন দুঃখহরণেশ্বর শিব। তিনি পাতালবাসী মহাদেব। তাঁহার লিঙ্গ উপর হইতে চর্মচক্ষে দৃশ্যমান নহে। এই বটের তলায় মহাদেবের পূজা করিলে পাতালবাসী দেবতা অতিশয় তুষ্ট হইবেন। আপনার সর্বদুঃখ লাঘব হইবে। সর্ব মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। বাবা দুঃখহরণেশ্বরকে তুষ্ট করুন, তিনি আপনার সর্ব দুঃখ হরণ করিবেন। দুঃখহরণের বটতলায় আসুন।' আর, এ দেশের মানুষকে যতটুকু চেনে বুদ্ধদেব, ঠাকুর-দ্যাবতার লেশমাত্র থাকলেই মানুষ একেবারে অন্ধ, আত্মহারা হয়ে যায়। ঠাকুর-দ্যাবতাকে কষ্ট করে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হয় না এদেশে। মানুষ ওঁদের বিশ্বাস করবার জন্য মুখিয়ে

থাকে। কাজেই, এ হেন বিজ্ঞপ্তি যদি সাইনবোর্ডের মতো করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বটতলার আশেপাশে এবং সেই সাইনবোর্ডের উপরিভাগে যদি মাথায় আধ-খাওয়া চাঁদ এবং গলায় ফণাতোলা সাপ জড়ানো একটি শিবের মূর্তি এঁকে দেওয়া যায় (শিব ঠাকুরের মাথার পেছনে সাইনবোর্ডের বেস-কালার বৃত্তাকারে ফিকে করে দিলে তা জ্যোর্তিবলয় হয়ে যাবে) তবে দু'দিন বাদেই কাতারে কাতারে মানুষ এসে ভিড় করবে সেখানে। পূজা দেবে, মানত করবে, হত্যে দেবে, খাঁটি দুধ ঢেলে ঢেলে কাদা করে দেবে বটের তলার জমি, দক্ষিণায়-প্রণামীতে ভরিয়ে দেবে দুঃখহরণেশ্বরের স্বঘোষিত পূজারির হাতদুটি। ক্রমে ক্রমে এখানে গাজন হবে, মেলা বসবে...। দুঃখহরণের বটতলা ক্রমে ক্রমে সাধনপীঠের মাহাত্ম্য পেয়ে যাবে। এভাবেই রটে যায়। এভাবেই ক্ষেপে যায় মানুষ। এভাবেই আমতলা, জামতলা, শ্যাওড়াতলাগুলি ক্রমশ পীঠ হয়ে উঠেছে এদেশে।

এইসব, বড় উল্টোপাল্টা ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল বুদ্ধদেব। পাশেই ব্লকের বারোআনা অফিসার রঙ্গরসে মজে ছিল। বুদ্ধদেবের মন ছিল না সেই মজলিসে। ব্লক অফিসে সে আনকোরা নতুন। তেমন কারো সঙ্গেই তার আলাপ নেই। ফলে, মজলিশ থেকে ক্রমশ দূরবর্তী হতে হতে সে এই উদ্ভট ভাবনার রাজ্যের বাসিন্দা। হুঁশ ফেরে ত্রিভঙ্গর ডাকে। বুদ্ধদেব ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, জমে উঠেছে দুঃখহরণের বটতলা।

পঞ্চায়েতে অফিসার কৃষ্ণেন্দু নাগ, সংক্ষেপে কৃষ্ণ নাগ, শত্রুপক্ষ আড়ালে ডাকে কাল-সাপ, সপাটে বাজা-বাদশা মারছিল। পাশে বসে গোগ্রাসে গিলছিল ব্লকের ওভারসিয়ার করালী সোম, ক্যাশিয়ার অখিল সরকার এবং কৃষি-অফিসার স্বদেশ কুণ্ডুরা। দুঃখহরণ জিলিপি ভাজছিল। কমলারঙের জিলিপি টগবগিয়ে ফুটছিল কড়াইতে। সেই ফাঁকে সবাই স্বদেশ কুণ্ডুর পেছনে লাগছিল। স্বদেশের সঙ্গে গ্রামসেবিকা মল্লিকা বোসের একটা মধুর সম্পর্ক রয়েছে, তলায় তলায় এমন একটা রটনা রয়েছে। আপাতত ঠাট্টা-তামাশা চলছিল তাই নিয়ে। এ ব্যাপারে কৃষ্ণ নাগই দলনেতা। সংসারের হাজারো ডালেপালায় ঘুরে বেড়ানো ব্যক্তি। এই দুনিয়ার হালফিল ঘটনাপ্রবাহের খবর যে তার চাইতে বেশি কেউ জানতেই পারে না, এ বিষয়ে তার কোনই সন্দেহ নেই। এছাড়া, সে আরও দুটি দুর্লভ গুণের অধিকারী। এক, অন্যের সম্পর্কে অনেক মনগড়া কথা চটপট বানিয়ে ফেলতে পারে। এবং খবরগুলি সাধারণত অপরের চরিত্রহনন সংক্রান্ত হয়ে থাকে। দুই, কারণে অকারণে মানুষের পেছনে লেগে নাস্তানাবুদ করাটা তার 'হবি'র মধ্যে পড়ে। গত সাতদিনে রোজ ব্লকে এসে বুদ্ধদেবের তেমনই ধারণা হয়েছে।

কৃষ্ণ নাগ ভারি চশমার আড়াল থেকে স্বদেশের দিকে আড়চোখে তাকায়। বার-দুই চোখ নাচায়। বলে, 'আরে ব্রাদার, এই কলিকালে ডুবে ডুবে জল খেলেও একাদশীর বাবারা টের পায়। এই কে-এন (কৃষ্ণেন্দু নাগ নিজের নামখানিকে এইভাবে সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছে।)-এর চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নয়। অত লুকোচুরিতে লাভ নেই, আগাম সেলিব্রেট করে ফেল দুঃখহরণের জিলিপি দিয়ে।'

'ঠিক।' সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরে অখিল সরকার,' 'জিলিপির প্যাঁচেপ্যাঁচে বাঁধা পড়ুক তোমাদের দুটি সবুজ হিয়া।'

'যত সব বাজে কথা।' স্বদেশের চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে।

'এক বর্ণ বাজে কথা নয়।' কৃষ্ণ নাগ নিজের উরুতে চাপড় মারে, 'ভেবে দ্যাখো, শহরের শিক্ষিত মেয়ে, তোমার সঙ্গে অজগাঁয়ে ঘুরে ঘুরে কিচেন-গার্ডেনের ট্রেনিং দিয়ে বেড়াচ্ছে। এতখানি এন্‌থু পায় কোত্থেকে?'

'ঠিক।' অখিল সরকার চোখ নাচায়, 'এনার্জি-ট্যাবৃটি কি? লকলকিয়ে বেড়ে ওঠার সার-জল?'

স্বদেশ কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ত্রিভঙ্গকে আসতে দেখে হৈ-হৈ করে ওঠে সবাই।

কৃষ্ণ নাগ চেঁচিয়ে বলে, 'এই যে রামসেবকবাবু, কলেবর যে দিনদিন বাড়ছে। এলাকার সব গেরস্তের গাই কি দুধেল হয়েছে ইদানীং?'

'তেমনটা হলে পঞ্চায়েত অফিসার কি বাদ পড়তেন?' ত্রিভঙ্গর তৎক্ষণাৎ জবাব।

'পড়তেও পারি রে ভাই।' কৃষ্ণ নাগের মুখে কপট ক্ষোভ, 'আমরা তো লোন-ড্রাইডোল, বীজ-সার বিলি করিনে।'

'প্রেসিডেন্টের বাড়ির ঘি-দুধও সেবন করি নে।' পাদপূরণ করে করালী সোম।

'টি আর-এর কাজের মাটিও মাপজোক করিনে।' ভাল মানুষের মতো মুখ করে বলে কৃষ্ণ নাগ।

কৃষ্ণ নাগের সঙ্গে এতক্ষণ তাল মেলাচ্ছিল ওভারশিয়ার করালী সোম। কিন্তু ও যে করালীর দিকেই বন্দুকের নলখানা ঘুরিয়ে দেবে তেমনটা আন্দাজই করতে পারে নি করালী। সারা মুখে এক ধরনের 'হৃতভাগ্য' গোছের মুদ্রা রচনা করে করালী, 'অভাগার দিকে নজর কেন ভাই? এমনিতেই এ বছর রিলিফের টাকা কম।'

'কম থাকবে না হে,' ঝলসে ওঠে ক্যাশিয়ার অখিল সরকার, 'যিনি টাকা দেবার মালিক, ঐ দ্যাখো, তিনি তোমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন।'

অখিল সরকার আঙুল তুলে সূর্যদেবকে দেখায়। বলে, 'উনি যত হাসতে থাকবেন, ততই খরা-খরা বলে কাঁদতে থাকবে মানুষ এবং ঝনঝনিয়ে টাকা ঝরবে ওপর থেকে।'

'তাহলে তো তোমবাও কুড়োতে পারবে।' করালী সোম মুচকি হাসে, 'সবাই কুড়োবে।'

'থিয়োরেটিক্যালি তাই বটে। তবে কি জান—।' কৃষ্ণ নাগ ধূর্ত চোখে গল্প জোড়ে, 'কীর্তনের আসরে বাতাসার হরির লুট দেওয়া হয়। দেখেছ তো? ছেলেবেলায় আমাদের পাড়ায় দেখেছি, ভীমাপদ ঠাকুর ঝুড়িতে বাতাসা ভরে হরির লুট দিত পাড়ার বারোয়ারি মণ্ডপে। অসংখ্য মানুষ কুড়োবার জন্য তৈরি। ভীমাপদর বাড়ির লোকজনও থাকত ওদের মধ্যে। কিন্তু এমন নিপুণ হাতে বাতাসা ছুঁড়ত ভীমাপদ, যাতে করে ওর বাড়ির লোকজনের কুড়োবার সুবিধে হয় সবচেয়ে বেশি। আমি ছেলেবেলায় বহুবার লক্ষ করেছি, কী নিপুণ কৌশলে ভীমাপদর আত্মীয়রা ভিড়ের মধ্যে নিঃশব্দে জায়গা বদলাত, এবং কী নিপুণ হাতের কারসাজিতে ভীমাপদ তার আত্মীয়দের চারপাশে বাতাসা বৃষ্টি করে চলত।'

'কাজেই ব্রাদার—' অখিল সরকার করালী সোমের দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে, 'হরির লুট হলেই সবার ভাগ্যে বাতাসা জোটে না।'

'এবছর কি খরা হবে?' বেঞ্চিটাতে বসেই আচমকা প্রশ্নটা শুধিয়ে বসে ত্রিভঙ্গ।

'কেন?' কপট সন্দেহের চোখে তাকায় কৃষ্ণ নাগ, 'ডান চোখ নাচছে নাকি?'

সবাই হেসে ওঠে। ত্রিভঙ্গও।

এইবার, যে জন্য শুঁকে শুঁকে বটতলা অবধি এসেছে, সেই আসল কথাটি পাড়ে ত্রিভঙ্গ। অখিল সরকারকে বলে, 'এই যে দাদা, অধমকে আর কতদিন ঝুলিয়ে রাখবেন? টি এ বিলের টাকাটা ছাড়ুন।'

'থামো, মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করো না।' অখিল সরকার এক ধমক দেয় ত্রিভঙ্গকে, 'মেসে শুয়ে শুয়ে ট্যুর কর। সেই টাকার জন্যে একেবারে পাগল!'

'অ্যাই, অ্যাই —।' ত্রিভঙ্গ হাঁ-হাঁ করে ওঠে, 'একেবারে ইন্‌টিগ্রিটি তুলে কথা বলা হয়ে যাচ্ছে মাইরি।'

'ওকে একটি পয়সাও দেবে না অখিল' স্বদেশ কুণ্ডু এতোক্ষণে মুখ খোলে, 'কাজকর্ম কিছুই করছে না ও। দু'মন ধইঞ্চাবীজ দিয়েছিলাম। দু'সেরও বোনাতে পারেনি। আর বোনমিল ইউরিয়া তো এখনও গোডাউন থেকে তোলেই নি।'

'শালারা ভযানক চালাক। মাইরি বলছি। কী বলে জানো? বলে, জমির সার নাকি ধইঞ্চা গাছেরা খেয়ে ফেলবে। আর, হাড়ের গুঁড়ো, ইউরিয়া? আমাকে কেটে ফেললেও আমি গাঁয়ের মধ্যে ঢোকাব না ওসব। আমার গায়ের ছাল খিঁচে নেবে। একবার কথাটা তুলেছিলাম, মারতে বাকি রেখেছে।'

'সত্যি—' আকাশের দিকে হাত তোলে স্বদেশ কুণ্ডু, 'এই বুড়বকের দেশে হবে কিনা উন্নত প্রথায় চাষ!'

'কি করে হবে?' কৃষ্ণ নাগ কিছুতেই পরিস্থিতিটাকে ভারি হতে দিতে চায় না। করালী সোমের চোখে চোখ রাখে। বলে, 'চাষাড়ে অফিসার যদি সারাদিন ধবধবে মাখনজিন পরে ঘোরে, আর সুন্দরী গ্রামসেবিকার সঙ্গে প্রেম করে বেড়ায়?'

স্বদেশ কুণ্ডু সর্বদা খুব ফিটফাট থাকে। পায়ের জুতো থেকে মাথার চুল অবধি সারাক্ষণ ঝকঝক করে ওর। মুখে স্নো-টো মাখছে আজকাল। জামাকাপড়ে বিলিতি এসেন্সের গন্ধ। কৃষ্ণ নাগের কথায় স্বদেশ লাজুক হাসে। কথায় কথায় মৃদু হাসি ভালোই হাসতে পারে স্বদেশ। অনেক সময় চোখা কথার জবাবটা হাসি দিয়ে এড়িয়ে যায়।

ত্রিভঙ্গ ভারি উতলা হয়ে উঠেছে।

অখিল সরকারের দিকে সরে গিয়ে বলে, 'মাইরি দাদা, বউটার বেজায় অসুখ। চিকিৎসা করাতে পারছি না টাকার অভাবে।'

'বউ!' চশমার আড়ালে কৃষ্ণ নাগের চোখদুটো মার্বেলের মতো গোল হয়, 'তোমার আবার বউ কোথায় হে? পাপচক্ষুতে দেখলাম না তো কোনদিন।'

'পাপচক্ষু দিয়ে পরের বউ দেখতে নেই।' মাঝপথে ফুট কাটে করালী সোম।

'আছে দাদা, দেশে আছে। বিশ্বেস করুন।' ত্রিভঙ্গ যেন অল্পজলে খাবি খেতে থাকে।

'গুল মেরো না, বুঝলে ত্রিভঙ্গ, গুলটি মেরো না।' অখিল সরকার কপালের তাবৎ বলিরেখায় ভাঁজ তুলে বলে।

'মাইরি দাদা। বিশ্বেস না হয় চলো একদিন দেশের বাড়িতে।'

'তা ভালো'। দার্শনিকের চোখে আকাশ দেখতে থাকে কৃষ্ণ নাগ, 'কাচ্চা-বাচ্চার অন্নপ্রাশনে টাকাকড়ি পাঠাও তো?'

বুদ্ধদেবের মোটেই ভালো লাগছিল না এসব খেজুরে আলোচনা। উঠে পড়বে কিনা ভাবছিল। বারদুই ত্রিভঙ্গর চোখের ওপর চোখ রাখে সে। কিন্তু ত্রিভঙ্গ অতো গা' করে না।

তার বলে এখন জীবন-মরণ সমস্যা! অখিল সরকারের দিকে আরো ঘেঁসে গিয়ে সমানে ঘ্যানরঘ্যানর করতে থাকে।

'কী আশ্চর্য। সাধনাই করলে না তুমি,' অখিল সরকারের গলায় কপট গাম্ভীর্য, 'সাধনার আগেই সিদ্ধিলাভ?'

'ঠিক।' মুখের কথা কেড়ে নেয় করালী সোম, 'আগে পুজো-আচ্চা কর। নৈবেদ্য দিয়ে ঠাকুরকে তুষ্ট কর। তবে তো।'

'এক ঠোঙা জিলিপি নৈবেদ্য দিচ্ছি দাদা। উদ্ধার করে দাও এবারের মতো।' ত্রিভঙ্গর কাতর অনুনয়।

'ব্যস? কেবল ওতেই?' করালী সোম যেন আকাশ থেকে পড়ে, 'যে-কোনো দেবতার পুজোর আগে গণেশপুজো করতে হয়, জানো না?'

'ওঁ গণেশ-বিঘ্নেশ—।' কৃষ্ণ নাগ মাথা নেড়ে মন্ত্র পাঠ করতে থাকে।

'ঠিক, বিঘ্ন ঘটে যাবে কিন্তু। সাবধান,' করালী সোম সতর্ক করে দেয় ত্রিভঙ্গকে।

'আপনি আর কী বিঘ্ন ঘটাবেন করালীদা?' স্বদেশ কুণ্ডু নাক কুঁচকে বলে ওঠে। করালীকে তাতাবার ছল।

'কী বিঘ্ন ঘটবে, তা ও দেখতে পাবে।' করালী সোমের গলা রহস্যময়, 'অন্তত তিনখানা রাস্তার কাজ হচ্ছে ওরই তদারকিতে। টেপটা একটু টেনে ধরব। স্রেফ পাঁচ হাজার মাটি কম। সামলাও এবার।'

'ও দুঃখহরণ, দাও দাও। এদের প্রত্যেককে এক ঠোঙা করে দাও।' নাচার হয়ে ওঠে ত্রিভঙ্গ, 'শুনেছি কাক নাকি কাকের মাংস খায় না। কলিযুগে শালা তাও খাচ্ছে।'

সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে ত্রিভঙ্গর বলার ভঙ্গিতে। দুঃখহরণ জিলিপির ঠোঙা নিয়ে আসতেই কৃষ্ণ নাগ জিভ কেটে বলে ওঠে 'আরে আমাদের কেন? প্রথমেই এক ঠোঙা পুজো পাঠিয়ে দাও হে দুঃখহরণ। ওদিকে দ্যাবতা হয়তো এতক্ষণে চটেমটে লাল।'

দুঃখহরণ এসব গুহ্য কথার অর্থ বোঝে। সে নাড়ুকে দিয়ে এক ঠোঙা জিলিপি পাঠিয়ে দেয় বড়বাবুর কাছে। অখিল সরকার বলে, 'হ্যাঁ, এইবার প্রসাদ হল।'

'ঠিক।' করালী সোম বলে, 'এসব হল নৈবেদ্যর সামগ্রী। প্রসাদ না করে খাওয়া চলে না।'

মহানন্দে জিলিপি খেতে থাকে সবাই। বুদ্ধদেব বসে ছিল এক পাশে। দুঃখহরণ তার হাতেও এক ঠোঙা জিলিপি ধরিয়ে দিয়ে গেছে।

স্বদেশ কুণ্ডু এতক্ষণে তাকায় বুদ্ধদেবের দিকে। মৃদু হাসে, 'ভালো আছেন?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ে বুদ্ধদেব।

কৃষ্ণ নাগ শুধোয়, 'কে?'

'চেনেন না?' ত্রিভঙ্গ আগ বাড়িয়ে জবাব দেয়, 'আমাদের নতুন গ্রামসেবক।'

'তাই নাকি? ছুটিতে ছিলাম। দেখিনি। তা, বলবে তো সে কথা। আমি ভাবি, তোমার কোনো মক্কেল বুঝি। হয়তো বা জিলিপি খাওয়াতে এসেছে তোমায়।'

ত্রিভঙ্গ একটা চোখা জবাব দিতে যাচ্ছিল, তার আগে হাঁ-হাঁ করে উঠল অখিল সরকার।

'এই, এই, ঢেকে ফেল জিলিপির ঠোঙা। জলদি।'

সকলেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকায়।

চোখেমুখে যথেষ্ট আতঙ্ক জড়ো করে অখিল সরকার বলে, 'বামাচবণ আসছে।'

সবাই পিছু ফিরে তাকায়।

বাঁ-হাত কোমরে ঠেকনা দিয়ে বেতো ঘোড়ার মতো খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছিল বামাচরণ। সবার চোখেমুখে এক ধরনের উল্লাসের হিল্লোল বয়ে যায় মুহূর্তে।

বুদ্ধদেব দেখছিল বামাচরণকে। সত্যিই বড় বিদঘুটে চেহারা। লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশি নয়। সারা গায়ে এবং মাথায় কটা চুল। চোখদুটোও কটা। হাতের আঙুলের গাঁটগুলো বুড়ো সজনে ডাঁটার মতো মোটা ও কর্কশ। বেতো ঘোড়ার মতো হাঁটে। হাঁটার দোষে পিঠেব ওপর একটা কুঁজের মতো মালুম হয়। মাথার চুলগুলো খাড়া। ছোট করে ছাঁটবার দরুন জুতোর বুরুশের মতো লাগে। বয়েস আন্দাজ তিরিশ মতো হলেও মুখে দাড়ি-গোঁফের লেশমাত্র নেই। বামাচরণ ব্লক অফিসের যাবতীয় চিঠি আমদানি-রফতানির হিসেব রাখে। করেসপন্ডেন্স ক্লার্ক। সংক্ষেপে সি-সি। সবাই বলেই, শিশি নয় বোতল। সত্যিই বোতলের মতো পেটমোটা আকার-অবয়ব ওর। জেনারেল সেক্‌শনের একেবারে কোণের চেয়ারটাতে ওকে বসে থাকতে দেখেছে বুদ্ধদেব। লক্ষ করেছে, বামাচরণকে দেখলেই অফিসের সবাইয়ের ঠোঁটজোড়া আপসেই খুলে যায়। মুখের সবগুলো দাঁত উঁকি মারে যেন বামাচরণকেই দেখবার জন্য। সকলের চোখেমুখে ফুটে ওঠে এক রাশ বিদ্রূপ।

বামাচরণকে জ্বালিয়ে কেন জানি ভীষণ মজা পায় সবাই। ওকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এক ধরনের আনন্দ পায়। সবাইয়ের খোঁচা খেতে খেতে বামাচরণের কটা চোখদুটো বেদনায় নীল হয়ে এলে, সেও এক দেখবার জিনিস হয়।

রোজরোজই বামাচরণের টেবিল থেকে ফাইল, কলমদান, প্যাড ইত্যাদি হারিয়ে যায়। চেয়ারখানা মাঝে মাঝেই অন্যঘরে পাচার হয়ে যায়। কোনো চিঠি গুছিয়ে রেখে বামাচরণ হয়তো একটুক্ষণের জন্য বাইরে গেল, অমনি পাশের থেকে কেউ এসে চটপট লুকিয়ে ফেলল ওটা। খানিক বাদে বিডিও সাহেবের ঘরে চিঠিখানিসহ যখন ডাক পড়ল, তখন বামাচরণের অবস্থাখানা দেখবার মতো।

এই অফিসে বামাচরণেব কোনো বন্ধু নেই। সে একা। পবিপূর্ণভাবেই একা। ও কাজ করে ধীরেসুস্থে। রয়েসয়ে। কোনো ব্যাপারই একবারে ওর মাথায় ঢোকে না। এক করতে সর্বদাই আর করে বসে। কোন্ চিঠি কোন্ ফাইলে রাখে, তার হিসাব থাকে না। প্রতিদিন অন্তত একবার বিডিও সাহেবের ধমক ওব জন্যে বরাদ্দ। তাতে প্রায়শই ইন্ধন জোগায় সবাই। সুযোগ পেলেই ওর নামে সাতকাহন করে লাগায়। ও যে কত বোকা, অপদার্থ, ও যে এক আজব জীব, সেটা প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগে যায় সবাই, এ ব্যাপারে মেয়েরাও পিছিয়ে থাকে না।

প্রতিদিন অফিসের শুরুতে বামাচরণের চারপাশ ঘিরে মেঘ জমতে থাকে। সবাইয়ের থমথমে গাম্ভীর্যের মধ্যে বামাচরণ দেখতে পায় আগামী বর্ষণের ইঙ্গিত। কাজের ফাঁকে সহকর্মীদের চোরা চাউনি আর চটুল হাসি বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে মুহুর্মুহু। বামাচরণ এদিক-ওদিক তাকায়। আজ ঝড়ের দাপট কতোখানি হবে, সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা করে।

খানিক বাদেই এদিক ওদিক থেকে টুকরো টুকরো মন্তব্য বামাচরণের উদ্দেশে বর্ষিত হয়। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মতো। টিফিন আওয়ার এলেই শুরু হয় অশ্রান্ত বর্ষণ। অজস্র ঠাট্টা-বিদ্রূপ, টীকা-টিপ্পুনি ঝমঝম করে ঝরে পড়তে থাকে বামাচরণের ওপর। বামাচরণ কোনো জবাব দেয় না। কথাই বলে না সে। কেবল অবিশ্রান্ত ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে নিঃসঙ্গ কাকের মতো অসহায় ভিজতে থাকে তার নীরস জীবনের শীর্ণ ডালটিতে বসে।

বামাচরণ কাছাকাছি আসতেই অখিল সরকার বলে ওঠে, 'আসুন, আসুন, বামাচরণবাবু আসুন। ওরে নাড়ু শাঁখ বাজা রে। খদ্দের লক্ষী এসেছেন।'

ছড়া কাটে কৃষ্ণ নাগ, 'চেয়ে দ্যাখো দুঃখহরণ/ তোমার দ্বারে বামাচরণ।'

ত্রিভঙ্গও মশকরাতে যোগ দেয়, 'ওরে কে আছিস, বামাচরণকে একটা কুমীরের কাটলেট দে।'

বামাচরণ নির্বিকার। ভাবলেশহীন মুখ। অল্প তফাতে গিয়ে নিঃশব্দে বসে সে।

'বামাচরণবাবুর নামখানি কিন্তু ভারি সিম্বোলিক।' জিলিপিতে একটি কামড় বসায় কৃষ্ণ নাগ, 'বাবাচরণ প্লাস মা-চরণ ইজ ইকোয়াল টু বামাচরণ। বাপ-মায়ের দু'জনেরই মনরক্ষা হলো এতে।'

সবাই শব্দ করে হেসে ওঠে।

বুদ্ধদেব মানুষগুলিকে অনুপুঙ্খ দেখতে থাকে। ওদের মুখের প্রতিটি রেখা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বার চেষ্টা করে। ওদের সারাক্ষণের ঠাট্টা-মশকরাগুলির ধরন নিয়ে মনে মনে বিশ্লেষণ করে। কথার মধ্যে মধু-বিষ-হুল সব কিছুরই সন্ধান পায়। বুদ্ধদেব বোঝে, রসেবশে একেবারে মজে রয়েছে মানুষগুলো। অফিসে আসছে, কাজকর্ম করছে, গুলতানি মারছে তার চেয়ে ঢের বেশি। এর-ওর পিছু লাগছে সুযোগ পেলেই। ধান্দা করছে সর্বক্ষণ। একটা ভাঙাচোরা দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার দায়দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত, তাদের তিলমাত্র নিষ্ঠা নেই, কল্পনা নেই। এক ধরনের চটুল রসে ডুবে হাবুডুবু খেতেই যেন অধিক আনন্দ। কাজকর্ম যেটুকু করছে, সবই যেন খেলার ছলেই করছে। সরকারি স্লোগানগুলো যেন সবই ছেলেভোলানো ছড়া। যেন সবাই মিলেঝুলে একটা প্রদর্শনী ম্যাচ খেলছে। এ ম্যাচে হারলেও যা, জিতলেও তাই। আসল হল, খেলার আগের রসালো টিফিন আর খেলার পরের ভুরিভোজ!

ইতিমধ্যে বটতলায় খদ্দেরের সংখ্যা বেড়েছে। কো-অপারেটিভ ইন্‌স্‌পেক্টর হেরম্ব বোস, এস-ই-ও মহেন্দ্র সেন, বাঁকাদহের গ্রামসেবক সীতানাথ মণ্ডল, পঞ্চায়েত ক্লার্ক রসময় শীল—সব একে একে জুটেছে। একপাশের বেঞ্চি জুড়ে বসেছে স-মক্কেল অধর ঝারমুনিয়া, সবাইকে জিলিপি জোগাতে জোগাতে হিমসিম খাচ্ছিল দুঃখহরণ। এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে প্রায় গরম তেলেই হাত ডুবিয়ে দিচ্ছিল সে। অল্পের জন্য বেঁচে গেল।

সোস্যাল এডুকেশন অফিসার মহেন্দ্র সেন, সবকিছুতেই সর্বক্ষণ বিপদের পদধ্বনি টের পান। সহকর্মীরা আড়ালে ওঁকে বিপদবাবু বলে ডাকেন। দুঃখহরণের হাল দেখে মহেন্দ্র সেন ঠাট্টা করে বলেন, 'কি হে, দুঃখহরণ। তুমি যে পাকুড়ডিহার ওঝার মতো হাত দিয়ে জিলিপি তুলতে শুরু করলে। বিপদ!'

লজ্জা পেয়ে হাসে দুঃখহরণ।

কথায় কথায় পাকুড়ডিহার পৌষমেলার গল্প জমে ওঠে।

'ব্যাটাদের কোনো বুজরুকি আছে নির্ঘাৎ।' কৃষ্ণ নাগ মন্তব্য করে, 'ফুটন্ত তেলের কড়াই থেকে কখনো খালি হাতে পিঠে তোলা যায়?'

'ব্যাপারটা আমার স্বচক্ষে দেখা।' দু'চোখ কপালে তুলে বলে হেরম্ব বোস, 'বিশ্বেস না হয় পৌষসংক্রান্তির দিন পাকুড়ডিহার মেলায় যাবেন একটিবার। নিজের চোখে দেখে আসবেন, কেমন করে বোঙ্গায় 'ভর' হওয়া ওঝা উনুনে কড়াই চাপিয়ে মহুয়া তেলে আরসা পিঠে ভাজে। কেমন করে গরম তেলে হাত ডুবিয়েই ছেঁকে তোলে পিঠে।'

কৃষ্ণ নাগ মুচকি মুচকি হাসছিল। গঙ্গার ওপারের মানুষ সে। এই রাঢ়-মুলুকের সব কিছুকেই নিদারুণ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে।

কৃষ্ণ নাগের হাসি দেখে অকস্মাৎ ভারি স্বদেশপ্রীতিতে পেয়ে বসে ক্যাশিয়ার অখিল সরকারকে।

গলা চড়িয়ে বলে, 'এখনো এই বিশ্ব-সংসারে অনেক আজব চিজ আছে, তা জানেন?'

'তা আর জানি নে? ঐ তো একটি শ্যাম্পেল সামনেই বসে।' তর্জনীটি, বলা বাহুল্য, তাক করা ছিল বামাচরণের দিকেই।

হেরম্ব বোস কী একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সবাই দেখে, বিডিও'র খাস পিয়ন ভবানী আসছে। ভবানীকে দেখেই অমন জমজমাট আড্ডাখানি ভেজা খইয়ের মতো মিইয়ে যায়। সবাই জানে, ভবানী শুধু সওদা করতেই আসেনি, গুপ্তচর বিদ্যাতেও সে সমান নিপুণ।

'দু'ঠোঙা ঝিলিপি দাও। জলদি।' ভবানী হাঁফাচ্ছিল।

'দু'ঠোঙা কি হবে হে?' হেরম্ব বোস শুধোয়, 'সাহেবের ঘরে আবার কার পায়ের ধুলো পড়লো?'

'এম এল এ সাহেব আঁইছেন।' ভবানী তাড়া দেয়, 'কই দাও।'

উপস্থিত সকলের মুখ মোলায়েম হাসিতে ভরে যায়, এম এল এ'র সঙ্গে বিডিও'র যে তলে তলে কতখানি ভাব, সেটা কারও অজানা নেই।।

'তা এখান থেকে জিলিপি নিয়ে যাওয়ার দরকার কি হে?' কৃষ্ণ নাগ মুচকি হাসে, 'সাহেবের মাথার মধ্যেই তো—খাসা জিলিপি—তার প্যাঁচও অনেক বেশি—'

ভবানী কথাটা গায়ে মাখে না। জিলিপির ঠোঙাদুটি দু'-হাতে ধরেই ছুটতে ছুটতে চলে যায়।

ভবানী নিরাপদ দূরত্বে যেতেই করালী সোম বলে, 'কথাটা বলে ঠিক করলে না নাগ। শালা এক্ষুনি গিয়ে তুলে দেবে বিডিও'র কানে।'

এক মুহূর্তের জন্য বিচলিত দেখায় কৃষ্ণ নাগকে। পরক্ষণেই চোখদুটো মারবেলের মতো গোল করে বলে, 'কে—এন্ কাউকে ভয় করে না, বুঝলে?'

আড্ডাটা আবার জমে উঠতে সময় নেবে।

কৃষ্ণ নাগ এতক্ষণে পরিপূর্ণ চোখে তাকায় বুদ্ধদেবের দিকে। বলে, 'কোথায় পোস্টিং হলো?'

'এখনও কোথাও হয় নি। শুনছি লায়েকবাঁধে হবে।'

'তোফা। মনের আনন্দে দুধ-ঘি খাবেন। সিংহগড়ের রাবড়ির জগৎজোড়া নাম।'

'হরবল্লভ সিংহবাবু খানদানি আদমি। মানুষকে খাইয়েও ভারী আনন্দ পান ভদ্রলোক।' করালী সোম পাদপূরণ করে।

'তাহলে এই মাসের শেষ নাগাদ একটা প্রোগ্রাম হয়ে যাক চুয়ামসিনায়।' মহেন্দ্র সেনের দিকে তাকায় কৃষ্ণ নাগ, 'একটা চিনে-লণ্ঠন দেখানোর প্রোগ্রাম করে ফেলুন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেকদিন যাইনি সিংহগড়ে।' হেরম্ব বোস সাগ্রহে বলে।

'ঠিক আছে।' বিপদবাবু হেসে বলেন, 'নাগরাজের যখন ডিম পাড়বার শখ হয়েছে, মেঘবাত একটু বইয়ে দেওয়া যাবে। বিপদ!'

কৃষ্ণ নাগকে যে অফিসের অনেকেই নাগরাজও বলে, সেটা বুদ্ধদেব জেনেছে। জ্যৈষ্ঠমাস পড়লেই মেঘবাত বয় এবং সাপেরা ডিম পাড়তে শুরু করে, এটাও ত্রিভঙ্গর মুখে এই ক'দিন আগে শুনেছে সে। কিন্তু চিনে-লণ্ঠনটি কী বস্তু সেটা তার বোধগম্য হয় না কিছুতেই।

ত্রিভঙ্গর দিকে তাকাতেই ও বলে, 'দেখেন নি চিনে-লণ্ঠন?'

মাথা নাড়ে বুদ্ধদেব।

'দেখবেন ঐদিন।' ত্রিভঙ্গ হাসে, 'ঐ বায়োস্কোপের ছোটখাটো সংস্করণ।'

'বিপদ হল দেখছি। তাহলে তো আজই একটা খবর পাঠিয়ে দিতে হয় সিংহগড়ে।' বিপদবাবু চারপাশে চোখ বোলান, 'এই তো ত্রিভঙ্গই রয়েছে।'

'আমি তো আজ আর ওদিকে যাবো না।' ত্রিভঙ্গ জবাব দেয়। 'কাল সকালে বাড়ি যাবো যে, জিনিসপত্তর গোছানো, কিছু কেনাকাটা...।'

'তবে তো ভারি বিপদের কথা।' বলতে বলতে বিপদবাবুর চোখ সহসা বিঁধে যায় তফাতে বসে থাকা অধর ঝারমুনিয়ার গায়ে। অধর ঝারমুনিয়া মক্কেলের পয়সায় জিলিপি সাঁটাচ্ছিল।

বিপদবাবু হাঁক পাড়েন, 'অধরবাবু, একটু শুনে যাবেন।'

চমকে তাকায় অধর ঝারমুনিয়া। পরক্ষণেই মুখখানাতে গদগদ হাসি। জিলিপির ঠোঙা নাবিয়ে রেখে কাছে আসে তড়িঘড়ি। ভক্তিভরে নমস্কার করে। ঢ্যাঙা লোকটা বাবুভায়াদের কাছে মাথা নোওযাতে নোওয়াতে এখন একেবারে জ্যা-রোপন করা ধনুকটি।

বিপদবাবু বলেন, 'একটা ভারি বিপদ হয়েছে, বুঝলেন। একখানা চিঠি পৌঁছে দিতে হবে চুয়ামসিনার সিংহগড়ে। আজই।'

অফিসারবাবুদের ফাই-ফরমাশ খাটতে পেলে যেন বর্তে যায় অধর ঝারমুনিয়া। গদগদ মুখে মাথা দোলায়।

'একটু বাদে আমার ঘরে আসুন।'

অধর ঝারমুনিয়া ফিরে গিয়ে ফের জিলিপিতে কামড় বসায়। খেতে খেতে ভাবে, এই সুযোগে ওভারসিয়ারবাবুকে আর্জিটা জানানো লেহ্য হবে কি না। আসলে, বড় ব্যাটা পচুকে নিয়ে তার ভাবনা। মেজোটা দাশু, শুদ্ধ নাম দশানন, যা হোক একটা গতি করা গেছে ওর। ব্লক আপিসের সামনে একখানা গুমটি বানিয়ে বসিয়ে দেওয়া গেছে ওকে। বিডিও সাহেবের অসীম করুণা, তাই গুমটি বসাবার পারমিশনটা পাওয়া গেছে। গুমটিতে বসে দাশুর ব্যবসাটা একটু অন্য ধরনের। সে পাবলিকের পিটিশন লিখে দেয়। মূলত, যে পাবলিক ব্লক অফিসে হরেক আর্জি নিয়ে আসে। ব্লকে বারো মাসে তেরো পার্বন। খরায় রিলিফ, বন্যায় রিলিফ, কৃষি লোন, পশু লোন, গুরুপ লোন। দাশু সব বিষয়ের ওপর পৃথক পৃথক দরখাস্ত লিখে আগাম বান্ডিল বেঁধে রেখে দেয়। আকাশে মেঘ জমল, দাশু বসে গেল বন্যার কবলে পড়া দুর্গতদের জন্য

দরখাস্ত লিখতে। জোর জোর হাওয়া বইল, দাশু বসে গেল ঝড়ের দরখাস্ত লিখতে। দু'দশ দিন সূর্যদেব একটু বেশি মাত্রায় জ্বললেন, অমনি দাশু বসে গেল খরার দরখাস্ত লিখতে। আষাঢ় মাসে জল জমল মাঠে, দাশু বসে গেল, কৃষিলোনের দরখাস্ত লিখতে। এক লপতে শ'দুশোখানা দরখাস্ত লিখে রেখে দেয় সে। ক্ষতিগ্রস্ত পাবলিক এলেই দরখাস্তের তলায় টিপসই নিয়ে হাতে ধরিয়ে দেওয়া এবং দরখাস্তের ধরন অনুসারে পয়সা বুঝে নেওয়া। বেশ রমরমিয়ে চলছে ব্যবসাটা। মাঝে মাঝে কাজের চাপ এত বাড়ে যে রাতভর দরখাস্ত লিখেও সামাল দিতে পারে না দাশু। অধর ওকে এ কাজ থেকে সরাবে না স্থির করেছে। কারণ এমন একটা ব্যবসা বেছে নিয়েছে দাশু, যাতে কোনদিনও মন্দা হবে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবেই। সরকারি লোন, দান-খয়রাত বাড়বে বই কমবে না। বরং জনসংখ্যা দিনদিন যে হারে বাড়ছে, সরকারের দুয়োরে অর্থী-প্রার্থীর সংখ্যাও দিনদিন বাড়বে। এমন দিন আসবে, যখন হয়ত বা দাশুকে একজন কর্মচারী রাখতে হবে এজন্য। একা হাতে হয়ত বা সামাল দিয়ে উঠতে পারবে না। দাশুকে নিয়ে অধর ঝারমুনিয়ার ভাবনা নেই। যত ভাবনা বড় ছেলে পচুকে নিয়ে। পচু এলাকায় কুয়া কেটে বেড়ায়। রাধাপদ দত্ত, কুয়া কাটার কন্ট্রাক্টর, ওর টিমেই হেড-কারিগর সে। হেড-কারিগর কথাটি শুনতে বেশ, কিন্তু কুয়া-কাটবার কাজে তারই বিপদ সবচেয়ে বেশি। কুয়া যতই গভীর হয়, একের পর একসিমেন্টের চাক পাতালে নেমে যায়, তখন অ্যাসিস্টেন্ট কারিগররা অচল। তখন স্বয়ং হেড-কারিগরকেই নামতে হয় পাতালে। দম আটকানো গুমোটে, হাওয়াহীন অন্ধকার মরণ-গহ্বরে বসে বসে তাকে একাই কাটতে হয় মাটি। দড়িতে বাঁধা টিন ওপর থেকে নামিয়ে দেয় চেলারা। কাদামাটি ভরে দিলে ফের টেনে নেয় ওপরে। এইভাবে একটু একটু করে মাটি কেটে কেটে সুড়ঙ্গ বানিয়ে বানিয়ে পচু ঝারমুনিয়া নেমে যেতে থাকে পাতাল থেকে পাতালে। তখন ওপর থেকে তাকে একটা গুবরে পোকার মতো লাগে। একটা গুবরে পোকা যেন নড়েচড়ে মাটি আঁচড়ে চলেছে অবিরাম। এ সময়টা প্রতি মুহূর্তে ভয়, জীবন-সংশয়। যে কোনও মুহূর্তে ওপরের গোলাকার দেওয়ালে ধ্বস নামতে পারে, চাকসহ পুরো দেয়াল হুড়মুড়িয়ে ঢেকে ফেলতে পারে পচুকে। বিষাক্ত গ্যাসে মাথা ঘুরে নেতিয়ে পড়তে পারে পাতালেই। পচু কুয়ার তলায় নামলেই অধরের বুকে ভারি পাথরের মতো কিছু একটা চেপে থাকে অষ্টপ্রহর। খায়, দায়, মক্কেলদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু ভারি পাথরখানা কিছুতেই নামতে চায় না বুকের থেকে। পচুর জন্য একটা বিকল্প কিছু ভাবছে অধর। একে ওকে ধরছে। তেমন সুযোগ-সুবিধা পেলে পচুর জন্য একটা কুয়া কাটবার দল গড়ে দিতে চায় সে। একটা হেড-কারিগব থাকবে, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট, জনা চারেক লেবার, পচুকে আর কুয়ায় নামতে হবে না। সে হবে ঠিকাদার। রাধানাথ দত্তর মতো কাজের থানে গাছতলায় বসে, হাই-হুই করে হুকুম-নির্দেশ দেবে। একাজে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু পুঁজি লাগে। ঠিকায় ধরা কাজ শেষ না হওয়া অবধি পুরো টাকা আদায় দেবে না মালিকপক্ষ। সে সময়টা লেবারদের নিয়মিত পেমেন্ট করে যেতে হবে। তা বাদে, মোটা মোটা রশি, বাঁশ, কপিকল, টিন ইত্যাদি কিনতে হবে। টাকা অবশ্যি জোগাড় করে ফেলবে অধর। এত মানুষ তাকে ভালবাসে। কিন্তু আসল তো হল কাজের জোগাড়। ব্যক্তিগত কুয়া যা কাটায় গেরস্ত, সে আর ক'টা? কুয়া-কাটিয়ের দলের সংখ্যাও তো কম নয় এ তল্লাটে। একজন গেরস্ত কুয়া কাটাবে বললে, তিনটে দল গিয়ে উঠোন চেপে বসে। তা বাদে, গেরস্তের কাজে লাভ কম। ষোলআনা বুঝে নিয়ে তবেই দাম দেয়। সরকারি কাজ চাই পচুর। সরকারি

কাজে লাভ বেশি। কাজ কম। কোনগতিকে জলটা বের করে দিতে পারলেই খেল খতম্ পয়সা হজম। বিশ-পঁচিশ হাত কেটেই ওভারশিয়ারবাবুর কল্যাণে চল্লিশ হাতের বিল পাওয়া যায়। ওভারশিয়ারবাবুকে অবশ্য সেজন্য কিছু দিতে হবেই। কিন্তু তাও দিয়েথুয়ে যা থাকবে, কম নয় মোটেই। রাধানাথ দত্ত তো সরকারি কুয়া কেটে কেটেই লাল হয়ে গেল। সারা জেলা জুড়ে কাজ করে সে। সাত-আটটা টিম রয়েছে তার। সরকারি কাজ পেলে অবশ্য পুঁজির দরকার অনেক। সরকার শুধু জায়গাটা দেখিয়ে দেবে, পচুকে সেখানে একটি জলভর্তি কুয়া দেখিয়ে দিতে হবে। চাক, বালি, সিমেন্ট, ইট, সব কিনতে হবে ঠিকাদারকে। কাজ অন্তে বিল পেশ এবং যথাস্থানে পুজোআচ্চা চড়ালে লোভনীয় অর্থপ্রাপ্তি। রামকমল চক্রবর্তীর চাক তৈরির কারখানা, ইটের পাঁজা। আগেভাগে বলে রেখেছে অধর। ধারে মাল পাবে। কানাইয়ালালও সিমেন্ট, কপিকল দেবে ধারে। সব ব্যবস্থা প্রায় পাকা। কেবল যদি সরকারি কাজের একটা নিশ্চয়তা মেলে, তবেই পচুটাকে ঠিকেদারিতে নামিয়ে দেয় অধর। তক্কেতক্কে রয়েছে। দু'একবার কথাটা পেড়েছে। তেমন করে বাজেন নি ওভারশিয়ারবাবু। তাই বলে আশা ছাড়ে নি অধর ঝারমুনিয়া। সে শুধু কাকের দৃষ্টি নিয়ে অপেক্ষা করছে, কখন সুযোগটা আসে।

সাত-পাঁচ ভেবে নিজেকে তখনকার মতো গুটিয়ে নেয় অধর ঝারমুনিয়া। করালী সোমের আশেপাশে এখন অনেক লোক। এসব কথা সর্বসমক্ষে বললে ক্ষেপে যাবে করালী। দু'ঢোক জল খেতে গিয়ে সাধের ঘটিখানা হারাতে হবে। অধর স্থির করে, প্রস্তাবটা নিয়ে একদিন ওভারশিয়ারবাবুর বাড়িতেই চলে যাবে সে। সরাসরি পা'দুটো জাপটে ধরবে। অধরের এই হল এক পিতৃদত্ত গুণ, প্রয়োজনে যে কোনও লোকের পা'দুটি জড়িয়ে ধরতে পারে অবলীলায়।

মুণ্ডহীন কবন্ধ

তেতলার ছাদে পরিপাটি করে বসেছেন হরবল্লভ আর কুমুদকান্ত। পাশে অরুন্ধতী। সন্ধ্যের আঁধার নেমে এসেছে তখন। নানা বিষয়ে গল্প জুড়েছেন তিন জনায়। অন্দর মহলের এক তলায় পড়তে বসেছে উমা আর দেবিদাস। শ্যাম মাস্টাব পড়াতে এসেছেন ওদের। রোজ সন্ধ্যেবেলায় নিঃশব্দে আসেন, পড়িয়ে-টড়িয়ে নিঃশব্দে ফিরে যান। হরবল্লভের সদর মহলে হয়ত তখন বসেছে তাস-পাশার আসর। কিংবা হয়তো জমে উঠেছে কাছের মানুষদের নিয়ে চা-পানের পর্ব। অথবা ওদের নিজস্ব মন্ত্রণাসভা। সবাই এক জোট হয়ে আসন্ন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন নিঃশব্দে। সময়ের সঙ্গে লড়াই। তাই নিয়ে যত মন্ত্রণা। মন্ত্রণা, মন্ত্রণা।

আজকাল নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করলেও কথার খেই ধরে চলে আসে দেশ-কালের দ্রুত বদলে যাওয়ার প্রসঙ্গ। চলে আসে আগামী দিনেব হালচাল, বেশ বদলের কথা। চলে আসে তেভাগা আন্দোলনের সূত্র ধরে মানুষের আচমকা জেগে ওঠার প্রসঙ্গ। কুমুদকান্ত স্পষ্টতই বিরক্ত। বলে, 'যা বল দাদাবাবু, তুমরা ল্যাতার দলই উয়াদ্যার মাথায় তুলছ দিনকে দিন।'

হরবল্লভ চুপচাপ বস্েছিলেন সামনের দিকে তাকিয়ে। পশ্চিম আকাশ এখনও রক্তাভ। ইতিমধ্যে দু'চারটি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। পদম পুকুরের অর্জুনগাছ থেকে বাদুড়েরা ডানা ঝাপটে উড়ে চলেছে লোখেশোলের দিকে। কুমুদকান্তর কথায় ভারি অস্বস্তি বোধ করেন হরবল্লভ। অরুন্ধতীর সুমুখে এ ধরনের প্রসঙ্গ উঠলে আরও গুটিয়ে নেন নিজেকে। কিন্তু আজ কুমুদকান্ত আক্রমণাত্মক। ফলে কিঞ্চিৎ আত্মরক্ষার প্রয়োজন বোধ করেন।

'আমরা মাথায় তুললাম কী করে?'

'তুলছো নাই? উয়াদ্যার লিয়ে এক মিছিলে হাঁটছ, বন্দে মাতারম হাঁকছ, এক সংে বসে মিটিং কচ্ছ দেদার।' কুমুদকান্তর গলায় গাঢ় শ্লেষ্মার মতো শ্লেষ, 'সেদিন বাঁকুড়া সদরে ব্রজদা মাইক হাঁকড়্যে বললেক, তুমরা স্বাধীন দেশের মানুষ, দেশ এখন তুমাদ্যার, তুমরাই দেশ শাসন কইর্‌বে ভোটের মাধ্যমে, মহাত্মার স্বপ্ন তুমরাই সফল কইর্‌বে...। বল দেখি, মুখের সুমুখে অমন সব বইল্‌লে শালারা মাথায় চইড়্‌বেক নাই?'

এই ধরনের প্রসঙ্গ শুরু হলেই অরুন্ধতী প্রথম থেকেই গুমরোতে শুরু করেন। ভেতরে যতই উত্তপ্ত বাষ্প জমতে থাকে, ফর্সা মুখখানা ততই রক্তাভ হয়ে ওঠে। নাকের পাটা ফুলেফুলে ওঠে। নিঃশব্দে ফুঁসতে থাকেন অরুন্ধতী। নিজের সদ্যজাত শাবককে কোল থেকে কেড়ে নিতে উদ্যত কেউ, এমন মুহূর্তে মা-বাঘিনীর যে সুগভীর, বিধ্বংসী রোষ, অরুন্ধতীর বুক সেই রোষে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তাঁর দীর্ঘদিনের লালিত শাবকগুলিকে বুঝি কেউ কেড়ে নিতে বদ্ধপরিকর। ধন-সম্পদ এক একটি শাবক, আরাম-বিলাস এক-একটি শাবক, প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি এক-একটি শাবক। শাবকগুলি বুঝি আর বুকের মধ্যে থাকে না,—এই বোধ থেকে, অনিশ্চয়তা থেকেই যত রোষ, ইদানীং সদা-সবর্দা বুকের মধ্যে পাহারা দেবার ভঙ্গিতে ঘুরপাক খায়। মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে উছলে পড়ে অতিরিক্ত রোষ, ফুটন্ত দুধের মতো উথলে ওঠে। একেবারে নাভিমুল থেকে উচ্চারণ করেন, 'এই জন্যেই তো এ সব হচ্ছে! বিচার বল, শাসন বল, সব চল্যে যাচ্ছে দিনকে-দিন। পুলিশের সে দাপট কুথা? লাভের লাভ বইল্‌তে, দিনদিন রিফুজিতে ভইরে যাচ্ছে দেশ। ফাঁকা জমিন বইল্‌তে কিচ্ছো রইবেক নাই। চুরি-ডাকাতি আরও বাড়বেক।' কথাটা মিছে নয়। কিস্তিতে কিস্তিতে উদ্বাস্তু আসছে জেলায়। রেল-ইস্টিশনগুলো ভবে যাচ্ছে। তা বাদে, লাইনের ধারে ধারে ঝুপড়ি বানিয়ে বসবাস করছে বহু পরিবার। কিছু কিছু জবরদখলের ঘটনাও ঘটছে। আচমকা জবরদখল করে ধুতমা ডাঙায় রাতারাতি বানিয়ে ফেলছে বাঁশের বেড়ার কলোনি। ঘরশত্রু বিভীষণ কম্যুনিস্টদের দল ওদের সঙ্গ দিচ্ছে। কোথাও কোথাও পুলিশ গিয়ে ভেঙে দিচ্ছে বাড়িঘর। রাতারাতি, আবার বানিয়ে নিচ্ছে ঝুপড়িঘর। ধীরে ধীরে এ জেলার পাথুরে মাটিতেও দাপটের সঙ্গে শিকড় চারাচ্ছে ওরা। ভাষাটাও দুর্বোধ্য। বেজায় জেদি আর গোঁয়ার জাত। ওল আর কচুর যম। জয়কৃষ্ণপুরের চরে একটা কলোনি বসেছে। এলাকার লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। পুকুরপাড় আর নয়ানজুলির তাবৎ বনকচু ইতিমধ্যেই সাবাড়। শালাদের এ জেলা থেকে বিদেয় করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে হরবল্লভের দল। দণ্ডকারণ্যর দিকে পাচার করে দেবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু ঐ ঘরশত্রু বিভীষণরাই বারে বারে বাদী হচ্ছে। ওদের হয়ে আন্দোলন করছে এরা। শালা, আপন ভাল পাগলও বোঝে, কিন্তু কম্যুনিস্টরা বোঝে না। আরে বাবা, পুকুরটা বাপের বলে কি উয়াতে ঝাঁপ দিয়ে মইর্‌তে হবেক। খাল কেইটে কুমীর আমদানি করলে সে কুমীর তুয়াকে গিলবেক নাই?

এই ধরনের প্রসঙ্গ যতই এগোতে থাকে, ততই আকাশে মেঘ জমে। থমথমে হয়ে ওঠে পরিবেশ। কুমুদকান্ত ফোঁস করে হাওয়া ছেড়ে দেয়। সত্যি, যা দিনকাল আঁইছে... ! কথাটা, বাস্তবিক, বড়ই সংক্রামক। ইদানীং তাৎক্ষণিকভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়েন হরবল্লভের মতো মানুষেরা। আগামী দিনের একটা চেহারা, ভাঙাচোরা একখানি ছবি, ধোঁয়াশার মতো ফুটে ওঠে চক্ষের সুমুখে। অনাগত ভবিষ্যত, একটা মুণ্ডহীন কবন্ধের মতো, দেখতে দেখতে শিউরে ওঠেন হরবল্লভ। অনেক আশঙ্কা, আতঙ্ক, পেঁচার মতো ডানা ঝাপটে উড়ে যায় মাথার ওপর

দিয়ে। কেবল ওদের কুৎসিৎ শরীরের গাঢ় ছায়া ফেলে যায় হরবল্লভদের শরীরে। একটা কবন্ধ, ছুটে আসছে বায়ুবেগে, ধড়ের ওপর তাজপরা মুণ্ডুখানা নেই, তবুও তার হাসির খলখল আওয়াজ হরবল্লভদের কানের পর্দায় স্পষ্ট ধাক্কা মারে।

এসব অনুভূতির কথা সবাইকে বলা যায় না। এমন কি কুমুদকান্ত কিংবা অরুন্ধতীর মতো আপনজনদের কাছেও সরাসরি ধরা দিতে সঙ্কোচ জাগে মনে।

মৃদু হেসে হরবল্লভ বলেন, 'উসব বক্তৃতার টাইমে বলতে হয়। উগুলা কিছো লয়।'

'তা না হয় হইল্যাক।' কুমুদকান্ত যেন সরাসরি জেরা শুরু করে এবার, 'আচ্ছা, বল ত, এই স্বরাজ এসে কী লাভটা হইল্যাক আমাদ্যার? ব্রিটিশ আমলে কী অমন দুখে ছিল্যাম আমরা? স্বাধীন হয়ে কী অমন মুয়াটি পেল্যম হাতে? মাঝের থিক্যে বাপ-চুদ্দোপুরুষের তালুকগুলান যেতে বসেছে! আর, ছোটলোকগুলা মাথায় চড়বার চাচ্ছে। হাতির পারা দাঁত গজাচ্ছে দেশি শুয়ারের মুখে। দাঁত লিয়ে কী কইর্‌বেক ভেবেই আকুল। সেই, বলে না, অদস্তের দাঁত হইল্যাক, কামড় খেতে খেতে পরাণ গেল্যাক। ছোটলোকগুলানের এখন সেই অবস্থা।'

'ইয়াদ্যার বুদ্ধি জানিস নাই তুই?' কথার মধ্যে শ্লেষের মিহি ছুরি চালান অরুন্ধতী, 'সুখে থাকতে ভূতে কিলাল্যাক উয়াদ্যার। টিলিয়ে কাঁ্যাগলাস গায়ে তুলল্যাক। এখন পায়ের জুতা মাথায় উঠবার চায়!'

'আরে, কী আচানক কথা!' হরবল্লভ প্রাণপণে আত্মরক্ষার প্রয়াস চালিয়ে যান, 'আগে ছিল ব্রিটিশ রাজা। ইখন আমরা।'

'আ-হা, কি আমার রাজা রে!' ঠোঁট বেঁকিয়ে সারা অঙ্গে স্বর্ণবাদ্য তুলে ঝাঁঝিয়ে ওঠেন অরুন্ধতী, 'লিজের তালুকখান থাকে কি না ঠিক নাই, উনি হলেন রাজা। আর রাজ-রাজড়াদ্যাব কি হাল!' অরুন্ধতী এবার অন্য জায়গায় ঠোক্কর মারেন, 'গেল ভোটে, দেখ নাই? বর্ধমানের রাজা-রানী দু'জনায় কেমন রাস্তায় রাস্তায় জোড়হাত কইরে ঘুরে বেড়াল্যাক ভোটের তরে। যেন ভিখারির পারা ভিখ্‌ মাগছে! ছ্যা-ছ্যা, দেইখে আমি লজ্জায় মরি।'

হরবল্লভ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে উদার হাসি হাসেন। ভরাট গলায় বলেন, 'উই ত মজা। আগে, একশ মৌজার মালিক নিজেকে বইল্‌ত রাজা। আশ্‌গুলাবা সব পাখির পারা ভাব কইরে উইড়্‌থ। আর এখন? এখন উয়ারা ভোটে জিতে সারা দেশের রাজা। সত্যি সত্যি রাজা যাকে বলে। এই ধর না, আগে পঁচিশ মৌজার তালুক ছিল সিংহবাবুদ্যার, ইখন সারা দেশটাই বলতে গেলে সিংহবাবুদের তালুক! ইখন হরবল্লভ সিংহবাবুর কথা দিল্লীতক্ক চলবেক হে!'

'চলবেক তো, লিজেদ্যার তালুকটা বাঁচাও না। দেখি তুমাদ্যার মুরাদটা!'

চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হরবল্লভ তেতে ওঠেন একটুখানি। বলেন, 'দ্যাখ, যারা উপরে রয়েছে, উয়ারা সব হাতি। আমরা ত বটে মুষার দল। বাঁচবার ভাবনা উয়ারাই স্থির করবেক লির্ঘাৎ। আর, হাতি যে ছ্যাঁদা দিয়ে বারাবেক, আমরা মুষার দল লাচতে লাচতে বারাঁই যাব উই ছ্যাঁদা দিয়ে।' নিজের এমনপারা মোক্ষম রসিকতায় নিজেই হাসতে থাকেন হরবল্লভ। কুমুদকান্ত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। রহস্যটাকে কিছুতেই ছুঁতে পারে না। হরবল্লভ চোখ নাচিয়ে বলেন, '১৯৫৩ সালে জমিদারী বিলোপ আইনটা বিধানসভায় পাশ করালেক কে? না, তৎকালীন ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বিমল চন্দ্র সিংহ। তিনি কে? না, কান্দীর রাজ পরিবারের সন্তান। ১৯৫৫ সালে ভূমি সংস্কার আইনও পাশ করালেন তিনি। বিশাল সম্পত্তির

মালিক তিনি, জেনেশুনে কি আর লিজেদ্যার পায়ে কুড়াল মারবেন? নিজের ফাঁসির হুকুমে নিজে সই করে কেউ?' বিজ্ঞের হাসি হাসেন হরবল্লভ।

'তেবে?' কুমুদকান্ত যেন এক সূক্ষ্ম রহস্যের সন্ধান পায় হরবল্লভের কথায়।

'হুঁ-হুঁ!' হরবল্লভ চোখ টিপে হাসেন, 'কথার মধ্যে কথা আছে, বুঝত্যে যদি পার, আর পিঠার ভিতর পূর্‌টি আছে খাইত্তে যদি পার। বুঝলে? এই, আইন বল, কানুন বল, সব হইল্যাক উই পিঠার মধ্যেকার পূর্‌টি!'

বিষ্টুপুরের ডাকসাইটে নেতা রামকমল চক্রবর্তী এখন মহকুমা কংগ্রেস কমিটির মাথা। কথায় কথায় সেদিন অনেক গূহ্য কথা শুনিয়েছিলেন হরবল্লভকে। কথাগুলো ভারী মনে ধরেছিল হরবল্লভের। ওই কথাগুলোকেই পুঁজি করে এখনও আশা-ভরসায় বুক বেঁধে রয়েছেন হরবল্লভের মতো মানুষেরা। আকারে-ইঙ্গিতে হরবল্লভ সেই কথাগুলোর সারমর্ম বোঝাতে চাইছিলেন কুমুদকান্তকে।

ভগ্নীপতির কথাগুলো কুমুদকান্তকে বুঝি সামান্য নাড়া দিয়ে যায়। চোখ নাচিয়ে রহস্যের হাসি হাসে সেও। হাসতে হাসতে মাথা দোলাতে থাকে বিজ্ঞের মতো, 'পিঠার মধ্যে পূর্‌টি আছে, খাইতে যদি পার!'

কিন্তু কথাগুলো অরুন্ধতীকে বিন্দুমাত্র ছোঁয় না। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেন, 'কি যে পূর্ আছে তা সে তুমরাই জান। সেদিন গোবিন মিস্তিরি যা সব কথা শুনাল্যাক, মুরুব্বিদ্যার দিনকাল থাকল্যে উয়ার সর্বাঙ্গে বাঁশ-ডলাই করাতেন। তুমাদ্যার পুড়া স্বাধীন যুগে ছাতি চাপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে লোক।'

'উ কথা বল নাই। ছিঃ!' হরবল্লভ হাঁ-হাঁ করে ওঠেন সহসা, 'ইটা হইল্যাক স্বাধীন যুগ। ইখন, কথায় কথায় বাঁশ-ডলাই কি?' পরক্ষণে মুখে ক্রুর হাসি ফুটিয়ে বলেন, 'ইখন স্বাধীন দেশের স্বাধীন মাইন্‌ষের বিচার হবেক আইন মোতাবেক।'

ক্রুর হাসিখানা লেগে থাকে হরবল্লভের ঠোঁটের ডগায়। চাপা গলায় বলেন, 'গোবিন্দ মিস্তিরির তরে ওষুধ ঘুঁটা শেষ। টুকচান সবুর ধর, দেখতে পাবে উয়ার বিচারটা!'

যদিও কিছুদিন বাদে গোবিন্ মিস্তিরিকে মিথ্যে চুরির দায়ে ধরে ছিল পুলিশ, কিন্তু ঐ মুহূর্তে হরবল্লভের কথাটা মোটেই মনঃপুত হয় না অরুন্ধতীর। অম্বিকানগরের সিংহ-মহাপাত্র বংশের মেয়ে সে। তার উম্বরেই সে বাপ-জেঠাকে হাতি দিয়ে দুর্গত মানুষের ঘর ভাঙতে দেখেছে। এসব তো এই সেদিনের কথা। এরই মধ্যে দেশটাকে এরা কোথায় এনে ফেলেছে। এখন ছোটলোকগুলোর চোখের দিকে যেন তাকান যায় না। বন্দুকধারী পুলিশের সঙ্গে তে-ভাগার ধুয়ো তুলে সামনা সামনি লড়াই করে ওরা। সেবার বাঁধগাবায় কি কাণ্ডটাই না ঘটল! বাপের জম্মে কেউ কোনদিন শুনেছে তেমন কথা! এমনধারা চলতে থাকলে দু'দিন বাদে মানুষকে এরা মানুষ বলে ভাববেক?

হরবল্লভ এসব অভিযোগ শুনে হাসেন। মেয়েমানুষ তো, শাসন করবার দুটি বৈ কৌশল জানে না। কলহ কিংবা ক্রন্দন। আরে, মানুষকে পোষ মানাবার হাজার-একটা উপায় রয়েছে! কি দরকার ওই সাবেক সনাতন পদ্ধতিতে! আসলে যত বুদ্ধিই ধরুক, এই মেয়ে জাতটা যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না একতিল। সে হিসেবে হরবল্লভ অনেক বাস্তববাদী, যথার্থই প্রগতিশীল। যুগের প্রয়োজন সর্বদাই তিনি মিটিয়ে দেন কড়ায়-গণ্ডায়। যে যুগের যা। বাপ-ঠাকুর্দা যুগের প্রয়োজনে ইংরাজের গোলামি করেছে। এলাকার ইংরেজ-

-বদ্বেষী সমস্ত আন্দোলনকে পিষে মারবার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে এসেছে চিরকাল। সাদা সাহেবরা শিকার করতে এলে সিংহগড়ে পায়ের ধুলো দিতে ভুলতেন না কখনও। আসতেন, রাত কাটাতেন, মদ্যে মাংসে-নারীতে ডুবে থাকতেন, যাবার কালে সিংহবাবুদের ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যেতেন। ওতেই কৃতার্থ ছিলেন সিংহবাবুরা। হরবল্লভও চুটিয়ে ব্রিটিশ তোষণ করেছেন। গোপনে খবর পাঠিয়েছেন থানায়। প্রিয়ব্রতসহ এলাকার তাবৎ স্বদেশীদের ধরা পড়বার পেছনে তাঁর অবদানও কম নয়। অনাথবন্ধু রায়ের মতো 'স্বদেশী'র বাড়িতে নিজের হাতে আগুন লাগিয়েছেন। থানায়, ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় ভেট-নজরানা পাঠিয়েছেন নিয়মিত। যুদ্ধের সময় সরকারের নির্দেশে নিজের হাতে খুলে দিয়েছেন বিশাল ধানের গোলা। আবার পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় সেটা পুষিয়ে নিয়েছেন আঠারো আনা।

সে যুগে যা যা করণীয় ছিল, সবই করেছেন হরবল্লভ।

আচমকা স্বাধীনতা এল। রাত দুপুরে। ঘুম ভেঙে তড়িঘড়ি উঠে বসতে তিলমাত্র দেরি হয় নি হরবল্লভের। চটপট খদ্দর চড়িয়ে নিয়েছেন গায়ে, টুপি লাগিয়েছেন মাথায়, পুরোনো দিনেব ক্লেদাক্ত স্মৃতিগুলোকে মুছে ফেলবার উদ্দেশ্যে জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাঁদা দিয়েছেন কংগ্রেস তহবিলে। বিনোবা ভাবের ভূদান যজ্ঞে বত্রিশভাগী জঙ্গলের লাগাও ষাট বিঘের কাঁকুরে ডাঙাখানি এক লপতে দান করে ফেলেছেন। বিষ্টুপুরের সিদ্ধেশ্বর হাজরা মহকুমার একনম্বর এবং জেলায় দু'নম্বর নেতা, তাঁর ঘরের বিয়ে-সাদি, ক্রিয়া-কর্মে ঢাউস উপাচার সাজিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন সময় মতো। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তুলে দিয়েছেন কাজ। ফলে, এখন হরবল্লভ এতদঞ্চলে শাসকদলের সোল-এজেন্ট। ওঁর সম্মতি ছাড়া এ তল্লাটে একটি কাজও হয় না। ওঁর বাড়ি ছাড়া কংগ্রেসের মিটিং হওয়া দুষ্কর। রাধানগরে অতুল্য ঘোষ এলে, জমায়েত দিয়ে মাঠ ভরাতে হরবল্লভই মূল ভরসা। সমস্ত মুনিষ-মাইন্দারদের ছুটি দিয়ে, পাঠিয়ে দেন মিটিং শুনতে। সম্প্রতি, বাঁকুড়া থেকে ব্রজরাজ সামন্ত স্বয়ং সিংহগড়ে এসে অথর্ব প্রতাপলালের পায়ের ধুলো নিয়ে গেছেন এবং হরবল্লভকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে গেছেন। আর, দারোগা, ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডি-ও এবং জেলার তাবড় তাবড় বাবু-ভায়ার সঙ্গে ইদানিং হরবল্লভের ভারি দহরম-মহরম।

আগে ছিল সার্কেল অফিস, এখন হয়েছে ব্লক। আগে যা টাকা আসত, তার চেয়ে ঢের টাকা আসছে ব্লক অফিসে। সে সব টাকা-পয়সা, দান সামগ্রী, ত্রানসামগ্রী, —সব কিছুর আসল মালিক হরবল্লভই। ঢালু পথ বেয়ে বেয়ে সে সব যথাসময়ে বিলি-বিতরণেব উদ্দেশ্যে পৌঁছে যায় সিংহগড়ে, গুদামজাত হয়। হরবল্লভই লিস্টি বানান। তাঁর হুকুমেই মাল বিলি হয়। এলাকার রাস্তাঘাট, পুকুর-কুয়ো, সব কিছুই হয় হরবল্লভের নির্দেশ মতো। ইদানীং হরবল্লভ সিংহবাবু বিহনে এলাকার কিছুই হওয়ার জো নেই। থানার বড়বাবু খবর পাঠালেন, হরবল্লভাবাবু যাচ্ছি। সার্কেল অফিসার খবর পাঠালেন, যাচ্ছি। হরবল্লভবাবু, অমুক তারিখে এস-ডি-ও যাচ্ছেন আপনার এলাকায়। জয়রামপুরের জিলা বোর্ডের ডাকবাংলোয় তাঁর থাকবার বন্দোবস্ত করবেন। হরবল্লভবাবু, কয়েকজনকে পাঠাচ্ছি, একটুখানি দেখবেন। হরবল্লভ হাসিমুখে সামলান সাহেবদের এবংবিধ জুলুম। তাতে করে কোনই লোকসান হয় না তাঁর। বরং নিজের আসনটি পাকাপোক্ত হচ্ছে তিলতিল। আজকাল বিষ্টুপুরের অফিস কাচারিতে হরবল্লভের বেজায় পরিচিতি, অগাধ প্রতিপত্তি, সব সাহেবের চেম্বারেই তাঁর অবাধ প্রবেশাধিকার। তবুও যদি কোন বেয়'ড়া সাহেব নিতান্তই বেগড়বাঁই করেন, তাতেও চিন্তার

কারণ নেই। সিদ্ধেশ্বরদাকে কিম্বা ব্রজদাকে বলে রাতারাতি বাছাধনকে ধ্যাপধাড়া গোবিন্দপুরে বদলি করিয়ে দেওয়া যাবে অনায়াসেই। বাকি রইল ওই তালুক-মুলুক চলে যাওয়ার ব্যাপারটা। সে তো আগে যাক, তখন দেখা যাবে। আইনটা তো পাশই হল এই সেদিন। ফর্ম-টর্ম দাখিল করা শুরু হয়েছে সবে। রামকমল চক্রবর্তী সেদিন যে আভাস দিলেন, সেইমতো যদি সব কিছু ঠিকঠাক চলে, তবে মোচ্ছব পাকতে দশ যুগ কেটে যাবে। তার মধ্যে কত কিছু ঘটে যেতে পারে এ দুনিয়ায়, কত ওলোট-পালট, পরিবর্তন। এই সংসার-সমুদ্রে ততদিনে কত দ্বীপ ডুববে, কত নতুন দ্বীপ গজাবে, মানুষের অবস্থান ও বসতি পাল্টাবে সেই অনুসারে। কাজেই যতটা মনে হয়, এখনও অবধি, সামাজিক এবং আর্থিক নিরাপত্তায় আগামী দিনে চিড় ধরবার কোনও সম্ভাবনাই দেখতে পান না হরবল্লভও। বরং, আগে ছিল অর্থ-সম্পদ-প্রতিপত্তি, এখন সেই সঙ্গে দেশের শাসনদণ্ডটিও দল-মারফত এসে গেছে হাতের মুঠোয়। ভাবতে ভাবতে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি এবং সুরক্ষাবোধ এসে নিরাপদ বাসা বাঁধে মনে। বুকের মধ্যে অনেকখানি স্বস্তি জমে তাতে।

এত কথা অরুন্ধতীকে বলা যায় না খোলসা করে। বোঝান যায় না এতসব জটিল হিসেবনিকেশ। মেয়েমানুষ তো, অতখানি সূক্ষ্ম দৃষ্টিও নেই, অত গভীরভাবে বোঝবার মগজও নেই। তাছাড়া এসব গুহ্য তত্ত্ব পাঁচকান না হওয়াই ভাল। রামকমল চক্রবর্তী পই পই করে বলে দিয়েছেন, মনসা চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞ—।

হরবল্লভের কথার বড় একটা গুরুত্ব নেই অরুন্ধতীর কাছে। ভয় পেয়েছেন তিনি মনে মনে। শাবক হারানোর ভয়। সেই কারণেই ইদানীং গাঁ-ঘরের দ্রুত বদলে যাওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন কথায় কথায়। বশংবদ মানুষগুলোর চোখের দিকে তাকিয়েও ইদানীং স্বস্তি পান না তিলমাত্র। কথায় কথায় তাড়া লাগান হরবল্লভকে। চল, চল, এই ভূতভূমি ছেইড়ে পালাই। যত জলদি সম্ভব। সুধীর বইলাকে খবর কর। বিষ্টুপুরের ঘরটা গাঁত্তে শুরু করুক। আমার আর এই পুড়া দেশে থাইক্তে মন নাই।

শহরে গিয়ে থিতু হওয়ার ব্যাপারটা অনেকদিন যাবৎ কামড়াতে লেগেছে অরুন্ধতীর মনে। শহরে বড়লোকেরা অনেক নিরাপদ। প্রতাপলাল বহুদিন যাবৎ একখানা দশ কাটার প্লট কিনে রেখেছেন বিষ্টুপুরের হাজরাপাড়ায়। অরুন্ধতী সেই জমিতে একখানা বাড়ি বানানোর জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন। বিষ্টুপুরের সুধীর বইলা নামকরা রাজমিস্ত্রী। বললেই শুরু করে দেয় কাজ। কিন্তু হরবল্লভই ঝুলিয়ে রেখেছেন ব্যাপারটা। শহর, তাঁর মতে, এক বারো-ভাতারি জায়গা। বারো পতি সে থানের। চুয়ামসিনায় যেমন চারপাশের বিস্তীর্ণ দিগন্তের ঘেরাটোপে একটিমাত্র প্রাসাদ, আকাশে অহংকারী মাথা তুলে মানুষজনের সম্ভ্রম আদায় করে নেয় অবলীলায়, সিংহগড়, এলাকার একমাত্র শক্তিকেন্দ্র, ঐ প্রাসাদখানিকে ঘিরে একটি পুরো দিগন্ত সিংহবাবুদের ষোলআনা দখলে। ঐ দিগন্তের মধ্যেকার যাবতীয় ভূমি, অরণ্য, নদী, জলাশয়, পাখিপাখাল, পশু-প্রাণী, যাবতীয় কর্মক্ষম পুরুষ, রূপসী নারী, সবকিছুতেই সিংহবাবুদের অখণ্ড ও প্রশ্নহীন আধিপত্য। এখানে এই এক-দিগন্তের-পৃথিবীতে একটিমাত্র সূর্য ওঠে, ডোবে, একটিমাত্র চাঁদ জ্যোৎস্না ঝরায়, একটি মানুষের মনের ইচ্ছে রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকার বাতাসে। শহরে ছবিটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে সিংহগড়ের তুল্য দোতলা-তিনতলা বাড়ি ডজনে ডজনে। সেখানে গিয়ে বসবাস করলে, হরবল্লভদের বাড়িখানা হবে কয়েক ডজনের মধ্যে একটি। মারোয়াড়িরা জাঁকিয়ে বসেছে সেখানে। বিশাল বিশাল বাড়ি তাদের,

রমরমা ব্যবসা, সম্পদের জৌলুষে তাদের কাছে ম্লান হয়ে থাকবেন হরবল্লভ। চুয়ামসিনায় যেমন চারপাশের গাঁ-গঞ্জের ওপর অটুট আধিপত্য হরবল্লভের, আসতে যেতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, এখনও তাঁর গর্জনে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে চতুর্দিক, তাঁর ইচ্ছায় সূর্য ওঠে দাপানজুড়ির জঙ্গলেব মাথায়, অস্ত যায় গামীরতলার জঙ্গলে, শহরে গেলে সেসব পুরোপুরি বিসর্জন দিতে হবে রাতাবাতি। সেখানে অনেক রাজা, অনেক প্রভু। রামকমল চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর হাজবা—এক-একজন রাজা। এস ডি ও, এস ডি পি ও, থানার বড়বাবু, বিডিও সাহেব এক-একজন রাজা। ওমপ্রকাশ আগরওয়ালা, যমুনা দাস কানাইয়ালাল—এক-একজন রাজা। অতগুলি রাজার মধ্যে হরবল্লভকে চিরকাল নিষ্প্রভ হয়ে থাকতে হবে। অরুন্ধতী হুল ফোটান, আহা, বাঁশবনে শিয়াল রাজা। ফড়িংয়ের দেশের আশ্‌গুলা পক্ষী! তুমি তবে থাক ইখেনে। রাজা হবার সাধ মিটাও। আমি উমা আর দেবিদাসকে লিয়ে চইলে যাব বিষ্টুপুর। ইখেনে উয়াদ্যার পড়ালিখার বারোটা বাইজ্যাক। হরবল্লভ অনেক ভেবে দেখেছেন, অরুন্ধতীকে অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা নেই তাঁর। আজ হোক, কাল হোক, বিষ্টুপুরে একখানা আস্তানা বানাতেই হবে তাঁকে।

তেতলার ছাদে পদ্মফুল

লায়েকবাঁধ অঞ্চলে যখন পোস্টিং হল বুদ্ধদেবের, ত্রিভঙ্গ শুনেই বলেছিল, 'ভালোই হল, পাশাপাশি থাকা যাবে। আমার তো অযোধ্যা। লায়েকবাঁধ এলাকাটা কেমন?—এমন প্রশ্নে নাক কোঁচকায় ত্রিভঙ্গ, 'এই বাঢ় এলাকার আবার ভালো-খারাপ! হয়, শুধু কাঁকুরে ন্যাড়া মাঠ, কচ্ছপের পিঠের মতো। নয়তো মাইলের পর মাইল শাল-মহুয়ার জঙ্গল। এর বেশি এই পোড়া দেশে আছেই বা কি! তবে খাতির-যত্নটা পাবে।'

'খাতিরযত্ন মানে?'

ত্রিভঙ্গ হেসেছিল, ' আরে ভাই, সরকারি চাক্‌রিতে আর আছেটাই বা কি? ঐ একচিলতে সম্মান ছাড়া? সেটা অবশ্যি ও অঞ্চলে পাবে ষোলআনা। হরবল্লভবাবু থাকতে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না।'

'হরবল্লভবাবুটি কে?'

'সে কি! যার রাজ্যে বাস করতে চলেছ, তার নামটাই জান না? হরবল্লভ সিংহবাবু। লাযেকবাঁধ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। এককালে বিশাল জমিদার ছিল ওরা। ওব জেঠা সুদর্শন সিংহবাবুর শাসনে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেতো। এমনিতে মেজাজী মানুষ, তবে মানিযে চলতে পারলে সরকারি চাকুরেদের মাথায় তুলে রাখেন ওঁবা।' ত্রিভঙ্গ চোখ টিপে হাসে, 'দুধ-ঘিয়ের মধ্যে ভাসতে থাকবে হে।'

ত্রিভঙ্গ চেয়েছিল বুদ্ধদেবও ওর মতো বিষ্টুপুরের মেসেই থাকুক। বলেছিল, 'বিডিও'র কথা ভাবছ তো?' ত্রিভঙ্গ বাঁকা চোখে হেসেছিল, 'গাই-বাছুরে মিল থাকলে গোয়ালার বাপও কিছু করতে পারবে না। তুমি শুধু হরবল্লভকে হাতে রেখো, ব্যস।'

শেষ অবধি ত্রিভঙ্গর কথায় সায় দিতে পারে নি বুদ্ধদেব। কোনও কারণেই বেনিযম করতে রাজী নয় সে। বলে, 'শহরে থেকে গ্রামসেবকের কাজ হয় না। শহর কখনও গ্রামের কাছে যায় না।'

'কেন?'

'কারণ, গ্রামে যেতে হলে পথে নদী পড়ে, বন পড়ে, ডাঙা, ডিহি । সে বড় দুর্গম, বড়ই দুরূহ।'

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙতেই বুদ্ধদেব দেখেছিল, মেসের সামনে একটা ছই-বাঁধা সুদৃশ্য গরুর গাড়ি।

ব্যাপারটা ভালো লাগেনি বুদ্ধদেবের। তবুও সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে বেধেছে।

সকাল ন'টা নাগাদ রওনা দিল বুদ্ধদেব। সঙ্গে ত্রিভঙ্গ। সে যাবে জয়কৃষ্ণপুর অবধি। গরুর গাড়িতে পুরু করে বিচালি বিছানো। তার ওপর পুরু কম্বলের বিছানা। খান-দুই হাতপাখা।

যেতে যেতে চারপাশের ক্ষেত-মাঠ, গাঁ-গঞ্জ, গাছ-গাছালি দেখছিল বুদ্ধদেব। আকাশে গনগনে রোদ্দুর। রাস্তায় পুরু লাল ধুলো। আবীরের মত উড়ছিল হাওয়ায়।

ত্রিভঙ্গ বলে, 'চুয়ামসিনা যেতে যেতে তুমি লাল-সাহেব বনে যাবে।'

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। সেই কার্তিক থেকে আজ অবধি এক ফোঁটাও বৃষ্টি ঝরে নি আকাশ থেকে। ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, যদি বরষে মাঘের শেষ। মাঘের শেষেও এক ফোঁটা ঝরায় নি আকাশ। আকাশে মেঘের লেশই নেই। সারা রাঢ়ভূমি জুড়ে আগুনের ঝড় বইছে। মনে হয়, একটা উত্তপ্ত পাথরবাটির মধ্য দিয়ে চলেছে ওরা। প্রায়-নিষ্পত্র গাছে শীর্ণ কাক বসে একনাগাড়ে কর্কশ গলায় ডেকে চলেছে। একটা ছোট্ট খাল। দু'ধারে সরু বালির চড়া। সুতোর মতো ক্ষীণ ধারা বইছে। গাড়ি খালের মধ্যে গড়িয়ে গিয়ে ফের উঠে গেল ওপারে।

'খালটার নাম জানো?' বুদ্ধদেব শুধোয়।

'খাল? খাল কি হে?' ত্রিভঙ্গ চোখ নাচিয়ে বলে, 'নদী, বিড়াই নদী।'

'সে কি! আমার তো একটা ছোট খাল বলেই মনে হয়েছিল।'

'বাঁকুড়ায় এগুলোই নদী। এই খরা আর লাল-মাটির দেশে ফুল্‌সাইজ নদী বলতে দ্বারকেশ্বর। বাকি সব 'পচা'রাই এখানে পঞ্চানন।'

নদীর দু'ধারে টাঁড় মাটি শুয়ে শুয়ে রোদ্দুরে গিলছে। দূরে দূরে বিস্তীর্ণ শাল-মহুয়ার জঙ্গল। রুক্ষ্ম পাথুরে ডিহি। নির্জীব গাঁ। পেছনে গাঁতাত-বাঁধ। ডাইনে বহুদূরে কৃষ্ণবাঁধের উঁচু পাড়। হেড়ে-পর্বতের জঙ্গল। ত্রিভঙ্গ সব একে একে চেনাচ্ছিল।

আকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ত্রিভঙ্গ। এক সময় বিড়বিড় করে বলতে থাকে, 'এ বছর মনে হচ্ছে খরা হবে।'

'কী করে বুঝলে?'

'সবাই বলছে। এমনিতে এবছর তেঁতুল হয় নি একেবারেই। আমে ধান, তেঁতুলে বান। তাছাড়া, এই এলাকার মুরুব্বিরা খরার লক্ষণগুলোকে চেনে। সবাই বলছে।'

বুদ্ধদেব বলে, 'বৃষ্টি না হলে চাষ হবে কি করে?'

'হবে না।' ত্রিভঙ্গর নিরাসক্ত জবাব, ' ফি-বছরই এ জেলার কোন না কোনও এলাকা অনাবাদী থাকে।'

'মানুষ তবে কেমন করে বাঁচে?'

'মানুষ?' ত্রিভঙ্গ অল্পক্ষণ কী যেন ভাবে, 'মানুষ কী করে যেন বেঁচে থাকে। আসলে, মানুষ অত সহজে মরে না।'

খানিকক্ষণ চুপ থেকে মানুষের বেঁচে থাকবার একটা যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে ত্রিভঙ্গ, 'এ হল খরা আর দুর্ভিক্ষের জেলা। খরার দিনে মাটি কাটার কাজ হয়। খাদে মোরাম কাটা চলে। ড্রাইডোল দেওয়া হয়। এ জেলার জঙ্গলগুলোও বহু মানুষের মা-বাপ।

ফল-পাকুড়, মোম-মধু, পশু-পাখী, শাল, মউল, বাবলা-বহেড়ার আঠা, বহেড়া-হর্তুকি, শাল-নিম-করঞ্জা-কুসুমের বীজ—।'

অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস বুঝি বেরিয়ে আসছিল বুদ্ধদেবের গলা চিরে। সামলে নিয়ে বলে, 'গতকাল বিডিও সাহেবও তাই বলছিলেন।'

'কি বলছিলেন, বিডিও সাহেব?'

বলছিলেন, 'এ জেলার মানুষ বড় অভাগা। এদের বাঁচাতে হবে।'

'এই সব মূঢ়-ম্লান-মুক-মুখে দিতে হবে ভাষা,—বলেনি?'

বুদ্ধদেব হেসে ফেলে, 'বলেছিলেন।'

'হুহ্!' ত্রিভঙ্গ মুখ বিকৃত করে, 'তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, কবে শ্মশানের দিকে ঠ্যাং বাড়াবে তার ঠিক নেই, ঐ সুড্ডা নাকি করবে দেশের ডেভেলপমেন্ট!' মুখ দিয়ে এক বিজাতীয় আওয়াজ তোলে ত্রিভঙ্গ, 'এ শালার গম্‌মেন্টের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা! বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো। নতুন ভাবনায় গাঁ গড়বার ইচ্ছে, অথচ কোত্থেকে সব হরেক ডিপার্টমেন্টের বুড্ডা-সুড্ডা, তাড়ানো-খেদানো সারপ্লাসগুলোকে এনে বসিয়ে দিল। নিজেদের পেনসনের কেস বানানো ছাড়া আর কোনও দিকেই মন নেই এদের।'

'কিন্তু আমরা তো বুড়ো নই।'

'আমরা কি করবো? চাবি কাঠিটাই যে অন্যের দখলে।'

বুদ্ধদেব কি যেন ভাবে। বলে, 'গতকাল বড়বাবুর কাছ থেকে সি-ডি ম্যানুয়েলটা চেয়ে নিয়ে পড়ছিলাম। গ্রামসেবকদের কিন্তু অনেক দায়িত্ব। সেগুলো ঠিক ঠিক করলে—।'

ত্রিভঙ্গ কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে বুদ্ধদেবের দিকে। তারপর হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে হো-হো করে।

'তুমি নিজেকে গ্রামসেবক ভেবে ফেলেছ নাকি? অবাক কাণ্ড। আরে, আমরা কেউই গ্রামসেবক নই।'

'তবে?' ভুরু কুঁচকে ওঠে বুদ্ধদেবের।

'সেদিন তবে বড়বাবু কি বললেন তোমায়? আমরা হলাম সবাই রামসেবক। অর্থাৎ কিনা হনুমান। রামচন্দ্ররা লঙ্কা জয় করবেন। সীতাদেবীকে বামে পাবেন। ফিরে পাবেন অযোধ্যার রাজত্ব, ঐশ্বর্য। আমরা কেবল লম্ফ দিয়ে সাগর ডিঙোবো, ল্যাজে আগুন জ্বেলে লঙ্কা দহন করবো, এবং সবশেষে নিজেদের মুখ পোড়াবো ঐ ল্যাজের আগুনে।'

'হেঁয়ালি আমি তেমন বুঝি না।' বুদ্ধদেব ঈষৎ বিরক্ত, 'আমরা গ্রামসেবক কিংবা রামসেবক যা-হই, কিছু কাজ তো আমাদের করতেই হবে।'

'একশোবার। কে না বলেছে সেটা?'

'ঐ কাজগুলো কি কি?'

'সেটা তো তোমায় এক্ষুনি বলা যাবে না ব্রাদার।'

'কেন?'

'তুমি যে আগে-ভাগে সি-ডি ম্যানুয়েল পড়ে ফেলেছ।'

'তাতে কি?'

'তুমি সেই গল্পটা জানো না? এক বিরাট ওস্তাদের কাছে তবলা শিখতে গ্যাছে এক ছোকরা। ওস্তাদ বললেন, বৎস, মোটামুটি শিখতে গেলেও সময় লাগবে বছর তিনেক।

ছোকরা বললো, অতদিন লাগবে? আমার কিন্তু তালজ্ঞান ভালোই, ওস্তাদজী। কলেজে টেবিল-ফেবিল বাজাতাম। নিজের থেকে খানিকটে প্র্যাকটিসও করেছি বই দেখে দেখে।

ওস্তাদ বললেন, তাই নাকি! আগে বলবে তো। তব্ তো বেটা, ছ'বরষ লাগেগা। ভুলানেকে লিয়ে তিন বরষ, অউর শিখানেকে লিয়ে তিন বরষ।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে থাকে ত্রিভঙ্গ। বলে, 'গ্রামসেবকের কাজ ঠিক ঠিক করতে হলে, ঐ সিডি ম্যানুয়েলে যা যা পড়েছো, ভুলতে হবে আগে।'

'ওগুলো কি তবে সবই ভুল?'

'ভুল কেন হবে?' ত্রিভঙ্গ হাসে, 'ওগুলো দেশের জ্ঞানী-গুণী ভাবুকদাসের দল বানিয়েছেন ভেবে ভেবে। আর গভীর ভাবে ভাবতে গেলে দু'চোখ বন্ধ করে ভাবতে হয়, জানো তো? যাঁরা এই সব প্ল্যান ছকেছেন, তাদের অনেকেই জানেন না, এদেশে মানুষ এখনো আধা-উলঙ্গ থাকে। জঙ্গলই এদের বছরে আট মাসের পরিত্রাতা। এদের অনেকেই জন্মের আগেই বাঁধা পড়ে যায় মালিকের লাল-খাতায়। এই দেশটা যে স্বাধীন হয়েছে, সেই খবরটাই জানা নেই অনেকের।'

'কিন্তু তাদের টেনে তোলার জন্যই তো এতো আয়োজন?'

'টেনে তুলবে? কি দিয়ে টেনে তুলবে শুনি?' ত্রিভঙ্গ অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে যায়, 'যাগ্‌গে, ওসব আলোচনা বাদ দাও। দু'দিন বাদে সব নিজের থেকেই বুঝতে পারবে। আপাতত আমি শুধু তোমার রুটিন-ডিউটির একটা ফিরিস্তি দিতে পারি।'

বুদ্ধদেব উৎকর্ণ হয়।

গাড়ির মধ্যে দোল খেতে খেতে ত্রিভঙ্গ বলতে থাকে, 'তুমি হরবল্লভবাবুদের সিংহগড়ে থাকবে, খাবে-দাবে, দরকার হলে ওর ছেলে-মেয়েগুলোকে একটু-আধটু পড়িয়ে দেবে। ব্লক থেকে পাওয়া সামগ্রী হুকুম মতো বিলি করে দেবে। গাঁয়ে আগুন লাগলে ব্লকে খবর-টবর দেবে। হনুমানের উপদ্রব হলে সরকারি হান্টার নিয়ে গিয়ে মারাবে। কিছু দরখাস্ত এনকোয়ারি করবে। হরবল্লভের ঠেকায়-বেঠেকায় পাশটিতে দাঁড়াবে। ওঁর দাদন-ফাদনের সময় খাতা-ফাতা লিখে-টিখে দিয়ে সাহায্য করবে। বিডিও সাহেব তোমার এলাকায় গেলে সর্বক্ষণ পাশে পাশে হাজির থাকবে। আর হরবল্লভের বাড়িতে উৎসব-অনুষ্ঠান হলে ঘন ঘন হ্যাজাক-লাইটে পাম্প দেবে। এত সব করে-টরেও তুমি অনেক সময় পাবে। সে সময়টা, তোমার যা কাঁচা -কার্ত্তিকের মত রূপটি, সচ্ছল বাপের একমাত্র ছেলেও যখন, হরবল্লভের মেয়েটার সাথে পারলে লড়ে যেও। বছর পনের বয়েস, কিন্তু এখনই রূপ যেন ফেটে পড়তে চায়। যেন রসে টইটম্বুর একটি হৃষ্টপুষ্ট বেদানা ফল। তা না হলে পাশের মহলে আরও একটি রয়েছে। কুন্তী। আমার তো নামটা শুনলেই সারা গা শিরশির করে। তবে খুব সাবধান, জলবিচুটির পাতা তো, আকারে ছোট হলেও জ্বলুনি সমান।'

মন দিয়ে শুনছিল বুদ্ধদেব। মিটিমিটি হাসছিল। ত্রিভঙ্গ যে পুরোপুরি ঠাট্টা করছে, সেটা বুঝতে বাকি নেই। বলে, 'এই সব করবার জন্য আমাদের 'গ্রামসেবক' বলা হয়?'

ত্রিভঙ্গ যেন প্রস্তুত ছিল। চোখ বড় বড় করে বলে, 'সেবক কথাটার দুটো মানে, জানো তো? যে সেবা করে এবং যে সেবন অর্থাৎ উপভোগ করে। প্রথমটা ভুলে যাও। দ্বিতীয়টা মনে রাখলে সুখে থাকবে।'

দ্বারকেশ্বরের পাড়ে এসে গাড়ি থামে। অবন্তিকা গাঁ। বিশাল নদীর চওড়া বুক এখানে শুকনো খটখটে। যতদূর চোখ যায়, ধু-ধু বালি। এ এক বালির নদী। মাঝখান দিয়ে অতি সূক্ষ্ম

জলেব সোঁতা। ছিন্নবিচ্ছিন্ন, আঁকা-বাঁকা। বালির চড়ায় কাশের ঝোপ। ঘন শর-বন। তার মধ্যে গরু বাছুর চরছে। কাঠের ঠরকা ঠর-র-র-র, ঠর-ব-র-ব আওযাজ তুলেছে, অবিরাম। বড় একঘেঁয়ে আওযাজ। এক নাগাড়ে শুনতে শুনতে কেমন নেশা ধরে যায়। নদীব ওপারে অযোধ্যা। বর্ধিষ্ণু গাঁ। প্রতাপশালী জমিদার বাড়ুজ্জাদের রাজধানী। বাঁয়ে বনমালিপুর। ডাইনে বিশাল মাঠ টপকে চোখ চলে যায় দূর-দূরান্তে। ঘন কালচে দিগন্ত রেখো। দীর্ঘ। বহু যোজন। ত্রিভঙ্গ বলে, সেনাপতির জঙ্গল।

নদীর বুক জুড়ে অনেক মেয়ে-মানুষ বসে বসে বালিব মধ্যে গর্ত খুঁড়ছে।

ত্রিভঙ্গ বলে, 'উনুই খুঁড়ছে। এখন জেলায় পানীয় জলের নিদারুণ অভাব। কুয়োগুলো সব শুকিয়ে গেছে প্রায়। এখন এই নদীই ভরসা। শেষরাত থেকে এসে বালির বুকে উনুই খুঁড়ে, জল-সংগ্রহ করে এরা। এ ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নাস্তি।'

গাড়ির বলদগুলো বেজায় তেজী। পুরু বালিব ওপর দিয়ে অবলীলাক্রমে টেনে নিয়ে গেল গাড়ি। বালি অতিক্রম করে ফের একপ্রস্থ নিবিড় শরবন। মধ্যিখান দিয়ে পথ।

বুদ্ধদেব বলে, 'বাপরে! এই শববনে তো দিনে-দুপুরে হাজাব মানুষ বসে থাকলেও বোঝা যাবে না।'

ত্রিভঙ্গ বলে, 'এই সব শরবনে কিন্তু হুঁড়ার থাকে। বাছুর-ছাগল তুলে নিযে যায় দিনে-দুপুরে।'

শরবনটা পেবিয়ে গেলেই একটা ছোট্ট ডাঙার মধ্যিখানে বিশাল এক কুসুম গাছ। গাছের তলায় মাঝারি জমায়েত। বহু উদোম মানুষের ভিড়।

'ভাসুর-বুয়াসিনির পুজো হচ্ছে এখানে। বৃষ্টির আশায়।' ত্রিভঙ্গ জানায়। এ ঠাকুরের নাম শোনে নি বুদ্ধদেব। ত্রিভঙ্গ প্রাঞ্জল করে বোঝায়। ভাসুরকে খেতে দিচ্ছে ভাদ্দর-বৌ। আচমকা বুকের আঁচল খসে পড়লো। ভাসুরের সামনে সে কি লজ্জা। হাতে ফের ভাতের থালা। দু'হাতই জোড়া। বাধ্য হয়ে থালাখানি বুকে চাপা দিয়ে লাজ ঢাকলো বউ। সেই ভাসুব-ভাদ্দরবউয়ের গল্প ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। দেবত্ব আবোপ করা হল ওদের ওপর। পূজা শুরু হল দু'জনার। আষাঢ় মাসে ভাসুর-বুয়াসিনিব পূজা করলে নাকি ঝেঁপে বৃষ্টি হয়।

প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জনা বিভিন্ন বয়েসী মেয়ে-পুরুষ। বাচ্চার সংখ্যাও অনেক। কালো মোবগ অনেকের হাতে। বলি দিয়ে কালো মোরগেব তাজা রক্ত দিতে হবে ঠাকুরকে। তবেই আকাশে কালো মেঘ গুকলে উঠবে। আকাশ ফাটিয়ে ঝরবে বৃষ্টি। মাঠে-ঘাটে কাজ কাম মিলবে। উপোসী পেটে দানা পড়বে। বাঢ়ভূমির নিস্তেজ উপোসী শবীবখানি নড়েচড়ে উঠে বসবে ধীরে ধীরে।

কুসুম গাছের গোড়াটি বেশ প্রাচীন। গোড়ায় গজিয়ে ওঠা লতা কালক্রমে মোটা হয়েছে। শয়ে শয়ে শাখা-লতা ছড়িয়ে দিয়ে কুসুমগাছটাকে শত পাকে পেঁচিযে ধরেছে। গাছেব গোড়ায় অজস্র মাটির ঘোড়া থরেথবে সাজানো। গাছেব গোড়ায কালচে জোড়া-পাথব। সিঁদূরে-রক্তে মাখামাখি। চারপাশে অজস্র শুকনো ফুল। শুকনো রক্ত পুরু হয়ে জমেছে চারপাশেব মাটিতে। ঐ মাটিব নাকি হাজার মহিমা। মহৌষধি গুণ। বন্ধ্যা নারীব সন্তান হয। বহু দুরারোগ্য রোগ নাকি সেরে যায।

গাছের চাবপাশে কতকালের হাতি-ঘোড়াব স্তূপ। ভাঙা-আধভাঙা। কালচে-ছাতাপড়া। বুদ্ধদেব মনোযোগ সহকাবে তাকিয়েছিল। ত্রিভঙ্গ বলে, 'এ হল ধর্মরাজের থান। ঐ ঘোড়াগুলো

ধর্মরাজের বাহন। এ দৃশ্য তুমি আকছার দেখবে এ জেলায়।' পরক্ষণেই ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি ফুটিয়ে বলে, 'ধর্মরাজের ঘোড়া, এক পা'টি লটরপটর আর পা'টি খোঁড়া। ঠিক আমাদের মতো।'

অবন্তিকার ঘাট পেরোচ্ছে অধর ঝারমুনিয়া। পিছু পিছু গুটি-আষ্টেক বিধবা। ত্রিভঙ্গ দূর থেকে হাঁক পেড়ে ডাকে। অধর, যাও কোথা? অধর গদগদ হাসে। খুড়ি-জেঠিদের গঙ্গাস্তানে লিয়ে যাচ্ছি, দাদা। নদীপার হয়ে হনহনিয়ে হাঁটা দেয় অধর। পিছু পিছু প্রায় ছুটতে থাকে বুড়ি-থুড়ির দল। অধরের এও এক ব্যবসা। পুণ্যার্থীদের জুটিয়ে-পুটিয়ে তীর্থ করিয়ে আনে। মাথা পিছু খরচ-খরচা যা ধরে, কিছু বেঁচে যায়। সেই সুবাদে নিজেরও দেবদর্শন, গঙ্গাস্নান ইত্যাদি হয়ে যায় মাঝে মধ্যে। অধরের ধারণা, পাপ তার শরীরে থিতু হবার সুযোগই পায় না। জাঁক করে বলে, আপনাদের পঞ্চজনার আশীর্বাদে অধর ঝারমুনিয়ার তুল্য তীরথো দর্শন করে নাই কেউ এই রাঢ়ভূমে।

যেমন আওয়াজ তুলে ছাগল-ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নিয়ে যায় বাগালেরা, অধর সেই গলায় হাঁকডাক জুড়েছে বুড়িদের উদ্দেশ্যে। বলে, 'আস গো, ও খুড়ি, অমন কল্লে টেরেন ফেল।'

জয়কৃষ্ণপুরে ঢুকতেই গাড়ি থামাতে বলে ত্রিভঙ্গ।

মোড়ের মাথায় প্রাচীন বটের ছায়া। হরিবোল দাসের চায়ের দোকান। এখন এই ঠা-ঠা দুপুরে খদ্দের নেই বললেই চলে। ত্রিভঙ্গকে দেখে হরিবোল দাস সাততাড়াতাড়ি কাঠের বেঞ্চি ঝেড়েপুছে দেয়।

হরিবোল দাসের আদি দেশ ছিল খুলনা জেলায়। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় বাড়িঘর খুইয়ে কয়েকটি পরিবার একবস্ত্রে পালিয়ে চলে এসেছিল। তারপর জীবনের ঘাটে ঘাটে ভাসতে ভাসতে, স্রোতের চোরাটানে তলিয়ে যেতে যেতে কোনও গতিকে ভিড়েছে এই জয়কৃষ্ণপুরের চড়ায়। আগে ওখানেই দ্বারকেশ্বর বইতো। এখন ও নদী পথ বদলেছে। পরিত্যক্ত নদীখাতটি এখনও স্পষ্ট। এখনো বর্ষায় জল জমে নদীর আকার নেয়। লোকে বলে কানা-নদী। ঐ কানা-নদীর ভরাট চরের খানিকটে দখল করে কাশবন-শরবন পরিষ্কার করে, হরিবোল দাসের দল ডেরা বানিয়েছিল আজ বছর সাত-আট আগে।

চা বানাতে বানাতে হরিবোল দাস সেই সব গল্পই করছিল। ত্রিভঙ্গ বুদ্ধদেবের পরিচয় আগেই দিয়েছে।

এবার বলে, 'তোমাদের সেই জমি দখলের লড়াইয়ের গপ্পোটা শুনিয়ে দাও না হে নতুন বাবুকে।'

সে কথায় হরিবোল দাস ফোকলা দাঁতে হাসে। সবাই জানে, ওটা ওর ভারি প্রিয় প্রসঙ্গ। অনেক শ্রম-কান্না-ঘাম এবং আনন্দের স্মৃতি এর সাথে জড়িত। ত্রিভঙ্গকে অন্তত বার দশেক শুনিয়েছে গল্পটা। বুদ্ধদেবদের চা-বিস্কুট দিয়ে সামনের জলচৌকিতে জুত করে বসে হরিবোল দাস। স্মৃতি রোমন্থন করতে থাকে তারিয়ে তারিয়ে। বলতে বলতে তার চোখেমুখে আনন্দ আর বিষাদ খেলা করতে থাকে আলো-ছায়ার মতো।

শনের মতো সাদা ক'গাছি চুল ফুরফুরিয়ে উড়ছিল। গল্প শেষ করে ম্লান হাসে হরিবোল দাস। ফস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'জমি-দখলের লড়াইখান্ জিতসি্। কিন্তু মনের জমি-দখলের লড়াইতে হাইরা যাইতেসি বারম্বার।'

'মানে?' বুদ্ধদেব বুঝতে পারে না।

'এ্যাই তল্লাডের লোকজন, আমাগো সাথ মিশে না। কথা কয় না। ঘরে আগুন লাইগ্‌লেও কেউ দুয়ার মারায় না। আমরা নাকি বাঙাল। আমরা নাকি মনুষ্য নই। আমাগো লৈয়া গান বাঁধসে অরা। বাঙাল কান্দে রে, বাঙাল কান্দে, আজ উয়াদ্যার কিচ্ছো নাই লটা-কম্বল কাঁধে—।'

শুনতে শুনতে বুদ্ধদেবের বুকখানা টনটনিয়ে উঠে। দেশ-ছাড়া ভিটে-ছাড়া এই মানুষগুলির জন্য সহসা ভিজে ওঠে মন। দেশভাগের প্রবক্তাদের প্রতি সহসা প্রবল ঘৃণায় তেতো হয়ে ওঠে বুক।

গলা খাটো করে ত্রিভঙ্গ বলে, 'আমাদের বিডিও তো বাঙাল। জান না? রিফিউজি ক্যাম্পে বহুদিন ছিল।'

'পূর্ববঙ্গের মানুষ, সেটা কথাতেই বোঝা যায়। কিন্তু রিফ্যুইজি ক্যাম্পে ছিলেন, এটা জানা ছিল না।'

'এখন ঐ প্রসঙ্গ তুললে ক্ষেপে যায় বুড়ো। আর, উদ্বাস্তুরা ওর দু'চক্ষের বিষ।'

চা শেষ করে পকেটে হাত ঢোকাতেই হাঁ-হাঁ করে ওঠে হরিবোল দাস। ফোকলাদাঁতে জিভ কাটতে গিয়ে জিভের ডগা বেরিয়ে পড়ে বাইরে।

সসম্ভ্রমে বলে, 'আপনার লগে পয়সা নিমু? ছ্যাঃ ছ্যাঃ, আমার মরণ হয় নাই ক্যান্?'

বুদ্ধদেব ত্রিভঙ্গর দিকে তাকায়। শুধোয়, 'পয়সা নেবেন না বলছেন কেন?'

মুচকি হাসে ত্রিভঙ্গ। বলে, 'ঐ যে বললাম, আমরা হলাম ধর্মরাজের ঘোড়া।'

বহুকষ্টে হরিবোল দাসের হাতে পয়সা কটি গুঁজে দিয়ে গাড়ির দিকে পা বাড়ায় বুদ্ধদেব।

এখানেই ত্রিভঙ্গ বিদায় নেয়। সে চলে যায় তার কর্মস্থল অযোধ্যায়। আচমকা গাড়ির মধ্যে এক ধরনের ফাঁকা ফাঁকা অনুভূতি। কেবল বুদ্ধদেব আর পাগল শিকারি, আর চারপাশে এক জ্বলন্ত পৃথিবী।

ঠিক সেই মুহূর্তে পাগল শিকারি খুব অলৌকিক গলায় শুধিয়েছিল ঐ প্রশ্নটা। হাঁ বাবু, সুধন্য নামটার মানে কি বটে?

চুয়ামসিনার সিংহগড়ের সামনে যখন গাড়ি এসে থামে, তখন মধ্য গগনে সূর্য। পাশাপাশি দুটি বিশাল গড়। পূবেরটি হরিণমুড়ির গাঁ ঘেঁসে, আকারে বড়, কিন্তু ঈষৎ জরাজীর্ণ। পশ্চিমের গড়টির সামনেই থেমে যায় গাড়ি। বুদ্ধদেব নামে। চারপাশে বিস্মিত চোখে তাকায়। তারপর আস্তে আস্তে পা বাড়ায় সিং-দরজার দিকে।

সিং-দরজা পেরোবার ঠিক আগের মুহূর্তে তার চোখদুটি বিঁধে যায় পূবের গড়টির তিনতলায়। বুদ্ধদেব দেখতে পায়, তিনতলার খোলা ছাদের কিনার ঘেঁসে ফুটে রয়েছে একটি গোলাপী পদ্ম ফুল।

এবং যদিও সূর্য মাথার ওপর, ফুলটির মুখ হেলে পড়েছে পশ্চিমের দিগন্তে।

ত্রিভঙ্গ কি এর কথাই বলছিল! কুন্তী!

কনকপ্রভার সার্কাস দল

জিয়োন গাছের তলায় বসে অলস ভাবনা। অলীক কল্পনা সমুদয়, যাব দ্বারা ইট-কাঠ-সিমেন্টের ভগ্ন অট্টালিকার শরীরে যৎপরোনাস্তি মাথ-মায়া মাখিয়ে দেওযা চলে। শরীরখানি

ঢেকে দেওয়া চলে যাবতীয় রহস্যময়তার স্বচ্ছ ওড়নায়। আসলে, কোনও একটা দৃশ্য, কাহিনী, ঘটনা, হঠাতই মনের মধ্যে একটা ছবি তৈরি করে দেয়। কোনও মানুষ, জায়গা, অথবা পরিস্থিতি সম্পর্কে একখানা তাৎক্ষণিক ছবি। সে ছবি বেশ পাকা রঙের হয়। পরে, অনেক ঘসাঘসিতেও পুরোপুরি তুলে ফেলা যায় না। ঠিক তেমনটিই ঘটেছিল বুদ্ধদেবের বেলায়। যেদিন প্রথম এল, ঐ ঠা-ঠা নির্জন দুপুরে, হরিণমুড়ির পাড়ে, শ্যাওলামেচেতো ধরা কালচে, প্রাচীন, ধ্বসে পড়া সাতমহলা অট্টালিকার চূড়োয় একখানা গোলাপী পদ্ম ফুটে থাকতে দেখেই মুহূর্তে তার মনের মধ্যে একখানা পাকারঙ একান্ত ছবি। বুদ্ধদেব ঐ ছবিখানিকেই বয়ে বেড়াচ্ছে। কী আশ্চর্য ছিল ঐ মধ্যাহ্নকালীন দৃশ্যপট। কী অপার রহস্যময় ছিল, ঐ দুপুরে, গোলাপী শাড়ি পরা কুন্তীর দাঁড়িয়ে থাকাটা! পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাটা। এমনই সে দৃশ্য, পুরো মহলের সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশের সমগ্র পটভূমিখানিও আক্রান্ত হয়েছিল সেই অপার রহস্যময়তায়। চারপাশের গাছ-গাছালি, পশ্চাদ্‌পটে বত্রিশভাগীর জঙ্গল, সুমুখে হরিণমুড়ি নদী, শালকাঁকির ডাঙা, সবকিছুর শরীরে, এমন কি ঐ গরুর গাড়িটি এবং তার মধ্যে বসে থাকা বুদ্ধদেবের শরীরেও লেগেছিল সেই রহস্যময়তা। একখানি পোশাকে আতর লাগিয়ে একবাক্স পোশাকের মধ্যে রাখলে যেমন করে বাক্সের মধ্যেকার প্রায় সমস্ত পোশাকের শরীরে চারিয়ে যায় আতরের গন্ধ, ঠিক তেমনি করে, এক পরিপূর্ণ রহস্যময়তায় তাৎক্ষণিকভাবে আক্রান্ত হয়ে বুদ্ধদেবও ক্ষণিকের জন্য হলেও ভেবেছিল, সে এক রূপকথার দেশে এসে পড়েছে এবং সে নিজেও ঐ রূপকথার একটি অধ্যায়। আসলে সেদিন সারাটা পথ এমন লাল ধুলোর মেঘ ওড়াতে ওড়াতে আসা, দু'ধারে এমন নিকষ মাকড়া পাথরের ডাঙা, এমন গাঢ় তুঁত রঙের ধারাবাহিক জঙ্গল দিগন্তের গায়ে, এমন তপ্ত তামাটে আকাশ, ঘুরে ঘুরে পাক খেতে থাকা ডোমচিলের দল, এমন প্রশস্ত বালির নদী, মধ্যিখানে সুতোর মতো স্রোত, বালির মধ্যে উনুই খুঁড়ে জল সংগ্রহ, এমন প্রখর অগ্নিবর্ষী দুপুর—রাঢ়ভূমির এমন অকল্পনীয় দৃশ্যপট তো তার মধ্যে একটু একটু করে রঙ-তুলি বোলাচ্ছিল সারা পথ। তারপর, হরিণমুড়ির পাড়ে অমন প্রাচীন, কালচে, অতিকায় প্রাসাদের চূড়োয় এক ঝাঁক নিশ্চল কাক, একেবারে পাথরের মতো স্থির। পাথর, পাথর। এবং খানিক তফাতে পশ্চিম দিগন্তে চোখ বিঁধিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ ফুটন্ত গোলাপী পদ্মটি! যদিও, আলাপ হওয়ার পর কুন্তী ঐ নিদারুণ অসময়ে অমন অনির্বচনীয় মুদ্রায় দাঁড়িয়ে থাকবার একখানা ব্যাখ্যা পেশ করেছিল। বলেছিল, বা-রে, তেঁতুলের আচারগুলা ছাদে রোদ্দুর খাচ্ছিল পাথরের বয়ামে, আর কাকগুলা বয়ামের ঢাকনা খুলে ফেলবার তরে উড়াউড়ি কচ্ছিল যে!

—তো, কী হয়েছে? তোমাদের মহলে দাসী-চাকরের অভাব? ঐ কাঠফাঠা রোদ্দুরে তোমাকেই উঠে আসতে হল?

—তখন যে ধারেপাশে কেউ ছিল নাই। তাই ভাবলাম, যাই, কাকগুলাকে তাড়িয়ে আসি।

মানুষের মুখ যখন কথা কয়, চোখদুটো তো তখন ঘুমিয়ে থাকে না। চোখ এক আশ্চর্য দর্পণ। এক মায়া-আরশি। কুন্তীর মুখ যখন চলছিল, চোখদুটিও সচল ছিল। তাদেরও ছিল নির্দিষ্ট ভাষা। সে ভাষা মুখের ভাষার সঙ্গে মিলছিল না। বুদ্ধদেব দেখতে পাচ্ছিল, ঐ মুহূর্তে কুন্তীর চোখের আরশিতে অন্যতর ছায়া। কুন্তীর মন অন্য কথা বলছিল। মনের সেই অন্য কথাটি, চোখের আরশিতে যাব ছায়া পড়েছিল সেদিন, মুখ দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল আরও অনেক পরে।

কিন্তু কেমন করে কুন্তীর সঙ্গে আলাপ হল বুদ্ধদেবের! আকাশের গোলাপী পদ্মটি কেমন করে নেমে এলো বুদ্ধদেবের মাটিতে। কী অসম্ভব দেমাকি ছিল কুন্তী, বুদ্ধদেব তো ইতিমধ্যেই তার পরিচয় পেয়ে গিয়েছে। আসলে, কুন্তীর সঙ্গে আলাপের আগে অন্তত দুটি সুনির্দিষ্ট স্তর পেরিয়ে আসতে হয়েছে বুদ্ধদেবকে। প্রথম স্তরটি ছিল মল্লিকা, এবং দ্বিতীয় স্তর, মল্লিকার মাধ্যমে দীপমালা।

মল্লিকার সঙ্গে আলাপটি ভারি নাটকীয়। সাধারণত নাটক-নভেলেই ঘটে তেমনটা। পরে বুদ্ধদেব খতিয়ে দেখেছে, নাটক-নভেলে ঘটে এমন অনেক কিছুই ঘটেছে তার জীবনে।

তখনও এলাকা বরাদ্দ হয় নি। বুদ্ধদেব ত্রিভঙ্গদের সঙ্গে মেসে থাকে আর রোজ হাজিরা দেয় ব্লক অফিসে। একদিন বিকেল নাগাদ একা একা বেড়াতে বেরিয়েছে। আপন মনে দেখে বেড়াচ্ছে একের পর এক মন্দির, দুচোখ দিয়ে মগ্ন পরিমাপ চলছে শহরটির প্রাচীনত্বের, এমনি সময়ে একেবারে নাটক-নভেলের মতো প্রস্তুতিহীন বৃষ্টি নামল চড়বড়িয়ে। বুদ্ধদেব তখন শাঁখারিপাড়ার মাঝামাঝি। ঝটিতি যে ঘরের দাওয়ায় আশ্রয় নিল, সেটাই যে মল্লিকাদের বাড়ি সেটা ঘুণাক্ষরেও জানা ছিল না, যদিও ত্রিভঙ্গ তিলমাত্র বিশ্বাস করে নি তা। চোখের মণিতে ঘোরতর প্রাজ্ঞতা ফুটিয়ে বলেছে, ও তুমি যতই বল, ব্রাদার ..। বুদ্ধদেব ক্ষেপে ওঠে, কালবৈশাখী হয় না এই মরসুমে? আচমকা চড়বড়িয়ে আসে না? ত্রিভঙ্গ বলে, হয়ত আসে, তবে একেবারে মল্লিকার দোরগোড়ায়, কালবৈশাখীর মেঘের পক্ষেও এতখানি বিবেচনা সময়ানুবর্তিতা... , না ব্রাদার, তুমি গল্পটা বদলাও।

সেদিন মল্লিকা পরেছিল এক অতি সাধারণ তাঁতের শাড়ি। ঘন তুঁত রঙের জমিতে সাদা সাদা কল্কে ছাপ। কোনও প্রসাধন ছিল না মুখে। অথচ এত অসামান্য লাগছিল ওকে .। আর, ওর তিন পাশে তখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। মাঝে মাঝে আকাশ চিরে ঝলসে উঠছে বিদ্যুত। মল্লিকার চোখের মণিজোড়া কেঁপে কেঁপে উঠছে। খুব অনাড়ম্বরভাবে ওকে ভেতরে নিয়ে গেল মল্লিকা। একটু পরে কাকভেজা হয়ে ফিরলেন ওর বাবা। বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের শিক্ষক। সৌম্য চেহারা। সরল-সরল হাসি। বুদ্ধদেবের খোঁজ-খবর নিলেন, এবং সামান্যক্ষণ কথা বলেই পেয়ে গেলেন ছেলেটির মধ্যে মেধার পরিচয়। সেই বিকেলে, মল্লিকা চা বানাল, চানাচুর দিয়ে মুড়ি মাখল . । আর, বৃষ্টি একটু কমতেই ছাতা মাথায় হাজির হলেন যিনি, তাঁকে দেখে বুদ্ধদেবের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। দীপমালা। বুদ্ধদেবের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে দীপমালা প্রণাম করলেন মল্লিকার বাবাকে। মল্লিকার বাবা ডান হাতখানি দীপমালার মাথায় স্থাপন করে, চোখ মুদে আশীর্বাদ করলেন। আর, মল্লিকা, বাইরের ঘরে চা এনে দীপমালাকে দেখে উচ্ছ্বসিত।

দীপমালার সঙ্গে মল্লিকার সম্পর্ক যে কতখানি গভীর, অন্তরঙ্গ, বুঝতে কষ্ট হয়নি বুদ্ধদেবের। পরে মল্লিকাই দীপমালার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল বুদ্ধদেবের। দীপমালাকে তখন কেবল নামে চিনত বুদ্ধদেব। ব্লক অফিসে বার কয়েক দেখেছে, এইমাত্র। ওঁর সম্পর্কে যেটুকু জানত তা হল, ওঁর পুরো নাম দীপমালা ব্যানার্জি। বিষ্ণুপুরে অগ্রণী মহিলা সমিতির নেত্রী। এটি একটি বামপন্থী মহিলা সমিতি। মেয়েদের হাতের কাজ শেখায়, সেলাই, এমব্রয়ডারি শেখায়। পড়াশুনোও। বিডিও সাহেবসহ ব্লক অফিসের অনেকেই সমিতিটা সম্পর্কে এক ধরনের বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। কিন্তু মল্লিকার সঙ্গে ওঁর যে এতখানি গলায় গলায় সেটা ঐ বিকেলেই প্রথম টের পায় বুদ্ধদেব। মাস-দুই বাদে মল্লিকা একদিন বুদ্ধদেবকে নিয়ে

গিয়েছিল দীপমালার শাঁখারিপাড়ার বাসায়। তখন বুদ্ধদেবের পোস্টিং হয়ে গিয়েছে চুয়ামসিনায়।

যেদিন বুদ্ধদেব দীপমালার বাসায় গিয়েছিল সেটা ছিল ওর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিন। সেদিন ছিল চমকের পর চমক। প্রথম চমকটি ছিল, কাঁথির অরিজিত ব্যানার্জি, অগ্নিযুগের আপোসহীন বিপ্লবী হিসেবে যাঁর নাম অদ্যাবধি কাঁথি এলাকার মানুষের মুখে মুখে ঘোরে, দীপমালা তাঁরই মেয়ে। কথাটা শোনা অবধি বুদ্ধদেবের শরীরের কোষে কোষে রোমাঞ্চ। অনেকক্ষণ চোখের পলক ফেলতে ভুলে গিয়েছিল সে। নিষ্পলক তাকিয়েছিল দীপমালার মুখের দিকে। সে দৃষ্টিতে বুঝি চাপা অবিশ্বাস ছিল। দীপমালার নজর এড়ায় নি তা।

—কি? বিশ্বাস হচ্ছে না? দীপমালা হেসেছিলেন। তারপর ঘরের তাক থেকে একটা ছোট্ট ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি এনে মেলে ধরেছিলেন বুদ্ধদেবের সুমুখে। ছবি দেখে অবশ্য বাড়তি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারে নি বুদ্ধদেব, কারণ অরিজিতের কোনও ছবি সে দেখে নি আগে। তবে, পরবর্তীকালে দেশের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিল যে অরিজিত বাঁকুড়া শহরেই বিয়ে করেছিলেন এবং এখনও তাঁর স্ত্রী এবং এক মেয়ে বাঁকুড়াতেই থাকে।

অরিজিত ব্যানার্জি সম্পর্কে অনেক গল্প-গাঁথা চালু রয়েছে কাঁথি এলাকায়। প্রায় সেই শৈশব থেকেই লোকমুখে সে সব শুনে আসছে বুদ্ধদেব। আর, বুদ্ধদেব যেহেতু ছেলেবেলা থেকেই একটু বেশি মাত্রায় আবেগপ্রবণ, আদর্শনিষ্ঠ, কল্পনাবিলাসী, অরিজিত সম্পর্কে রোমহর্ষক গল্পগাঁথাগুলিকে সে গোগ্রাসে গিলেছে এবং মণিমুক্তোর মতো খোদাই করে রেখে দিয়েছে মগজের খোপে। ভারি রহস্যময় চরিত্রের মানুষ ছিলেন অরিজিত। শচীদুলাল ব্যানার্জির মতো ডাকসাইটে জমিদারের ছেলে হয়েও তিনি একদিনের তরেও ভোগ করেন নি আরাম, বিলাস, ঐশ্বর্য। কেবল পালিয়ে বেড়িয়েছেন, লুকোচুরি খেলে বেড়িয়েছেন পুলিশ ও রাজপুরুষদের সঙ্গে। সেইসব লুকোচুরির গল্প আজও, হয়তো সময়ের গুণে সামান্য ফেনায়িত হয়ে, মানুষের মুখে মুখে ফেরে। রহস্যে, রোমাঞ্চে, চমকে, সাসপেন্সে যে কোনও রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের কাহিনীর সঙ্গে তুলনীয় সে সব গল্প। শুনতে শুনতে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠেছিল কিশোর বুদ্ধদেবের। মনে মনে একেবারে নায়কের আসনে মানুষটিকে বসিয়ে ফেলেছিল সে। কল্পনায় একখানা ছবিও এঁকে রেখেছিল মানুষটির।

ওই সিরিজের শেষ কাহিনীটি বড় হৃদয়বিদারক বুদ্ধদেবের কাছে। অরিজিত যে রাতে আচমকা ধরা পড়ে গেলেন, সেই রাতের কাহিনী। বহুদিন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ানোর পর সবেমাত্র ঘরে ফিরেছিলেন মানুষটি। তিনটি রাতও গেল না, একরাতে নিশ্চিত খবর পেয়ে পুলিশ ঘিরে ফেলল পুরো বাড়ি। সে রাতে হার মানলেন বুদ্ধদেবের রূপকথার নায়কটি। ধরা পড়ে গেলেন। সর্বসমক্ষে পুলিশ তাঁর হাতে হাতকড়া পরাল, পায়ে বেড়ি পরাল, কোমরে রশি বাঁধল, একেবারে ছিঁচকে চোরের মতো হেঁচড়তে হেঁচড়াতে জীপে তুলল।

পুলিশের জীপে চড়ে শেষরাতে সেই যে চলে গেলেন মানুষটি, আর ফিরে আসেন নি। তাঁকে নিয়ে যাবতীয় কাহিনী, কিংবদন্তি, গল্প-গাথার ইতি ঐখানেই। ঐ রাতের পর ওঁকে নিয়ে সব গল্পই শেষ।

ঐ শেষ গল্পটি কোনও কালেই ভাল লাগত না বুদ্ধদেবের। ও গল্প কেউ বলতে শুরু করলেই মুখ ফিরিয়ে নিত সে। অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। বুদ্ধদেবের বাসনা ছিল,

বড় হয়ে মানুষটির সম্পর্কে প্রচলিত যাবতীয় গল্প-গাথাকে একত্র করে একখানা বই লিখবে। নিজের পয়সায় ছাপিয়ে বিনে পয়সায় বিলি করবে সর্বত্র। কিন্তু ঐ বইতে শেষের গল্পটি বদলে দেবে সে। কিছুতেই পুলিশের হাতে ওঁর অতখানি নিগৃহীত হবার গল্পটা লিখবে না। বরং যত রোমাঞ্চকর কীর্তিকলাপ তাঁর সম্পর্কে চালু রয়েছে তল্লাটে, তার চেয়েও ঢের রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক পদ্ধতিতে সে অরিজিতকে পুলিশের বেড়াজাল ছিন্ন করে বের করে দেবে ব্যানার্জি-বাড়ির বাইরে। তারপর মানুষটিকে হাওয়া করে দেবে চিরকালের তরে। তিনি কোথায় গেলেন, কী করলেন, এখনও বেঁচে রয়েছেন কিনা, থাকলে কোথায় আছেন, এইসব নিয়ে সারা তল্লাট জুড়ে চালু হবে দ্বিতীয়প্রস্থ গল্প-গাথা, অনুমান, অনুসন্ধান, কল্পনা। সেসব আর কোনও দিনও শেষ হবে না। ঠিক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মতো তাঁর শেষ জীবনটিও অপরিসীম রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা থাকবে। এমন মানুষের ক্ষেত্রে ঠিক যেমনটা হওয়া উচিত।

সেদিন দীপমালাকে অতিশয় লাজুক ভঙ্গিতে একটু একটু করে বলেছিল বুদ্ধদেব তার মনোগত বাসনার কথা।

দীপমালা হেসেছিলেন। বলেছিলেন, তাহলে তোমাকে আরও একটা গল্প শোনাই যা শুনলে তোমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠবে।

দীপমালা একটু একটু করে বলেছিলেন গল্পটা, আর সেই থেকেই বুদ্ধদেব জেনেছিল, অরিজিত তাঁর পলাতক জীবনে একবার মাস-তিন-চারেকের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন চুয়াসমিনার সিংহগড়ে। এখন যাকে সবাই সিংহগড় বলে জানে, সেই প্রতাপলাল সিংহবাবুর গড়ে নয়। তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর বড় ভাই সুদর্শন সিংহবাবুর গড়ে। সুদর্শনের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি তখন পাগলের মতো একজন পুরুষ-উত্তরাধিকারী খুঁজে চলেছেন। একমাত্র মেয়ে লাবণ্যপ্রভার সঙ্গে অরিজিতের বিবাহ দিয়ে তাঁকে আজীবনকাল সিংহগড়ে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন সুদর্শন। কিন্তু উড়ন্ত পাখি তো খাঁচার বন্দীত্বকে ঘৃণা করে। ফলে, সুদর্শনের মনোগত সেই ইচ্ছাটি ফলপ্রসূ হয় নি। সুদর্শনও শেষের পর্যায়ে আর বেশি দূর এগোন নি, কারণ তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল অরিজিতের মানসিক গঠন জমিদারি চালানোর অনুকূল নয়। আভিজাত্য এবং সামন্তবৃত্তিকে সে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে।

অরিজিত সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য পরবর্তীকালে জেনেছিল বুদ্ধদেব, কিছুটা পরীক্ষিত বাউরির থেকে, কিছুটা সুকুমার আচার্য। সেগুলোও কম রহস্যময় নয়। সিংহগড়ে অবস্থানকালে কিশোরী লাবণ্য নাকি মনে মনে আকৃষ্ট হয়েছিল ঐ সুদর্শন ডাকাবুকো যুবকটির প্রতি। সম্ভবত লাবণ্যও অরিজিতের মনে গভীরভাবে দাগ ফেলেছিল। অরিজিতের নিজস্ব দিনপঞ্জীতেই নাকি লেখা ছিল সে সব কথা। পরবর্তীকালে দীপমালা উদ্ধার করেছিলেন সেই ধারাবাহিক দিনপঞ্জী। লাবণ্যর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মশিয়াড়া গ্রামের বেদজ্ঞ পণ্ডিত পরিবারের ছেলে শঙ্করপ্রসাদের। শঙ্করপ্রসাদ ঘরজামাই হয়ে আজীবনকাল বসবাস করেছিলেন সিংহগড়ে। লাবণ্যর গর্ভে জন্মেছিল ওদের একমাত্র পুত্র প্রিয়ব্রত। ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে 'কোকিল' বলে ডাকত সিংহগড়ের জ্ঞাতি-গুষ্টি বৈরী মানুষজন। সিংহগড়ের আভিজাত্য এবং প্রজানির্যাতনকে সহজ ভাবে নিতে পারেন নি প্রিয়ব্রত। নিজের বাবাকে মনে হত বৈভবের প্রাসাদে এক বন্দী মানুষ। আভিজাত্যহীন মানুষটি সিংহগড়বাসীর হাতে অপমানিত হয়েছেন আজীবনকাল। কিশোর প্রিয়ব্রতর দৃষ্টি এড়ায়নি কিছুই।

স্কুলজীবন থেকেই প্রিয়ব্রত অনুশীলন দলে যোগ দিয়ে বিপ্লবী হয়ে যায়। ওখানেই আলাপ হয় দীপমালার সঙ্গে। পরীক্ষিত বাউরির মুখ থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে যে সব কথা শুনেছে বুদ্ধদেব, তাতে করে তাব এমনই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে দীপমালার সঙ্গে প্রিয়ব্রতর সম্পর্কটাও ছিল আগাগোড়া রহস্যের মোড়কে ঢাকা। প্রিয়ব্রতর সঙ্গে সেই কিশোরী বয়েসে দীপমালা একাধিকবার সিংহগড়ে এসেছেন। বিপ্লবী বাবার তিন মাসের একান্ত আশ্রয়টিকে নিয়ে তাঁর ছিল সীমাহীন কৌতূহল। লাবণ্য, প্রিয়ব্রতর মা, দীপমালাকে মেয়ের মতো ভাল বাসতেন। একবার নাকি, তিনি তাঁর উড়ন্ত পুত্রের কাছে দীপমালাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কেন যে প্রিয়ব্রত সেই প্রস্তাবে সায় দেন নি, কেনই বা দীপমালার বদলে কনকপ্রভা ঢুকেছিল সিংহগড়ের বধূ হয়ে, পরীক্ষিত বাউরি তার কোনও সন্তোষজনক কারণ দর্শাতে পারে নি। কিন্তু আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বিবাহের পরও প্রিয়ব্রত থিতু হন নি সিংহগড়ে। আজীবনকাল উড়ে বেড়িয়েছেন ঘরছাড়া পাখির মতো, নিজেকে সঁপে দিয়েছেন বাঁকুড়ার যাবতীয় লড়াই-আন্দোলনের কেন্দ্রভূমিতে। সেই সুবাদে জেলও খেটেছেন একাধিকবার। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর অনুপস্থিতিতে দীপমালা সিংহগড়ে ঘনঘন গিয়েছেন। লাবণ্য, কনকপ্রভা এবং কুন্তীর প্রতি তাঁর নজর ছিল সর্বক্ষণের। প্রিয়ব্রত মারা যাওয়ার পর যখন সাবেক সিংহগড়ে কনকপ্রভা এবং কুন্তী ছাড়া আর কেউই নেই, তখন দীপমালা তাঁর নজরদারি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। কেনই বা, কিসের টানে, প্রিয়ব্রতর স্ত্রী-কন্যার প্রতি তিনি এখনও এক ধরনের দায়িত্ববোধ পোষণ করে চলেছেন, বুদ্ধদেব বুঝতে পারে না কিছুতেই।

সেদিন সারা বিকেল গল্প-গুজব করে যখন দীপমালার থেকে বিদায় নেয় বুদ্ধদেব, দীপমালা খুব অনুনয় মাখানো গলায় উচ্চারণ করেছিলেন কয়েকটিমাত্র কথা।

—তুমি তো নাগালের মধ্যেই রয়েছ, ওদের একটুখানি দেখো। আবেগে ভারি হয়ে এসেছিল দীপমালার কণ্ঠস্বর, ওদের দেখবার মতো কেউ নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে বুদ্ধদেব লক্ষ করেছিল, দীপমালার চোখদুটি ডিমে তা দিতে থাকা পাখির চোখের মতো। তেমনই নিমগ্ন, মমতাময়, দায়িত্বশীল। তেমনই, শরীরের যাবতীয় একাগ্রতা দু'চোখের মণিতে তিলতিল সঞ্চয় করেছে দীপমালা।

বাস্তবিক কনকপ্রভার মহলটা তখনও বুদ্ধদেবের কাছে এক জলজ্যান্ত রহস্য। দীপমালা বলবার আগেই ঐ মহল সম্পর্কে তীব্র আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল ওর মনে। বিশাল অট্টালিকা, মোটা মোটা থাম, থামের গায়ে আঁকা লতাপাতা, ভাঙাচোরা, পলেস্তারা খসে পড়া দেওয়াল, শ্যাওলা-আগাছা গজানো পাঁচিল, বিবর্ণ সিং-দরজা, হা-হা খোলা জানালা, কালচে মেচেতা-পড়া অবয়বখানি দেখলে মনে হয়, হরিণমুড়ির পাড়ে বুঝি কোনও ঐতিহাসিক প্রাসাদ। দিনের বেলায় প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ বলেই মনে হয়, রাতের বেলায় মনে হয়, নিকষ অন্ধকার সর্বাঙ্গে মেখে নিয়ে কোনও অতিকায় আদিম জন্তু বুঝি বত্রিশভাগীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নৈশ জলপানে এসেছে হরিণমুড়ির পাড়ে। আর, জলে মুখ দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা বুদ্ধদেবকে দেখে থমকে গিয়েছে। আর, অন্দর-আলোর দ্বারা সামান্য আলোকিত সদর উঠোন, বিশাল সিং-দরজার ভেতর দিয়ে দেখলে ওটাকেই জন্তুটার মুখগহ্বর মনে হয়। আসলে বুদ্ধদেবেরই ভাবনা এসব। একটি অতিকায় আদিম প্রাসাদ, তার মধ্যে বুনো গাছ-গাছালি, শ্যাওলা, প্রাচীন প্রাচীন গন্ধ ও একগাদা দাস-দাসী, নায়েকগোমস্তা নিয়ে বাস করে

দু'টি রূপসী রমণী, তাদের জীবন যাপন অপরিসীম রহস্যে ঢাকা, চারপাশের মানুষজনের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র, এই রহস্যময়তাই বুদ্ধদেবকে প্রবলভাবে টানত।

বুদ্ধদেবের অমন বাঁধভাঙা কৌতূহল দেখে সুকুমার আচার্য হো-হো করে হেসেছিল, কনকপ্রভার সার্কিস-দলের কথা বলছেন তো? শোনাব একদিন।

—সার্কাস দল?

—হুঁ। সে এক জব্বর সার্কিস-দল বটে। এ তল্লাটে ভারি নাম উই দলের।

বুদ্ধদেব মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকায় আরও মজা পায় সুকুমার। আরও একচোট হেসে নেয়। বলে, বিচিত্র জাতের জীবজন্তু রয়েছে উই দলে। খেলোয়াড়ও ঢের। উয়াদ্যার নিত্য-নতুন হরেক হরেক কিসিমের খেলা। দেইখ্যে পাবেন সব। সবুর ধরুন।

বুদ্ধদেব দেখতে পেত, সারা মহল জুড়ে দিনরাত হৈ-চৈ। অবিরাম হাসিঠাট্টা লাগিয়ে বেখেছে বহু মানুষ। যেন কী এক উৎসব চলছে সর্বক্ষণ। দলে দলে মেয়ে-পুরুষ ঢুকছে, বেরোচ্ছে। এবেলা হয়ত গরুরগাড়িভর্তি মালপত্তর ঢুকল, ওবেলায আধডজন গাড়ি বোঝাই হয়ে বেরিয়ে গেল প্রায় সকলেই। অথচ মহলের নিজস্ব বাসিন্দা বলতে তো দুটিমাত্তর প্রাণী। কনকপ্রভা এবং কুন্তী। বাকি সবাই কি তবে পরগাছা? মহলের দেওয়ালে দেওয়ালে যত পরগাছা গজিয়েছে, ভেতরে কি তার চেয়েও বেশি? এতগুলি পরগাছা গজিয়ে গিয়েছে দুটি প্রাণীর শরীরে!

দিনের বেলায় হৈ-চৈখানা অত মালুম হয় না। চাপা পড়ে যায় চারপাশের হাজারো জাগতিক শব্দে। পুরোপুরি মালুম হয় সন্ধেবেলায়। তখন একের পর এক হ্যাজাক জ্বলে ওঠে, উজ্জ্বল আলো পাঁচিল টপকে লাফিয়ে পড়ে হরবল্লভদের সীমানায়। অল্পক্ষণ বাদেই হারমোনিয়মে গৎ বেজে ওঠে, তবলায় হাতুড়ির ঘা পড়ে, গানের আসর জমে ওঠে। চলতে থাকে সমঝদারদের হল্লা। অনেক রাত অবধি জলসা চলে। এক-একদিন আধ-ডজন গরুর গাড়ি এসে দাঁড়ায় সদর দরজায়। গাড়ি বোঝাই হয়ে যেন কোথায় চলে যায় সবাই। সারা মহলখানা যেন সহসা নিঝ্ঝুম হয়ে যায়। দু'একদিন বাদে আবার সোরগোল তুলে ফিরে আসে গো-শকটের মিছিল, মৃতপুরীতে যেন সহসা প্রাণসঞ্চার হয়।

বুদ্ধদেব অবাক হয়ে লক্ষ্য করে যায় ওদের কাণ্ডকাবখানা।

ঠাট্টা-তামাশায় ভেঙে পড়তে পড়তে এক সময় গম্ভীর হয়ে যায় সুকুমার। তখন তার গলার স্বর হয়ে ওঠে শুদ্ধ নদীর জলের মতো। বলে, 'মাইন্ষের তলিয়ে যাবার গল্প বলতে ভাল লাগে না। তবুও শুনতে চাচ্ছেন যখন, শুনুন।'

বুদ্ধদেবকে কনকপ্রভার গল্প শোনাতে থাকে সুকুমার।

কনকপ্রভা হরবল্লভের ভাগনে প্রিয়ব্রত মহাপাত্রব স্ত্রী। সুদর্শন সিংহবাবুর একমাত্র মেয়ে এবং প্রিয়ব্রতর মা লাবণ্য হলেন হরবল্লভের জেঠতুত বোন। একটি কন্যা সন্তান রেখে আজ বছর দু'তিন গত হয়েছেন প্রিয়ব্রত। দীর্ঘকাল জেলে থাকবার দরুণ তাঁর ফুসফুস একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। ওঁর মেয়ে কুন্তীর বয়েস ষোল-সতের বেশি নয়।

দুটি গড় পাশাপাশি হলেও, কনকপ্রভার গড় তার জৌলুস হারিয়েছে অনেক আগেই, সুদর্শন সিংহবাবু মারা যাওয়ার পরপরই। শঙ্করপ্রসাদ, সুদর্শনের একমাত্র জামাই, ছিলেন চিরকালই আলাভোলা মানুষ। একমাত্র ছেলে প্রিয়ব্রত যখন স্বদেশী করতে গিয়ে জেলে চলে

গেল, মানুষটা একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন। সুদর্শন সিংহবাবুর দ্বিতীয়পক্ষ সরযুবালা ছিলেন ধীর-স্থির কিন্তু খুব শক্ত ধাতের মহিলা। লাবণ্যপ্রভা মায়ের মতো শান্ত হলেও বাপের কাঠিন্য পেয়েছিলেন চরিত্রে। এঁরা বেঁচে থাকতে সবকিছু তাও চলছিল মোটামুটি ঠিকঠাক। কিন্তু তাঁদের অবর্তমানে যেন সবকিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল। লাবণ্য তাঁর জীবিতকালে মসিয়াড়া থেকে আমদানি করেছিলেন তাঁর এক ভাসুর-পো নিকুঞ্জপতিকে। পুত্রশোকে এবং আরো নানাবিধ শোকে তাঁর তখন পাগল-পাগল অবস্থা। সে সময় নিকুঞ্জপতি ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসে। সে ছিল বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী। লাবণ্য বিশেষ আপত্তি করেন নি। এতবড় এস্টেট সামলাবার জন্য একজন করিতকর্মা পুরুষ-মানুষের প্রয়োজন ছিল মহাপাত্র-গড়ে। প্রিয়ব্রত যখন বাঁধগাবার আন্দোলনের পর দ্বিতীয় দফায় জেল খেটে ফিরলেন, তখন তাঁর শরীর একেবারেই ভেঙে পড়েছে। শরীরে বাসা বেঁধেছে হরেক কিসিমের ব্যাধি। সরযু এবং শঙ্করপ্রসাদ তখন গত হয়েছেন। ফলে প্রিয়ব্রত ফিরে আসার পরও নিকুঞ্জপতির আসনটি অটুট রইল। কিছুদিন বাদে আরও একজন ঢুকল মহাপাত্র-গড়ে। পান্নালাল। এখন সে নিকুঞ্জপতির বিশ্বস্ত সহকারী এবং মহাপাত্রগড়ের দু'নম্বর ব্যক্তি। প্রিয়ব্রত বেঁচে থাকতেই মহাপাত্রগড়ে ঢুকেছিল পান্নালাল। কুন্তীর গানের মাস্টার হিসাবে। বাপের বাড়ির শহর খড়্গপুর থেকেই ওকে আমদানি করেছিলেন কনকপ্রভা। সেই যে এল, আর ফিরে যায় নি। অপেরা দলে বিবেকের গান গেয়ে আঘাটায়-বেঘাটায় ঘুরে বেড়াত যে লোকটা, তার ঠাট-ঠমক এখন পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। সম্রাট ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে পাম্প-শ্যু,—সর্বদা ফুলবাবুটি। এখন যেমন-তেমন পোশাকে তার চলে না, মাছ-মাংস, মালাই-রাবড়ি ছাড়া রোচে না। সুকুমাররা ইলচি করে বলে, হব্যেক্ই তো। অনেক যদি মাছ পায়, বিড়ালেও কাঁটা বেছে খায়।

দুটি গড় পাশাপাশি এবং একই রকম দেখতে হলেও দু'গড়ের মধ্যে এখন বিত্তে-ঐশ্বর্যে, আভিজাত্যে, গুরুত্বে আসমান-জমিন ফারাক। যেমন শাঁখ আর গুগলি। আকারে এক হলেও প্রকারে এক নয়। জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদ হলেও হরবল্লভ সিংহবাবু তাঁর বুদ্ধি ও কৌশলের জোরে এখনও এলাকার অলিখিত জমিদার। তাঁর প্রতাপ সামান্যই কমেছে। তার ওপর এখনও অথর্ব হলেও বেঁচে রয়েছেন প্রতাপলাল। চোখে দেখেন না, কানে শোনেন না, হাঁটা চলা একেবারেই করতে পারেন না, কিন্তু তাঁর বুকের মধ্যে যে প্রাণযন্ত্রটি ধুকপুক করে চলেছে, এতেই এলাকার মানুষ সিংহগড়ের দিকে তাকিয়ে সম্ভ্রমে মাথা হেঁট করে। এখনও গাঁয়ে রাজপুরুষ এলে হরবল্লভের মহলেই ওঠেন। গাঁয়ের বিচার-আচার তো চিরকাল সিংহগড়েই হত, হরবল্লভ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুবাদে সে সব ব্যবস্থাদি আরও পোক্ত হয়েছে। অন্যদিকে কনকপ্রভার মহলে নিছক প্রমীলা-রাজত্ব। মা-মেয়েতে দু'জন বাকি যারা, নিকুঞ্জপতি, পান্নালাল, নেপাল ঝারমুনিয়া, ফকির কুচলান, নন্দ সরকার,— স উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। মহাপাত্রগড়ের অতীত আভিজাত্য, তার বর্তমান-ভবিষ্যত নিয়ে ওদের তিলমাত্র মাথাব্যথা নেই। ওরা সব সুখের পায়রা। এদের উৎসাহেই দিনরাত কনকপ্রভার গড়ে হরেক কিসিমের উৎসব, আমোদ-প্রমোদ, পান-ভোজন, দু'দিন অন্তর মহাসমারোহে ভ্রমণ-বিলাস।

প্রায় চল্লিশ ছুঁইছুঁই বয়েসেও কনকপ্রভা অসামান্যা সুন্দরী। যে কোনও কুড়ি-পঁচিশ বছরের যুবতীও বুঝি লজ্জা পাবে ওঁর সুমুখে। রূপের প্রশংসা শুনতে বড়ই ভালবাসেন কনকপ্রভা। প্রধানত এই একটা মন্ত্রেই লোকগুলো একেবারে বশ করে ফেলেছে ওঁকে।

সারাক্ষণ তোয়াজ করে, মাথাটি দিয়েছে একেবারে খারাপ করে। স্তব-স্তুতিতে স্বর্গের দেব-দেবীও তুষ্ট হয়ে বর দেন, কনকপ্রভা তো অসামান্য রূপের আড়ালে সামান্য এক নারী মাত্র। ফলে, প্রতি সন্ধ্যায়, হরবল্লভের বৈঠকখানায় যখন চায়ের আসর বসে, এলাকার বাছাবাছা মানুষেরা যখন চা খেতে খেতে আগামী দিনের সম্পত্তিরক্ষা এবং প্রজাশাসনের পদ্ধতি স্থির করতে করতে গুম মেরে যায়, কনকপ্রভার মহলে তখন নুপুর বেজে চলে চটুল লয়ে, গজল-ঠুংরির কলি ভেসে বেড়ায় নৈশবাতাসে যুঁই ফুলের মাতাল গন্ধের মতো। হরবল্লভের মহলের দিনভর পাষাণ-স্তব্ধতা, বারে বারে ভেঙে খানখান হয়ে যায়। তাঁর গড়ের অভিজাত দম-আটকান গুমোট পরিবেশ লঘু ও তরল হয়ে যায় কনকপ্রভার মহলের সুবাসে লেগে। হরবল্লভের গড়ের সামনে দিয়ে পথচলতি মানুষ যারা সসম্ভ্রমে পেরিয়ে যায়, তারাই কনকপ্রভার গড়ের সুমুখে এসে হঠাতই থমকে দাঁড়ায়। ভেতরমহলে সারাদিন, সারারাত জুড়ে জীবনকে উপভোগ করবার হাজার উপকরণ রচনার কাজ চলছে, মানুষজন মৌমাছির মতো গুনগুন স্বরে মধুচক্র রচনার কাজে মশগুল, পথচলতি মানুষ দু'দণ্ড খাড়া হয়ে তার স্বাদ নিতে চায় অজান্তে।

হরবল্লভ সিংহবাবুকে মাঝে মাঝেই ঐ মহলটার দিকে পলকহীন তাকিয়ে থাকতে দেখা যায়। তখন ভারি অন্যমনস্ক লাগে ওঁকে। জেঠতুতো বোনের ছেলে প্রিয়ব্রতর মুখখানা মনে পড়ে বুঝি। দু'মহলে দীর্ঘকাল মুখ দেখাদেখি না থাকলেও প্রিয়ব্রতকে বুঝি মনে মনে সামান্য অন্য চোখে দেখতেন হরবল্লভ। নীলরক্তের অধিকারী না হয়েও প্রিয়ব্রতর আপাত-শান্ত মুখে একধরনের দৃঢ়তার কাঠিন্য ছিল, হরবল্লভকে অবাক করেছিল সেটাই। শঙ্করপ্রসাদের মতো আলাভোলা মানুষের ঔরসে জন্মেও কেমন করে সে অর্জন করল এমন বজ্রের মতো দৃঢ়তা। হরবল্লভের স্থির বিশ্বাস, স্বদেশী, তে-ভাগা ইত্যাদিতে জীবনটাকে এমনভাবে বাজে খরচ না করলে প্রিয়ব্রত এস্টেট পরিচালনায় হরবল্লভকেও লজ্জা দিতেন। আজ তাঁর অবর্তমানে তাঁরই মহলে এসে ভীড় জমিয়েছে ছুঁচো-ইঁদুরের দল, তাদের চাল নেই, চুলো নেই, বংশমর্যাদা, অর্থকৌলিন্য কিছুই নেই। আর, ওদেরই ফাঁদে পড়ে গিয়েছেন প্রিয়ব্রতর সুন্দরী স্ত্রী। তারাই ওঁকে চালাচ্ছে, দোলাচ্ছে, এগিয়ে নিয়ে চলেছে, পায়ে পায়ে, অধঃপাতের দোরগোড়ায়। এখন পুরো মহলের অভিভাবক বলতে নিকুঞ্জপতি মহাপাত্র। কনকপ্রভার পুরো এস্টেটখানা চলে ওরই অঙ্গুলি হেলনে। জমিজিরেত, তালুক-মুলুকের আয়-ব্যয়, বেচা-কেনা সবই নিয়ন্ত্রণ করে সে। কনকপ্রভা ওর কথা ফেলতে পারেন না কিছুতেই।

মেয়েটাও মায়ের রূপ আর দেমাক পেয়েছে ষোল আনা। সতের বছরের কুন্তী যখন জরিপাড় শাড়ি পরে, পিঠময় এলোচুলের ঢল নামিয়ে তেতলার খোলা ছাদে পায়চারি করে, তখন ওর থেকে চোখ ফেরান দুষ্কর। বুদ্ধদেব বারকয়েক দেখেছে সেই ছড়িয়ে পড়া রূপ। তার শাঁখের মতো সাদা বাহুতে অস্তগামী সূর্যের আলো পড়ে যে মোহময়ী শ্রী ফোটে, তা দেখলে যে কোনও পুরুষের বুক অসাড় হয়ে যাবে। গোলাপী বেনারসীতে মোড়া একখানি টাটকা পদ্মফুল। বুদ্ধদেবের সঙ্গে ঐ তেতলার ছাদ থেকেই বারকয়েক চোখাচোখি হয়েছে কুন্তীর। দু'চোখে যে এমন সীমাহীন তাচ্ছিল্য ফোটান যায়, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। তারপর থেকে বুদ্ধদেব আর পারতপক্ষে তাকাতই না ওই তেতলার খোলাছাদের দিকে। কিন্তু কৌতূহলটাকে তো চেপে রাখাও যায় না। উঁচু পাঁচিলের অন্তরালে কী সব ক্রিয়াকাণ্ড চলে, সেটা জানতে ইচ্ছে করে ভীষণ।

দিনকয় আগে পদম পুকুরের পাড়ে হঠাৎ দেখা হয়েছিল নিকুঞ্জপতির সঙ্গে। বুদ্ধদেবকে দেখে আচমকা থমকে দাঁড়িয়েছিল নিকুঞ্জপতি।

বলেছিল, 'গ্রামসেবকবাবু কি আমাদ্যার সাথ কথাবার্তা বলবেন নাই?'

থতমত খায় বুদ্ধদেব, 'কেন?'

'কে জানে। কিছো অপ্রাধ হয়ত করেছি মনেব অগোচরে।'

'ছি, ছি, এমন বলবেন না।' বুদ্ধদেব লজ্জা পায়।

'মুৎসুদ্দিবাবু কত আসতেন।' নিকুঞ্জপতি দু'পা এগিয়ে আসে বুদ্ধদেবের দিকে, 'প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় গানের আসরে এসে গান শুনতেন। কত তারিফ করতেন কুন্তীর নাচ-গানের। বলতেন, ঢের ঢের উস্তাদ দেখ্যেছি, পান্নালালের মতো উস্তাদ এ যুগে বিরল। বড়ই সমঝদার মানুষ ছিলেন মুৎসুদ্দিবাবু। সঙ্গীত কাকে বলে, বুঝতেন।'

'তাই বুঝি!' বুদ্ধদেব চোখ নাচিয়ে বলে।

সেদিকে দৃকপাত করে না নিকুঞ্জপতি। বলে. 'আপনি তো কিছোই দেখলেন নাই, শুনলেন নাই। খালি সকাল-সইঞ্ঝ্যা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে টো-টো ঘুর্যে বেড়ান্।'

'সেটাই যে আমার কাজ নিকুঞ্জবাবু।' বুদ্ধদেব হাসে।

'আরে মশাই, কাজ কে নাই করে, এ দুনিয়ায়?' নিকুঞ্জপতি যেন সামান্য ক্ষুব্ধ, 'এ জগতে কর্ম বিহনে ত মুক্তি নাই। মুৎসুদ্দিবাবু কি কাজ করতেন নাই?'

সে কথার জবাব দেয় না বুদ্ধদেব। এমন কথার কোনও জবাব হয় না বুঝি। নিকুঞ্জপতি বলে, 'কনকবৌদি বলে, যে ফুর্তি করত্যে জানে না, সে কাজও করত্যে জানে না।'

এমন অপ্রত্যাশিত মন্তব্যে থতমত খায় বুদ্ধদেব। বলে, 'আপনার বৌদি কি আমার সম্পর্কেই বলছিলেন কথাটা?'

'ঠিক তা লয়—।' নিকুঞ্জপতি আমতা আমতা করতে থাকে, 'আসলে কনকবৌদি খুব আশা কচ্ছিলেন আপনিও মুৎসুদ্দিবাবুর মতন—। অন্তত উঁয়ার সাথে একটি বার দেখা করে আসাটা আপনার কতর্ব্য ছিল। হাজার হোক, উ মহলটাও ত সিংহগড়েরই অংশ।'

বুদ্ধদেব বোঝে, ওকে নিয়ে আলোচনা চলে কনকপ্রভার মহলে। মনে মনে ভারি অস্বস্তি বোধ করে সে।

বুদ্ধদেবের গা ঘেঁসে দাঁড়ায় নিকুঞ্জপতি। খুব ঘনিষ্ঠ আর আন্তরিক গলায় বলে, 'আজ সইঞ্ঝ্যায় আসুন না। কাঞ্জিলাল আঁইছে নাড়াজোল থিক্যে। কত বড় উস্তাদ! আজ জমজমাট আসর বসবেক।'

বুদ্ধদেব মৃদু হাসে। বলে, 'কথাটা কি জানেন নিকুঞ্জবাবু, সবার পেটে সবকিছু সয় না যে। কুকুরের পেটে কি ঘি সয়? গায়ের সব লোম উঠে যাবে না?'

বুদ্ধদেব পা বাড়ায়।

সুকুমার বলল, 'ভাবতে গেলেই ভারি কষ্ট হয়, বুঝলেন। অত বড় মহলটা এক্কেবারে ছারখার হইয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে।'

পাশে পাশে হাঁটছিল বুদ্ধদেব।

বলে, 'কিন্তু এই বিশাল খরচ আসছে কোত্থেকে?'

'জমি বিকছে। জমি-বাস্তু-পুকুর; ফি-হপ্তায় বিকে দিচ্ছে এন্তার। প্রায় জলের দামে কিনে লিচ্ছে এলাকার সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষ। গত পাঁচ বচ্ছরে প্রায় অর্ধেক সম্পত্তি কাবার।'

দু'চোখ কপালে উঠে যায় বুদ্ধদেবের। চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায়। সম্পত্তি বেচে ফূর্তি করছে! মনের এও কি এক বিকার!

ভাবতে ভাবতে কনকপ্রভাসংক্রান্ত পুরো ব্যাপারখানা একটু একটু করে একটা ছবি হয়ে ওঠে মনের মধ্যে। একখানা সংক্ষিপ্ত ছবি। দুটি পরমা সুন্দরীর গৌরবর্ণ নগ্ন শরীরে অসংখ্য জোঁক বসেছে। মহানন্দে চুষে নিচ্ছে আকণ্ঠ রক্তিম পানীয়। শরীরের কমনীয় ত্বক শক্ত ঠোঁটে চেপে ধরে ওরা অবিরাম চুষছে। শরীর জুড়ে দংশনের ক্ষত আর শোষনের যন্ত্রণায় ওদের আর্তনাদ তোলার কথা। কিন্তু কনকপ্রভা সেই যন্ত্রণায় হাসছেন। রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে যেতে যেতেও জোঁকগুলির শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করছেন। শরীরের যন্ত্রণা যত তীব্র হচ্ছে, মুখ দিয়ে ততই বেরিয়ে আসছে ঝলকে ঝলকে বিষাক্ত হাসি। অবিরাম রক্তক্ষরণের যন্ত্রণাকে তাবিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন কনকপ্রভা।

এও এক সুখ। এও এক শৃঙ্গার। জাটিংগা নামে বুদ্ধদেব একজাতের পাখির কথা জানে, যারা আগুনের বুকে মহোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে দলে দলে, কেবলমাত্র আত্মহত্যার আনন্দে। সেই দহন-আনন্দ থেকে তাদের কিছুতেই নিবৃত্ত করা যায় না।

কনকপ্রভাকে সেই জাতের এক পাখি বলে মনে হয়।

ভারতবর্ষ গ্রামেই বাস করে

জিয়োন গাছটাকে কেটে ফেলবার চক্রান্ত চলছিল অনেকদিন। বুদ্ধদেব সেটা জেনেছিল অনেক পরে। রাঢ়ভূমির সঙ্গে তার সম্যক পরিচয় ঘটবার অনেক পরের কথা সে-সব। তখন এই রাঢ় ভূমির প্রকৃতি ও মানুষকে সে একটু একটু করে চিনছে। বুঝছে।

এই প্রকৃতির বুকে যেদিন অভিষেক ঘটেছিল বুদ্ধদেবের, সারা চোখে ছিল অতল্যান্ত বিস্ময়, তখনও এই জিয়োন গাছটার সন্ধান পায় নি সে। তখনও অবধি পাগল শিকারির সঙ্গে আলাপই হয় নি তার। তখন কেবল সুকুমার আচার্য, তিলক বাউরি, হঠাৎ মুর্মু, আর অনাথবন্ধুর সঙ্গে পরিচয়। এমন কি পরীক্ষিত বাউরি অথবা ওর মেয়ে অগ্নিকেও চাক্ষুষ করে নি বুদ্ধদেব। তখন হরবল্লভ সিংহবাবুর বড়ছেলে প্রভঞ্জন ওকে পাকেপাকে জড়িয়ে চলেছে।

সুকুমার আচার্যর সঙ্গে প্রথম আলাপটা সুখকর হয়নি। গ্রামপরিক্রমায় বেরিয়ে ছিল বুদ্ধদেব। আচমকা পথ-চলতি সুকুমার আচার্যর সঙ্গে মুখোমুখি। সঙ্গে ছিল মকবুল। বুদ্ধদেব তখন চারপাশের সবকিছুকে বুঝছিল, চিনছিল। গাঁয়ের নামখানা ভারি অদ্ভুত। চুয়ামসিনা। গাঁয়ের মধ্যে খানপাঁচেক পাড়া। গাঁয়ের বাইরে বাউরি, বাগদি, শিকারি, লোহারদের পাড়া, ছড়িয়ে ছিটিয়ে। দু'পাড়ার মধ্যিখানে একখানা করে মাকড়া পাথরের ধুতমা ডাঙা। কিন্তু চুয়ামসিনার মানে কি?

সেদিন ব্লক অফিসে পঞ্চায়েত অফিসার কৃষ্ণ নাগ এক ধরনের ব্যাখ্যা দিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা শিকার করে ফেরার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন এক গাঁয়ের কিনারে এসে। একটা বিকট ঝাঁঝাল গন্ধ মুহুর্মুহু ধাক্কা মারে নাকে। তাঁর রাজ্যে এমন উৎকট গন্ধ কিসের? ঘোড়া থেকে নামলেন রাজা, দাঁড়ালেন গাছের ছায়ায়, গন্ধের উৎস খুঁজতে পাঠালেন পাইক-বরকন্দাজদের। খানিকবাদে গাঁয়ের ভেতর থেকে ফিরে এল ওরা। সঙ্গে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। হুজুর, এই বামুনের পাকশাল থিকেই গন্ধটা আঁইছে। ব্রাহ্মণ তখন ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল। জোড়হস্তে বলে, মহারাজ, আমরা নিতান্তই গরীব। সকাল বেলায় আমার বউ রান্না চাপিয়েছে বাচ্চাদের জন্য। কাল সারারাত বাচ্চাগুলান কিছু খায় নি হুজুর।

—কি রান্না চাপিয়েছে তোমার বউ? এমন দুর্গন্ধ কেন?

—হুজুর, আমরা তো গরীব, চাল-টাল পাই কোথায়? বউ তাই মাটির কড়াইতে মসিনা বীজের তেল চাপিয়ে পুকুরপাড়ে শাক তুলতে গিয়েছিল। ফিরতে দেরি হয়েছিল তার। সেই ফাঁকে মসিনার তেল পুড়ে চুঁয়ে গিয়েছে। সেই চুঁয়ে যাওয়া মসিনার তেল থেকেই এমন গন্ধ ছড়িয়েছে। বলতে বলতে ভয়ে-ভক্তিতে কেঁদে ফেলে ব্রাহ্মণ। বলে, প্রভুর আতরের আঘ্রাণ নেওয়া নাকে এই দুর্গন্ধ ঢুকে না জানি কত কষ্টই দিয়েছে। আমার বউয়ের অপরাধ মার্জনা করে দিন, হুজুর।

রাজা বিস্মিত, ব্যথিত। এমন গরীব ব্রাহ্মণও আমার রাজ্যে রয়েছে। তক্ষুনি তিনি ব্রাহ্মণকে দান করলেন একটি তালুক। আর, ঐ গ্রাম থেকে চুঁয়ে যাওয়া মসিনা তেলের গন্ধ পাচ্ছিলেন বলে গ্রামটির নাম দিলেন চুঁয়ামসিনা।

ঐ ব্রাহ্মণ-বংশই হল বর্তমানের সিংহবাবু বংশ। এখন ওদের দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

ত্রিভঙ্গ তো শুনে হেসেই খুন। বলে, কৃষ্ণদা ঐ রকমই। বানিয়ে গল্প বলতে ওর জুড়ি নেই। আসলে, বিষ্ণুপুর রাজাদের সৈন্যরা বিভিন্ন চৌকিতে থেকে পাহারা দিত। সারা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিল তেমন অনেক চৌকি। বিভিন্ন চৌকিতে সৈন্যসংখ্যা ছিল বিভিন্ন রকম। এখানে ছিল রাজার চুয়ান্ন-সেনার চৌকি। চুয়ান্ন-সেনা থেকে কালক্রমে চুয়ামসিনা। ব্যাখ্যাটা মনে ধরে বুদ্ধদেবের। কৃষ্ণ নাগের গল্পটি এখন নিছক হাসির উদ্রেক ঘটায়। এইভাবেই বুঝি পৃথিবীতে কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়।

সামনেই বিশাল ডিহি, জমাট মাকড়াপাথরের ঢেউখেলানো ভুঁই। এখানে ওখানে লিউলি আর চাকুন্দার ঝোপ। বনলঙ্কার গাছ জ্বলে গিয়েছে রোদ্দুরে। দু'একটা বিবর্ণ খেজুর-ঝোড়, আর গেরুয়া রঙের টিকরা ছাড়া সারা ডিহি জুড়ে প্রায় খাঁ-খাঁ শূন্যতা। ডিহির ওপারে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলটা পূব দিক থেকে ঘুরে উত্তরে চলে গেছে। বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত। দক্ষিণে ও পশ্চিমে। পশ্চিমের জমিগুলো শোল-জমি। জমির ওপারে হরিণমুড়ি খাল। ক্ষেতের মাঝে মাঝে দু'চারটে গাঁ-ছাড়া দীঘি, এদেশে বলে 'বাঁধ'। অধিকাংশই মজে এসেছে। চারপাড়ে ঘন গাছ-গাছালি। রাতের বেলায় মনে হয় একটি বিশালকায় কালির ছোপ। পুকুর-দীঘি এই রাঢ়ভূমিতে কম। মাকড়াপাথর ফাটিয়ে দীঘি বানানো সহজ নয়।

বুদ্ধদেব ঘুরে ঘুরে দেখছিল চারপাশের রুক্ষ্ম প্রকৃতি। তখন আন্দাজ দু'ঘড়ি বেলা। ডালে-পালায় ঝলমলে রোদ্দুর। অল্প তফাতে, রাস্তার ধারে গোটা দুই জাম গাছ। কচি তামাটে রঙের পাতায় ভরে গেছে গাছগুলো। পাতার গায়ে রোদ্দুর খেলছে ঝিকমিকিয়ে। আচমকা হুলের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল বুদ্ধদেব।

সুকুমারের মুখের মধ্যে জিভ নামে যে প্রত্যঙ্গটি রয়েছে তার বহুমুখী ভূমিকা। কখনো কথা বলে, কখনো হুল ফোটায়, কখনো মধু ঝরায়। বুদ্ধদেবকে প্রথম দর্শনেই হুল ফুটিয়েছিল সুকুমার আচার্য। একেবারে মুখোমুখি দেখা। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট, বেশ পুরুষালি চেহারা, বিশাল টাঙির মতো একজোড়া গোঁফ। সারা মুখে বিদ্রূপ ফোটাবার বেলায় সেই গোঁফ-জোড়া নাচতে থাকে। সারা শরীরে এক ধরনের রুক্ষ্মতা। কেবল চোখদুটি খুব অন্তর্ভেদী উজ্জ্বল।

সুকুমারের সঙ্গে হঠাৎ মুর্মু আর মকবুল। 'অধমের নাম সুকুমার আচার্য, বিখ্যাত আচার্য বংশের সর্বকনিষ্ঠ কুলাঙ্গার, আপনিই তো নূতন গ্রামসেবকবাবু?' বলে শুরু করে ও

দ্রুত চলে গিয়েছিল বুদ্ধদেবের আস্তানা প্রসঙ্গে, 'হরবল্লভের খুঁয়াড়েই আছেন তো?' বুদ্ধদেব মাথা দুলিয়ে সায় দিতেই চোখদুটোকে দ্রুত পিচকিরি বানিয়ে ফেলে সুকুমার। ঐ পিচকিরি দিয়ে তীব্র শ্লেষ ছিটোতে ছিটোতে বলে, 'হাঁ—আপনি তো সরকারি সম্পত্তি। সিংহগড় ছাড়া সরকারি সম্পত্তি আর কুথা থাইক্‌বেক?' পিচকিরির ঝাঁঝাল রঙে তখন জেরবার বুদ্ধদেব। অপমানে সারা শরীরে তীব্রজ্বালা। পরবর্ত্তীকালে, জ্বালা-যন্ত্রণা সামান্য কমতেই বুদ্ধদেবের মনে হয়েছিল, শুনতে খারাপ লাগলেও সুকুমার তেমন অন্যায় কিছু বলে নি। এ ক'দিনেই সে বুঝেছে, সিংহগড়ই এই এলাকার শক্তিকেন্দ্র এবং প্রশাসনের সর্বকনিষ্ঠ সংস্করণ।

সিংহগড়ের সদর মহলে ছোটবড় মাঝারি মিলে ঘরের সংখ্যা সাকুল্যে খানবিশেক। ঘুরে ঘুরে ঘরগুলো দেখেছে বুদ্ধদেব। কেবল পূবে আর উত্তরে সারবন্দী ঘর, সামনে দিয়ে টানা বারান্দা, সামনের বিশাল উঠোন থেকে প্রায় চার-পাঁচ ফুট উঁচুতে। অধিকাংশ ঘরই আর নিজেদের জন্য ব্যবহার হয় না ইদানিং। কেবল উত্তরের দুটি ঘরে হরবল্লভ সিংহবাবুর বৈঠকখানা ও কাচারি। একটিতে থাকে এস্টেট-ম্যানেজার রতিকান্ত। দুটো ঘর অতিথিদের জন্য বরাদ্দ। একটি ঘরে পুরোনো আমলের জমিদারী সেরেস্তার স্তূপীকৃত কাগজপত্র ডাঁই করে রাখা রয়েছে। পশ্চিমমুখো ঘরগুলোর একটাতে সিংহবাবুদের নিজস্ব তৈজসপত্র, সাজসরঞ্জাম, হ্যাজাক, ডে-লাইট, সামিয়ানা, শতরঞ্জি ইত্যাদি থাকে। একটিতে থাকে সরকারী সার, ধইঞ্চার বীজ, সরকার প্রদত্ত বিলিতি লাঙ্গল। ঠিক তার পাশের ঘরটাতে রিলিফের গম, পাউডার দুধ, ধুতি-শাড়ি-কম্বল, নাইট স্কুলের শ্লেটখড়ি, বইখাতা ইত্যাদি। উত্তর দিকের একেবারে শেষ প্রান্তে পরপর পাঁচটি ঘরের একটিতে ডাকঘর, অন্যটিতে চ্যারিটেব্‌ল্ ডিসপেনসারি, তৃতীয়টিতে 'অবলা মুক্তি সমিতির' অফিস ঘর, চতুর্থটিতে থাকেন পোস্টমাস্টার মশাই এবং পঞ্চম ঘরখানাতেই হয়েছে বুদ্ধদেবের থাকবার ব্যবস্থা। বাকি ঘরগুলি সংবৎসব তালাবন্ধ থাকে। বাবুদের কাজেকর্মে, উৎসব-পার্বনে, বিয়ে-সাদিতে যখন অতিথি-অভ্যাগতদের ভিড় বাড়ে, তখনই ঐ ঘরগুলো ব্যবহার করা হয়।

পাশে দাঁড়িয়ে বেঁটেখাটো মকবুল হাসছিল। একসময় সুকুমারকেই ধমক দেয় সে, সুকুমারদা থাম। গেরামসেবকবাবু রেইগে কাঁই হচ্ছেন। বুদ্ধদেবের দিকে সন্ধিস্থাপনের ভঙ্গিতে তাকিয়েছিল, সুকুমারদার কথা মনে লিবেন নাই। মানুষকে রাগাতে ভালবাসে। পরবর্তীকালে অনাথবন্ধুও বলেছিলেন, সুকুমারটা এরকমই। মুখটা খারাপ, তবে মনটা ভাল। সুকুমার নিজেও স্বীকার করেছিল, সুকুমার আচায্যিব কথা মনে লিবেন নাই আইজ্ঞা। দুড়ুম-দুড়ুম কথা কই বলে সারা তল্লাটে আমার বদনাম। বুদ্ধদেবও তো ভেতরে ভেতরে সন্ধিস্থাপনে আগ্রহী ছিল। তার বুক থেকে তো বারবার উঠে আসছিল একটিই সতর্কবাণী : এদের সঙ্গেই তোমার কাজ। এদের সবাইয়ের জন্যই তোমার আসা। এদের সব্বাইকে নিয়েই চলতে হবে তোমাকে। কোনও কারণে কাউকে এড়িয়ে যাওয়া মানেই, দূরত্ব একটুখানি বেড়ে যাওয়া।

মকবুলই সেদিন জ্বলন্ত অগ্নিতে জল ঢেলেছিল। বেঁটে-খাটো ছোকরা, গায়ের রঙ ঘোর কালো, বেশ পেটাই শরীর। দু'চোখে শিশুর সরলতা। বলেছিল সুকুমারকে, তুমি ত বলেই খালাস, অমন অজ গেরামে চাকরি কইর্‌তে এসে কুথায় থাইক্‌বেক মানুষ? ইখ্যেনে তো আর ঘরভাড়া মিলে না।

—আরে, সেই কথাই ত বইলছি। সুকুমার গোঁফ নাচায়, সিংহগড়ই ত এ তল্লাটের সরকারি গুদামখানা।

পরে, ওখানে থাকতে থাকতেই আরও একটি সত্য বুঝেছিল বুদ্ধদেব। ওকে থাকতে দেবার মতো একখানা বাড়তি কুঠরি যে এলাকার কারোরই ছিল না তা নয়। কিন্তু কেউ সাহস পায় না। সরকারি মানুষজন সিংহগড়েই থাকবে, এটাই চিরকালের রেওয়াজ। সে রেওয়াজ ভাঙবে, সিংহগড়ের চিরাচরিত সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে, এতখানি সাহস কার! নিজস্ব সম্পত্তি থেকে সিংহবাবুদের বেদখল করবার মতো ব্যাপার হবে সেটা।

সরকারি কর্মচারীদের সম্পর্কে সুকুমার যে অমন তাৎক্ষণিক ভাবে নির্মম, প্রসঙ্গ উঠলে প্রায়শই শিষ্টতার মাত্রা অতিক্রম করে যায়, তার পেছনেও সঙ্গত কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ, আগের গ্রামসেবক মুৎসুদ্দিবাবু। সেও সিংহগড়ে থাকত। সরকারি কাজকর্মের চেয়ে সিংহগড়ের পারিবারিক কাজকর্মেই তার উৎসাহ ছিল বেশি। সে দেবিদাস আর উমাকে পড়াত, সিংহগড়ের উৎসব-পার্বনে জান ফাটিয়ে খাটত। দাদন-বিলির সময় খাতাপত্তর নিয়ে বসত। এলাকায় ঘুরে ঘুরে হরবল্লভের দাদন-কর্জ আদায় করত। মাঝে মধ্যে হরবল্লভের আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি গিয়ে তত্ত্ব-তালাশ নিয়ে আসত। সে ছিল হরবল্লভেরই একখানি প্রত্যঙ্গ। বুদ্ধদেবের জন্য যা কিছু লজ্জা গ্লানি সে তিলতিল জমিয়ে রেখে গেছে এই এলাকার অগণিত সাধারণ মানুষের মধ্যে। সুকুমার মাঝে মধ্যে সেটা প্রকাশ করে দেয় মাত্র।

পুবের পাড়াটা শালকাঁকি। ডিহির একেবারে মধ্যিখানে। ডিহির ওপারে জয়রামপুর। পাশাপাশি গাঁ মেটেপোতান। উত্তরে, খানিক দূরে, লোখেশোল। তার পাশেই, জমজ ভাইয়ের মতো, ঘাঁটাড়মাথা। পশ্চিমে মেটালতোড়া। দক্ষিণ-পশ্চিমে, ঐ দূরে পরপর তিনখানা গ্রাম, লায়েকবাঁধ, অর্জুনপুর, বৈদ্যা। দক্ষিণে হরিণমুড়ি খাল। খাল পেরোলে বিশাল ক্ষেত, তার ওপারে রাধানগর, বর্ধিষ্ণু গাঁ। পুব আর উত্তর ঘুরে শালমহুয়ার জঙ্গলটা চলে গেছে বহুদূরে। বত্রিশভাগী, পাথরমৌড়া হয়ে একেবারে ধনশিমলার জঙ্গলের সঙ্গে তার যোগ। ধনশিমলার জঙ্গল আবার মিশেছে সোনামুখির জঙ্গলের সঙ্গে। সব মিলিয়ে এ এক বিশাল ধারাবাহিক অরণ্যের পাঁচিল।

হরিণমুড়ি খাল, রাঢ়ের মানুষ খালকে বলে 'জোড়', এখন, এই প্রখর গ্রীষ্মে হরিণমুড়ি জোড়ে জল নেই বললেই চলে। কেবল মাঝ বরাবর চিকন সুতোর মতো চিরিয়ে বয়ে যায় জল। বাঁকের মুখগুলোতে সামান্য দহ, সেখানে অবশ্য জলের পরিমাণ সামান্য বেশি। কিন্তু বর্ষাকালে হরিণমুড়ি টই-টম্বুর ভরে যায়। গভীর করে কাটালে চাষবাস হতে পারে শীতে। কিন্তু সুকুমার আচার্য কথাটা শোনামাত্রই চোখদুটোকে পিচকিরি বানিয়ে ফেলেছিল, 'হবেক নাই ক্যানে?' সুকুমার হাসে, 'তবে এ এলাকায় শীতের চাষ হয় না।'

রবি মরসুমে ধানচাষের রীতি এখনও চালু হয়নি এসব এলাকায়। কিন্তু এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে।

'হয় না বলে তো আর থেমে থাকলে চলবে না।' বুদ্ধদেব বলে, 'আজ হয় না, কাল হবে।'

'কালও হবেক নাই।'

'কাল না হয়, পরশু হবে।'

'পরশুও হবেক নাই।'

বুদ্ধদেব সুকুমারের চোখে চোখ রাখে। পড়তে চায় ওর মনের ভাষা।

'হবে না কেন?'

সুকুমারের সারামুখ সূক্ষ্ম হাসিতে ভরে যায়। বলে, 'সিট্যা বাখান করে বলা যায়, তবে পরের মুখে ঝাল খেয়ে লাভ কি? রোগটাকে নিজেই চিনুন। তবে বুঝি ডাক্তার!'

শালকাঁকির বাউরিপাড়ায় যখন পৌঁছুল ওরা তখন রোদের তাত বেড়েছে।

ভাঙাচোরা কুঁড়েঘর সব। সামনের উঠোনে চরে বেড়াচ্ছে মুরগীর পাল। ঘুরে বেড়াচ্ছে শুয়োর। হাড় জিরজিরে বাচ্চাগুলো ধুলোবালি মেখেছে সর্বাঙ্গে। ময়লা ছেঁড়া কাপড় শুকোচ্ছে বেড়ার গায়ে। খুঁটিতে শেকল দিয়ে বাঁধা একটা বেজি ঘুরে বেড়াচ্ছে উঠোনময়। খুঁটে খুঁটে কিছু খাচ্ছে। সব মিলিয়ে পরিবেশটা অপরিচ্ছন্ন।

শুধু তিলকদের বাড়িই নয়, পুরো পাড়াটাই, চারপাশে বড়ই দৈন্যদশা, সর্বত্রই বড় ছন্নছাড়া জরাজীর্ণ ছবি। ছেঁড়াফাঁড়া কাপড়ের মতো শ্রীহীন ও ময়লা। সুকুমার বলেছিল, অকল্পনীয় অভাব এদের, সর্বক্ষণ নিদারুণ অনটন। তিলক বাউরি শুনে চমকে ওঠার ভাব করেছিল। অভাব? আমাদ্যাব তো অভাব বলতে, ভাদ্দর থিক্যে ফিরতি আষাঢ়তক্ক কঁটা মাস্তর মাস। তারপর, শাঁওন মাসে, তাল পাকবেক, তখন কুড়াব আর খাব। বুদ্ধদেবের সারা শরীর শিরশির করে উঠেছিল। না, অভাবের তীব্রতা শুনে নয়, অভাবটাকে ব্যাখ্যা করবার ধরনে। তিলক বাউরিব বয়েস নিতান্তই কম। বাইশ-তেইশের বেশি নয়। তারও খুব পুরুষালি, পেটাই চেহারা, একমাথা ঝাঁকড়া চুল, সুকুমারের মতো সেও তির্যকে কথা বলে, কিন্তু সুকুমারের শ্লেষে হুল থাকে, বিষ থাকে, ওর কথায় আচমকা বুকের মধ্যে বিষ-জ্বলন, কিন্তু তিলক বাউবিব শ্লেষ এমন নির্বিকার, এমন নৈর্ব্যক্তিক, শোনার পব মর্মোদ্ধার করতে সময় নেয় বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই শিউরে উঠতে হয়। এই হল তিলক বাউরি। একেবারে প্রথম দিন আলাপ হওয়ার মুহূর্তেই তো ওকে দেখে শিউরে উঠেছিল বুদ্ধদেব।

শক্ত সুঠাম দুই বাহুতে দগদগে ঘা। উদোম পিঠের মধ্যিখানেও গভীর ক্ষত। বুদ্ধদেবের পরিচয় পেয়ে বিস্ময় বেড়ে যায় ওর চোখে। তার সঙ্গে ভয়ও। বিস্ময়ের কারণ, এমন ছেলেমানুষ গ্রামসেবক সে আগে দেখে নি। তার ওপব 'গ্রামসেবকবাবু' হয়ে তিনি সুকুমার আচার্যর সঙ্গে ঘুবে বেড়াচ্ছেন, এও এক আচানক ব্যাপার। ভয়ের কথা, কেন না তিনি আগ্ বাড়িয়ে হাজির হয়েছেন বাউরিপাড়ায়, যেখানে বাবুলোকবা মূলত তিনটি কারণে আসেন। এক, যে কোনও অছিলায় জুলুম করতে, দুই, মুরগী-মদ ইত্যাদির সন্ধানে, তিন, বাউরিদের ডাগর মেয়েগুলিকে চাখতে। আর আসেন বিষ্টুপুব থানা থেকে পুলুশ। তাবা আসে মূলত বাতে-ভিতে দাগী আসামীর তল্লাসে কিংবা এলাকাব বাবুদেব অঙ্গুলি হেলনে কোনও বাউবির পাছায় হুড়কা সেঁধাতে। আব এসেছিলেন বাবুরা, বার-দুই, দল বেঁধে ভোট চাইতে। সেও প্রায় বছরকয় আগে। অপিসাব মানুষ হয়ে বাউরিপাড়ায় এসেছেন, এটা তিলকেব পবিচিত দৃশ্যের মধ্যে পড়ে না। এর আগে যিনি গ্রামসেবক ছিলেন, মুৎসুদ্দিবাবু, বেশ বয়স্ক, নাদুস নুদুস চেহারা, কথাবার্তা বলতেন কম, যাওবা বলতেন, ভদ্দর-সজ্জনদের সঙ্গে। সারা দিনমান সিংহবাবুর পিছু পিছু এখানে ওখানে যেতেন। বাউরি-বাগদি, ছোটলোকদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতেন সর্বদাই। এ গ্রামসেবকবাবুটি বোধ লেয় দৈত্যকুলে প্রহলাদ!

সে সব প্রথম দিনের কথা। ছেঁড়া গোছের দড়ির খাটিয়াখানা উঠোনে নিমগাছের তলায় পাতা ছিল। ওতে গ্রামসেবকবাবুকে বসতে বলা ঠিক হবে কিনা সেটাই ভাবছিল তিলক। বুদ্ধদেবই আগ বাড়িয়ে এগিয়ে যায়। তিলক বসে বসে ডাংজাল বুনছিল। বুদ্ধদেবদের দেখে নামিয়ে রেখেছে পাশে। মকবুল তুলে নেয় জালখানা। বুনতে থাকে আপনমনে। এতক্ষণে

বুদ্ধদেব বুঝেছে, মকবুল ছেলেটি খুবই সরল, সাদাসিধে, আর কথা বলে খুবই সামান্য। তিলকের পিঠের দগদগে ক্ষতগুলোর থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছিল না বুদ্ধদেব। বলে, 'গায়ের ঘা'গুলো কিসের?'

আশ্চর্য মমতার হাসি হাসে সুকুমার আচার্য।

বলে, 'চুয়ামসিনায় বাবা কপিলেশ্বরের গাজন হয়। তাতে 'বানফুঁড়া' হয়। গেল-চড়কে তিলক বান ফুঁড়িয়েছিল্যাক।'

বুদ্ধদেবও নিজের এলাকায় চড়ক দেখেছে। একটি উচুঁ পোতের মাথায় আড়াআড়ি কাঠ বাঁধা থাকে। ঐ কাঠের সঙ্গে নিজেকে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে উড়তে থাকে ভক্তারা। কিন্তু চড়ক উপলক্ষে এমন নির্মমভাবে নিজের শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করতে দেখে নি সে।

সুকুমার প্রাঞ্জল করে বোঝায়।

চড়কের দিন এ তল্লাটের বহু মানুষ ভয়ে-ভক্তিতে কিংবা মানসিক শোধ করতে 'বানফুঁড়া'য় সামিল হয়। দু'বাহুতে, পিঠে, জিভে, লোহার শিক ঢুকিয়ে উদ্দাম নাচে। ঝরঝরিয়ে রক্ত পড়ে, পিঠ থেকে ঠিক ঘামের মতো ঝরে পড়ে রক্ত। ঐ অবস্থায় নাচতে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। তিলক বান ফুঁড়িয়েছিল মানসিক শোধ করতে। নিদারুণ পেটের যন্ত্রণায় দীর্ঘদিন কষ্ট পাচ্ছিল বেচারা। ওঝা-গুণিন-কোবরাজ অনেক কিছুই করেও ফল পায় নি। পঞ্চজনার পরামর্শে বাবা কপিলেশ্বরের থানে হত্যে দিল। তৃতীয় রাতে বাবা দিলেন স্বপ্নাদেশ।

এই অবধি শুনে বুদ্ধদেব ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলে তুমি? আমি বলছি, বাবা তোমাকে সরাসরি বলল যে গাজনে বান ফোঁড়ালে পেটের ব্যথা সেরে যাবে? তুমি নিজের কানে শুনলে সেই কথা? তিলক মিটিমিটি হাসছিল। বলে, 'আদেশ না পেইলে শুধুমুদু ঘা করি শরীলে? এর পরে তিলক বিতাং করে শুনিয়েছিল স্বপ্নাদেশের ইতিবৃত্ত।

তিনদিন, তিনরাত নির্জলা উপোস। সারা শরীর শিথিল। তিরতিরিয়ে কাঁপে। আর, হত্যে মানে তো সাষ্টাঙ্গে শুয়ে শুয়ে সারাক্ষণ ঠাকুরকে ডাকা, হে ঠাকুর, আমার পেট গুগ্‌গুলিটা সারাঁই দে বাপ। আর, তিলকের মতে, মনপ্রাণ ঢেলে হত্যে দিলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বাড়ি-ঘর, সমাজ-সংসার, আত্মীয়পরিজন, ফিকে হয়ে যায় সবকিছু। তখন দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, শুধু ঠাকুর আর নিজের পেটের মধ্যেকার যন্ত্রণা, এ দুয়ের বাইরে আর কিছুই থাকে না। তখন ঐ দুয়ের ভাবনাতেই চব্বিশ ঘন্টা ডুবে থাকে মানুষ। যে মুহূর্তে স্বপ্নাদেশ পেল তিলক বাউরি, তিলকের মতে, তখন তো রাতের শেষ প্রহর, চারপাশ শুনশান, ধরিত্রী নিথর, আর, ক্ষিদে-তেষ্টায়, অবসাদে, শরীর শিথিল, মস্তিষ্কে ভোঁ ভোঁ অসাড়তা, ঐ অবস্থায় চোখ মুদে শুধু কায়মনোবাক্যে ঠাকুরকে ডাকতে থাকা, ঘন্টার পর ঘন্টা। চোখ মুদে শুয়ে থাকলে, ঐ শিথিল শরীরে, অসাড় মস্তিষ্কে, মাঝে মাঝেই তন্দ্রা, ঘুম....। জেগে থাকতে থাকতেই নিজের অজান্তে ঘুমের রাজ্যে ঢুকে পড়া। নিদ্রা আর জাগরণের তফাতটা ফিকে হয়ে আসে। এই মনে হয়, ঘুমিয়ে আছি, এই মনে হয় জেগে আছি, বাড়িতে আছি, ঘুরছি, ফিরছি.....। আবার ঘুমন্ত অবস্থায় মনে হয়, জেগে আছি, পেটের যন্ত্রণায় বড় কাতরাচ্ছি, উঠোনে গড়াগড়ি খাচ্ছি, অকস্মাৎ বাবা কপিলেশ্বর এলেন, কপালে চাঁদ আর গলায় সাপ ঝুলিয়ে, যেমনটি দেখা যায় ছাপা ছবিতে, বললেন, শুন্ রে তিলক, বহুৎ কষ্ট পাচ্ছু তুই, আমার গাজনে বাণ ফুঁড়াবি, ভাল হয়ে যাবি। বলেই তিনি ত উধাও হয়ে গেলেন। তিলকের তো মনে বড়ই পুলক। পাড়াময় দৌড়ে দৌড়ে সব্বাইকে বলে কথাটা। আচমকা দাবনায় জ্বালা করছে, বেশ তীব্র বিষজ্বলন,

ধীরে ধীরে চোখ খুলে, দাবনায় হাত চাপড়ে বিষ-পিঁপড়াটাকে দু'আঙুলের ফাঁকে চিমটে ধরে।

'তার মানে স্বপ্নই দেখছিলে অতক্ষণ!'

'ঐ যে বললুম....স্বপন আর জাগরণের মধ্যবর্তী অবস্থা...কপাটি খেলার পারা আইজ্ঞা, এ একবার উয়াকে ছুঁয়ে দেয়, উ একথার তাকে, দু'পক্ষের ছুঁয়াছুঁয়ি চলতেই থাকে।'

তিলক বাউরির কথাগুলো বুদ্ধদেবকে তাৎক্ষণিকভাবে শিউরে দেয়। কোন্ ভূমি থেকে উপমাখানা খুঁটে তুলল সে। কপাটি খেলায় যেমন দু'পক্ষই দু'পক্ষকে ছুঁয়ে দিতে থাকে যখন-তখন। আসলে কপাটি খেলাটাই তাই। দু'পক্ষেরই একে অপরকে ছুঁয়ে ফেলা। কিন্তু তিলক বাউরি হত্যে দেবার কালে নিদ্রা-জাগরণ পর্যায়টিকে বোঝাতে গিয়ে যে আচমকা এমন একখানি উপমা সংগ্রহ করে ফেলবে তা বুদ্ধদেবের কল্পনাতেও ছিল না। সেই থেকেই তিলক বাউরির প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ে সে।

তিলক বলে, 'তবে, মনে লেয়, উট্যা স্বপ্নই।' এরপরই তিলকের ঠোঁটের ডগায় চাপা অবিশ্বাসী হাসি, 'ঠাকুর কি আর সরাসরি এসে খাড়া হবেক মাইন্ষের সুমুখে?'

অনেকপরে, যখন তিলকের সঙ্গে বুদ্ধদেবের তেমনই সম্পর্ক, যেমনটি হলে যে কোনও মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের জায়গাটিতেও খোঁচা দেওয়া যায় অনায়াসে, বুদ্ধদেব বলেছিল, 'আমি যদি বলি, ঐ র'ম অবসন্ন শরীরে, শিথিল স্নায়ুতে, অসাড় মস্তিকে, নিজের ব্যাকুল প্রার্থনাটি স্বপ্ন হয়ে ফিরে এসেছে ! এমনটা তো হয়ই, যা নিয়ে খুব ভাবি, তাই নিয়ে স্বপ্ন দেখি বাতে। আর ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল থাকলে তো কথাই নেই।'

তিলক খুব অচেনা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, 'সিট্যা আপনি বলতে পারেন।' তিলকের গলায় এমন কিছু ছিল, যা শুনে বুদ্ধদেব নিশ্চিত হয়েছিল, তেমন সম্ভাবনাকে অনুমোদনই করল তিলক। সম্ভবত, তারও পরবর্তীকালে এমন বিশ্বাস জন্মেছে যে, সেদিনের স্বপ্নটা এবং স্বপ্নের মধ্যে বিরাজমান ঠাকুবটিকে সৃষ্টি করেছিল তারই দুর্বল, শিথিল মন ও মগজ। স্বপ্নাদেশের স্রষ্টা সে নিজে। এটাও বুদ্ধদেবেব কাছে কম বিস্ময়কর নয়। প্রবল কুসংস্কারের মধ্যেও একটি সচেতন মন কোথায়, কত তলায় কাজ করে চলেছে নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে, অতি সন্তর্পণে মুখখানি দেখাতে চায় সে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনেব বদ্ধ, পচা অন্ধকাব সেই মুখখানিকে নিঃশেষে ঢেকে দেয। কারণ, বুদ্ধদেব যখন শুধোয়, 'বান ফুঁড়িয়ে লাভ হযেছে কিছু?' তখন সে সামান্যক্ষণ চুপ থেকে অপেক্ষাকৃত নিচু স্বরে বলে, 'যন্তন্নাটা টুকচান কম।'

দগদগে ক্ষতগুলিকে দেখতে দেখতে শিউরে উঠছিল বুদ্ধদেব। বলে, 'ইস্, এ যে সেপটিক হয়ে গেছে। ডাক্তার দেখিয়েছ?'

ডাক্তার! তিলক বিস্মিত। সুকুমারের সঙ্গে নিভৃত চোখাচোখি হয় তার।

বলে, 'বানফুঁড়ার ঘা সারাতে কে কবে ডাক্তার দেখায়? বাবার দিয়া ঘা', ডাক্তার ওষুধে সারবেক?'

'তবে?'

'কালাপুষ্প'র রস দিতে দিতে উ আপসেই সেরে যাবেক। বাবাই টেনে লিব্যাক যাবতীয় পুঁজ, রস।' বুদ্ধদেবের চোখে ভয়, আশঙ্কা। তাই দেখে তিলক হাসে। বলে, 'আবার বান ফুঁড়াব সামনের বচ্ছর। উই একোই থানে।' সরল মুখে দেমাক ফুটে ওঠে।

মনে মনে শিউরে ওঠে বুদ্ধদেব। ভেবে পায় না, কিসের আশায় ধর্মের নামে এই কৃচ্ছসাধন! শুধুই কি সংস্কার? পুণ্যের লোভ? নাকি সামান্য পিঠ-চাপড়ানি আর নামমাত্র রৌপ্যমূল্যের বিনিময়ে সমাজের কিছু মানুষকে এইভাবে বানানো হয়েছে উচ্চবর্ণের বিনোদন হিসেবে, যুগ যুগ ধরে? জীবনের সবক্ষেত্রে অবহেলিত, অপমানিত এই মানুষগুলো একটুখানি ধর্মীয় স্বীকৃতি এবং বাবু-ভায়াদের পিঠ-চাপড়ানির লোভেই কি এবংবিধ বাহাদুরীর কাজে নেমে পড়ে চিরকাল! ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এ জাতীয় কষ্টকর এবং নিগ্রহমূলক অংশগুলিতে উচ্চবর্ণের মানুষের অংশগ্রহণ তো বলতে গেলে দেখা যায় না।

খাটিয়ার গা ঘেঁসে মাটির ওপর থাবড়ে বসেছিল তিলক বাউরি। গল্প-গুজবের ফাঁকে মকবুলের কাছ থেকে ডাংজালখানা ফিরিয়ে নেয়। বুনতে থাকে । সুকুমার জানায়, ছোট-শিকার ধরবার মরসুম এসে গেল। আর কিছুদিন বাদে কচি ধানের চারায় ভরে যাবে ক্ষেত। জঙ্গল থেকে খরগোসের পাল আসবে ধানের চারা খেতে। তখন ফাঁদ বসালেই দু'চারটে ধরা পড়বে রোজ। তারই প্রস্তুতি চলছে, এখন থেকেই বাউরি-বাগদিপাড়ার ঘরে ঘরে।

বড়ই দৈন্যদশা এদের। বুদ্ধদেব যতই দেখে, ততই অবাক হয়। মেদিনীপুর জেলার এক অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন এলাকার বাসিন্দা সে। ওখানেও মানুষের দারিদ্র্য রয়েছে, অভাব-অনটন রয়েছে, তবে এ দারিদ্র্যের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। মোট তিরিশ-ঘর বাউরির বাস এ পাড়ায়। প্রায় কারোরই নিজস্ব জমিজিরেত নেই। বাবুদের জমিন ভাগে চষে সবাই। অভাবের জ্বালায় ভালভাবে চাষবাসও করতে পারে না। যাওবা করে, ফসল কাটবার পর হরেক খাতে সে ফসলের চোদ্দ আনা চলে যায় বাবুদের গোলায়। নিজের ফলানো ফসল অন্যের গোলায় তুলে দিয়ে এরা সম্বৎসর পরের দোরে মজুর খাটে, ভাতুয়া-মজুর, দাদন-মজুর, পেট-ভাতুয়া বাগাল....। কেউ কেউ বংশানুক্রমিক বাবুদের মাইন্দার।

মজুর খাটালির বাইরে বিস্তীর্ণ জঙ্গলই এদের মা-বাপ, সখা-স্যাঙাত, জঙ্গলই এদের বাঁচিয়ে রাখে সংবৎসর। জঙ্গলের কাঠ, পাতা, ভুঁড়ুর ভেলাই, মধু, বেল, হত্তুকি, শিমুল তুলো, বাবলা-বহেড়ার আঠা,—এই সব হাজারো সামগ্রী সংগ্রহ করে এরা। বনে গিজগিজ করে খরগোস, গুঁড়চ্যা, ভাম, সাটনা, বনমুরগি, গুঁড়ুর, তিতির, কোয়েল..., দল বেঁধে শিকার করে এসব। এসব দিয়েই ক্ষিদে মেটায়। কিছুটা জলের মূল্যে বিক্রি করে দেয় দূরবর্তী গ্রামে। লুকিয়ে-চুরিয়েই করতে হয় এইসব 'বন-ঝাঁটানো'র কাজ। রাজার জঙ্গল, জমিদারের জঙ্গল, কোনও গতিকে ধরা পড়লে হেনস্থার শেষ থাকে না। অথচ এই জঙ্গল বংশানুক্রমে মিশে গেছে ওদের রক্তের সঙ্গে, ওদের জীবন-জীবিকা, নিয়তি-ভবিতব্যের সঙ্গে।

ইদানিং অবশ্য কমে আসছে জঙ্গল। ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হচ্ছে চারপাশ থেকে। জঙ্গলের মধ্যে ফল-পাকুড়, পশু-প্রাণীও কমে আসছে দ্রুত। মনে মনে প্রমাদ গোনে প্রবীণের দল, শঙ্কাভরে তাকিয়ে থাকে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। বিশেষ করে সাঁওতাল, মুণ্ডা,ওঁরাওদের মতো আদিবাসীদের ক্ষেত্রে জঙ্গলহানি প্রায় জীবনহানির তুল্য, মাতৃ-বিয়োগের সমান। ইদানিং এ পাড়ার অনেক মানুষ 'নাবালে' যাচ্ছে। পাত্রসায়েব, ইন্দাস পেরিয়ে, জিলা বর্ধমান কিংবা কোতুলপুর, জয়পুর পেরিয়ে আরামবাগ, জিলা হুগলি। ওসব নীচু এলাকায় চাষবাস অনেক বেশি। খাটালির লোক কম। ওসব দেশে মজুরের রেটও বেশি। ফি-বছর ধান রোয়ার আগে আগেই এরা লটবহর মাথায় চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ে 'নাবাল'-এর উদ্দেশ্যে। ভাদ্র মাসে ফিরে এসে নিজেদের বর্গা জমিন রোয়। আবার ধান কাটার মরসুমে চলে যায় নাবালে।

এই ক'দিন যাবৎ বুদ্ধদেব দেখছে। সারা এলাকা জুড়ে কাতারে কাতারে মানুষ 'নাবাল' চলেছে। বিষ্ণুপুর থেকে জয়রামপুর অবধি সারা পথ জুড়ে এদের দেখা মিলছে পথে-ঘাটে, বাসস্ট্যান্ডগুলিতে। হাঁড়ি-কড়াই, তালাই-চাটাই, হুঁকো-কলকে, বোঁচকাবুচকি সহকারে দলবদ্ধ মানুষ চলেছে পুবের মুলুকে কাজের সন্ধানে। কোথা যাও গো তোমরা? নাবাল যাচ্ছি গো। ভাদরে ফিরব।

'অত করেও ইয়াদের পেটের জ্বলন কমে না।' সুকুমার থমথমে গলায় বলে, 'আশ্বিন-কার্তিকে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মবে।'

সুকুমারের মুখে এক ধরনের চাপা বেদনা লক্ষ করে বুদ্ধদেব। বলে, 'এসব দিন আর থাকবে না। জমিদারী-উচ্ছেদ আইন পাশ হয়ে গেছে। ওদের হাজার-হাজার বিঘে জমি এখন তিলকের মতো লোকেরা পাবে। তখন 'নাবাল'-এ না গিয়ে মন দিয়ে ওরা চাষ করবে নিজেদের জমি।'

তিলক বাউরি ড্যাবড্যাবে চোখে গিলছিল বুদ্ধদেবের কথাগুলো। শুনতে শুনতে বুঝি মগজের সাড় হারিয়ে ফেলে সে।

সুকুমার আচার্য হো-হো করে হেসে ওঠে। বলে, 'ওই আনন্দে রয়েছেন আপনি? শুনে বাখুন, সাতমন তেল নাই পুড়বেক, বাধাও নাই লাচবেক।'

'আরে, না, না। আইন পাশ হয়ে গিয়েছে। এবার বাড়তি জমি সরকাবের খাতায় জমা পড়বেই।'

'বটে, বটে! জীবন থাকত্যে দেখে যেতে পারবো তো সে দৃশ্য?'

এমন হুলমেশানো কথায় মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে বুদ্ধদেব। তাই দেখে মজা পায় সুকুমার। ঝোপাল গোঁফজোড়ার আড়ালে হাসির ঝিলিক তুলে বলে, 'শুনে লে, তিলক, মকবুল, তুয়ারা এবার বড়োলোক হইয়ে যাবি। গ্রামসেবকবাবু যখন বলছেন—।'

'কি আশ্চর্য!' বুদ্ধদেব বিরক্ত হয়, 'বি-ফরমে জমি ছাড়তে শুরু করেছে সবাই। আপনি কোনও খোঁজ-খবব রাখেন না নাকি?'

সুকুমাব অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, 'দেখুন মশায়, আমি উই লোকগুলানকে আপনার চেয়ে ঢের বেশি চিনি। কারণ, আমার শিরায় শিবায় উয়াদ্যার রক্তই বইছে।'

'কিন্তু সরকাব কি ছেড়ে কথা কইবে?'

'আমি সরকারকেও চিনি।'

মানুষ বিশ্বাস হারিয়েছে, এটা ভাবতেও খারাপ লাগে বুদ্ধদেবের। একটা পরিপূর্ণ বিশ্বাসে বুক ভরে নিয়ে সে এসেছে এই কাজে, ভবিষ্যতের সব প্রচলিত স্বপ্নকে দু'পায়ে মাড়িয়ে। একটা স্থির বিশ্বাস,—বায়ুহীন মধ্যাহ্নে নিষ্কম্প সরোবরের মতো, দিন বদলাবেই, একদিন না একদিন এই স্বাধীনতা অর্থবহ হয়ে উঠবেই, স্বর্ণকান্তি পুরুষের ওজস্বিনী ঘোষণাগুলি মিথ্যে হবার নয়.....।

প্রবল উত্তেজনায় একখানা বিড়ি ধরিয়ে জোরে জোরে টান মারছিল সুকুমার। গলগলিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল। আচমকা বিড়িখানা নিমগাছের আড়ালে ছুঁড়ে দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হনহনিয়ে হেঁটে চলেছেন একজন মানুষ, সামনের রাস্তা দিয়ে। হাঁটু অবধি খদ্দরের ধুতি, খালি গা, মাথার চুল ধবধবে সাদা।

'চেনেন?' চাপা গলায় শুধোয় সুকুমার।

'না তো। কে?'

'অনাথবন্ধু রায়।' সুকুমারের গলায় সম্ভ্রম ফুটে ওঠে, ' সেই ছেলেবেলায় স্বাধীনতার আন্দোলনে ঢুকেছিলেন। আজীবনকাল গান্ধীর চেলা। পঁচিশ বছর গাঁ-ছাড়া। জীবনভর তাড়া করেছেন ব্রিটিশকে, ব্রিটিশও তাড়া করে ফিরেছে উয়াঁকে। সারা জীবনে বার-পাঁচেক জেল খেটেছেন। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে একেবারে পাঁচবছর জেল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ছাড়া পেয়েছেন। একটা ইস্কুল গড়ছেন লোখেশোলে। রাধালগর বাজারে একটা ফ্রি হোমোপ্যাথি ডিসপেনসারি খুলেছেন। উই লিয়েই মেতে রয়্যেছেন।'

হাঁটতে হাঁটতে মুখ ঘোরাতেই বুদ্ধদেবদের দেখতে পান অনাথবন্ধু। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসেন কাছে।

সুকুমার বিনয়ের হাসি হাসে।

'ভাল তো?' উজ্জ্বল হাসেন অনাথবন্ধু, 'সঙ্গে উটি কে?'

'চিনেন নাই? আমাদ্যার লৈতন্ গ্রামসেবকবাবু।'

'বটে, বটে।' বুদ্ধদেবকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে থাকেন অনাথবন্ধু।

বুদ্ধদেব দু'হাত তুলে নমস্কার জানায়। গদগদ হয়ে দু'হাত জড়ো করেন অনাথবন্ধু। বলেন, 'গ্রামসেবক, মানে গ্রামের সেবক, মানে দেশের সেবক। কারণ, ইন্ডিয়া লিভ্স্ ইন্ ভিলেজেস।' শঙ্খশুভ্র হাসি হাসেন অনাথবন্ধু।

বুদ্ধদেব সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায় অনাথবন্ধুর দিকে।

'বেশ, বেশ।' বুদ্ধদেবের সারা গায়ে মমতার তুলিখানি বোলাতে বোলাতে অনাথবন্ধু বলতে থাকেন, 'করুন, প্রাণভরে গাঁয়ের সেবা করুন। কর্মেই মানুষের মুক্তি, ধর্মে নয়, জ্ঞানে নয়, পূজা-আচ্চা কিছুতেই নয়। এখন বয়স কম, সারা জীবন পড়ে রয়েছে শুধু অক্লান্ত কর্মের জন্য। তবে কাজ করবার উপায়টাও ঠিক করতে হবে, লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথটাও। নচেৎ, সব ভস্মে ঘি ঢালা।'

এক আশ্চর্য আবেগময় গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করে চলেন অনাথবন্ধু।

এক সময় বলেন, 'আচ্ছা, চলি।'

আবার সেই সাদা ধবধবে হাসি। পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে বলেন, 'একদিন আসুন আমার ইস্কুলে। দেখুন। বুদ্ধি-ভরসা দ্যান। পাশে এসে দাঁড়ান। এই বয়েসে আপনাদের ভরসাতেই তো এতবড় কাজে নামা। নচেৎ—' নিজের মাথার সাদা চুলগুলোকে বাঁ-হাতে এলোমেলো করতে করতে বলেন, 'দেখছেন তো, একটাও কালো নাই।'

বাঁকের ওপারে মিলিয়ে গেলেন অনাথবন্ধু, সুকুমাররা পেছন থেকে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে থাকে ওঁকে।

'ভারি আশ্চর্য মানুষ তো!' বলে বুদ্ধদেব ।

'হ্যাঁ। এমন মানুষ ক্রমশ বিরল হইয়েঁ আসছে।' সুকুমার আত্মস্থ গলায় বলে। পরমুহূর্তে চোখমুখ তরল হয়ে আসে ওর, 'উঁয়ার মরসুম শুরু হইত্যে আর বেশি দেরি নাই।'

'কিসের মরসুম?'

'জানু-প্রদর্শনীর মরসুম।' সুকুমার রহস্যময় হাসে।

'জানু-প্রদর্শনী! সেটা আবার কি?'

'সহসা হো-হো করে হেসে ওঠে সুকুমার। বলে, 'ধৈর্য ধরুন, গ্রামসেবকবাবু। ধীরে ধীরে দেখত্যে পাবেন সব কিছো। কলির ত' সবে সইন্‌ঝা-পহর!'

বিশ্বরূপ দর্শন

ত্রিভঙ্গর ঠোটের কোণে সর্বদাই ঝুলে থাকে এক ধরনের চালাক-চালাক হাসি। সামনের একটি দাঁত ক্ষয়া বলে তার হাসিখানিকেও খুব সেয়ানা লাগে। বুদ্ধদেবকে দেখে হাসিখানা প্রকট হয় ত্রিভঙ্গর। বলে, 'কেমন? বলেছিলাম না? একেবারে রাজবাড়িতে অভিষেক হয়েছে তোমার। ক্ষীর-রাবড়ি কেমন সাঁটাচ্ছ?'

এসব একেবারে প্রথম দিককার কথা। তখন বুদ্ধদেবের শরীর জুড়ে নতুন কাপড়ের মতো আনকোরা গন্ধ ছিল। বুদ্ধদেব মৃদু হাসে। কোনও সমর্থন ছিল না সেই হাসিতে।

বিডিও সাহেবের চেম্বারের কাছাকাছি এসেই আচমকা বাঁয়ে কনুই-মোচড় নেয় ত্রিভঙ্গ। বলে, 'দাঁড়াও, আগে বুড়ো শকুনটার খাঁই মিটিয়ে আসি।'

বড়বাবুর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ত্রিভঙ্গ। নিজের হাতে টেবিলের ড্রয়ার খুলে তাতে ভরে দেয় খান-আষ্টেক হাঁসের ডিম। বড়বাবু বৃদ্ধ মানুষ। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। নাদুসনুদুস চেহারা। মাথায় কাঁচাপাকা বাবরি চুল। সর্বদাই পানের রসে ভিজে থাকেজোঁকের মতো পুরুষ্টু ঠোঁট। বুদ্ধদেব দেখেছে, বাইরে একটা হুতোম প্যাঁচা মার্কা মুখ করে রাখলেও, ভেতরে মানুষটা বড়ই রসিক আর মজাদার। নিজের শরীরের নিকষ রঙটিকে নিয়েও মজা করতে ছাড়েন না। দিনকয় আগে বাঁ হাতের তর্জনীতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রেখেছিলেন। এ শুধোয়, ও শুধোয়, বড়বাবু, আঙুলে কী হইল্যাক? বড়বাবু গম্ভীর মুখে জবাব দেন, কয়লা ভাঙছিল্যাম, বুঝিনি উট্যা আঙুল না কি কয়লার টুকরা। মেইরেছি ঘা।

ঘাড় গুঁজে খুব ব্যস্ত মুখে কী যেন লিখছিলেন বড়বাবু। আচমকা আটখানা ডিমপ্রাপ্তি হল, এজন্য তাঁর চোখেমুখে সামান্যতম ভাবান্তর তো দূরের কথা, ত্রিভঙ্গর দিকে বারেকের তরে তাকালেনই না। যেন ওটা তাঁর ড্রয়ারই নয়। যেন কেউই খোলে নি সে ড্রয়ার। যেন তাঁর ধারেপাশে কেউই নেই।

ত্রিভঙ্গ নিঃশব্দে সরে আসে। দু'পা না এগোতেই মুখখানা সামান্যতমও না তুলে, খুব কর্কশ গলায় বড়বাবু বলে ওঠেন, 'টি-এ বিলে দুটা সই বাদ পড়েছে। যাবার আগে সই করে যাস।'

বুদ্ধদেব দূর থেকে এসব লক্ষ করে। অনেকদিনই শুধিয়েছে, 'এসব কেন দাও?'

'সাধে কি দিই? ঠেলায় পড়ে দিতে হয়। ঠেলার নাম বাবাজীবন।' ত্রিভঙ্গ সারা মুখে হিক্কা তোলার মুদ্রা বানায়। বলে, 'এদের সব খাঁই মেটাতে মাইনের অর্ধেক কাবার।'

বুদ্ধদেব আচমকা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে যায়। বুঝতে তার তিলমাত্র বাকি থাকে না, বাধ্য কিংবা নিরুপায় হয়ে কিছুই দিচ্ছে না ত্রিভঙ্গ। ঘুষ হল পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট এক পারস্পরিক লেনদেন। সেই লেনদেনে দু'পক্ষেরই অসৎ মন ক্রিয়াশীল থাকে।

ত্রিভঙ্গ অস্বস্তিবোধ করে। বলে, 'শুধু আমি নই, সব্বাইকে কিছু না কিছু ঢালতে হয় ঐ ড্রয়ারে।' চোখ নাচায় ত্রিভঙ্গ, 'তুমিও বাদ যাবে না।'

'না দিলে কী হয়?'

'কী হয়? সেটা টের পাবে কালেকালে। বুড়ো হল বিডিওর পেয়ারের লোক। আইনকানুনের কচুটি জানে, কিন্তু বাগড়া দিতে ওস্তাদ।' খুব করুণ কণ্ঠে বলে ত্রিভঙ্গ, 'আমাদের প্রাণ-ভোমরাটি তো ওরই হাতে ভাই।'

বুদ্ধদেবের বোধগম্য হয় না কিছুই। চাকরি করব আমি, নিজে ঠিক থাকলে ও আমার করবেটা কি?

'তবে শোন।' ত্রিভঙ্গ ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'মাইনের বিল, এরিয়ার বিল, টি-এ বিল, সব কিছুই তো ওর হাতেই। ইচ্ছে করলে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে মাসের পর মাস। তারপর ধর, ছুটিছাঁটার দরখাস্ত, প্রভিডেন্ট ফান্ডের এ্যাডভান্স...। হয়ত দেখবে তোমার সার্ভিস-বুকখানাই হাপিস করে দিয়েছে। কিংবা সার্ভির্স ভেরিফিকেশনের জায়গায় দু'চারটে ফাঁক রেখে গেল। এখন তো কিছুই বুঝবে না, রিটেয়ার করবার পর তোমার পেনশনটি যাবে আটকে।'

শুনতে শুনতে বুদ্ধদেবের মুখে চিন্তার রেখা প্রকট হয়। যত অসম্ভবই মনে হোক, ইচ্ছে করলে অফিসের বড়বাবুরা এটা করতে পারে বৈকি। বিশেষ করে অফিস-মাস্টার যদি তার পকেটে থাকে। বুদ্ধদেবের মনের ভাবখানি আন্দাজ করতে পারে ত্রিভঙ্গ। সামান্য উৎসাহ পায় সে। বলে, 'নইলে, একই অফিসে তিন গ্রামসেবকের তিনরকমের টি-এ রেট শুনেছ কখনও? বুড়ো তিনজনের টি-এ বিল তিন রেটে পাশ করে। এবার টি-এ বিল পেলে বুড়োকে সামান্য কিছু খামে ভরে দিয়ে এসো, বুঝলে?'

মিটিং-এর দেরি ছিল। সেই তিনটেয়। অফিসের করিডোর ধরে হাঁটতে থাকে দু'জনে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় ত্রিভঙ্গ বলে, 'তুমি নাকি সংগঠনে নাম লিখিয়েছ?'

'তুমি লেখাও নি?' 'পাগল! আমার ভাই অত বিপ্লব করবার বাসনা নেই। আমি ছা-পোষা মানুষ। চাকরি করতে এসেছি। জিন্দাবাদ করে হাজতে যেতে নয়।' একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে ত্রিভঙ্গ, 'ঐ যে প্রণয় দাশগুপ্ত, আকাট বদ্যি, পাথরে পুঁতে দিলেও গাছ হয়ে বেরোয়। একদম পড়বে না ওর খপ্পরে। অনেক ভুজুংভাজুং দেবে ও। সমাজব্যবস্থা, শ্রেণীচেতনা,—এসব নিয়ে বক্তিমা দেবে। ব্যাটা টুপি পরানোয় ওস্তাদ। খবর্দার, ওর পাল্লায় পড়েছ কি মরেছ।' বলতে বলতে সহসা আশঙ্কা জমে ত্রিভঙ্গর চোখে। বলে, 'এসব বলেছি বলে যেন গল্প করো না কোথাও। তুমি বন্ধু, তাই বললাম। চল, একটু চা-খাওয়া যাক।'

কৃষ্ণ নাগের নেতৃত্বে দুঃখহরণের বটতলা যথারীতি জমে উঠেছে। ত্রিভঙ্গরা দূর থেকেই কলকলানির আওয়াজ পাচ্ছিল। কৃষ্ণ নাগ চৌকস ব্যক্তি। সর্বক্ষণ তার চারপাশে মধুচক্র জমজমাট।

ত্রিভঙ্গ যেতেই হৈ হৈ করে ওঠে সবাই

কৃষ্ণ নাগ চোখ নাচিয়ে বলে, 'কী ব্যাপার? একেবারে জোড়া রামসেবক যে! কোন্ লঙ্কা দহন করে ফিরলে বাবা?'

বুদ্ধদেব এ ধরনের রসিকতায় অভ্যস্ত নয়। সে মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকে ত্রিভঙ্গর পাশে।

বামাচরণ বসেছে সামান্য তফাতে। ঘুঘনি দিয়ে পাঁউরুটি খাচ্ছে নিঃশব্দে। ওর আশেপাশেই যে অতখানি হল্লা চলছে, তার বিন্দু-বিসর্গও বুঝি কানে ঢুকছে না ওর।

কথা হচ্ছিল বিডিও-র ডিউটি নিয়ে। কৃষ্ণ নাগ খুব বিজ্ঞের মতো বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে, বিডিও হল ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, অর্থাৎ কিনা যে অফিসার এলাকার

সমস্ত ডেভেলপমেন্টকে ব্লক করে দেয়। আর গ্রামসেবক, অর্থাৎ ভি-এল-ডব্লু হল ভিলেজ লেভেল ওয়াকার অর্থাৎ যে ওয়ার্কার কিনা ভিলেজগুলোকে লেভেল করে সমতল বানিয়ে ফেলে। এমনিধারা মজার মজার ব্যাখ্যা পেশ করতে কৃষ্ণ নাগ ওস্তাদ।

'আর ওভারশিয়ার?'

'ওভারশিয়ার?' কৃষ্ণ নাগের চোখে মুখে কপট গাম্ভীর্য, 'ওভার শিয়ার অর্থাৎ ওপব থেকে দেখে যে। ওপর থেকে কে দেখে? অনেক উঁচু থেকে?'

'কে দেখে?'

'শকুন। ওপর থেকে সর্বদাই তার ভাগাড়ের দিকে দৃষ্টি, ফলার পাকল কিনা। অর্থাৎ ওপর থেকে স্কীমের টাকা এল কিনা।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কৃষ্ণ নাগ, অকস্মাৎ মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো হাজির হয় অধর ঝারমুনিয়া। মজলিসটা আচমকা মুখ থুবড়ে পড়ে।

খুব অস্থির লাগছিল অধরকে। কৃষ্ণ নাগ শুধোয়, 'কাকে খুঁজছ, অধর? আমাদের মধ্যে তো তোমার কোনও মক্কেল-টক্কেল নেই বাপ?'

'পর্‌নাম হুজুরেরা।' হাতদুটো জড়ো করে সবার দিকে তাক করে অর্ধচক্রাকাবে ঘুবিয়ে আনে অধর, 'উপরশিয়ালবাবুকে টুকচান খুঁইজ্‌ছিল্যাম হুজুর।'

'উপর শিয়ালবাবু?' কৃষ্ণ নাগ বহুকষ্টে হাসি চাপে, 'তিনি তো এখানে নেই বাপ। দ্যাখো গে, মাঠের মধ্যে কোনও গর্তে ল্যাজ ঢুকিয়ে কাঁকড়া-টাকড়া ধরছেন। নিজের ঘরে নেই?'

'লয় হুজুর।'

'ওহে প্রয়াগ, ওভারশিয়ারবাবু আজ বাইরে গেছেন কিনা জান?'

পঞ্চায়েত-পিয়ন প্রয়াগ দাস খুব শুড়ৎ শুড়ৎ আওয়াজ তুলে চা খাচ্ছিল সামান্য তফাতে। ঘন ঘন মাথা চুলকোয় সে।

'ঠিক জানি নাই আইজ্ঞা। তবে, কাল বলছিলেন খড়িকাগুলি যাবেন।'

'ওই। শুনলে তো? খড়িকাগুলি।' কৃষ্ণ নাগ আশ্বস্ত করেন অধরকে।

দুর্ভাবনায় মুখ কালো করে চলে যায় অধর ঝারমুনিয়া। মজলিসটা আবার জমে ওঠে।

ওভারশিয়ার করালী সোম আসে একটু বাদেই। হৈ হৈ করে ওঠে সবাই। অধর ঝারমুনিয়া তোমাকে গরু-খোঁজা খুঁজছে।

'দেখা হয়েছে।' করালীর মুখে রহস্যময় হাসি।

'তোমার সঙ্গে অধরের কী দরকার হে? মাঝে মাঝে এসে খোঁজ করে।'

'আছে, আছে, ট্রেড-সিক্রেট।' করালী চোখ মটকায়।

'ট্রেড। তোমার আবার কিসের ট্রেড হে? তুমি ট্রেডেও আছ নাকি? তুমি তো চাকরি কর।' রগড় জোড়ে কৃষ্ণ নাগ। এমন নিরীহ মুখ করে কথাগুলো বলে, সবাই বেজায় মজা পেয়ে হেসে ওঠে।

করালী অবশেষে কথাটা ভাঙে। বলে, 'অধরের বড় ছেলে, পচু ঝারমুনিয়া, ঐ যে, কুয়া কেটে বেড়ায়, ব্যাটা কুয়া কাটার মিস্তিরি, ঠিকাদারি নিয়ে ব্লকের সরকারি কুয়া কাটতে চায়। কন্ট্রাক্টর হতে চায়। এখন ওর নাম পঞ্চানন। পিছু পিছু ঘুরছে সেই পৌষ থেকে। অধরটা তো এক নম্বরের নেই-আঁকড়া। যাকে একটিবার ধরে, ছাড়ায় কার সাধ্যি। একেবারে চোরকাঁটার মতো লেগে থাকে।'

করালীর শেষের কথাগুলো এবং মুখের অভিব্যক্তি দেখে কারোরই সন্দেহ থাকে না যে অধর ঝারমুনিয়া ওকে চোদ্দ-আনা পটিয়ে ফেলেছে।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কৃষ্ণ নাগ, ঠিক সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়ায় বামাচরণ। বাঁ হাত কোমরে ঠেকনা দিয়ে বেতো রোগীর মতো হাঁটতে থাকে ব্লক অফিসের দিকে।

কৃষ্ণ নাগ গলা কাঁপিয়ে বলে ওঠে, 'বামাচরণ বা- বু, চললেন?'

করালী পাশ থেকে ফোড়ন দেয়, 'অত তাড়াতাড়ি চললেন যে, বামাচরণবাবু?'

'ওকে বাধা দিও না।' কৃষ্ণ নাগের নাটকীয় গলা, 'এম-এল-এ সাহেব হয়ত এতক্ষণে ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন।'

খ্যা-খ্যা করে হাসতে থাকে সবাই।

বামাচরণ জবাব দেয় না, কারোর দিকেই দৃকপাত করে না সে। ঠাণ্ডা নির্বিকার চোখে সবাইকে একপ্রস্থ দেখে নিয়ে, ধীরপায়ে চলে যায়।

সবাই, যতক্ষণ ওকে দেখা যায়, তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক।

'একটি ওরাং-ওটাং। জরদ্গব।' বামাচরণ সামান্য তফাতে যেতে না যেতেই বলে ওঠে কৃষ্ণ নাগ।

'কাকে বইল্ছ হে? আমাকে লয় তো?'

এমন কথায় পেছন ফিরে তাকায় সবাই। নড়েচড়ে বসে। অফিসের বড়বাবু গিরিজা কাইতি হনহনিয়ে এসে দাঁড়ান কৃষ্ণ নাগের গা ঘেঁসে।

'আরে ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন দাদা?' কৃষ্ণ নাগ লম্বা করে জিভ কাটে, 'আপনাকে ওরাং-ওটাং বলতে পারি? ধড়ে ক'খানা মুণ্ডু আমার?'

গিরিজা কাইতির একটু সন্দেহের বাতিক রয়েছে। যে কোনও কারণেই হোক, তাঁর সর্বদা মনে হয়, কেউ না কেউ তাঁর পেছনে কাঠি দেবার তালে আছে। তাঁর নামে পেছনে কুৎসা করছে সবাই। তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করছে।

'তবে? কাকে বইল্ছিলে বটে?' গিরিজা কাইতির দু'চোখে পাতলা সন্দেহ।

কৃষ্ণ নাগরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

করালী সোম ঝাঁ করে বলে বসে, 'নিজেদের।'

এমন কথায় গিরিজা কাইতির চোখের তারায় সন্দেহটা গাঢ় হয়। দেখেই প্রমাদ গোনে কৃষ্ণ নাগ। সন্দেহ হল বিষের তুল্য। বেশিক্ষণ সে বিষ চারাতে দেওয়া উচিত নয়। তড়িঘড়ি বলে, 'কাকে ওরাং-ওটাং বলা যায় সেটাই আর বুঝলেন না বড়বাবু? ইয়ে, ঐ—যে যাচে কোমরে হাত-ঠেকনা দিয়ে জ্যান্ত ঢেঁকির মতো হাঁটছে।'

দূরে হেঁটে যাচ্ছিল বামাচরণ। তাকে দেখে সন্দেহটা খানিক ঘুচলো বড়বাবুর। হ্যাঁ, অমন লোকের 'ওরাং-ওটাং' নামকরণ অসম্ভব নয়। ছোঁড়াগুলো মিছে বলছে না খুব সম্ভব।

গিরিজা কাইতি একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন বামাচরণের দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'উয়ার সম্বন্ধে কতটুকু জানো হে তুমরা? শুনলে গায়ে রোমাঞ্চ হবেক্। যাগ্গা, যে কথা বইলতে এল্যাম্—।'

সকলেই জানে, গিরিজা কাইতি একবার মুখে কুলুপ আঁটলে, দুনিয়ায় হেন চাবি নেই যা দিয়ে তা খোলা যাবে। উপস্থিত ভারি হয়ে আসা পরিবেশটাকে হাল্কা করার দিকে মন দেয় ওরা।

করালী সোম ভয়ে ভয়ে শুধোয়, 'কি ব্যাপার দাদা, অসময়ে হঠাৎ মথুরা ছেড়ে বৃন্দাবনে?'

'বড়বাবুর আবার সময়-অসময় কি হে?' কৃষ্ণ নাগের কপট-ধমক, 'পরিত্রাণায় সাধুনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং—তিনি যখন খুশী ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও প্রান্তে আবির্ভূত হতে পারেন।'

'ইয়েস!' ফুট কাটে হেরম্ব বোস, 'হি ইজ অমনিপোটেন্ট, অমনি প্রেজেন্ট।'

'অতো ইয়ার্কি মারবেন নাই।' ভেংচি কাটেন গিরিজা কাইতি, 'উদিগের খবর শুনেছেন কিছু?'

'খবর? কার খবর? কিসের খবর? কেন খবর?'

'হুঁঃ হুঁঃ। ডি-এম আঁইছেন ব্লক ভিজিটে।'

শুনেই অল্প চমক খায় সবাই।

'কবে?'

'সামনের হপ্তায়।'

এতক্ষণে মুখে যেন মেঘ জমতে থাকে সবাইয়ের। খববটা সুস্বাদু নয়। বরং বড্ড তেতো। ডি-এম লোকটা নাকি বেজায় কড়া এবং ততোধিক পাগলাটে। ওকে নিয়ে অনেক রোমহর্ষক গল্প চালু আছে সারা জেলায়। যখন কাঁথির এস-ডি-ও ছিলেন, ঐ এলাকার তাবৎ চোর-ছ্যাঁচোড়, বজ্জাত ওঁর নামে থরহরি কম্পমান ছিল।

কৃষ্ণ নাগ মুহূর্তে সামলে নেয় নিজেকে। বলে, 'ওটা কোনও খবরই নয়।'

'বটে, বটে!' কুতকুতে চোখে তাকান গিরিজা কাইতি, 'তবে কোন্‌টা খবর, শুনি?'

'শুনুন—।' কৃষ্ণ নাগ গম্ভীর গলায় শুরু করে, 'কুকুরে মানুষকে কামড়েছে, এটা কি কোনও খবর? মানুষ কুকুরকে কামড়েছে, এটাই খবর। ডি-এম ব্লক ভিজিটে আসবেন, এ আর খবর কি? খবর হতো, যদি বিডিও যেতো ডি-এম'-এর অফিস ভিজিট করতে।'

'ঠিক আছে, আমি তবে চলি।' বড়বাবু যেন ঈষৎ ক্ষুন্ন, 'ঠিক সময়ে দেখা যাবেক, কোন্‌টা বটে খবর, কোন্‌টা লয়।'

বড়বাবু উঠে দাঁড়াতেই সবাই হাঁ-হাঁ করে ওঠে। 'আরে দাদা, চললেন কোথায়? বসুন বসুন। ওহে দুঃখহরণ, দাদাকে একখানা ইস্পেশাল চা দাও।' কৃষ্ণ নাগ ওঁকে টেনে বসিয়ে দেয়।

'ছিঃ ছি,' করালী সোম ফুট কাটে, 'দাদাকে শুধু চা?'

'কখনোই নয়।' হেরম্ব বোসের পাদপূরণ, 'চা, ফলোড বাই বিস্কুট।'

সবাই জানে, বড়বাবুর এ সময়ে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য পরের ঘাড় ভেঙে চা-বিস্কুট খাওয়া। ব্লক ভিজিটের খবর দেওয়াটা নিতান্তই উপলক্ষ।

চা খেতে খেতে ওপরওয়ালার ইন্‌স্‌পেকসন নিয়ে হরেক গল্প চলে। বড়বাবু শোনাতে থাকেন তাঁর অজস্র অভিজ্ঞতার কথা। হোমরা-চোমরাদের খামখেয়ালীপনা আর ছিটলেমীর গল্প...।

কাউকে কোথাও ওয়াক্-ওভার দেওয়ার ব্যাপারটা কৃষ্ণ নাগের কোষ্ঠীতে লেখা নেই। বড়বাবুর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সে শুরু করে, 'মনে পড়ে রামানুজ ব্যানার্জীর কথা? এ-ডি-এম ছিলেন। মনে নেই? অমন ছিটেল অফিসার আমি আমার বাপের জন্মেও দেখিনি। আমি তখন জয়পুর ব্লকে। ব্লক ভিজিট করতে এলেন ব্যানার্জী সাহেব। সাত দিন আগে থেকে সারা অফিস তটস্থ। সাজানো-গোছানো। ঝাড়-পুছ। কিস্তিতে কিস্তিতে বিডিওর ঘরে রিহার্সেল। মাছ-মাংস-দই-মিষ্টি। বাঁকুড়ার নিখুঁতি। পিয়ারডোবার ল্যাংচা। এলাহি ব্যাপার। গার্ডফাইল, রেজিস্টার টুয়েন্টি-সিক্স ইত্যাদি ঝেড়েপুছে রাখা হল। আসার কথা ছিল দশটায়, এলেন প্রায় দু'টোয়। ভুরিভোজ শেষ হতে তিনটে। বিশ্রাম পাঁচটা অবধি। ছ'টা নাগাদ হুকুম হল, গরুর গাড়ি চাই। ব্লক এরিয়া ঘুরব। বেস্ট কোয়ালিটি ছই লাগানো হল এক ডিলারের গরুর গাড়িতে। বলদের গলায় ঘুঙুরের মালা পরানো হল। শিঙ-এ তেল মাখানো হল জবজবে। নরম লেপ পাতা হল গাড়িতে। তার ওপর সুদৃশ্য জাজিম, তাকিয়া। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ রওনা হলেন ব্যানার্জী সাহেব। সংগে আমি আর বিডিও।' আচমকা থামে কৃষ্ণ নাগ।

'তারপর?' উদগ্রীব শ্রোতার দল।

সবাই হাঁ-হাঁ করে উৎসাহ দেখাবে, এই জন্যেই থেমেছিল কৃষ্ণ নাগ। পুনরায় শুরু করে সে।

'তারপর আর কি! সারারাত ধরে গরুর গাড়িতে বসে একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করলেন তিনি। ইংরেজী-বাংলা-সংস্কৃত-উর্দু কিছুই বাদ গেল না।'

'আর, আপনারা?'

'আমরা সারারাত জেগে ঢুলুঢুলু চোখে তারিফ করতে লাগলাম।'

'ফিরলেন কখন?'

'এই, ধর, সকাল ছ'টা নাগাদ। হাত-মুখ ধুয়ে মিষ্টি, ডিম-সেদ্ধ আর চা খেয়ে ফিরে গেলেন সদরে।'

'ইন্‌স্‌পেকসন হল না?'

'ইন্‌স্‌পেকশন? তা হল বৈকি। যাওয়ার সময় ওঁর জীপের চারপাশ ঘিরে ব্লকের তাবৎ অফিসার। প্রায় জোড়হস্তে। সবার দিকে একবার কৃপাদৃষ্টি বুলোলেন তিনি। এগ্রিকালচার‍্যাল অফিসার ছিল দিলীপ দত্ত। তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হু আর য়্যু?'

'আমি এ-ই-ও স্যার।'

'সামনের গাছটার নাম কি?'

গাছটার দিকে অবোধ চোখে তাকিয়ে থাকে দিলীপ দত্ত। চিনতে পারে না। দরদরিয়ে ঘামতে থাকে। পাশেই দাঁড়িয়েছিল ব্লকের ক্যাশিয়ার মুরারী ভঞ্জ। বলে, 'ওটা স্যার ভুয়াশ গাছ।'

'হু আর য়্যু?'

'আমি স্যার ক্যাশিয়ার।'

দিলীপ দত্তর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ব্যানার্জী সাহেব বললেন, 'হু ব্লেডি হ্যাজ মেড য়্যু এ-ই-ও?' তারপর ক্যাশিয়ারকে বললেন, 'আপনিই আজ থেকে এগ্রিকালচার‍্যাল অফিসারের কাজ করবেন। আর ও করবে ক্যাশিয়ারের কাজ। যান্, এক্ষুণি ক্যাশ বুঝিয়ে দিন। আমি গিয়েই অর্ডার পাঠিযে দোব।'

বলেই গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন ব্যানার্জী সাহেব। সহসা তাঁর চোখ পড়ল এস-ই-ও মহেন্দ্র সেনের ওপর। বললেন, 'হু ইজ দিস ওল্ড ফেলা?'

মহেন্দ্রদা তখন ছিলেন জয়পুর ব্লকে। বুড়ো মানুষ। সার্টিফিকেটে যাই লেখা থাক, তখনই বয়েস ষাট ছুঁই ছুঁই। এমনিতে ধুতি-সার্ট পরতেন। ওঁর এক সেট প্যান্ট-সার্টও ছিল। মান্ধাতা আমলের। বাইরের থেকে সাহেব-সুবো এলে তখন, সেটাই পরতেন। সেদিনও তাই পরেছেন। বিশেষ করে তিনি শুনেছিলেন যে এই ব্যানার্জী সাহেব ধুতি-জামা একদম সইতে পারেন না।

বিডিও সাহেব বললেন, 'ইনি আমার সোস্যাল এডুকেশন অফিসার, স্যার।'

কটমট করে মহেন্দ্র সেনকে দেখছিলেন ব্যানার্জী সাহেব। বাজখাঁই গলায় বললেন, 'হু ফুল্ হ্যাজ মেইড্ য়্যু এস-ই-ও? আই শ্যাল থ্রো য়্যু আউট অব্ দ্য ডিস্ট্রিক্ট টু-ডে।'

জনতা অবাক হয়ে শুনছিল কৃষ্ণ নাগের গল্প।

ত্রিভঙ্গ বলে ওঠে, 'কেন, কেন? ওঁর অপরাধ?'

'অপরাধ? সে বড় গুরুতর অপরাধ।' কৃষ্ণ নাগ গম্ভীর গলায় বলে, 'ওঁর প্যান্টের একখানা বোতাম ছিল না। ব্যানার্জী সাহেবের নজরে পড়ে যায় সেটা।'

'এ হেঃ। একেবারে হীট্ বিলো দ্য বেল্ট।' হেরম্ব বোস চুকচুক করে ওঠে, 'বেচারা!'

'সে আর বলতে!' কৃষ্ণ নাগ খাটো গলায় বলে, 'গাঁড়োলও পুরোপুরি। কী দরকার ছিল তোর ঐ চিমসে শরীর নিয়ে একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর? ঘোড়ার পেছনে আর ওপরওয়ালার সামনে বাধ্য না হলে যায় কেউ?'

'তারপর? কি হল মহেন্দ্রদার?'

'কি আর হবে? প্যান্টে নতুন বোতাম লাগিয়ে সদরে গিয়ে ব্যানার্জী সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন পরের দিন। হাতে-পায়ে ধরে মাফ পেলেন সেবারের মতো। শোনা যায়, পকেটে নাকি আরো দু'ডজন বোতাম নিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ বোতাম দেখিয়ে বলেছিলেন, এবার থেকে আর কোনও রিস্ক নেবো না স্যার। বোতাম ছিঁড়ে গেলেই যাতে সংগে সংগে লাগিয়ে নিতে পারি সেই জন্য দু'ডজন বাড়তি বোতাম কিনে রেখেছি। এই দেখুন।'

শুনতে শুনতে হেসে গড়িয়ে পড়ে সবাই।

বড়বাবু উঠে দাঁড়ান্। বলেন, 'যাই হে। অনেক কাজ বাকি। তোমাদের মতো কাজে ফাঁকি মারাটা তো শিখতে পারল্যম নাই জীবনে।'

বড়বাবু চলে যেতেই করালী সোমের সঙ্গে চোখাচোখি হয় কৃষ্ণ নাগের।

করালী বলে, 'শালা একটি চিজ।'

'চিজ বলে চিজ! পুঁতলে গাছ, বাজালে বাঁশি, নাচালে বাঁদর।' কৃষ্ণ নাগ নিজের রসিকতায় নিজেই হাসে, 'সাধে কি আর সাদা সাহেবরা বড়বাবুদের ডাকত 'বুরা বাবু' বলে। ব্যাটারা মানুষ চিনত।'

এক সময় ভেঙে যায় চাঁদের হাট। একে একে পা বাড়ায় প্রায় সবাই। কেউ অফিসের দিকে। কেউ ঘরের দিকে। বসে থাকে কেবল করালী সোম আর কৃষ্ণ নাগ। দু'জনে আর এক কাপ করে চা নেয়।

চা খেতে খেতে করালী সোম বলে, 'আজকেই তাহলে রফাটা হল?'

'কিসের রফা?'

'মোরাম সাপ্লাইয়ের। কাঁকিলা থেকে হিংজুড়ি রাস্তাটা মোরাম হবে যে।'

'তো রফা কিসের?'

'তুমি জানো না? সিদ্ধেশ্বর হাজরা এম-এল-এ হওয়ার পর ওর ভাইপো পল্টু হাজরা কন্ট্রাক্টরী ফেঁদেছে যে।'

'কিসের কন্ট্রাক্টরী?'

'এনি থিং। ফ্রম আলপিন টু এলিফ্যান্ট।' করালী সোম ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে, 'বিশেষ করে ব্লকে যে সব কাজ-বাজ, সাপ্লাই-টাপ্লাই হয়।'

কৃষ্ণ নাগ মন দিয়ে শুনছিল। এবার তরল গলায় বলে, 'তোমার তো তাহলে ভারি বিপদ। আমে-দুধে মিশে গেলে তোমার কী গতি হবে হে? হাজার হোক, তুমি হলে ব্লকের ওভারশিয়ার।'

'ইয়ার্কি মেরো না, বুঝলে। এমনিতে মন-টন ভালো নেই আমার।'

'স্বাভাবিক।' নিরিহ গলা কৃষ্ণ নাগের, 'যাগ্‌গে, যেতে দাও ভাই। হাজার হোক, কষ্ট কষ্টে স্বাধীনতা এনেছে, সেটি একবার ভেবে দ্যাখো। এখন সুদিনে তার ছেলে পল্টু হাজরা একটু ফল ভোগ করবে না?'

'কামেশ্বর হাজরা স্বাধীনতা এনেছে? ব্রিটিশ আমলে ও এক নম্বরের ইনফর্মার ছিল জানো? নিয়মিত টাকা পেত ব্রিটিশ-পুলিশের কাছ থেকে। আজ চাকা ওল্‌টাতেই গান্ধীবাদী বনে গেছে। বেড়াল হয়েছে তপস্বী!'

বাস্তবিক, সিদ্ধেশ্বর হাজরার দাদা কামেশ্বর হাজরা, ব্রিটিশ আমলে ছিলেন পি-ডব্লু-ডি'র ঝানু কন্ট্রাক্টর। আর কে না জানে, পি-ডব্লু-ডি'র পুরোটা হল প্লান্ডার উইদাউট ডিটেক্‌শন। যা শোনা যায়, আজীবনকাল লুণ্ঠনই করেছেন তিনি। অগাধ টাকা আয় করেছেন কন্ট্রাক্টরী করে। এ দিকে গোপালপুর, ওদিকে প্রকাশ গাঁ। মধ্যিখানে দ্বারকেশ্বর। গ্রীষ্মে যেমন তেমন, বর্ষায় যাতায়াত এক সমস্যা। একখানা কাঠের ব্রীজ হলে এদিকে বাঁধগাবা, হেড়েপর্বত, গোপালপুর থেকে ওপাড়ে প্রকাশ, হিংজুড়ি পাতলাপুর, ছিলিমপুর লোক চলাচল করতে পারে। কিন্তু ব্রীজ আর হয় না। এই খবর আসে, ব্রীজ হবেক। টাকা আইছে। দিনকতক বাদে মালুম হয়, ভুয়া কথা। স্বপ্নের পোলাওতে আচ্ছা করে ঘি মিশিয়ে পরিবেশন করেছে কেউ। একবার এক তরুণ অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এলেন বিষ্টুপুরের অফিসে। বড়ই কড়া তিনি, পরের মুখের ঝাল খান না একতিল। একদিন একটা বিল সাহেবের সইয়ের জন্য পেশ করলেন অ্যাকাউন্টেন্টবাবু। রিপেয়ার অব্ উডেন ব্রীজ ওভার দ্য রিভার ডারকেশ্বর এ্যাট প্রকাশ-ঘাট। অন্য কেউ হলে খসখসিয়ে সই করে দিতেন সাহেবীয় কায়দায়, কিন্তু নতুন এই সাহেবটি একেবারে পাতি। বলে, দেখতে যাব। গোপালপুরে পৌঁছে তো সাহেবের চোখ ছানাবড়া। কোনও ব্রীজেরই নামগন্ধ নেই সেখানে। চারপাশের মানুষজনকে, সাহেব দেখতে এসেছে তারা, জিজ্ঞেসটিজ্ঞেস করে তো মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড়। কস্মিনকালে কোনও ব্রীজ, কাঠের তো দূরের কথা, পাটকাঠিরও, তৈরি হয়নি ওখানে। সাহেব নদীর পাড়ে দাঁড়িয়েই শপথ নিলেন সাব-অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আর অ্যাকাউন্টেন্টের চাকরি তিনি খাবেনই খাবেন। সারা রাস্তা তড়পাতে তড়পাতে অফিসে ফিরলেন সাহেব। তলব করলেন দুই মহাপাষণ্ডকে। গালাগাল দিলেন যৎপরোনাস্তি। বললেন, তৈরি থাকুন। শো-কজ করছি। আর, ঐ যে কন্ট্রাক্টর, কে যেন বিলটা পেশ করেছে? তাকে

ব্ল্যাক-লিস্টেড করে চিঠি দিন আজই। অ্যাকাউন্টেন্ট চোরের গলায় জবাব দেয়, কামেশ্বর হাজরা স্যার, মোস্ট রিনাউন্‌ড্ কন্ট্রাক্টব অব্ বিষ্টুপুর। চোরের মতো মুখ করে সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে দুই অপরাধী। দিন দু'তিন এড়িয়ে চলে সাহেবকে। তদ্দিনে শো-কজ ড্রাফ্‌ট্ করা হয়েছে, টাইপ করা হয়েছে, সাহেবের টেবিলে সইয়েব জন্য পেশ করা হযেছে, হেনকালে একদিন উত্তীর্ণ-সন্ধ্যায় অফিস তখন প্রায় ফাঁকা, কেবল সাহেব তখনও নিজের চেম্বারে বসে কাজ করে চলেছেন, গুটিপায়ে ঢুকল দুই পাষণ্ড। হাত জোড় করে দাঁড়াল সাহেবের সামনে। সই করবার ফাঁকে এক ঝলক মুখ তুলেই ঝাঁ করে রেগে উঠলেন সাহেব, নো নো, নো মার্সি। সাসপেন্ড আপনাদের করবই। কেউ বাঁচাতে পাববে না। যান, যান, কোনও অনুরোধই শুনব না।

'ওজন্য আসি নাই স্যার।' হাত কচলাতে কচলাতে নিবেদন করেন অ্যাকাউন্টেন্ট বাবু, 'নিজেদের বাঁচাবার জন্য আসি নাই।'

'তবে?' সাহেবের হাতের কলম থেমে যায়।

'আমরা এসেছি, আসলে, আপনাকেই বাঁচাতে।'

প্রচণ্ড, রোষে, উত্তেজনায় সাহেবের হাতের কলম খসে পড়ে, 'কী স্পর্ধা আপনাদেব! আমাকে বাঁচাবেন? থ্রেট করতে এসেছেন!'

'সত্যি বইল্‌ছি স্যার, রাগের মাথায় কিছু কবে বসলে আপনাব চাকবিটাই চলে যাবে স্যাব।'

'ভয় দেখাচ্ছেন? হুমকি দিচ্ছেন?' রাগে ঠকঠক কবে কাঁপছিলেন সাহেব।

'সবটা শুনুন স্যর। শুনে-টুনে সুবিচাব করুন।' অ্যাকাউন্টেন্টবাবু বিনযে গলে যেতে যেতে বলেন, 'এই পুলটা যাঁর সময়ে তৈরি হযেছিল, মানে, যিনি অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিযার থাকাকালীন ব্রীজটার বিল পাশ করেছিলেন, তিনি এখন চিফ-ইঞ্জিনিযাব, স্যব। কামেশ্বর হাজবাই কন্ট্রাক্টব ছিল। মানুন না মানুন, আমি আপনার বাপেব বযেসী লোক, বিবেচনা ককন, ব্রীজটা কোনকালে তৈরিই হয় নি এমন অভিযোগ তুলে আপনি খোদ কাকে চোব সাব্যস্ত কবতে চলেছেন।'

বয়েসে তরুণ হলেও, সাহেবের বুদ্ধি ছিল ঘটে। তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেললেন ব্যাপাবটা। বললেন, 'তবে এখন কী করা?'

'কামেশ্বরদাকে বলছি, ব্রীজটাকে ডিমোলিশ কববাব একটা বিল পেশ কববেন তিনি। বিলটা পাশ কবে দিন এই যুক্তিতে যে বছব বছব গাদাগাদা টাকা খবচ কবে ঐ ভাঙাচোবা ব্রীজকে আব টিকিয়ে রেখে লাভ নেই। বিষফোঁড়াটা আপনাব হাতেই ফাটুক, স্যব। বিদঘুটে চ্যাপ্টারটা আপনার হাতেই ক্লোজড্ হয়ে যাক। ওয়ান্স ফর অল।' সাহেব তৎক্ষণাৎ বাজি। ঘাম দিয়ে বুঝি জ্বর ছাড়ে তাঁর।

ব্রিটিশ আমলের কথা এসব। আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে।

শুধু দু'হাতে টাকা আয়ই নয়, কামেশ্বর হাজবা যে সে যুগে কত বড় বাজভক্ত ছিলেন, তাও শোনা যায় তাঁর নিজের জবানবন্দী থেকে। বহুদিন যাবৎ ঐসব গল্প সাতকাহন করে বলতেন তিনি। ইংরাজ রাজপুরুষবা যে তাঁকে কী পরিমাণ ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন, তাঁদের পত্নীবা কতখানি যে পছন্দ করতেন ওঁকে, সেসব কাহিনী বিতাং করে বলতে ভালবাসতেন তিনি। এ ছিল তাঁর এক অতি প্রিয় প্রসঙ্গ।

ইদানীং কামেশ্বর হাজরা তাঁর গল্পটা বদলে ফেলেছেন। ইদানীং তাঁর প্রিয় প্রসঙ্গ নেতাজী, জহরলাল, বিধান রায়, অতুল্য ঘোষ...। নেতাজী যখন বাঁকুড়ায় এলেন, তখন তিনি কীভাবে কামেশ্বরকে বাহবা দিয়েছিলেন, বিধানদা আর অতুল্যদা কী পরিমাণ ভালবাসেন তাঁকে... সেই গল্প বলতেই আজকাল অধিক পছন্দ করেন কামেশ্বর হাজরা। তিনি এখন ঘোরতর ফ্রিডম-ফাইটার। তাঁকে নইলে এখন রুলিং পার্টির এক কদমও হাঁটা দায়। এখন বাঁকুড়া জেলায় কোনও তা-বড় নেতা এলে, তাঁর জনসভার যাবতীয় প্যান্ডেল, ব্যারিকেড, সব কিছু বানিয়ে দেবার দায়িত্ব এক কামেশ্বর হাজরা ছাড়া এ জেলায় আর দ্বিতীয়জন নাস্তি।

তেতো মুখে হাসে করালী সোম, 'উঠি। আমাকে আবার একবার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। ঘরে অসুখ-বিসুখ লেগেই রয়েছে।'

করালী সোম চলে যেতেই অফিসে ফেরে কৃষ্ণ নাগ। পায়ে পায়ে বিডিওর ঘরে ঢোকে।

একথা-সেকথার পর খাটো গলায় বলে, 'করালী সোমের সাথে আপনার কিছু হয়েছে নাকি স্যার?'

'ক্যান্? করালীর সাথে আবার কি হইবো?' অবিনাশ ভৌমিক আকাশ থেকে পড়েন।

'না, কী সব যেন বলছিল তখন। আপনার মাথায় নাকি জিলিপির প্যাঁচ। যাগ্গে, যাগ্গে। যত ভাবি এসব ব্যাপারে থাকবো না। কিন্তু অফিস-মাস্টারের নামে নিন্দে-মন্দ শুনলে আর—। আপনি করালীকে যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু বলবেন না, দোহাই। এমনিতে ভদ্রলোক খুব একটা খারাপ নয়। মাঝে মাঝে কী যে হয়—!'

রঘুয়া চড়ে ঘোড়া

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট অনাথবন্ধু রায়ের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন। জীবনের যাবতীয় স্বপ্ন, সাধ ও সাধনা যেন পূর্ণ হল এতদিনে। অনাথবন্ধু ঐদিন জেলের মধ্যে বসে বসে বিনিদ্র রাত যাপন করেছিলেন। জেলের লোহার গরাদে মুখখানি চেপে ধরে একখানি মধুর স্বপ্নে বুঁদ হয়ে গিয়েছিলেন। কল্পনা করছিলেন, ঐ মুহূর্তে দিল্লীর লালকেল্লায় ব্রিটিশের ইউনিয়ন-জ্যাক নেমে যাচ্ছে, পাশাপাশি উঠে যাচ্ছে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা। ঠিক ঐ মুহূর্তে অনাথবন্ধু ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।

একদিন কৈশোরের, যৌবনেব অপরিমিত তেজ নিয়ে, সমাজ-সংসার তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে। গড়বেতা থানার সন্ধিপুরে গড়েছিলেন গুপ্ত আড্ডা। সন্ধিপুর ছিল অনাথবন্ধুর মামার বাড়ি। বাবা মারা গেছেন সেই ছেলেবেলায়। মা ছিলেন ভাইদের আশ্রয়ে। পুলিশ বারকয় মামার বাড়িতে হানা দেবার পর মামারা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ঐ বাড়িতে থেকে এসব করা চলবে না। কাজেই সন্ধিপুরের পাট তুলে দিয়ে অনাথবন্ধু চলে এলেন রাণীবাঁধ থানার ছ্যাঁদাপাথর গাঁয়ে। সেখানে তখন ধুন্দুমার কাণ্ড চলছে। দেশি বন্দুক আর বোমা তৈরি হচ্ছে ছ্যাঁদাপাথরের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে। পাথর কেটে কেটে গুপ্ত সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে। যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে রাখছে বিপ্লবীরা। নিজেরাও আত্মগোপন করছে সুড়ঙ্গের মধ্যে। অনাথবন্ধু নিজেকে সঁপে দেন সেই কর্মযজ্ঞে। চার্লস টেগার্ট দু'দুবার হানা দিয়েও ঐ জঙ্গলের মধ্যে ধরতে পারেন নি অনাথবন্ধুদের। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী দলে বেশিদিন মানিয়ে নিতে পারেন নি অনাথবন্ধু। তাঁর মনে হয়েছিল, সুসজ্জিত ইংরেজবাহিনীর কাছে সন্ত্রাসবাদীদের এই

আয়োজন তপ্ত মরুভূমির বুকে একফোঁটা জলের মতো। গান্ধীর পথই বেছে নিয়েছিলেন। সেই পথেই হেঁটেছিলেন সারাজীবন। সত্যাগ্রহ, লবণ আন্দোলন, ভারত ছাড়ো, সব আন্দোলনেই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর। ইতিমধ্যে বিভিন্ন আন্দোলনে সামিল হয়ে চারপাঁচবার জেলখাটা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোনটাই একবছরের বেশি নয়। কিন্তু বিয়াল্লিশের আন্দোলনে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে প্রকাশ্যে আন্দোলন করতে গিয়ে ধরা পড়ে যান অনাথবন্ধু। ইংরেজের জেলে তাঁর কেটে যায় পাঁচটি বছর।

১৯৪৮-এ জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মামারা ভেক বদলালেন। অনাথবন্ধু তখন বিখ্যাত মানুষ। সারাদেশের গৌরব। মামারা তাঁকে সন্ধিপুরেই থেকে যেতে বললেন। কংগ্রেস নেতারা তাঁর পুণর্বাসনের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু সবাইয়ের অনুরোধকে দু'পায়ে ঠেলে তিনি মা'কে নিয়ে চলে এলেন চুয়ামসিনায়। নিজের জন্মভূমিতে। জন্মভূমির জন্য কিছু করবার তরে তখন তাঁর প্রাণ উতলা। তিনি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন, স্বাধীনতার সৈনিকেরা, যে যেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, সবাই ফিরে যাক যে-যার এলাকায়। ধ্বস্ত গ্রামগুলিকে পুনরায় গড়ে তুলুক। আশা-ভরসা যোগাক ক্ষতবিক্ষত, বিধ্বস্ত মানুষগুলির মনে। ততদিনে অনাথবন্ধুদের জমি-জিরেত যা ছিল, মায় পৈতৃক ভিটেখানি অবধি সিংহবাবুদের দখলে। প্রতাপলাল সিংহবাবু ঐ ভিটের দখল নিয়ে খুব সবজির চাষ করছেন। চাষের জমিগুলোও সব বিলি-বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন অনুগত প্রজাদের মধ্যে।

অনাথবন্ধুর দাবিকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন প্রতাপলাল। জন্মভূমি থেকে প্রায় বিতাড়িতই হয়ে যেতেন অনাথবন্ধু যদি না জেলা-কংগ্রেসের নেতারা ওঁর ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগ নিতেন। তাঁদেরই চেষ্টায় নিজের ভিটেখানি ফেরৎ পেয়েছিলেন অনাথবন্ধু, জমি-জিরেতও কিছু কিছু এবং প্রতাপলালের দল বুঝে ফেলেছিল, অনাথবন্ধুর অনেক প্রভাব দলের ওপরমহলে। তাঁর ওপর জুলুম করলে, হিতে বিপরীত হবে। প্রতাপলাল বুদ্ধিমান ব্যক্তি। অনাথবন্ধুর সঙ্গে মিত্রতা সৃষ্টির কথাটা তখন থেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন তিনি।

সারাজীবনের অনিয়মে ততদিনে অনাথবন্ধুর শরীর ভেঙে পড়েছে, হরেক কিসিমের অসুস্থতা একটু একটু করে গ্রাস করে ফেলছে ওঁকে। ঘুণধরা শালকাঠ । তবুও দমেন নি। চারপাশের গাঁ-গঞ্জ চষে বেড়াতে থাকেন। মানুষগুলির খোঁজখবর নিতে থাকেন জনেজনে। একদিন হাজির হলেন প্রতাপলালের গড়ে। লোখেশোল আর চুয়ামসিনার মধ্যবর্তী যে কাঁকুরে ডাঙাখানা, ওর থেকে বিঘে চার-পাঁচ চাই আমার।

প্রতাপলালের ভুরুজোড়ায় অজান্তে ভাঁজ পড়ে, 'ক্যানে?'

'একটা ইস্কুল গড়তে চাই। জুনিয়র হাইস্কুল।'

প্রতাপলালের কানের ডগার লম্বা চুলগুলি হাওয়ায় অল্পঅল্প দুলছিল। দলের মধ্যে অনাথবন্ধুর কদর কতখানি, তদ্দিনে বুঝে ফেলেছেন তা। ওঁকে যে কোনও মূল্যে হাতে রাখতে বিশেষভাবে আগ্রহী তিনি।

বললেন, 'বেশ তো। দিল্যম পাঁচ বিঘা জমিন। লিখাপড়ার দিনক্ষণ ঠিক কর। দান কইর‍্যে দিব।'

. জমিটা পাওয়া মাত্রই কাজে নেমে পড়েন অনাথবন্ধু। পরপর কয়েকটা মিটিং করেন লোখেশোল, চুয়ামসিনা, জয়রামপুর বৈদ্যো, অর্জুনপুর, রাধানগর ইত্যাদি গাঁয়ে। বোঝাতে থাকেন শিক্ষার গুরুত্ব। চুয়ামসিনা প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে ছুটির দিনে ঘুরতে থাকেন দুয়োরে দুয়োরে। একটা ইস্কুল গড়ত্যে চাই। যে যা পার ভিক্ষা দাও। তোমাদের ছেলে-পিলেরাই পড়বেক সেই ইস্কুলে। বলেন, শিক্ষা, সে আর একজোড়া চক্ষু। দিব্যচক্ষু। মানুষ চর্মচক্ষে যা দেখতে পায় না, ঐ চোখ দিয়ে দেখে । ঐ চোখ দিয়ে দেখলে দুনিয়াটার রঙ বদলে যায়, রূপ বদলে যায়। ওটা একটা আজব আরশিও বটে। ঐ আরশিতে নিজেকে পুরোপুরি দেখা যায়। চেনা যায়। অনেকেই সাধ্যমত যৎকিঞ্চিৎ দেয়। নগদে নামমাত্র। ধান-চালই বেশি। পাঁচ-সের থেকে এক পোয়া অবধি। ছাত্ররা চটের বস্তা ঘাড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় গাঁয়ে গাঁয়ে, সামনে সামনে অনাথবন্ধু। দিনভর যা সংগ্রহ হয়, বেচে দেন রাসবিহারীর দোকানে। বৌ-ঝিদের বলেন, তোমরাও পিছিয়ে থেকো নাই মা-জননীরা। মূর্খ ছেলের মা হইত্যে লজ্জা করে না তোমাদের? মেয়েরা বলে, আমাদের আর কী রয়েছে সন্সারে যে দিব? আজীবনকাল অন্যের অধীন। শৈশবে-কৈশোরে বাবার, যৌবনে স্বামীর, প্রৌঢ়ত্বে-বার্ধক্যে ছেলের। অনাথবন্ধু বলেন, সেতুবন্ধনকালে কাঠ-বিড়ালিরাও সাহায্য করেছিল, আর তোমরা তো মানুষ মা-জননীরা। দৈনিক দু'বেলা যখন ভাত রাঁধতে চাল নেবে ধুচুনিতে, এক মুঠো চাল তুলে রেখো একটা মাটির হাঁড়িতে। সারা সংসারের অন্ন থেকে এক মুঠো চাল তুলে নিলে কারোর ভাগেই কম পড়বেক নাই মা-জননীরা। কিন্তু ঐ দিয়ে তোমাদের ছেলে-পিলেদের জন্য একটা ইস্কুল গড়ে উঠবেক। বল ত একটা করে মাটির হাঁড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে যাই প্রত্যেকের পাকশালে। মেয়েরা রাজি। ঘরে ঘরে হাঁড়ি ঝুলিয়ে আসেন অনাথবন্ধুর দল। মাসে একবার করে সংগ্রহ করে নেন সেই চাল। এলাকার গরীব ক্ষেতমজুরদের বলেন, তোমরা গায়েগতরে খেটে দাও। বেশি নয়। বছরে দু'তিনদিন। তাতেই হবেক।

ইস্কুলটা চলছে। অনাথবন্ধু গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে ছাত্র জোগাড় করছেন। প্রাইমারি স্কুল থেকে পাশ করে যারা বসে রয়েছে , তাদের ডেকে এনে ভর্তি করে দিয়েছেন স্কুলে। বই দিয়েছেন বিনামুল্যে।

দেখেশুনে প্রতাপলালের বুকে দুর্ভাবনার মেঘ জমে। বলেন, হাঁ হে অনাথ, দুনিয়ার সব কাচ্চা-বাচ্চা যদি ইস্কুলে গিয়ে পাঢ়ালিখা শিখে, তো চাষে-বাসে খাইট্ব্যেক কে? গরু-ছাগল চরাবেক কে? তুমি এ কী এক কারখেনা খুইল্লে হে? সক্কলে যদি হাতে খাতা-কলম ধরে তো, হালের বঁটা আর পাঁচনবাড়ি ধইর্বার লোক কি বিলাত থিক্যে আইবেক ? তুমিও ত ভদ্দর লোকের ছেইলা, না কি? বুঝত্যে পার না?

অনাথবন্ধু অনেকদিন যাবৎ বুঝতে পারছিলেন, স্কুল গড়বার ব্যাপারে প্রতাপলালদের তিলমাত্র সায় নেই। বরং তাঁরা মনে মনে প্রমাদ গুণছেন। কিন্তু অনাথবন্ধুর জনপ্রিয়তার কথা ভেবে সরাসরি বাদ সাধতে সাহস পাচ্ছেন না।

আজ অনাথবন্ধুর হিসেব-নিকেশের সময় এসেছে। স্কুল গড়বার প্রথম পর্বের কথাগুলো বেশি করে মনে পড়ছে। এলাকার উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষগুলো আশানুরূপ সাহায্য করে নি। বরং নানাভাবে বাগড়া দিয়েছে প্রতিটি স্তরে। বাউরি-বাগদিদের মধ্যে কানে-কানে রটিয়ে দিয়েছে এমনতরো কথা যে, অনাথবন্ধু গরীব ঘরের ছেলেগুলোর আখের

খাচ্ছে। ইস্কুলে গিয়ে পড়াশুনা শিখে 'বাবু' হয়ে যাবে ছেলেগুলো, আরামপ্রিয় হয়ে উঠবে। শরীর ঘামাতে চাইবে না কিছুতেই। আর, না খাটলে যাদের অন্ন জোটে না, তাদের ঘরের ছেলেরা যদি শ্রমবিমুখ হয়ে ওঠে, তাহলে সর্বনাশ রাখবার জায়গা থাকবে না। অনাথবন্ধু কি সবাইয়ের চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে? প্রতাপলাল একান্তে বলেন, ইয়ার নাম গরীবের ঘোড়া-রোগ। এ রোগের কুনো চিকিচ্ছা নাই। কথাটা বাউরি-বাগদিদের অনেকেরই মনে ধরেছে। তাদের বুকের মধ্যে আশঙ্কা জমেছে। হাড়ভাঙা খাটালি করেও যাদের অন্ন জোটে না, সেই বাড়ির ছেইলা-ছোকরারা যদি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘোরা রপ্ত করে, কথায় কথায় হ্যাঁট-ম্যাট বলে ফুটানি মেরে বেড়ায়, তবে অন্ন-বিহনে মারা পড়বেক পুরো সংসার। ভয়ে, আশঙ্কায় অনেকেই তাদের বাড়ির ছেলেদের ছাড়িয়ে নিয়েছে স্কুল থেকে। তারা এখন বাবুদের বাড়িতে গরু চরায় কিংবা মাইন্দারি করে।

ঠিক তেমন মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সুকুমার আচার্য। অনাথবন্ধুর সঙ্গে গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায়-পাড়ায় দিনরাত ঘুরেছে সে। মানুষকে পাখিপড়া পড়িয়েছে। প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে, শিক্ষার সঙ্গে শ্রমের কোনও বিরোধ নেই।

অনাথবন্ধু বসে বসে ভাবছিলেন সেই সব নির্মাণপর্বের দিনগুলির কথা। বাধা এসেছিল অনেক দিক থেকেই। কিন্তু তখন অনাথবন্ধুর অনেকখানি প্রভাব ছিল দলেব মধ্যে এবং এলাকার সম্পন্ন মানুষগুলির মধ্যে। তখন এলাকায় দলের প্রতিনিধিত্ব করতেন তিনিই। ক্রমে ক্রমে বদলে যেতে লাগল সবকিছু। প্রতাপলালেবা দলের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বাড়িয়ে ফেলল দ্রুত। প্রতাপলালের ছেলে হরবল্লভ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হয়ে বসল। এলাকার তাবৎ জোতদার দাঁড়াল ওদেরই পেছনে। দলও ধীরে ধীরে ওদেরই পাত্তা দিতে লাগল বেশি বেশি করে। কারণ, ওরা দলীয় ফাণ্ডে চাঁদা দিয়ে দিল প্রত্যাশার চেয়ে বেশি। দলীয় সভা-বৈঠকে পাঠাতে লাগল শয়েশয়ে অনুগত মানুষকে। নির্বাচনের সময় নিজেদের প্রভাব খাটাতে লাগল এলাকার একদা-প্রজা বশংবদ মানুষদের মধ্যে। ওরাই একটু একটু করে দখল করে নিয়েছে দলীয় সংগঠনেব গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোকে। অনাথবন্ধু অনুভব করেন, তিনি একটু একটু করে অপাংক্তেয়, অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছেন দলের কাছে। মুখের সামনে সম্মান দেখিয়ে এখনও কথা বলে বটে, কিন্তু দলীয় কর্মকাণ্ডের মূল প্রবাহ থেকে তাঁকে প্রায় ছেঁটে ফেলাই হয়েছে। ববং ইদানীং সুকুমার আচার্যর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাকে কেন্দ্র করে হরেক কিসিমের কুৎসা রটনা চলছে আড়ালে, আবডালে। সুকুমার আচার্য আজীবন কম্যুনিস্ট। এমন লোকের সঙ্গে অনাথবন্ধুর ঘনিষ্ঠতাকে প্রতাপলালের দল অন্যভাবে ব্যাখ্যা করছে। ব্যাপারটা দলের জেলাস্তরের নেতাদের কানেও পৌঁছেছে। দু'একবার খুব পরোক্ষভাবে প্রসঙ্গটা তুলেছেন তাঁরা। মৃদু অনুযোগও করেছেন। শেষ অবধি অনেকে ভেতরে ভেতরে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে অনাথবন্ধু আস্তে আস্তে কম্যুনিস্টদের দিকে ঝুঁকছেন। প্রতাপলাল, হরবল্লভেরা সেই বিশ্বাসের আগুনে ইন্ধন জুগিয়েছেন দিনের পর দিন। ইদানীং জেলাস্তরের নেতারা এলাকার কোনও দলীয় কর্মসূচীতে অনাথবন্ধুকে সযত্নে এড়িয়ে যান।

শুধু তাই নয়, ইদানীং অনাথবন্ধু যা কিছু করেন সবকিছুকেই বাঁকা চোখে দেখেন হরবল্লভের দল। প্রতিটি উক্তিরই কদর্থ করেন। রাধানগরে একখানা চারিটেব্‌ল

ডিসপেনসারি খুলেছেন অনাথবন্ধু। অনাথ আতুরদের বিনে পয়সায় ওষুধ দেন। হরবল্লভরা সেটাকেও 'আদিখ্যেতা,' 'লোক টানবার কৌশল' বলে বিদ্রূপ করেন। বিদ্রূপ করেন অনাথবন্ধুর ডাক্তারি জ্ঞান সম্পর্কে। সে প্রসঙ্গ উঠলে প্রকাশ্যেই বলে ওঠেন, ডাক্তারি কুনো ছেইলা-খেলা লয়। দস্তুর মতন পইড়ে পাশ কত্তে লাগে। সেই বলে না, আমার এমনই হাত যশ—এ পাড়ায় যদি ওষোধ খাবাই, উ পাড়ায় মরে গণ্ডাদশ....! শুধু তাই নয়, ইদানীং অনাথবন্ধুর প্রতিটি কাজের ওপর কড়া নজর রেখেছেন হরবল্লভরা। তাঁর প্রতিটি আচরণ, বিচরণ, প্রতিটি উক্তিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখছেন, তার মধ্যে কোনও কৌশল, কোনরূপ গোপন উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা। তিনি কোথায় কোথায় যাচ্ছেন, কার সঙ্গে কী কথা বলছেন, কোন্ কাজে নামছেন, কোথায় বৈঠক করছেন, সবকিছু ওদের নখদর্পণে থাকে। মোট কথা, পরাধীন যুগে বহুদিনই জেলে ছিলেন অনাথবন্ধু, স্বাধীন ভারতেও তাঁর বন্দীদশা ঘোচে নি। স্বদেশী জেলে তিনি আজ চব্বিশ ঘন্টা নজরবন্দী। তাঁর প্রতিটি কাজকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়।

তাঁকে দরকার হয় বছরের কেবল স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, জাতির জনকের জন্মদিনগোছের তিনটি কি চারটি মাত্র দিনে। হরবল্লভ ঐ দিনগুলোতে খুব সসম্ভ্রমে ওঁকে ডেকে নিয়ে যান চুয়ামসিনা প্রাইমারি স্কুলের সামনের মাঠে। সেখানে, সুকুমার আচার্যর ভাষায়, চলে অনাথবন্ধুর 'জানু-প্রদর্শনী'র আসর।

পাগল শিকারি একান্তে বাঙ্ময় হয়। তার সারা মুখে ছলকে ওঠে তিক্ত হাসি, এ হইল্যাক কলিকালের ছড়া, রঘুপণ্ডিত ঘুঁটিয়া বিকে, রঘুয়া চড়ে ঘোড়া।

এ হইল্যাক আইজ্ঞা, রঘুয়াদ্যার যুগ।

মগজে তগীর টান

যেমন তগী দিয়ে মাছ ধরা।

ছিপ দিয়ে মাছ ধরবার মোটা সুতো। বিশ-পঁচিশ হাত লম্বা। একদিকে একগোছা বড়শি। সামান্য ওপরে একতাল সিসে, যাতে বড়শিগুলো জলে পড়বামাত্তর ডুবে যায়। অন্যদিকটা লাটাইয়ের সঙ্গে বাঁধা। সুতোর সবগুলো বড়শিতে টোপ গেঁথে মেছুয়াল ছুঁড়ে দেবে মাঝপুকুরে। ঝপাং করে একটা শব্দ। ঐ একবার, ব্যস। বাকিটুকু, পুরোটাই জলের তলাকার খেলা। সে খেলায় কোনও শব্দ নেই। লাটাইখানা ধরে এবার ওস্তাদ মেছুয়াল বসে থাকবে পুকুরপাড়ে, জল থেকে অনেক তফাতে, ঝোপের আড়ালে। কিংবা জলঘেঁসা কোনও গাছের মোটা শিকড়ে সুতোর অপর প্রান্ত বেঁধে দিয়ে ফিরে যাবে ঘরে। দু'তিন ঘন্টা বাদে, মধ্যরাতের নির্জনতায় যখন শিকারি বাদুড়ের ঝাঁক নিকষ অন্ধকারে পাখনাজোড়ায় সাঁইসাঁই হাওয়া কাটতে কাটতে উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে, মেছুয়াল সন্তর্পণে শিকড়ের শরীর থেকে খুলে নেবে সুতো। লাটাইতে জড়িয়ে নেবে। লাটাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টানটান করবে সুতো। এবং তখনই বুঝতে পারবে, অনেক দূরে, মাঝপুকুরে, শীতল জলের তলায় বড়শি কী বলে। মাছ লাগলে লাটাইয়ের টানেই মালুম। সুতোয় আলতো ঝাঁকুনি, কিনা তিনি সুতোর টানে আসতে নারাজ। কতবড় সাইজ, কতখানি ওজন, এমন কি রুই, কাতল, মিড়িক, নাকি কালবোস, সবই বোঝা যাবে সুতোর ঝাঁকুনিতে। ওস্তাদ মেছুয়াল জলের কিনার থেকে দশ হাত তফাতে বসেই মেপে নেবে তা। লাটাই তবে ঘোরাতে থাক। আকাশ থেকে অবাধ্য ঘুড়ি নেমে আসে,

জলের তলার ঘুড়িটিও আসবে। তবে ঘোরাতেই থাক লাটাই। প্রতিটি টানে সংক্ষিপ্ত হোক মাছের সঙ্গে মেছুয়ালের সরলরৈখিক দূরত্ব। জলের তলার অবোধ মাছ, সে তো মালুমই পায় না, তাকে কে টানে, কেন টানে, কতদূর থেকে টানে! যখন তার হুঁশ হল, মালুম হল, সে তখন মেছুয়ালের দু'হাতের দশ আঙুলের নিশ্ছিদ্র কব্জায়। রাঢ়ভূমির মাছ ধরবার এ এক প্রাচীন কৌশল। বিশেষ করে, চুরি করে মাছ ধরতে তগীর তুল্য প্রায়-অদৃশ্য সুদূরনিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তি আর দ্বিতীয়টি নেই। মাছ-চোরদের কাছে এই যন্ত্রের ভারি কদর। পুকুরের অবোধ মাছ, সে সর্বনাশের আগের মুহূর্ত অবধি তিলমাত্র মালুম পাবে না, তার জন্য মরণ কত দূরে, কোন্ ঝোপের আড়ালে, কার হাতের লাটাইতে অপেক্ষা করছে।

বেশ কিছুদিন যাবৎ সেই টান অনুভব করছিল বুদ্ধদেব। তগীর অদৃশ্য টান। যে টানছে তাকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না। মনে হয় বড়শিই বুঝি টানছে। কিন্তু বড়শি যে ক্রিয়াশীল সুতোর টানে, সুতো যে টানটান লাটাইয়ের পাকেপাকে, লাটাই যে পাক খাচ্ছে মেছুয়ালের দশ আঙুলের কেরামতিতে, বেচারি মাছ অতশত বুঝবে কেমন করে!

সিংহগড়ে প্রবেশের দ্বিতীয় দিনেই প্রভঞ্জন এসে যেচে আলাপ করে। প্রায় সমবয়েসী। বেশ প্রাণোচ্ছল। ধপ করে বসে পড়ে পরিপাটি বিছানায়। আপনি আসায় সবচে' সুবিধা হইল্যাক আমারই। নিজের মন্তব্যকে নিজেই ব্যাখ্যা করে বোঝায়। এই গাঁ-ঘরে মিশবার লোক নাই। পল্টুদা, বিষ্টুপুরের পল্টু হাজরা, এম-এল-এ'র ভাইপো, আমার জিগরি দোস্ত। মাঝে মাঝে যাই উয়ার পাশ, সিনেমা-টিনেমা দেখি। ব্যস, গাঁয় ফিরলেই বোবা। আমি থাইক্‌তে আপনার ইখ্যেনে কুনো অসুবিধাই হব্যেক নাই। কিছু দরকার হইলে আমাকে বইল্‌বেন। সিংহবাবু-বংশের ছেইলা, বুঝেন তো, সক্কলে ডরায়। জমিদারিটা চইলে যাচ্ছে বটে, তবে কি জানেন, মরা হাতি লাখ টাকা। বিজোড় দাঁতে হাসে প্রভঞ্জন। আমি বিষ্টুপুর কলেজে পড়িও। বেড়াতে বেরাবেন নাকি? চলুন, আপনাকে গাঁ দেখাই আনি। পদমদীঘি, কপিলেশ্বরেব থান, .। পদমদীঘিতে শীতে কত পাখি আসে। সরাল, বালিহাঁস। বন্দুকে শিকার কইব্‌ব। এক একদিন আট-দশটা। কী তেল! খেইলে বুঝবেন! আর একটা কথা। আমরা একটা ক্লাব বানাচ্ছি। আপনাকে কমিটিতে থাইক্‌তে হব্যেক। ফুটবল খেলেন ত? ক্যারাম জানেন? না জানলে শিখাই লুব। সরকার থিক্যে ক্লাবকে একখান রেডিও দিব্যেক। মহেনবাবু কথা দিছেন। উই ধুতমা ডাঙায় ক্লাবঘর, রেডিও থাইক্‌লে এক রাতেই চোরের ভোগে যাবেক। ঘরেই আন্যে রাখব উটা। দুজনে মজাসে অনুরোধের আসর শুনব। আপনার কার গান ভাল লাগে? আমার সইন্ধ্যার । ফাটাফাটি গায়। খুব আন্তরিক গলায় অনেক কথাই বলেছিল প্রভঞ্জন। একটু বেশি মাত্রায় প্রগল্‌ভ, তবে বেশ দিলখোলা। বুদ্ধদেবের ভাল লেগেছিল। বেড়াতে বেরিয়েছিল ওর সঙ্গে । গ্রামেব পথে পথে হেঁটেছিল পাশাপাশি। পদমদীঘি, কপিলেশ্বরের মন্দির, হরিণমুড়ির পাড়...সেখান থেকে ক্লাবঘর। লুঙ্গির কোছা বাম হাতে বাগিয়ে বেশ ভারিক্কি চালে হাঁটছিল প্রভঞ্জন। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষজনেব উদ্দেশ্যে অকারণে তর্জন-গর্জন করছিল। টিপ্পনি কাটছিল। এ ভঁড়া, ইদিগ আয়। সেদিন ক্লাবের কাজে গেলু নাই যে বড়? একদিন অমন ধইর্‌ব না...। এ তালগাছের বাগলাগুলা কুন শালা কাইট্‌লি রে? সাহস ত খোব বাড়ছে রে তুয়াদ্যার? বদনা, মরসুম গেল, একদিনও তালরস দিলি নাই যে বড়? কাল যতটা রস বারাবে, সব লিয়ে পৌঁছে দিবি গড়ে। তালের রস খান? খায়্যে

দেখবেন। ভুলা দায়। এক বেলা গ্যাঁজাই লিলে আর দেইখ্‌তে হবেক নাই। এই চপল লুহাব, আমাদ্যার মুরগীর কী হইল্যাক রে? বলছি, শুনছু নাই, একদিন লুট হইয়ে যাব্যেক, তখন বুইঝবি, ঠ্যালার নাম বাব্‌ধন। অতুল্যদা আইবেক বিষ্টুপুর। রাইস মিলে মিটিং। পুরা পাড়া যাওয়া চাই। মাথা গুনতি বুঝে লিব। এইভাবে পথ চলে প্রভঞ্জন। একে-ওকে ধমকায়, আব বুদ্ধদেবের পানে তাকিয়ে দেমাকের হাসি হাসে। এখনও পুরো এলাকায় ওদের কতখানি দাপট, সেটাই বুঝিয়ে দেয় বুদ্ধদেবকে। বিজোড় দাঁতগুলি প্রকট করে হাসে, শালারা বেজায় ডরায় আমাকে। আপনি ছিপ আড়েন?

একদিন বিষ্টুপুরের দিকে রওনা দেবার মুহূর্তে বুদ্ধদেবের ঘরে ঢোকে প্রভঞ্জন। পরনে খুব টাইট চোঙা-প্যান্ট, গায়ে জংলা প্রিন্টের হাওয়াই সার্ট, পায়ে সূচোলো বুটজুতো। বাবরি চুল ঢেউ খেলিয়ে আঁচড়ানো। বেশ মোহনবাঁশি বাজানোর মুদ্রায় কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ায় বুদ্ধদেবের সামনে। বেশ হীরো হীরো পোজ দিয়ে হাসে। বলে, কেমন লাইগ্‌ছে? বুদ্ধদেব তাকিয়ে থাকে ওর বেশভূষাব দিকে। বলে, প্যান্টখানা কি বেশ কয়েক বছর আগে বানিয়েছিলেন? না, না—। দু'দিকে বারংবার মাথা দুলিয়ে বুদ্ধদেবের আন্দাজটাকে মাঝপথে নস্যাৎ করে দেয় প্রভঞ্জন, এই তো, মাসকয় আগে। বুদ্ধদেবের অজ্ঞতায় করুণা জেগেছে তার মনে। বলে, এই কাটিংটাই ইদানীং চইল্‌ছে। চুস্‌-প্যান্ট। আর, জুতাটা দেখুন। প্রভঞ্জন মোহনহাসি হাসে, পইন্টেড শু্য। পল্টুদা তো এসবই পরে। প্যান্ট যদি সামান্য ঢিলা হয় তো এক লাথে দর্জির পেট ফাটাই দিব্যেক। একটা টেলারিং-এর দোকান ধরা আছে পল্টুদার। মডার্ণ টেলারিং পল্টুদার সব প্যান্ট উয়ারাই বানায়। পল্টুদা বইল্‌ল্যাক, বানাই লে এক সেট। কদ্দিন আর গাঁইয়া হইয়ে থাকবি? সহসা বুদ্ধদেবের ওপর খুব সহৃদয় হয়ে ওঠে প্রভঞ্জন, আপনিও এক সেট কাটাই লিন। আপনার তো টাকার অভাব নাই। বড়লোকের একমাত্র ব্যাটা। চাকরি কত্তে আইছেন সখে। সব জানি। একদিন আপনাকে লিয়ে যাব মডার্ণ টেলারিং-এ। আপনি যেমন প্যান্ট-জামা পরেন, জুতা পায়ে দেন, শহরের কুনো মেয়া আপনার দিকে ঘুরেও ভাল্‌বেক নাই। প্রভঞ্জন এক চোখ ছোট করে হাসে।

একটা সাইকেল দরকার হচ্ছিল বুদ্ধদেবের। সারা এলাকা ঘোরা দরকার। পায়ে হেঁটে সম্ভব নয়। প্রভঞ্জন বলে, কিনবেন নাই। দু'দু'টা বন্ধকী সাইকেল পড়ে রইছে গড়ে। শালাবা ছাড় করাতে পারবেক নাই। একটা লিয়ে লিন, সারাইসুবাই লিয়ে চড়ুন। ইদানীং সাইকেলটা গ্রামাঞ্চলে বাড়ছে। প্রভঞ্জনই জানায়। চুয়ামসিনা গাঁয়ে বছর দশেক আগেও সাইকেল ছিল দুটো কি তিনটে। এখন সারা গাঁ চোখ চারিয়ে এলে না-হক দশটা। বিয়েসাদিতে তো চাষাভুষোরাও সাইকেল পাচ্ছে ইদানীং। প্রভঞ্জন তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে দু'ঠোঁটের অভিনব মুদ্রায়। তবে, যা বলেন, সাইকেলে কুনো চার্ম নাই। একখান মোটর-সাইকেল চাই। রাজদূত। পল্টুদা কিনেছে। ইঞ্জিন স্টার্ট কর, গিয়ার দাবাও, সাঁ কইরে উড়ে যাব্যেক পক্ষীরাজ। তবে পিছনে একজন কেউ না বসলে রাজদূত চালিয়ে সুখ নাই। একজন পিছনে বইসে থাইকবেক, দু'হাত দিয়ে কোমর জাপটাই ধরবেক, পল্টুদাকে দেখি তো, সদা-সর্বদা ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। আপনার লাভার আছে? বুদ্ধদেব ধীরে ধীরে বুঝতে চেষ্টা করে প্রভঞ্জনের ভেতরমহলটিকে। কথাবার্তা, রসিকতা, সব কিছুতেই এক ধরনের গ্রাম্য-স্থূলতা। ম্যাড়ম্যাড়ে দেওয়ালে চড়া দাগের আলপনা। তবে মনের মধ্যে খুব প্যাঁচ-পয়জার রয়েছে বলে মনে হয়

না। বুকের মধ্যে যা কিছু বুঁজকুড়ি কাটে, বাক্য হয়ে বেরিয়ে আসে দু'ঠোঁটের নড়বড়ে দরজা ঠেলে। কোনও রাখঢাক নেই। বলে, বাবাকে পটাচ্ছি। রাজি হচ্ছে নাই। আপনি একবার বইল্বেন ত। উয়ার পাশ খোব কদর আপনার। সেদিন বলছিল। ম্যাট্রিকে তিনটা লেটার। পিউতে ফাস্ট্ ডিভিশন। ইংলিশে অনাস্ লিয়ে পড়ছিল। চাবুক ছগরা। বাবাকে চিনেন ত? যাকে ভালবাসবেক মাথায় তুইলে রাখবেক। আর, যার উপর ক্ষেপবেক, তার কপালে দুঃখু। ভীমরুলের জাত। খেদাই খেদাই হুল ফুটাবেক। আপনারা মধ্যশ্রেণী না রাঢ়ীশ্রেণী? দু'দিন না যেতেই একান্তে মীরার গল্প শুনিয়েছিল প্রভঞ্জন। আপনাকে বন্ধুর মতো লিচ্ছি, তাই বলছি। পাঁচকান কইর্বেন নাই। পেটে কথা থাকে তো আপনার? ঐ যে গাঙ্গুলি, প্রমথ গাঙ্গুলি, উয়ার মেয়ে মীরা....। খুব রসিয়ে রসিয়ে বলেছিল মীরার উপাখ্যান। মীরা নাকি ওর জন্য পাগল। হপ্তায় হপ্তায় চিঠি পাঠায় গোরা বাউরির হাতে। দেখতে অবশ্য ভালই, মুখ-চোখ বেশ কাটা কাটা, ফিগারটাও দেখবার মতো, তবে গাঁয়ের মেয়া তো, প্রতিমার গায়ে সদা-সর্বদা একটু-আধটু ধুলা জমবেই। শহরের মেয়াদের মতো স্টাইল-স্টীমার, হাঁটন-চলন, বেশবাস, কথা বলবার কায়দা, এসব সে পাবেক কোথা? গাঁয়ের মেয়া যত সুন্দরীই হোক, কেমন ম্যাদা মেরে থাকে। শহরের মেয়া, সামনে গেলেই রোমাঞ্চ! চোখে চোখ রাইখ্তে পারবেন নাই বেশিক্ষণ। আব, সারা শরীব থেকে সারাক্ষণ ভেসে আইছে আঠাঙ্গীলতার সুবাস।

বত্রিশভাগীর ঘোর জঙ্গলে ঢুকে একদিন বুদ্ধদেবকে আঠাঙ্গীলতা চেনাল প্রভঞ্জন। বলে, পাশে গিয়ে দাঁড়ান, নাক দিয়ে শ্বাস লিন, গন্ধটা অন্যরকম। যুবতী মেয়াদ্যার গায়ের গন্ধ জানা আছে? পাশে গিয়ে শ্বাস লিন, অবিকল তেমন গন্ধ। মাইরি। প্রভঞ্জন তার এক একান্ত ইচ্ছের কথা জানিয়েছিল সেদিন। ওর শোবার ঘরের জানলার পাশে একখানা আঠাঙ্গীলতার গাছ লাগাবে। সারা রাত দখিনা হাওয়ায় যুবতী মেয়ের গায়ের গন্ধ পাবে। কেবল বাবা হরবল্লভের ভয়েই লাগাতে পারে না। বাবা যদি শুধোয়, এ বুনো লতা চৌহদ্দির মধ্যে কেন? কী জবাব দেবে প্রভঞ্জন? সে তো আর বাবাকে বলতে পারবে না আসল কারণটা। তা বাদে, আরও কথা আছে। বাবাটিও তো কম যায় না, কেবল মায়ের দাপটে কাবু, উড়ত্যে লাইরে পোষ মানা। কে জানে, আঠাঙ্গীলতার মাহিত্যের কথা সেও হয়ত বা আমার মতোই জানে। প্রভঞ্জন নিজের রসিকতায় খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসে। কথাগুলো শুনতে খুবই খারাপ লাগছিল বুদ্ধদেবের। কেবল ভাল লাগছিল একটা কথা ভেবে যে, ছেলেটা মনের কথা চেপে রাখতে শেখে নি একতিল।

আঠাঙ্গীলতার মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে সেদিন মীরা উপাখ্যানে আর ফিরে আসতে পারে নি প্রভঞ্জন। দিন-দুইতিন বাদে ফের তুলল পর্দা। মীরাকে নিয়ে একদিন বিষ্টুপুরে সিনেমা দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে প্রভঞ্জনের। কিন্তু মীরা রাজি নয়। তার লজ্জা করে, ভয় করে। বলে, বিয়ের পর যাব। আরে, সে তো যাবেকই, কিন্তু বলুন দেখি, বিয়ার আগে দু'জনায় পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখা, তার সুয়াদই আলাদা। বটে কিনা? তা বাদে বিয়া হবেক কিনা তারও তো ঠিক নাই। উয়ারা রাঢ়ীশ্রেণী, আমরা উৎকল। রাঢ়ীতে-উৎকলে বিয়া হয়? আপনি কোন্ শ্রেণী?

এইভাবে একটু একটু করে বুদ্ধদেবের সঙ্গে আঠার মতো লেপটে যেতে থাকে প্রভঞ্জন। প্রায় সর্বক্ষণই আশে পাশে ঘুরঘুর করে। তার নানাবিধ অসুবিধা দূর করে দেয়। ব্লক অফিসে গিয়েছে বুদ্ধদেব, বিকেলের দিকে প্রভঞ্জন গিয়ে হাজির। কাজ-কাম শেষ হইল্যাক?

কেন বলুন তো? তাইলে চলুন। এক জাগায় যাব। কোথায়? এমন প্রশ্নে প্রভঞ্জন বিজোড় দাঁতের বেশ কয়েকটিকে উন্মুক্ত করে হাসে, চলুন না. আপনাকে আজ খাবাব। পীড়াপীড়ি শুরু করে দেয় প্রভঞ্জন। কিছুতেই ছাড়ে না। পোকাবাঁধের পাড়ে নিয়ে গিয়ে প্রায় জোর করেই মোগলাই পরোটা খাওয়ায় রেস্টুরেন্টে। তারপর সিনেমা দেখতে যাওয়ার জন্য জবরদস্তি শুরু করে। বুদ্ধদেব বহু কষ্টে সে যাত্রা রেহাই পায়।

নতুন ক্লাবঘরে মাঝে মধ্যেই ফিস্ট্ হয়। মাংস-ভাতের ফিস্ট। প্রভঞ্জন টানা-হেঁচড়া জুড়ে দেয়। দু'একবার যেতে হয়েছে বুদ্ধদেবকে। একটু একটু করে একখানা তগীর টান অনুভব করছিল বুদ্ধদেব। কে টানে, কেন টানে, কোন্ দিকে টানে! সুকুমার বলে, তবে আব কি, ঝাঁকের কই মিশে যান ঝাঁকে।

বেশ কিছুদিন বাদে, তগীর মালিকটিকে সম্ভবত সনাক্ত করতে পারল বুদ্ধদেব। একদিন, মাসিক বৈঠকের পর, অকস্মাৎ, অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে বিডিও সাহেব শুধিয়ে বসলেন, প্রভঞ্জনরে কেমন লাগ্‌সে? বুদ্ধদেব সামান্য বিস্মিত। প্রভঞ্জন যে ওর সঙ্গে লেপটে থাকতে চাইছে, এ খবর অত জলদি বিডিও সাহেবের কাছে পৌঁছে গেল কোন্ সংক্ষিপ্ত রন্ধ্রপথ দিয়ে! আবার যখন প্রভঞ্জন একদিন আচমকা শুধিয়ে বসল, 'আপনি সুমিতি করেন?'

'সুমিতি মানে?'

'ইয়ে, আপনাদের কর্মচারী সুমিতি। তার নাকি মেম্বার হয়েছেন আপনি? খুব নাকি মিছিলে-টিছিলে হাঁটছেন?'

বুদ্ধদেব মাথা নেড়ে সায় দেওয়া মাত্র প্রভঞ্জন শুধোয়, 'আপনি কি কম্যুনিস্ট?'

'এমন কথা কেন?'

'আপনাদের সুমিতির নেতারা সব কম্যুনিস্ট। জানেন নাই?' পরক্ষণে যেন নিজের ভুল নিজেই বুঝতে পারে প্রভঞ্জন, 'আপনি ক্যানে কম্যুনিস্ট হবেন? কত বড়লোকের ছেইলা আপনি।'

বুদ্ধদেব আবারও ভাবনায় পড়ে যায়, 'কে বলল, আমি সমিতি করি?'

'বাবা বইলছিল্যাক সেদিন।'

'তিনি কী করে জানলেন?'

'বিডিও সাহেবই বলেছেন উয়াঁকে।'

বুদ্ধদেব জানে, হরবল্লভের সঙ্গে বিডিও সাহেবের একটা অদৃশ্য যোগাযোগ রযেছে। একটা দড়িতে দুটো মানুষ বাঁধা থাকলে যেমনটি হয়। একপ্রান্তে নড়াচড়া হলে, অন্যপ্রান্ত তৎক্ষণাৎ তা টের পায়।

পরবর্তী কালে, এমনও অনুভব হয়েছে বুদ্ধদেবের, বিডিও সাহেবও তগীর আসল মালিক নন। সে থাকে আরও অলক্ষ্যে। আরও ওপরে। তাকে চর্মচক্ষে দেখতে পায় না বুদ্ধদেব। কিন্তু তার প্রচ্ছন্ন ইচ্ছেটিকে বুঝতে পারে। তার অদৃশ্য শক্তির অমোঘতাকে অনুভব করতে পারে। তার রাগ, রোষ, প্রতিহিংসা, তার দন্ত-নখর, সগর্জন মুখব্যাদানকে চিনতে পারে। বুদ্ধদেব তাকে মনশ্চক্ষে দেখে। তার সমগ্র রূপখানির একখানা ঝাপসা অসম্পূর্ণ ছবি এঁকে ফেলতে পারে মনের মধ্যে।

তগীর মালিকটিকে পুরোপুরি চিনতে চাইছে বুদ্ধদেব। ছবিটিকে সম্পূর্ণভাবে এঁকে ফেলতে চাইছে।

আগে ভারতীয়, নাকি আগে কম্যুনিস্ট

উনিশ শো বাষট্টিতে চীন-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কম্যুনিস্টরা বুঝতে পেরেছিল তাদের দুর্দিন সমাগত। আশঙ্কাটা সত্যে পরিণত হল, যখন ঐ সুযোগে পাইকারি-হারে কম্যুনিস্টদের ধর-পাকড় শুরু হল। কম্যুনিস্টরা বলতে চেয়েছিল, হিমালয় এলাকায়, কয়েক হাজার ফুট উঁচুতে, চীন এবং ভারতের মধ্যে কে যে কাকে প্রথমে আক্রমণ করেছে এই সমতলভূমিতে বসে কীভাবে তা নির্দ্ধারিণ করব আমরা? এমন বক্তব্যের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল ভয়ানক। নিমেষের মধ্যে আগুনে যেন ঘি পড়ল। তখন অন্ধ দেশেপ্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে দেশের আপামর জনতা। রেডিও-সংবাদপত্রগুলি প্রতিদিন উত্তেজক মন্তব্য করে চলেছে। নেহেরুর 'পঞ্চশীল' নীতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে চীনারা যেভাবে ভারতের বুকে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশের প্রতিটি মানুষ তার নিন্দায় মুখর। তেমন মুহূর্তে কম্যুনিস্টদের এ হেন মন্তব্যকে সুচারুভাবে ব্যবহার করতে তিলমাত্র বিলম্ব করল না কংগ্রেস। কম্যুনিস্টরা যে চিরকালই দেশদ্রোহী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে তারা ইংরেজদের সাহায্য করেছে, কঠিন মূল্যে অর্জিত স্বাধীনতাকে 'ঝুটা আজাদী' বলে অপমান করেছে, আবার চীন-ভারতের যুদ্ধে চীনের হয়ে কথা বলছে, এ কথাগুলি দেশের মানুষকে অতি সহজে বুঝিয়ে দেওয়া গেল। দেশের মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন যখন পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে কম্যুনিস্টরা, তখনই শুরু হল চতুর্দিকে ব্যাপক ধর-পাকড়। কম্যুনিস্টরা এটা আগাম আন্দাজ করতে পেরেছিল। তারা পার্টির সমস্ত নেতা-কর্মীদের আত্মগোপনের নির্দেশ জারি করেছিল আগেভাগে। যারা সেই নির্দেশকে তৎক্ষণাৎ মান্য করেছে, তারা চলে গিয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ডে। যারা গড়িমশি করেছে, তারা ধরা পড়ে গিয়েছে পুলিশের জালে।

প্রতিদিন রেডিওতে যুদ্ধের তাৎক্ষণিক খবর প্রচার করা চলছে। বাধানগর বাজারে যতগুলি রেডিও রয়েছে, সব ক'টার সামনেই কাতারে কাতারে মানুষ। প্রথম কিছুদিন প্রচার করা হয়েছিল ভারতের লাগাতার জয়ের কাহিনী। ধীরে ধীরে প্রচারের ধরন বদলে যেতে লাগল । ভারত যে বীরের মতো লড়াই করে সসম্মানে পশ্চাদপসরণ করে চলেছে এমন প্রচার ক্রমশ স্থায়ী হতে লাগল। প্রতিদিন আসতে লাগল নানান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভারতের লাগাতার পরাজয়ের সংবাদ। প্রবল শোকে মুষড়ে পড়ল সারা দেশ। উটকো খবরেব শরীরে পাখনা গজাল। চতুর্দিকে উড়ে বেড়াতে লাগল অসম্ভব সব গুজব। চীনারা এগিয়ে আসছে দ্রুতগতিতে। লাদাখ আর নেফা সীমান্তে একজনও ভারতীয় সৈন্য নেই। চীনাদের আর যুদ্ধই করতে হচ্ছে না। তারা মার্চ করে রওনা দিয়েছে দিল্লীর দিকে। কম্যুনিস্টরাই ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। কী করে যেন খবর রটে গেল কোলকাতার আকাশে চীনা উড়োজাহাজ চক্কর মেরেছে বারকয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি বুকে আঁকড়ে বসে রয়েছে যারা সেইসব মুরুব্বির দল মন্তব্য করে, ইবার কলকেত্তায় বোমা পইড়বেক। চারপাশে এক ধরনের 'গেল গেল' রব। যাদের মানুষজন কোলকাতায় পড়ে কিংবা চাকরি করে, তাদের রাতের ঘুম ছুটে গেল। এদিকে জিনিষপত্রের দাম হু-হু করে বাড়ছে। বিষ্ণুপুরের ব্যবসায়ীকুল নিজেদের চাল-আটার আড়তে কুলুপ লাগিয়েছে। সর্বত্র খাদ্যাভাব, অনটন। কেরোসিনও উধাও হয়ে গেল বাজার থেকে। পরিস্থিতি যতই খারাপ হতে লাগল কম্যুনিস্টদের বিপদ বাড়তে লাগল ততই। কংগ্রেসীরা বলে বেড়াতে লাগল, এই বিপর্যয়ের জন্য কম্যুনিস্টরাই দায়ী। ওরা হল ঘবভেদী

বিভীষণ। হাঁড়ির যাবতীয় খবর চীনাদের কাছে পাচার করে ওরা চীনাদের জয়কে সুনিশ্চিত করেছে। দেশটাকে ওরা চীনের হাতে তুলে দিতে চায়।

রেডিও মারফত এক নতুন প্রচার শুরু হয়েছে। জনসাধারণের কাছ থেকে মুক্ত কণ্ঠে সাহায্যের আবেদন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের খাবার নেই, পোশাক নেই, অস্ত্রশস্ত্র, গুলিবারুদ নেই, দেশমাতৃকার এমন সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতীয়কে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে প্রত্যেক ভারতবাসীকে দেশমাতৃকার বেদিমূলে অঞ্জলি দিতে হবে তাদের যা কিছু সম্বল। দেশমাতৃকা আজ অঝোর ঝোরে কাঁদছেন। তিনি প্রতিটি দেশভক্ত সন্তানের কাছে পূজা চান। অহরহ, রেডিওতে, গান-বাজনা, সংবাদ, নাটকের ফাঁকে ফাঁকে প্রচার করা হচ্ছে এই আবেদন। দেশমাতৃকাকে শৃঙ্খলমুক্ত কবতে মুক্তহস্তে দান করুন। ফল যা ফলছে, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। শহরে-গঞ্জে কংগ্রেসের নেতারা শয়ে শয়ে যুবক-যুবতীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। বক্তৃতা করছেন, দেশপ্রেমের গান গাইছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন পাড়ায় পাড়ায়। বিছানার চাদরের চার খুঁটে চারজনাতে ধরে হাঁটছে। ওর মধ্যে মানুষ ছুঁড়ে দিচ্ছে দান। টাকা পয়সা, কাপড়-চোপড়, এমন কি সোনার গয়নাও। দিনের শেষে সবকিছু পুঁটলি বেঁধে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে জেলা-সদরে।

লোখেশোল হাইস্কুলের হেডমাস্টার মহাদেব কয়াল ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখেন। গান লেগেন। সুর দেন। গানও। তাঁর ধারণা, কেবল অজ গাঁয়ে পড়ে থাকবার দরুণ তাঁর এতখানি প্রতিভা জলে গেল। কোলকাতায় যেতে পারলে আজ দেশজুড়ে নাম হত তাঁর। ইদানীং আর কবিতা-টবিতা তেমন লেখেন না মহাদেব। তবে গানটা আজও লেখেন। তেমন কোনও উপলক্ষ জুটে গেলেই ঐ নিয়ে গান লিখে, সুর করে, ছাত্রদের নিয়ে গেয়ে বেড়ান। সেই ১৯৪৭-এ, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গান বেঁধেছিলেন, আজকে এদেশ স্বাধীন হল, উঠল নুতন সূর্য/বাজল ভেরি ঢক্কানিনাদ, বাজল বিজয় তুর্য। আটচল্লিশে মহাত্মা গান্ধী গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর লিখেছিলেন, 'আমাদের ছেড়ে চলে গেলে তুমি জাতির জনক গান্ধী / সারাদেশ জুড়ে ওঠে হাহাকার, মাথা খুঁড়ে মরি কান্দি....।' চুয়ামসিনা, জয়রামপুর, রাধানগরের রাস্তায় রাস্তায় হারমোনিয়ম গলায় ঝুলিয়ে দলবল নিয়ে গেয়ে বেড়িয়েছিলেন পুরো হপ্তাকাল। আবার চীন-ভারত যুদ্ধ নিয়ে গান বেঁধেছেন তিনি, দু'এক জায়গায় ছুটকো-ছাটকা শুনিয়েছেন।

(আমার) মায়ের হাতে শিকল পরায় কোন্ সে নীচাশয়।
জাগছে মায়ের কোটি ছেলে আর করিনা ভয়।
(মায়ের) এক হস্তে অসি আছে, অন্যহাতে বরাভয়,
বীর জোয়ানের অস্ত্রে হবে শত্রুকুলের ক্ষয়।
জয় ভারতের জয়।।

এ্যাদ্দিন একটা বড়সড় সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন মহাদেব। দেশব্যাপী ভিক্ষা-অভিযান শুরু হওয়ামাত্রই সুযোগটা তৎক্ষণাৎ লুফে নিয়েছেন। গলায় হারমোনিয়ম ঝুলিয়ে ছাত্রছাত্রী পরিবৃত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভিক্ষাদলের সঙ্গে। কম্বুকণ্ঠে গেয়ে বেড়াচ্ছেন দেশের গান। সারা এলাকা জুড়ে ধন্যধন্য রব উঠেছে মহাদেব কয়ালের নামে। মহাদেব অনুগতজনদের কাছে একান্তে বলে বেড়াচ্ছেন, তাঁর গানে উদ্বুদ্ধ হয়েই এত মানুষ দান করল এত এত টাকা।

নচেৎ কেউ একটা ফুটা কড়িও বের করত নাই। হুঁ-হুঁ, বাবা, সঙ্গীতের একটা আলাদা শক্তি রয়েছে। সেই জন্যেই তো শাস্ত্রে বলে, গানাৎ পরতরং নহি।

সুকুমার বুঝতে পারছিল, তার দিকে শ্যেনদৃষ্টি রয়েছে সিংহবাবুদের। কানাঘুষোয় শুনতে পেয়েছে, হরবল্লভ নাকি থানায় গিয়েছিলেন ক'দিন আগে। সুকুমারদের সম্পর্কে তাঁর নাকি পাকাপাকি কথা হয়ে গিয়েছে বড়বাবুর সঙ্গে। খবরটা বিষ্ণুপুর পার্টি-অফিসে পৌঁছে গিয়েছে তৎক্ষণাৎ। দিবাকর দত্ত খবর পাঠিয়েছেন, সুকুমার যেন খুবই সতর্ক থাকে। সম্ভব হলে বাছাবাছা কর্মীদের নিয়ে যেন অবিলম্বে আত্মগোপন করে। খবরটা পেয়ে সুকুমারের ইচ্ছে হল, দিবাকরদার সঙ্গে একটিবার মুখোমুখি কথা বলে আসে। আর সেই উদ্দেশে রাতের আঁধারে অন্‌পথ ধরে ধরে বিষ্টুপুর শহরে গিয়েই সে পায় অন্য এক জাতের অশনি-সঙ্কেত।

পার্টির অফিস বন্ধ। দিবাকরদাদের গোপন ডেরায় গিয়ে সুকুমার দেখে বাছাবাছা নেতারা কেউই সেখানে নেই। না দিবাকর দত্ত, না মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুজ্জ্যা, না বিমল সরকার। বসে ছিল কেবল সন্তোষ সাহা আর রাধিকা ধীবর। তাদের থেকে যেটুকু জানা গেল, সন্ধের মুখে বাঁকুড়া থেকে অশ্বিনী রাজ এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গেই কোথায় যেন বেরিয়েছেন ওঁরা। কখন ফিরবেন ঠিক নেই। সন্তোষদার থেকে শহরের পরিস্থিতির হাল-হদিশ পায় সুকুমার। কংগ্রেস উঠে পড়ে লেগেছে। কম্যুনিস্টদের এই সুযোগে একেবারে ধ্বংস করে দিতে ওরা বদ্ধপরিকর। শুধু মাত্র দলটিকেই নয়, কম্যুনিস্ট নেতাদের ব্যক্তিগত চরিত্রহননও চালিয়ে যাচ্ছে পুরোদমে। ধরপাকড় শুরু হয়েছে পুরোদমে। ইতিমধ্যেই ভারতরক্ষা আইনে আটক করা হয়েছে পার্টির কিছু মাঝারি নেতা ও কর্মীদের। নেতারা আশঙ্কা করছেন, যে কোনও মুহূর্তে তাঁরাও গ্রেপ্তার হতে পারেন। পি-ডি-এ্যাক্ট তো ছিলই, সম্প্রতি তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতরক্ষা আইন। মানুষকে বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখবার এই কালাকানুনগুলি বেছে বেছে প্রয়োগ করা হচ্ছে কেবল কম্যুনিস্টদের ওপর।

সন্তোষ সাহা এবং রাধিকা ধীবরের চোখে গাঢ় আশঙ্কা। দুর্ভাবনার ছায়া। বলে, 'বড় দুঃসময় আইছে সুকুমার। পার্টির সুমুখে ঘোর দুর্দিন।' পরমুহূর্তে সন্তোষের চোখেমুখে ফুটে ওঠে সীমাহীন বিরক্তি, 'শুধু হটকারী সিদ্ধান্তই পার্টিটাকে শেষ কইর‍্যে দিব্যেক।'

সুকুমার সামান্য চমক খায়। সন্তোষ সাহার মতো পোড় খাওয়া পার্টি-কর্মীর মুখে পার্টি-বিরোধী কথা!

'অমন কথা বইল্‌ছেন ক্যানে?'

'ক্যানে বইল্‌ছি?' সন্তোষ সাহা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুকুমারের দিকে, 'দেশ আক্রান্ত, জাতি বিপন্ন, আমরা বইল্‌ছি কি? চীন নাকি আক্রমণ করে নাই। ইট্যা একটা কথা হইল্যাক? আমাদ্যার হাজার হাজার জুয়ানকে কি ভূতে মাইর‍্ছে তবে? হইত্যে পারে চীন কম্যুনিস্ট দেশ, তা বলে নিজের দেশের স্বার্থটা ভাইব্‌তে হবেক নাই? সে আমাদ্যার জন্মভূমি। বটে কিনা?' শেষের দিকে সন্তোষ সাহাকে একটু বেশি মাত্রায় উত্তেজিত দেখায়। বলে, 'ইবার লাও ঠ্যালা, ঘর থিকে বারালেই চারপাশের লোক 'চীনের দালাল, চীনের দালাল' বলে চিল্লাচ্ছে। সরকারও সেই পাবলিক সিন্টিমেন্টের সুযোগ লিয়ে ধর-পাকড় শুরু করেছে।' সন্তোষ সাহা গুম মেরে বসে থাকে। বিড়বিড় করে বলতে থাকে, 'পার্টি কইর‍্তে নেমেছ তুমি, ভাইবে-চিন্তে কাজ কইর‍্বে নাই? দুম কইর‍্যে একটা কথা বলে দিলেই হইল্যাক?'

সুকুমার কেমন ধন্ধে পড়ে যায়। সন্তোষ সাহার কথাগুলো ওর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। অনেক দিন আগে পার্টির সর্বোচ্চ নেতা কম : প্রমথ ঘোষ পার্টি-ক্লাসে এসে কম্যুনিস্ট-ইনটারন্যাশন্যাল বুঝিয়েছিলেন। সেখানে প্রতিটি দেশের আলাদা আলাদা পার্টি সত্তাকে অস্বীকার করেছিলেন তিনি। কম্যুনিস্টপার্টি যে সারা দুনিয়া জুড়ে একটিই, প্রতিটি দেশের পার্টি যে তারই এক-একটি শাখা মাত্র, কোনও বিশেষ দেশের নয়, সারা দুনিয়ার শ্রমিক-সমগ্রকে মুক্ত করাই যে আমাদের সমবেত উদ্দেশ্য, এটা খুব সুন্দর করেই বুঝিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, সেই অর্থে কম্যুনিস্টরা কোনও বিশেষ দেশের মানুষ নয়। কোনও বিশেষ রাষ্ট্রের নাগরিক নয়, তারা সারা বিশ্ব-কম্যুনিস্ট-পার্টির সদস্য, সারা দুনিয়ার শ্রমিক-সমাজের অংশ। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদে কম্যুনিস্টরা বিশ্বাসী নয়। যদি প্রমথদার বিশ্লেষণ সঠিক হয়, তবে 'আমরা ভারতের নাগরিক' এই বোধটাকে প্রথমে স্থান দিলে, একজন কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকতার বোধে স্নাত হতে পারবে না। যে কোনও ঘটনাতেই জাতীয় স্বার্থ সামনে এসে পাঁচিলের মতো আড়াল করে দেবে আন্তর্জাতিক ভাবনার দুয়োরগুলিকে। যেমনটি এই মুহূর্তে সন্তোষদার মধ্যে হয়েছে। সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না যে সে প্রথমে ভারতের নাগরিক, ভারতের সন্তান, তারপরে সে বিশ্ব শ্রমিক-সমাজের সদস্য। ফলে ভারত-ভূখণ্ডের প্রতি তার দায় যদি সমগ্র শ্রমিক-সমাজের দায়েরও ঊর্ধ্বে উঠে যায়, তবে কম্যুনিজ্‌ম্-এর ভাবনা থেকে সে বিচ্যুত হতে বাধ্য। এটা ঠিক, কম্যুনিস্টদের প্রকাশ্যে চীনের দালাল বলতে শুরু করেছে মানুষ । এমনও রটনা হচ্ছে যে এদেশ থেকে বহু কম্যুনিস্ট চোরাপথে চীনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে চীনা সৈন্যদের সাহায্য করবার জন্য। হপ্তা-দুই আগে সুকুমার রাইপুরে গিয়েছিল তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে । দু'তিন দিন বাদে ফিরে এসে দেখল, কারা জানি রটিয়ে দিয়েছে, সুকুমার চীনে চলে গেছে।

সন্তোষ সাহা স্পষ্টতই ফুঁসছিল। সুকুমার বুঝতে পারে, চীন-ভারত যুদ্ধের প্রশ্নে পার্টির মধ্যে তীব্র মতবিরোধ শুরু হয়েছে।

যুদ্ধটা শুরু হয়ে গেছে অজান্তে

টোপ খেতে খেতে বুদ্ধদেব যে বড়শিতে আটকে গিয়েছে এমন ধারণা তার মধ্যে ক্রিয়া করছিল বেশ কিছুদিন যাবৎ। তার মধ্যে বড়শি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার প্রথম সচেতন প্রয়াস দেখা গেল একটি নগণ্য ঘটনায়। নাইট-স্কুলে হ্যাজাক জ্বালানো নিয়েই ব্যাপারখানা শুরু হয়েছিল। মুখে বড়শির কাঁটা নিয়ে আচমকা টান মেরেছিল বুদ্ধদেব। তগীর লাটাই যাদের হাতে ছিল, তারা তখন থেকেই বুঝতে শুরু করে এ মাছ বঁড়শি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসুক।

বিপদবাবু একটা নাইট-ইস্কুল গড়ে দিয়েছিলেন চুয়ামসিনা গাঁয়ে। কামদেব দত্তর ব্যাটা গনেশ দত্ত মাস্টার। মাসিক কুড়ি টাকা মাইনে। 'মিতালি -সংঘ'র বারান্দায় বসত ইস্কুল। মূলত চারপাশের আদিবাসী পাড়া থেকে বয়স্ক মানুষেরা আসত পড়তে। সরকার থেকে সিলেট-খড়ি, শতরঞ্জি, বই-খাতা, মায় বিড়ি অবধি দিয়েছিল। গ্রামসেবক হিসেবে বুদ্ধদেবের ওপরই ইস্কুলটা দেখভালের ভার ছিল। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জনা-কুড়ির বেশি বয়স্ক মানুষ জোটে নি। তাও তাদের হাজিরা একেবারেই নিয়মিত ছিল না। রোজদিন সন্ধ্যের আঁধারে বুদ্ধদেবকে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে তাদের প্রায় ধরে আনতে হত। তাও সবাইকে আনা যেত না। তিন-চার

পাড়া ঢুঁড়ে দশ-বারো জনের বেশি জোগাড় করতে পারত না বুদ্ধদেব। ওদেব মধ্যে আবাব তিন-চারজন রোজই বাড়ি এবং ক্লাবঘরের মধ্যবর্তী জলকুলি, ডাঙা, পুকুবপাড়, খোঁযাড়বাড়ি ইত্যাদির মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ গায়েব হয়ে যেত। পরের দিন কিংবা তার পবেব দিন দেখা হলে দাঁত গিজুড়ে কৈফিয়ত দিত, আচমকা আইজ্ঞা এমন জলঘাট পাইয়ে গেল্যাক। কিংবা প্যাটটা অমন মুচড়াল্যাক। অথবা মাথাটা অমন দপদপাল্যাক। অবস্থা এমন হল, দিনের বেলা বুদ্ধদেবকে দেখলে যারা দূর থেকে হাঁক মেরে কথা কয়, সন্ধেটি নামলেই তারা দূর থেকে নিঃশব্দে সরে পড়ে, রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঝুপ করে বসে পড়ে ঝোপের মধ্যে, গাং-দিয়ালি থেকে বিদ্যুৎগতিতে ঢুকে পড়ে নিজের ঝোপড়ির মধ্যে। ছেলে কিংবা নাতির দল যখন-তখন হুমকি দেয়, আজ সইন্ঝায় রামসেবকবাবুকে আইতে দাও একটিবার, ধরাই দুবো। যে-সব ঘোড়া শেষ অবধি পুকুরপাড়তক্ক আসে, তাদের জল খাওয়াতে যে কী ঝক্কি পোহাতে হয গণেশ দত্তকে। পড়তে বসে প্রথমেই ওরা সবাই হাত পেতে দেয় গণেশেব সামনে। একখানা করে বিড়ি দিলে, তবেই সিলেট-খড়ি ছোঁবে। মৌজ করে বিড়িটা শেষ করে ওরা কোরাসে চেঁচাতে শুরু করে, আয় অজগর আঁইছে তেইড়ে / আয় আমটি খাব্ব পেইড়ে। উঁদুর ছ্যানা ভয়ে মরে / ঈগল পাখি....ঈগল পাইখটি কী বটে মাস্টর?

—উই শিকব্যা পাখিরই এক জাত।

—বটে? ত, দে, একটা বিড়ি দে। দুরহ বাবু, শুধু বকাঁই মাইর্‌ছ, বিড়ি দিবার ব্যালায় কলাটি।

কোনও গতিকে একটা যোগ কিংবা বিযোগের অঙ্ক কষে ফেলতে পারলেই একটা বিড়ি চাই। নচেৎ পরের অঙ্কটি কষায কার সাধ্যি। বিড়ি নাই ত পড়া নাই। দেখেশুনে বুদ্ধদেব হতাশ। বিরক্ত। মানুষের যদি নিজেরই না আঠা থাকে, মানুষ যদি ঘোর অন্ধকারে স্বেচ্ছা-নির্বাসন চায়, সরকারের ক্ষমতা কি, তাদেব আলোয় টেনে আনে! মানুষ যদি পেঁচা হয়ে থাকতে চায়, আলো যদি তাদের চোখে না সয় । সুকুমার বলে, আসলে, এই বযেসে পড়াশুনাটা ওদের নিজের কাছেই একটা প্রচণ্ড তামাশা বলে মনে হয়। বুদ্ধদেবের ভারি তেতো লাগে কথাগুলো। বলে, তামাশা মনে হয? আব, দশ টাকা কর্জ দিযে যখন একশো টাকা লিখে তাব তলায বুড়ো আঙুলের ছাপ নিযে নেয মহাজন, সেটা বুঝি কিছু কম তামাশা? সুকুমাব বেশ খানিকক্ষণ গুম মেবে বসে থাকে । এক সময খুব স্বাভাবিক গলায় বলে, আপনি এক কাজ করুন। একদিন সকাল থিকে সন্ধ্যাতক্ক আধপেটা খেয়ে মাঠে খাটুন। তারপর আমি আপনাকে সারা সন্ধ্য পড়াব। আপনাকে বিড়ি খেতে দুব, পড়ালিখা কইর্‌লে কী কী ভাল হয়, বুঝাব। রাজি?

একটা হ্যাজাক দিয়েছিল ব্লক থেকে। নাইট ইস্কুলেব জন্য। সব ইস্কুল পায না। হরবল্লভের বিশেষ সুপারিশে, প্রভঞ্জনের বিশেষ উদ্যোগে, বিপদবাবুর বিশেষ সহৃদয়তায়, পাওয়া গেছে। দু'দিন জ্বলেওছিল পড়ুয়াদের মধ্যিখানে, তাবপরই চলে গেছে বারান্দা থেকে ক্লাবঘবের মধ্যে। সেখানে ক্লাবের মেম্বরদের একটা দল তাস খেলে, অন্য দল ক্যারম। হ্যাজাকটা মধ্যিখানে রাখলে দু'দলই দেখতে পায়। বিশেষ করে ক্যারম খেলতে হলে আলোর দবকার হয় বেশি। টিপ করে গর্তে ফেলতে হয় তো। প্রভঞ্জনের ভাষায়, অল্প আলোয় টিপ

করে করে ঘুঁটি মারলে অল্পক্ষণের মধ্যেই মাথা ধইরে যায়। বুদ্ধদেব লক্ষ করে, পড়ুয়ারা পড়ছে সিংহগড়ের পুরোনো চৌকোনো লণ্ঠনের কিংবা ডিবরি লম্ফের কালি-ঝুলি মাখা আলোয়, আর ক্লাবের ভেতরে হ্যাজাক জ্বালিয়ে বাবুঘরের ছেলেরা তাস-ক্যাবাম খেলছে। দশ-বারোটা ছোকরা মিলে ঘরের মধ্যে হল্লা তোলে রোজ। গনেশ দত্তও মাঝে মধ্যে গিয়ে ঐ দলে ভেড়ে। ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যায়। সুযোগ পেলেই দু'একদান খেলতে বসে যায়, কাউকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে। পড়ুয়াদের কোনটাতেই আপত্তি নেই। নির্বিকার তারা। বুদ্ধদেব তাদের মধ্যে কিছুতেই আগুন ছোঁয়াতে পারে না। তাদের হকের হ্যাজাক নিয়ে যে বাবুঘরের ছগরারা খেলাধুলা করছে, এই নিয়ে প্রবীণ পড়ুয়াদের সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেছে বুদ্ধদেব। তারা কোনও কিছুতেই তেমন করে ক্ষেপে ওঠে না, কোনও তালেই তেমন করে বাজতে চায় না। বলে, হ্যাচাকখান্ পাশে থাইক্‌লে বিড়ি ধরাতে সুবিধা হয়, এই আর কি। ফোকরের মইধ্যে সেঁধাই দিলে ঝটপট আগুন জ্বইলে যায়। আর গণেশ দত্ত যে অর্ধেকটা সময় তাস-ক্যারম খেলে এ ব্যাপারেও ওদের কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। পড়াটাই তো এক বিড়ম্বনা ওদের কাছে। নেহাৎ বুদ্ধদেব, আর ব্লকের কিলাপ-বাবু এমন করে জাপটাই ধইরল্যাক...। হরবল্লভও প্রথম মিটিনে কিলাপ-বাবুর সাক্ষাতে বলেছিলেন, সুযোগ যখন পাচ্ছ ত শিখে লাও। উকিল-হাকিম হওয়ার তো বইস নাই, কিন্তু বলা নাই যায়, ইস্কুলের মাস্টার-টাস্টার হইয়ে যেতে পার। খুব মজার কথা বিবেচনায় মুরুব্বিরা সব কানতক্ক হেসেছিল। এইভাবে এলাকার নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মযজ্ঞে নিজেকে সামিল করেছিলেন হরবল্লভ। বলেছিলেন, অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ, কবির কথা। তা বলে নিজের খাস মাইন্দার ইন্দ্র বাগদি, পাগল শিকারি, রতন শিকারিদের এই বিবেচনার বাইরে রেখেছিলেন। অন্তরালে ওদের কানে এমন কিছু মন্ত্র ঢেলেছিলেন, মগজের ইস্কুলপটা এতখানি টাইট করে দিয়েছিলেন যে বুদ্ধদেব ওদের কিছুতেই রাজি করাতে পারল না। তার বদলে ইন্দ্র বাগদি বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে ফুট কেটেছিল, গেরিবের তরে ভারি এক ঘড়ারোগ আমদানি কইর্‌ল্যাক আমাদ্যার রামসেবকবাবু। সেই বলে না, দাতা বড় বিরস্পতি, মাইগ্‌লে ঘড়া, দেয় হাতি। দু'মুঠা ভাতের বন্দোবস্ত কইরে দে না রে বাপ। বুঝি, তুয়ার লগার ত্যাজ।

কিন্তু কথাটা হচ্ছে হ্যাজাক নিয়ে। হপ্তাটাক বাদে বুদ্ধদেব প্রথম আপত্তি জানাল। নাইট-স্কুলের জন্য বরাদ্দ হ্যাজাকে তাস-পাশা খেলা উচিত নয়। ওদের জিনিস ওদেরই কাজে লাগা উচিত। প্রভঞ্জন বড় একটা গা করে নি। তখনও বুদ্ধদেবকে নিজেদের মানুষ বলে ভাবত ওরা সবাই। চোখ টিপে বলেছিল, বাদ দ্যান দেখি। ডিবরি-লম্ফতে ভালই বিড়ি ধরাতে পারবেক উয়্যারা। গলা খাটো করে বলেছিল, কুত্তার পেটে ঘি সইবেক নাই। কুন্‌দিন শুনবেন, হ্যাজাক বাস্ট্ কইরে, লঙ্কাকাণ্ড। প্রভঞ্জনদের সামনে আর কথা বাড়ায় নি বুদ্ধদেব। কিন্তু দিনকয় বাদে হরবল্লভ বিষ্টুপুর থেকে ফিরেই বুদ্ধদেবের পানে খরচোখে তাকালেন এবং তখনই চুয়ামসিনার বাবু-সমাজ জানল, তগী কাটবার তাল করছে মাছটা। সে বিডিও সাহেবের কাছে লিখিত জানিয়েছে, নাইট-স্কুলের জন্য বরাদ্দ হ্যাজাকের অপব্যবহার হচ্ছে।

সেদিন সারা সন্ধে গুম মেরে রইলেন হরবল্লভ।

হরবল্লভ সিংহবাবুব মুখে ঘনিয়ে আসা যে অন্ধকার সেদিন দেখেছিল বুদ্ধদেব, দিন দিন সেই অন্ধকারখানি ক্রমশ গাঢ় হল। এবং স্থায়ী হল। এবং বুদ্ধদেব সেই আষাঢ়ে-মেঘের বুকে গোপন বিদ্যুতের ঝিলিক প্রথম দেখল বৈঢ্যার মিটিং-এ।

দিনটা শুরু হয়েছিল এইভাবে। সুকুমার আচার্যর বাড়ি থেকে সিংহগড়ে ফিরছিল বুদ্ধদেব। হাতে একখানা চটের থলি। থলির মধ্যে সাদা রঙের দানা। অবিকল চিনি যেমন। আন্দাজ পাঁচ-সের মতো।

হরবল্লভ বলেন, 'কন্ট্রোল থেকে চিনি আনলেন নাকি? বাড়ি লিয়ে যাবেন?'

বুদ্ধদেব হাসে। ভারি তিক্ত হাসি। বলে, 'আপনি ভালই জানেন, কন্ট্রোলের নিয়ম ভেঙে আমি কিছু নিই না।'

হরবল্লভের মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। তিনি বুঝতে পারেন, খোঁচাটা তাঁকেই মারা হল। তিনি তো ভালই জানেন, রাসবিহারী তুঙ্-এর কন্ট্রোলের দোকানের অর্ধেক চিনি আর কেরাসিন তাঁরা পাঁচ-ছ'টা পরিবারই মিলে-ঝুলে খান। কন্ট্রোলের চাল-গম ওঁরা কস্মিনকালেও নেন না। কেবল চিনি আর কেরাসিন। হপ্তায় হপ্তায় প্রচুর পরিমাণে চিনি তো লাগেই সিংহবাবুদের। কেরাসিনও লাগে। সিংহগড়ে বারো মাসে তেরো পার্বন লেগেই থাকে। রাস-দোল-দুর্গাপূজা বাদেও হরেক পুজো-আচ্চা, উৎসব । সম্বৎসর দু'বেলা সিংহগড়ে লোকজনের আনাগোনা তো লেগেই থাকে নিত্যদিন। বাবু-ভায়া, পুলিশ-আমলা, কেউ না কেউ আসেনই। আসেন, খানা-পিনা করেন, রাত্রিবাস। সেই সুবাদে সিংহগড়ে হ্যাজাক জ্বলে প্রায় ফি-রাতে। স্টোভ জ্বালিয়ে চা বানাতে হয় দিনে দশবার। কাজেই, মাঝে মাঝেই, 'রাসবিহারী পাঁচসের চিনি আর দশ লিটার কেরাসিন পাঠাই দাও' এমন নির্দেশ পাওয়া মাত্রই রাসবিহারী অভিলাষ মারফৎ পাঠিয়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গেই। রাসবিহারীর আর কোন্ কচুপুড়াটি! প্রেসিডেন যদি নিজেই চেয়ে পাঠায়! খাতাপত্র ঠিকঠাক রাখতে তেমন অসুবিধে হয় না রাসবিহারীর। চুয়ামসিনা—লোখেশোলের বাউরি, বাগদি, লোহারেরা আর কে কবে চিনি তোলে রেশনে! কেরাসিনও যেটুকু তোলে, নামমাত্র। চাল-গমই তুলে উঠতে পারে না সব হপ্তায়। ওদের কার্ডগুলো সব জমা থাকে রাসবিহারীর দোকানে। কার্ডের ধার ধারে না ওরা, যখন হাতে পয়সা আসে, চাল-গম যেটুকু দরকার, রাসবিহারী দিয়ে দেয়। কিন্তু সেটাও তার স্টকের তুলনায় যৎসামান্য। বাকি স্টকেরও হিসেব মিলিয়ে রাখে রাসবিহারী। প্রতিটি কার্ডেই চাল-গম-চিনি-কেরাসিন এন্ট্রি করে রাখে। এইভাবেই, মাল যা তোলে, সবটাই বিলি দেখিয়ে দেয়। ফি-হপ্তায় যে বিপুল পরিমাণ মাল বেড়ে যায়, তার এক অংশ বিষ্টুপুরেই কানাহিয়ালালের কাছে বিক্রি করে দিয়ে আসে। বাকিটা দিয়ে নিজের এলাকায় চুটিয়ে মহাজনী করে। দোকানেই তার মহাজনীর আলাদা খাতা রাখা থাকে। সে খাতার অঙ্ক, হিসেব, খুবই জটিল। কন্ট্রোলের চাল-কম দিয়েই সে দাদন বিলি করে মাহিন্দরদের। চড়া সুদে কর্জও দেয়।

এসব করতে গিয়ে রাসবিহারীর মনে তো ভয় জাগে অল্পস্বল্প। এক ধরনের অপরাধবোধও তৈরি হয়। সেই অপরাধবোধের স্খালন ঘটাবার উদ্দেশ্যেই সে হরবল্লভসহ এলাকার মান্যগণ্য ব্যক্তিদের প্রয়োজন মতো মাল দিয়ে দেয় মুখ থেকে কথা না খসতেই। এভাবেই সে এলাকার চাঁইদের তুষ্ট রাখে। তাদের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ যাচ্ঞা করে।

এ হল, ঠাকুর-দ্যাবতাকে তুষ্ট করা। যেমন ঠাকুরের তেমন পূজা। দুনিয়ার মানুষ যে ঠাকুর-দ্যাবতাকে পূজা করে, তুষ্ট করে, তার পিছেও হেতু ঐ একই। পাপ করলেই যমের ভয়, যম না জানি কেমন হয়! মনে পাপ থাকলে, বনে গিয়েও ভয় যায় না। তো, অবিরাম পাপ

করছে মানুষ। পাপ থেকে ভয়, কখন কী হয়! সেই কারণেই পাপের কিঞ্চিৎ ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। পাপী মানুষ মন্দির গড়ে, পুজো-আচ্চা, দান-ধ্যান করে। ঠাকুর-দ্যাবতাকে তুষ্ট রাখে। গরীব মানুষের কেড়ে নেওয়া শস্যের একটা অংশ দিয়ে তারা অন্নভোগ, খিচুড়িভোগ, পরমান্নভোগ রেঁধে ঠাকুরকে নৈবেদ্য দেয়। খাও ঠাকুর, সুখে থেকো, বিপদকালে আমাকে দেখো। আসলে, পাপের দোসর জুটিয়ে নিতে চায় সবাই। কুকর্মের সঙ্গী। যাবতীয় কুকর্মের পেছনে একজন মুরুব্বি জুটিয়ে নিয়ে শান্তি পায়। পাপী মানুষের কাছে ঠাকুর-দ্যাবতাও তেমনি এক-একজন রহস্যময় মুরুব্বি। তা সে স্বর্গের ঠাকুরটি হোক, আর মর্তের দু'পেয়ে ঠাকুরই হোক। রাসবিহারীও তার কুকর্মের পেছনে মুরুব্বি-বল চায়। হরবল্লভরাই তার মুরুব্বি। জবরদস্ত খুঁটি। মেঢ়া লড়ে খুঁটির জোরে।

হরবল্লভ কঠিন চোখে তাকান। প্রমথ গাঙ্গুলি ঠিকেই বলেছে, এ অন্য ডালের পাইখ। মুৎসুদ্দিবাবুর ঠিক উল্টো। ইদানীং আবার সুকুমার আচায্যির সঙ্গে খোব লটরপটর। বাউরি -বাগদিদের পাড়ায় খোব আনাগোনা, ওঠাবসা। সেই বলে না, অগুরু-চন্দন ফেলে চায় শ্যাওড়া কাঠ / কোকিলের ধ্বনি ফেলে, বানরের নাট। সেই বিত্তান্ত। সেদিন কথায় কথায় বিডিও সাহেবের সুমুখে কথাটা তুলেছিলেন হরবল্লভ। সব কিছু মন দিয়ে শুনলেন বিডিও সাহেব। লম্বা হাই তুললেন। বললেন, 'বরোলোকের একমাত্র পোলা, স্টুডেন্ট হিসেবে ব্রিলিয়্যান্ট। কেবল স্বাধীন দ্যাশটারে গর্‌বার জন্যে সব ছাইরা-ছুইরা দিয়া গ্রামসেবকের চাকরি নিয়েছে। বরোলোকের পোলার খেয়াল আর কি! আবেগটা ফিল করেন।' বিডিও সাহেব হাসেন। হাসিতে চাপা তাচ্ছিল্য। বলেন, 'আবেগ হইল গিয়া দুধের ফেনা। থিতাইয়া গেলে অর্ধেক কমিয়া যায়। থিতাইতে দ্যান। ঘোরটা না কাটা অবধি উর্‌বে। উর্‌তে দ্যান। গভর্নমেন্টের চোখ-কান খোলা থাকে মশাই। ঠিক সময়ে ডানা ছাঁইট্যা দিমু গা। ঘাব্‌রাইয়েন না।'

উপস্থিত, বুদ্ধদেবের খোঁচাটা নিঃশব্দে হজম করেন হরবল্লভ। বলেন, 'তবে কুখিকে আনলেন চিনি? বাজার থিক্যে?'

সামান্য গম্ভীর দেখায় বুদ্ধদেবকে, 'এটা চিনি নয়।'

'তবে?'

'ইউরিয়া। জমিতে দেবার সার। ফসল ফলবে দ্বিগুণ।'

'জানি, জানি, ঐ লিয়ে এক মহাভারত হয়ে গেছে।'

রুষ্ট চোখে তাকিয়ে থাকেন হরবল্লভ। উন্নত প্রথায় চাষ করবার জন্য গোবর-সার ছাড়াও সরকাব আরও অনেক কিসিমের সারের কথা বলছে বটে। কিছুদিন ধইঞ্চা-বীজ বোনানোর হিড়িক চলল। এখন আবার ইউরিয়া। হরবল্লভের তিলমাত্র বিশ্বাস নেই এসব বিলিতি সারে। সরকার কী না বলে! ওদের কথায় নাচতে গেলেই হয়েছে। সরকার তো ইদানীং জমিনে হাড়ের গুঁড়াও ছড়াতে বলছে। আরে রামো! হাড়ের গুঁড়া ছড়াব জমিনে! হাড়ের গুঁড়া থেকে রস নিয়ে ফসল ফলাবে গাছ, সেই ফসল আমরা খাব! ঠাকুর-দ্যাবতাকে ভোগ দিবো! গরুর হাড়ের গুঁড়া—মা বসুমত্তার বুকে তাই কখনো ছড়াতে পারে হিন্দু চাষীবা? সরকারের মাথার ঠিক থাকলে এমন কথা বলে! সরকার কি জাত-ধরম লিতে চায় মাইন্‌ষের! সেই একবার, মুৎসুদ্দিবাবু এনেছিলেন ঐ হাড়ের গুঁড়ো। শোনামাত্তর তল্লাটের মানুষ রেগে কাঁই। নেহাৎ মুৎসুদ্দিবাবুকে হববল্লভরা পঞ্চজনা ভালবাসতেন, তাই বড়সড় কোনও ঝঞ্ঝাট

বাধে নি। তবে, রাতারাতি সমস্ত হাড়ের গুঁড়ো গো-ভাগাড়ে ফেলা করিয়ে, কাচারি ঘরকে ধুয়েমুছে গঙ্গাজল ছিটিয়ে তবে শান্তি। মুৎসুদ্দিবাবু এব পরেও যদ্দিন ছিলেন, কোনও বিলাতি সার ঢোকান নি চুয়ামসিনা গাঁয়ে। বলক আপিস থেকে যা তাঁকে বিলি করবার জন্য দেওয়া হত, সবটুকু ফেলে আসতেন কানশিকড়ার শ্মশানে। হরবল্লভ প্রতিবারেই সার্টিফিকেট দিয়ে দিতেন। 'সরকার প্রদত্ত যাবতীয় সার পরীক্ষামূলকভাবে নিম্নলিখিত চাষীগণের জমিনে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা হইল। ফলাফল সন্তোষজনক।' তলায় লিখে দিতেন কিছু বশংবদ চাষীর নাম। কোনদিন কোনও ঝঞ্ঝাটই হয় নি ঐ নিয়ে। উনি চলে যাওয়ার পর কিছুদিন বন্ধ ছিল ব্যাপারখানা। আবার এ ছোকরা শুরু করেছে। হাড়ের গুঁড়ার পাশাপাশি এ আবার আমদানি করেছে ইউরিয়া। গোদের উপর বিষফোঁড়া। পয়লা চটকায় গাঁয়ের মাতব্বরদের সন্দেহ হয়েছিল, ইংরাজী নামের আড়ালে এও বোধ লেয় হাড়-গুঁড়াই। কিন্তু কৃষি-আপিসার স্বদেশ কুণ্ডু এবং স্বয়ং বিডো সাহেব আশ্বস্ত করেছেন যে, এ সারে পশুর হাড়ের লেশমাত্র নেই। তবে হ্যাঁ, এ একজাতের রাসায়নিক সার। হাড়-সারের আতঙ্কটা গেছে বটে তখনকার মতো, কিন্তু তাও বেঁকে বসেছে তল্লাটের মানুষ। দেশে-গাঁয়ে গোবর-সার থাকতে এসব হাবিজাবি কেম ফেলব জমিনে? বাপ-চোদ্দপুরুষ গোবরসারে চাষ কইরে আইল্যাক, বিলাতি সারে কী দরকার আমাদ্যার? কাজ কি আমার অন্য ধনে? সেই বলে না, মা'র দুধ খেঁইয়ে পেট ভইরল্যাক নাই, বাপের উট্যা চুষে ভইর্‌বেক? ধরিত্রী হইল্যাক মায়ের তুল্য, মা বসমত্তা, উয়ার শুদ্ধ অঙ্গে উসব ইসিড়বিসিড় চিজ কি দিয়া চলে? হরবল্লভ খোঁজ দিয়ে দেখেছেন, বিষ্টুপুর থানায় কোনও এলাকাতেই চলছে না এসব সার। সব এলাকার গ্রামসেবকেরাই কৌশলে সামাল দিয়ে চলেছে পরিস্থিতি। সাপও মরছে, লাঠিও ভাঙছে না।

বুদ্ধদেবের ভারি ব্যাগখানাব দিকেআড়চোখে তাকান হরবল্লভ। মনে মনে শ্লেষে ভেঙে পড়েন। অকর্মা লাপিতের বোঝাভরা ক্ষুর। মুখে বলেন, 'আপনি আবার ঐসব আনতে লেগেছেন?' দু'চোখে কুতকত করে সন্দেহ। শুধুই ইউরিয়া, নাকি হাড়ের গুঁড়া-ফুড়াও আছে মশয়? দেখবেন, আমার গড়ে যেন উসব চিজ ঢুকাবেন নাই ভুলেও। আমার গড়ে দু'দুটা জাগ্রত ঠাকুর।

ইউরিয়া আর বোনডাস্ট সিংহগড়ে রাখে না বুদ্ধদেব। প্রথম দিনেই বাধা পেয়েছে। অনাথবন্ধু আর সুকুমারের বাড়িতেই থাকে এসব। হরবল্লভের কথায় বাঁকা চোখে হাসে বুদ্ধদেব. 'মাত্র দুটো ঠাকুব কেন, অন্তত বিশ-পঁচিশটা ঠাকুরের অধিষ্ঠান আপনার গড়ে।' হরবল্লভ এবারও খোঁচাটা বুঝতে পারেন। দেবোত্তর হিসেবে বেশ কিছু শিলিং-বহির্ভূত জমি রেখে দেবার উদ্দেশ্যে বিশ-পঁচিশটা পাথরের মূর্তি এনে রেখে দিয়েছেন মন্দিরে। প্রতাপলালের আমলেই হয়েছে সেসব। প্রত্যেক ঠাকুরের পৃথক পৃথক নামকরণ করেছেন। প্রত্যেকের নামে পৃথক পৃথক সম্পত্তি। কোনটার সেবাইত হরবল্লভ, কোনটাব প্রভঞ্জন, দেবিদাস...।

এ খোঁচাখানিও নিঃশব্দে হজম করেন হরবল্লভ। মুখে বলেন, 'আমার গড়ে যতগুলা ঠাকুরই থাক্, সে আমার ব্যাপার। আপনি কিন্তু শুধুমুদু ভূতের বেগার বইছেন. মশয়। গাঁয়ের মানুষ মরে যাবেক, তবু এইসব চিজ জমিনে ফেলতে দিবেক নাই। মাঝের থিকে কখন যে কী ঘটে যায়! মাইনষের ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত দিলে...।'

বুদ্ধদেব জবাব দেয় না। কেবল তার চোয়ালদুটো অলক্ষ্যে শক্ত হয়ে ওঠে। ধীরপায়ে সদর দরজার দিকে পা বাড়ায়। আজ বৈঢ্যায় উন্নত প্রথায় চাষের মিটিং। হরবল্লভ বোঝেন, ঐ মিটিং-এর উদ্দেশ্যেই অমন আড়ম্বর সহকারে চলেছে ছোকরা।

বৈঢ্যার মিটিং-এ বেশ লোকসমাগম হল।

কমবেশি একশো মানুষের জমায়েত। তাদের মধ্যে নব্বই জনই খেটে-খাওয়া দিনমজুর। এই ধরনের মিটিং-এ তাদের উপস্থিত থাকবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু কেমন করে জানি রটে গিয়েছিল, আজ বৈঢ্যার মিটিনে অনেক কিছু চিজ বিলি করবেন বলকের বাবুরা। মানুষ পিলপিল করে এসেছে তারই টানে।

অধর ঝারমুনিয়াও জমায়েতের মধ্যে থাবড়ে বসেছে। ইদানীং সে এ ধরনের সমস্ত মিটিং-এ যায়। বলা যায় না, কোন্ পথে মক্কেল মিলে যাবে। এই যে বলক-লোন বিলি হয়, কমিশনের বিনিময়ে সেই তো ব্যবস্থাপাতি করে দেয়। বলকে যাতায়াত না থাকলে এসব জানা যেত? আজকাল কত জিনিষপত্র আসছে মানুষের জন্য। তার বিলি-ব্যবস্থায় কত খেলা। টিমের মধ্যে শুধু ঢুকে পড়। ব্যস। খেলতে থাক, টাকা কামাও। কুয়া আসছে। লোন আসছে। নানান খয়রাতি।

মিটিংয়ের প্রধান বক্তা স্বদেশ কুণ্ডু, ব্লকের এ-ই-ও। অর্থাৎ কিনা কৃষি অফিসার। উপস্থিত রয়েছেন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হরবল্লভ সিংহবাবু, ঝাড়েশ্বর নায়ক, মনোমোহন গোস্বামী এবং আরও জনাচারেক মাতব্বর ব্যক্তি।

স্বদেশবাবু বক্তৃতা শুরু করেন। স্বাধীন দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখান। গ্রামগুলোকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে মহাত্মাজীর আজীবনকালের দেখা স্বপ্নগুলোর কথা বলেন কৃষির উন্নতি করতে হবে। নতুন জাপানি প্রথায় চাষবাস শুরু করতে হবে। নতুন নতুন সার প্রয়োগের বিধি শিখতে হবে। ধইঞ্চা গাছের বীজ বুনতে হবে জমিতে। তাতে করে জমিতে সবুজ-সার তৈরি হবে। হাড়ের গুঁড়ো, ইউরিয়া ইত্যাদির ব্যবহারও শিখতে হবে। বিনামূল্যে ধইঞ্চা-বীজ, হাড়ের গুঁড়ো আর ইউরিয়া দিচ্ছে সরকার। অল্প সুদে লোন মিলবে। সাবডোবা তৈরির জন্য, পতিত জমিন উদ্ধারের জন্য, সেচ-কুয়া, সেচ-বাঁধ তৈরির জন্য।

পাগল শিকারিরা এক সময় হাই তুলতে থাকে। এসব কথা শোনাবার জন্য ওদের যে কেন ডেকে আনা হয়েছে সেটাই মাথায় ঢোকে না কিছুতেই। ওদেব জমিন নেই, জিরেত নেই, কিছুই নেই। মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা! পরনেব লেংটিও নেই যাদের, কোছা বাগিয়ে কাপড় পরবার কৃৎকৌশল শিখে কী হবেক! ধইঞ্চা বীজ আর হাড়ের গুঁড়া লিয়ে কি পোঁদে পুরব আইজ্ঞা? বাবুরা যে কী মস্করা করেন!

এক সময় উঠে দাঁড়ায় পাগল শিকারি। বলে, 'ঘোড়াই নাই তো চাবুকের মাহিত্ম্য শুনে কি হব্যেক আইজ্ঞা? হুকুম করেন, আমরা তেবে ঘরে যাই ইবার।'

স্বদেশবাবু অস্বস্তি বোধ করেন। চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে সামলে নেন। বলেন, 'যাঁদের জমি-জিরেত রয়েছে, তাঁরা তো এসব করতে পারেন।'

'উঁয়ারা হু-ই উদিকে বইসেছেন বেঞ্চিতে।' পাগল শিকারি আঙুল দিয়ে দেখায়।

বেঞ্চিতে বসে রয়েছেন হরবল্লভরা চার-পাঁচজন। তাঁদের দিকে তাকান স্বদেশবাবু। মনে মনে বড় অসহায় বোধ করেন তিনি। তাও হাল ছাড়েন না। বলেন, 'তোমাদের জন্যও ব্যবস্থা আছে হে।'

জমায়েত সামান্য উৎসুক হয়।

'তোমরা বিনামূল্যে নারকোল চারা, সুপুরি চারা পাবে ব্লক থেকে। যে যার বাড়িতে লাগাবে। তাছাড়া হাঁস-মুরগি, গাই-গরুও পেতে পার।'

পাগল শিকারিদের ঈষৎ দ্বিধাগ্রস্থ দেখায়। কয়েকটা নারকোল আর সুপারি চারা লাগিয়ে কি দুখ যাবেক! এই রাঢ়ের দেশে নারকোল-সুপারি ফলবেক? হাঁস-মুরগি কিংবা গাই-গরু দিলে অবশ্যি অন্য কথা।

হাঁদা মুর্মু উঠে দাঁড়ায়, 'তাইলে আমাদের প্রেত্যেককে একটা করে গাই-গরু দ্যান আইজ্ঞা। আর, গটাকতক হাঁস-মুরগি।'

স্বদেশবাবু এবারও দমে যান। সাকুল্যে পনেরটা গাই এসেছে সারা ব্লকে। পুরো লায়েকবাঁধ ইউনিয়নের জন্য একটার বেশি মিলবে না। হাঁস-মুরগীও গোটা বিশেকের বেশি নয়। তবুও তিনি জোর গলায় বলেন, 'সবাইকে তো একসঙ্গে দেওয়া যাবে না। ধীরে ধীরে পাবে সবাই।'

হরবল্লভ এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিলেন। একসময় ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় ওঁর। স্বদেশবাবুর কানের কাছে মুখ এনে বলেন, 'এদের সাথ বকবক কইর‍্যে সময় নষ্ট। ইন্দ্রের ঐরাবত দিলে তাও ইয়াদ্যার পেটের গভ্ভর ভরবেক নাই। আপনি বরং উন্নত জাতের চাষের কথা বলুন। শেচ-কূয়া, শেচ-বাঁধ—ঐসব কথা শোনা যাক।'

স্বদেশবাবু ফের বলতে থাকেন আধুনিক প্রথায় চাষবাসের কৃৎকৌশল। এবং একটু বাদে পাগল শিকারির দল পুনরায় ঘনঘন হাই তুলতে থাকে।

ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে ভাবনা শুরু হয়েছে বুদ্ধদেবের মনে। সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো এইসব গরিব মানুষদের কাছে পৌঁছে দেবার কোনও উপায় নেই। গাঁয়ের আশিভাগ মানুষই ভূমিহীন, নয় বর্গাদার। এদের কাছে কৃষি উন্নয়নের গল্প বলা বৃথা। বাকি কুড়িভাগের মধ্যে পনের ভাগই দু'পাঁচ বিঘের জমিনের মালিক। তাদের সম্বৎসর দিন-গুজরান করতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। নতুন কৃষিপদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা, খরচপত্তর করবার কথা ওরা ভাবতেই পারে না। বাকি পাঁচ ভাগ হলেন হরবল্লভবাবুর দল। তাদের মনে অনেক দ্বিধা, অনেক সংশয়। হাড়ের গুঁড়ো, ইউরিয়া জমিতে ছড়াবার কথায় আঁতকে ওঠেন এঁরা। কেন আঁতকে ওঠেন? কেবলই সংস্কারবশত? মনে হয় না। বুদ্ধদেবের অন্তত একটি ঘটনার পর আর মোটেই মনে হয় না তা। হরিণমুড়ির খালখানাকে গভীর করে কেটে শেচের জল ধরে রাখবার কথাটা আজ এক দশক ধরে বারেবারেই উঠছে। বারেবারেই কেবল হরবল্লভ সিংহবাবুই কেঁচিয়ে দিচ্ছেন সেটা। বুদ্ধদেব আসার পর আবার ব্যাপারটাকে খুঁচিয়ে তুলেছে। তাই নিয়ে হরবল্লভের গোঁসা। বলেন, 'সুখে থাইক্‌তে ভূতে কিলাচ্ছে আপনাকে! হরিণমুড়ি সিংহগড়ের সম্পত্তি। সরকারি টাকা ঢুকিয়ে উটাকে বারোয়ারি কইর‍্তে দিব কেন?'

'কিন্তু ওটা তো সরকারে ভেস্ট হয়ে যাবে।'

'যবে যাবেক, যাবেক। আজ থাইক্‌তে দিব কেন?'

'আপনারও তো উপকার হবে এতে।'

'কী উপকার হবেক শুনি?'

'হরিণমুড়ির দু'ধারে তো আপনার প্রচুর জমি। খালটাকে গভীর করে কাটালে, বাঁধ দিয়ে জল আটকালে, আপনার অনেক জমি শেচ পাবে। বছরে দু'বার ফসল ফলাবেন।'

বুদ্ধদেবের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন হরবল্লভ, 'হাসালেন আপনি। ভাগে-বর্গায়, সাঁজায়, যত জমিন আছে, তা আছে। নিজ হালেই বারোশ বিঘা। একবার হাল চষে কোনও গতিকে বীচন ছড়িয়ে দিতেই হিমসিম খেইতে হয়। তার উপর দু'বার চাষ! সেই বলে না, একলা রামে রইক্ষা নাই, তার উপর সুগ্রীব দোসর! না, মশায়, গোদের উপর বিষফোঁড়া আর সইবেক নাই। তা বাদে, শীতকালের ধানচাষ মানে তো আপনাদ্যার সেই শুনে-গৈইথ্যে, মাপজোক কইরে ধান রুয়া। দু'দিকে সমান ফাঁক রাইখ্‌তে হব্যেক..., আমার তো পাঁচ বছর লাগবেক শুধু রুইতে। নিজের রসিকতায় নিজেই হো-হো করে হেসে ওঠেন হরবল্লভ। বশংবদরা গোঁ ধরে, শুধু রুইতেই যদি পাঁচ বছর লেইগে যায় তো কাটত্যে ক'যুগ লাইগ্‌বেক হে?

ভাল যুক্তি বাতলান হরভল্লভ, আপনারা বরং রিফুজিদের কাছে গিয়ে এসব বলুন। উয়ারা খাটিয়ে লোক, জমিন-জিরাতও যৎসামান্য। উয়ারাই এই পোকা-বাছা কাজটা পারবেক ঠিকঠিক। তখন থেকেই বুদ্ধদেব ভাবছিল। দু'এক জনের হাতে বিপুল পরিমাণ জমি থাকলে এটা হবেই। জমিতে দু'বার ফসল ফলানো কিংবা নতুন পদ্ধতি চালু করবার ব্যাপারে কোনও গরজই এরা দেখাবে না। এরা সব ননী-মাখনে বেড়ে ওঠা মানুষ। নিজেদের বারোআনা জমিই চেনে না। অন্য কোনও উপায় চাই। গাঁয়ে-গঞ্জে কৃষির উন্নতি করতে গেলে আগে মুষ্টিমেয়র হাতে এই বিপুল জমির ভার লাঘব করা দরকার।

স্বদেশ কুণ্ডুর বক্তৃতা শেষ হবার পর বুদ্ধদেব উঠে দাঁড়ায়। ইউরিয়া এবং হাড়ের গুঁড়োর উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে থাকে সে। কিন্তু দু'চারটে বাক্য উচ্চারণ করতে না করতেই হুড়মুড় করে উঠে দাড়ায় সম্পন্ন চাষীর দল। প্রাণভরে গালাগাল দিতে থাকে বুদ্ধদেবকে।কেউ কেউ একেবারে সামনে এসে শাসাতে থাকে। বুদ্ধদেব হিন্দু নাকি মুসলমান সে সংশয়ও প্রকাশ করে। ধীরে ধীরে উত্তেজনাটা বাড়তে থাকে। বুদ্ধদেবকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে তুমুল বিতণ্ডা শুরু করে দেয় বিশ-পঁচিশ জন মানুষ। ওদের মধ্যে কেউ একজন বলে ওঠে, শালা তুয়াকে মেইরে তুয়ার হাড় গুঁড়া কইরে জমিনে ছিটাই দুবো আমরা। উত্তেজনা ক্রমশ চরমে ওঠে। বেগতিক দেখে স্বদেশ কুণ্ডু এসে বহুকষ্টে শান্ত করে উন্মত্ত জনতাকে। বুদ্ধদেবকে সরিয়ে দেয় নিরাপদ দূরত্বে। ঠিক সেই মুহূর্তে বুদ্ধদেব লক্ষ করে, হরবল্লভের ঠোঁটের কোণে এক টুকরো চাপা হাসি, বেরোবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

বুদ্ধদেব সেদিনই অনুভব করল, যুদ্ধটা অজান্তে শুরু হয়ে গিয়েছে।

মরণ-গাছ ছুঁয়ে ফেলে অগ্নিকে

বাড়ির সামনের ডোবাটাতে হাঁটুটাক কাদাজল। নিশান বাউরি জলে দাঁড়িয়ে হাতদুটো ধুচ্ছিল। বারবার হাত ঘসছিল ঘাটের মাকড়া-পাথরে। কিছুতেই যেন স্বস্তি হচ্ছিল না তার। আজ প্রায় এক যুগ ধরে নিশানের এটি একটি নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। সারাদিনে দশবিশবার সে হাতদুটো ধোয়। ডোবার ময়লা জল মুখে নিয়ে বারংবার কুলকুচো করে। মুখ থেকে ফোয়াবার মতো জল ছুঁড়ে দেয় আকাশে। হাতদুটোকে নাকে ঠেকিয়ে শোঁকে বারবার। কী এক দুর্গন্ধে বিকৃত হয়ে ওঠে সারা মুখ। আবার কাদাজলে কচলাতে থাকে হাত। চৌহদ্দিতে রাং-

চিতার বেড়া। মাঝে মাঝে দু'চারটে আঁকোড়, বুধাকুল, জিয়াতি আর বনচাঁড়ালের গাছ। ডোবাটার চারপাশে অজস্র ভাটগাছ, বনতুলসীর ঝোপ, শ্যামালতা. তার ভেতর ডাহুক আর গোসাপের রাজত্ব। এমন পরিবেশে নিশান বাউরির নিজেকে খুব সাবলীল মনে হয়।

এখন আকাট দুপুর। রাঢ়ের তামাটে আকাশ। জ্যৈষ্ঠর ঝলা বাতাস। পুকুরপাড়ের শ্যাওড়া গাছটার মরাডালে বসে একটা ছন্নছাড়া কাক কর্কশ গলায় ডেকে চলেছে। নির্জন দুপুরে ডাকখানা কানে বড় বাজে। মনের মধ্যে অবিরাম কু-গায় কেউ। নিশান বাউরি দু'হাত কচলাতে কচলাতে ঘোলাটে চোখে দেখবার চেষ্টা করে কাকটাকে। শ্যাওড়া গাছের ডালেডালে আঁতিপাঁতি চরে বেড়ায় তার ঝাপসা চোখ। গাছটার নিকষ ডালে এমন একজন কেউ থাকে, যার অস্তিত্ব সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে মালুম করে নিশান বাউরি, কিন্তু সে কদাপি দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। তার সঙ্গে তাই দৃষ্টিবিনিময় হয় না নিশানের, কিন্তু নিয়মিত ভাববিনিময় চলে। তেমন কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, কিন্তু নিশানের কেন জানি ঐ অদৃশ্যচারীকে খুব আপনার জন বলে মনে হয়। ওর সঙ্গে ভাববিনিময় করতে গিয়ে নিশানকে কখনো বনচাঁড়াল সাজতে হয়, কখনো শ্যামালতা।

এখন অগ্নি ঘরে নেই। শালকাঁকির ডিহিতে ভাসুর-বুয়াসিনির পুজো লেগেছে। জ্যৈষ্ঠের শেষ হতে চলল। এক ফোঁটা বৃষ্টির নামগন্ধ নেই এখনতক্। পুজোর আয়োজনটা সেই কারণেই। কয়েক ডজন কালো মোরগ বলি পড়বে আজ ভাসুর-বুয়াসিনির থানে। অগ্নি সেখানেই গেছে। গেছে, তাই রক্ষে। এখন ঘরে থাকলে চেঁচিয়ে ফাটিয়ে একসা করত। নিশানকে জবরদস্তি তুলে আনত পুকুরঘাট থেকে। অগ্নিকে মনে মনে ভারি ভয় পায় নিশান বাউরি। নিজের নাতনি হলে কি হবে, অগ্নি ক্ষেপে গেলে একেবারে অন্য মানুষ। ঠাকুর্দাকে দিনভর অকারণে হাত আর মুখ ধুতে দেখলে সে আরও ক্ষেপে যায়। সেই কারণেই ইদানীং অগ্নি ঘরে থাকলে কোন গতিকে নিজেকে সামলে-সুমলে রাখে নিশান। হাত-মুখ ধুতে সাহস হয় না। সে কাজটা সেরে নেয় অগ্নির অলক্ষ্যে।

নিশানের হাতের দুর্গন্ধটা অগ্নি পায় না। মাঝে মাঝে কাঁই হয়ে ওঠে সে। বলে, 'দেখি, কি গন্ধ তুমার হাতে।' নিশানের দু'হাতের চেটো নাকের সামনে তুলে ধরে বলে, 'কুথায় গন্ধ?' পেটের ছেলে গোঁরাচাদকে হাত নেড়ে ডাকে, 'গোরা, দেখ্ তো রে, তুয়ার বড়বাবুর হাতে কুনো গন্ধ পাউ কিনা।' গোঁবাচাঁদও নিশান বাউরির চেটো শুঁকে কোনও দুর্গন্ধ পায় না। নিশান বাউরি অসহায় চোখে তাকায়। অগ্নিকে বোঝাতে পারে না, আজ একযুগ ধরে সে কেমন তিলতিল করে গন্ধের তাড়নায় ভুগছে। গন্ধটা তার হাতে, মুখে, নাকে, মগজে, সর্বাঙ্গে লেপটে রয়েছে অষ্টপ্রহর। একদণ্ডের তরেও ছেড়ে যায় না ওকে। এমন কি ঘুমের মধ্যেও গন্ধটা পাক খায় ওর মগজে।

সেই কতদিন আগে এই দুগর্ন্ধের বীজটি নিশানের হাতে রোপন করেছিলেন সাবেক সিংহগড়ের বড়কর্তা সুদর্শন সিংহবাবু। তখন অগ্নির বয়েস সাত কি আট। বাপ পরীক্ষিত বাউরি স্বদেশী আন্দোলনে ঘরছাড়া। নিশান বাউরির প্রতি কোনও এক দুর্জ্ঞেয় কারণে জাতক্রোধ ছিল সুদর্শন সিংহবাবুর। সুদর্শন সিংহবাবু নিশান বাউরিকে ধরে নিয়ে গিয়ে এমন এক কিসিমের সাজা দিয়েছিলেন, যা শুনলেই ঠকঠক করে কাঁপতে থাকবে যে কোনও পাষাণহৃদয় বাউরির বুক। না, মারধোর কিছুই করেন নি তিনি, নাটমণ্ডপেও ঝোলান নি ওকে, কেবল ওর দু'হাতে মাখিয়ে দিয়েছিলেন ঘোড়ার নাদি, মুখের মধ্যেও ভরে দিয়েছিলেন

খানিকটা। আর, বাউরি-সমাজে যেজন একবার ঘোড়ার নাদি ছুঁয়েছে, সে চিরকালের তরে অচ্ছুৎ। শুধু সে-ই নয়, তার চোদ্দপুরুষ অস্পৃশ্য থেকে যায় বাউরি সমাজের কাছে।

সাজাটাজা দিয়ে চোখ মুদলেন সুদর্শন সিংহবাবু। নিশান বাউরি বেঁচে রইল। সারা শরীরময় একরাশ দুর্গন্ধ নিয়ে। সেই তাড়নায় আজও অবধি হাত-মুখ ধুয়ে চলেছে সে।

দেখতে দেখতে স্বাধীন হল দেশ। তে-ভাগার লড়াই শুরু হল সারা জঙ্গলমহল জুড়ে। এক সময় মুখ থুবড়ে পড়ল সে লড়াই। নেতারা চলে গেলেন জেলে। পরীক্ষিত বাউরিকে ধরতে পারে নি পুলিশ। সে পালিয়ে পালিয়ে দিন কাটায়। পুলিশের সঙ্গে তার চলে ইঁদুর-বেড়াল খেলা। অগ্নি ততদিনে বেড়ে উঠেছে কচি লাউডগার মতো। দেশে-ভুঁয়ে তার বিয়ে দেওয়া অসম্ভব। বাউরি জাতের কোনও মানুষই নিশান বাউরির ঘরের মেয়েকে গলায় বাঁধবে না। বাধ্য হয়ে পরীক্ষিত বাউরি তাকে নিয়ে গেল রাইপুর থানার ফুলকুসমা গাঁয়ে অগ্নির মাসির বাড়িতে। সেখান থেকেই একদিন বিয়ে হয়ে গেল তার, ফুলকুসমার গজেন বাউরির সঙ্গে।

গজেন ছিল জাত-লম্পট। ফুলকুসমার প্রায় প্রতিটি বাউরিঘরে তার মনের মানুষ ছিল। তবুও কোনগতিকে বছরটাক ঘর করেছিল অগ্নি। একদিন গজেনের হাতে বেদম মার খেয়ে ফুলকসমা ছাড়ে সে। তখন সে মাসদুয়েকের পোয়াতি। তখন গোরাবাড়িতে জলডুবির আন্দোলন চলছে। পরীক্ষিত দু'দিন ঘরে থাকে তো, চারদিন গোরাবাড়িতে। অগ্নিকে নিয়ে যে কী করবে সে, ভেবে পায় না। প্রিয়ব্রত মহাপাত্র, সুদর্শনের একমাত্র মেয়ে লাবণ্যর ছেলে সে, পরীক্ষিত বাউরির আজীবনের সঙ্গী, তখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে সিংহগড়ে শয্যাশায়ী। পরীক্ষিত অগ্নিকে সিংহগড়েই বহাল করল অসুস্থ প্রিয়ব্রতকে দেখভালের জন্য। অগ্নি ওখানেই পড়ে থাকত দিনরাত। একটা নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছিল মেয়েটা।

একদিন কোল জুড়ে ছেলে এল অগ্নির। টকটকে গৌরবর্ণ ছেলে। দেখে দেখে যেন আশ মেটে না অগ্নির।

পাশের মহলে হরবল্লভরা মুখ টিপে হাসে। বলে, এ বাচ্চা কোনও বাউরির ঔরসে হতেই পারেনা। বাউরির বাচ্চা কখনো সাহেবের মতো ফর্সা হয়? সবাই ইঙ্গিতে প্রিয়ব্রতর দিকেই আঙুল দেখায়। বলে, প্রিয়ব্রতর শেষকীর্তি এটা।

অসুস্থ শরীর নিয়ে প্রিয়ব্রত মহাপাত্র একদিন রাতের আঁধারে সিংহগড় ছেড়েছিলেন। পরবর্তীকালে, পরীক্ষিত বাউরির মুখ থেকে সবাই জেনেছিল, গোরাবাড়িতেই জীবনের শেষ দিনগুলো কেটেছিল তাঁর। ওখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃতদেহ পরীক্ষিতরা নিয়ে এসেছিল সিংহগড়ে। প্রিয়ব্রত শেষ জীবনে যে ঘর ছেড়েছিলেন সকলের অজ্ঞাতে, তা নাকি অগ্নির কারণেই। অগ্নির উদরে তাঁর শেষ কীর্তিটি রোপন করে তিনি নাকি লজ্জায় গৃহত্যাগী হয়েছেন, এমনই ব্যাখ্যা হরবল্লভদের।

গায়ের রঙ ফর্সা বলে অগ্নি ছেলের নাম রেখেছিল গৌর, গৌরাঙ্গ, গোরা। শেষ নামখানিই স্থায়ী হল। সবাইয়ের মুখে মুখে ছেলেটির নাম হয়ে যায় গোরা বাউরি।

নামটার মধ্যে যে তার জন্ম নিয়ে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ রয়েছে সেটা কৈশোরেই টের পেয়ে যায় গোরা। তার জন্মে একটা রহস্য রয়েছে। কিন্তু বাচ্চা বয়েসে, যখন লজ্জা তৈরির বয়সই হয়নি, গোরা তার চারপাশের ভীমরুলদের দংশনে ব্যথা পেত না। বরং সবাইকে বেশ বড়াই করে বলে বেড়াত, যার-তার ব্যাটা লই হে আমি, আমি হচ্ছি রাজার ব্যাটা।

একটুখানি বয়েস বাড়তেই, জ্ঞানবুদ্ধি হতেই, কেমন যেন মুষড়ে যেতে লাগল গোরা। নিজের জন্মের প্রসঙ্গে উঠলেই কেমন উপড়ে ফেলা লতার মতো ঝামরে যায় নিমেষে। বছর আটেক যখন বয়স গোরার, অগ্নি তাকে পেটভাতুয়ায় ভর্তি করে দিয়েছে প্রমথ গাঙ্গুলির বাখুলে। সেখানে অন্যদের সঙ্গে সিংহগড়ের গরু-টরু চরায় সে, ফাই ফরমাস খাটে, গাঙ্গুলির গা-হাত-পা টিপে দেয়। সন্ধেবেলায় ঘরে ফিরে আসে।

দাওয়ার ওপর বাঁশের খাঁচায় একটা টিয়ে। অগ্নির পোষা টিয়ে। অগ্নি ওর নাম দিয়েছে গোপী। বলে, টিয়া লয়, চন্দনা। গলায় লাল রঙের বেড় রয়েছে যে। পাখিটা তারস্বরে ডাকতে লেগেছে। মালকিনের জন্য অতিশয় উতলা হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে অগ্নির ফিরে এসে ওকে খাওয়ানোর কথা। নিশান অবোধ পাখিটাকে বোধ দেবার চেষ্টা করে। চুপ মার্, চুপ মার্। পাখিটা চিল্লিয়েই চলে। নিশান রেগেমেগে পাখিটাকেই গাল পাড়তে থাকে পাড়া ফাটিয়ে।

হাত ধুতে ধুতে বিকেল হয়ে আসে। আচমকা আকাশ জুড়ে মেঘ জমে। পাকা জামের মতো কালো মেঘ। গুরুলে ওঠে আকাশ। ধুলুণ্ডি ঝড় বইতে শুরু করে চরাচর দাপিয়ে। চারপাশের গাছ-গাছালির ডালপোলায় প্রলয়-মাতন ওঠে। সোঁ-সোঁ আওয়াজ তুলে ছুটে আসে ঝড়। ডোগর-ডোগর চালতাফুলি বৃষ্টির ফোঁটা ছিটকে পড়তে থাকে রুক্ষ ধুলোয়।

নিশান বাউরি চটজলদি পুকুরঘাট থেকে চলে আসে। খেজুর পাতার তালাইতে চাট্টি ধান শুকোচ্ছিল। চটজলদি তুলে আনে দাওয়ায়। অগ্নির সাধের চন্দনাটি খাঁচার মধ্যে দোল খাচ্ছিল প্রবল বেগে, খাঁচাটিকে বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে রেখে আসে। তারপর ভয়ে-ভাবনায় মুখ কালো করে বসে থাকে বারান্দায়, আগড়ের দিকে তাকিয়ে। অগ্নিটা এখনো ফিরল না। শালকাঁকির পূজার থানে থাকলে এক কথা, কিন্তু যা খেপি মেয়ে, আচমকা বাই উঠলে কোথায় যে চলে যাবে কাঠকুটো, ফল-পাকুড় সংগ্রহের লছনায়! তেমন যদি গিয়ে থাকে কোথাও, এখন তো তার নড়াচড়ার উপায় নেই। যেখানেই যাক আটকে গিয়েছে ওখানেই। এই প্রবল ঝড়ে পথ হাঁটবে, এমন বুকের পাটা কার! এদিকে বেলাও পড়ে আসছে দ্রুত। চারপাশের দিগন্তের শরীর থেকে হারিয়ে যাচ্ছে আলো। দেখতে দেখতে নিশান বাউরির ঘোলাটে চোখের মণিতে দুর্ভাবনা জমে।

চড়বড়িয়ে বৃষ্টি নামে। একেবারে চরাচর কাঁপিয়ে। রাঢ়ের রুখা মাটিতে বছরের প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা। উত্তপ্ত মাটি থেকে ভাঁপ বেরোচ্ছে। সোঁদাসোঁদা গন্ধ ছড়াচ্ছে হাওয়ায়। ডোবার মধ্যে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে আশ্চর্য বাজনা বাজছে। আর আম গাছের মরা ডালে যে কাকটা বসেছিল সেই বিকেল থেকে, নিশান চোখ চারিয়ে দেখল, কাকটা বসে বসে নিরুপায় ভিজছে, একখণ্ড কালো কাপড়ের পুঁটলির মতো স্থির।

দেখতে দেখতে সন্ধে নামে। রাত হয়। বৃষ্টি থেমে যায়। ভর সন্ধেয় গোরা ফিরে আসে ভিজতে ভিজতে। কাকটা কোথায় যেন উড়ে যায়। কিন্তু অগ্নি ফেরে না। দাওয়ায় বসে বসে, আগড়ের দিকে থিরপলকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের জল মরে যায় নিশানের। মনটা হাজারো কু-গায়। ফোলাফোলা চোখের পাতনি জুড়ে কত কিসিমের আশঙ্কা জমে, নাভিমূলে বেড়াল আঁচড়াতে থাকে ভয়ে-তড়াসে, মনের অজান্তে চারপাশের দে-দেবতাকে আকুল মনে ডাকতে থাকে সে, তথাপি সে রাতে অগ্নি ঘরে ফেরে না।

দাওয়ায় বসে থেকে থেকে একসময় মেঝের ওপর নেতিয়ে পড়ে গোরা। নিশান বাউরির চোখের সুমুখে একটু একটু করে ঘনিয়ে আসে আঁধার।

অগ্নির ওপর নয়, নিশান বাউরির রাগ জমছিল ছেলে পরীক্ষিত বাউরির ওপর। ফুটন্ত দুধের কড়াইতে যেমন একটু একটু করে সর জমে। লোকটা আজীবনকাল শুধু ভেসেই বেড়াল উড়ন্ত পাখির পারা। নিজের মেয়েটাকেও ভাসিয়ে দিল অকূলপাথারে। লম্ফাট!

বাধ্য হয়ে গোরচাঁদকে ঠেলা মেরে তুলতে হয়। ঐ নিশুত রাতে পাঠাতে হয় তিলক বাউরির বাড়িতে। তিলকের বোন বাতাসীর সঙ্গে খুব ভাবসাব অগ্নির। হয়ত ওর পাশটিতে বসে বসে গল্পে মজে গিয়েছে। যদি নাও থাকে, বাতাসী দিতে পারে তার হাল-হদিশ।

কিন্তু তিলক বাউরির বাড়িতে অগ্নি নেই। সে আজ সকাল থেকে একটিবারের জন্যও যায়নি বাতাসীর বাড়িতে। তিলক বাড়িতে ছিল। শুনতে শুনতে তার ভ্রূ-সঙ্গমে ভাঁজ পড়ে। হাজারো কু-গাইতে থাকে মন। এ তল্লাটে অগ্নির শত্রু ঢের। অগ্নির শরীরখানা নিয়েই ওর সঙ্গে যার যত শত্রুতা। সিংহবাবুর বড় ব্যাটা কাগের মতো এক চোখে তাকিয়ে রয়েছে অনেকদিন। আরও অনেকেরই লোলুপ দৃষ্টি ওর ওপর। তিলক উঠে দাঁড়ায়। পাকা লাঠিখানা তুলে নেয় হাতে। হাঁটা দেয় গোরাচাঁদের পিছু পিছু।

নিশান বাউরিকে অনেকক্ষণ জেরা করে করে অগ্নির তত্ত্বতালাশ নেয় তিলক। সে যে কোথায় যেতে পারে, বুঝে উঠতে পারে না। আচমকা একটা সম্ভাবনার কথা মনে আসে তার। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চল্ ত গোরা, দেখি।

চুয়ামসিনা থেকে খানিক তফাতে, হরিণমুড়ি যেখানে আচমকা বাঁক নিয়েছে, সেখানে সবুজ জল স্থির। পাড়েই একটা প্রাচীন তালগাছ। এককালে বাজ পড়ে তার একপাশটা পত্রহীন। শকুনের দল ফি-বছর বাসা বাঁধে ডিম পাড়বার মরসুমে। গাছটা বড় অপয়া। এ যাবৎ কাঁচাতাল পাড়তে গিয়ে জনা পাঁচ-ছয় গাছ থেকে পড়েছে । দু'জন তৎক্ষণাৎ মরেছে। বাকিদের হাড়গোড় ভেঙেছে। তাদের মধ্যে কালো শিকারির ব্যাটা মেথর শিকারি তো এমন মরসুমে উঠেছিল যখন গাছে তালই থাকে না। কেন উঠেছিল মেথর শিকারি? শুধোলে রা কাড়ে না সে। কিছুই ভেঙে বলে না। অনেক রটনা রয়েছে গাছটাকে নিয়ে। মরণ-গাছ নাকি ওটা। এ গাছের তলায় বসলে মানুষের মনে নাকি আত্মহননের বাসনা জাগে। এলাকার অনেকেই বিশ্বাস করে, এ গাছের তলায় একটিবার গিয়ে পড়লে তার আর ফিরে আসা দুষ্কর। যে কোনও অজুহাতে ঐ গাছের তলায় আত্মঘাতী হবে সে। যদি তৎক্ষণাৎ নাও খুন করে নিজেকে, ধীরে ধীরে, সতর্ক পায়ে সে সবার অজান্তে এগোতে থাকবে যমপুরীর দিকে। তাকে তখন বাঁচানো দুষ্কর। অনেকের ধারণা, মেথর শিকারি যে তালহীন গাছে তরতরিয়ে উঠেছিল, তার জন্য ও দায়ী নয় কোন মতেই, গাছটাই পুরোপুরি দায়ী। ওই মেথর শিকারিকে মায়াজালে ফাঁসিয়ে তুলে নিয়েছিল নিজের ঘাড়ে। তুলেই আছড়ে ফেলে দিয়েছিল মাটিতে। মেথর শিকারি যে তাও বেঁচে গেছে, তা তার পূর্বজন্মের সুকৃতি আর বাপ-চোদ্দপুরুষের আশীর্বাদের ফল। তবে এটাও ঠিক, মেথর শিকারি, একবার যখন মরণ-গাছ ছুঁয়ে ফেলেছে ওকে, আর বাঁচবে না। আজ হোক, কাল হোক, অপঘাতে মরবেই।

তিলক শুনেছে, অগ্নি ইদানীং মাঝে মাঝে ঐ গাছের তলায় গিয়ে বসে। বাতাসীই বলেছে ওকে। তিলক কথাটা কারও কাছে ভাঙে নি। কার কাছেই বা ভাঙবে। পরীক্ষিত বাউরি তো আঘাটায়-বেঘাটায় ঘুরে বেড়ায়। নিশান বাউরিকে এমন কথা বললে সে বুড়া হয়ত বা

শুনেই অক্কা পাবে। আর গোরাচাঁদ তো দুধের বালক। সে কীই বা বোঝে। অকারণে দশকান করে কথাটা চাউর করে দেবে ঘরে ঘরে। এ বড় অলুক্ষণে কথা। মরণ-গাছের তলায় গিয়ে বসে থাকাটা সুস্থ মানুষের লক্ষণ নয়।

একদিন একান্তে শুধিয়েছিল অগ্নিকে। অগ্নি ভারি রহস্যময় চোখে তাকিয়েছিল। পরমুহূর্তে খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিল ঝুমকোর মতো। বলেছিল, ভাল লাগে, তাই। আমার ভাল লাগে বুইস্‌তে। অগ্নির দু'চোখের মণিতে অচেনা ছায়া। কার ছায়া। তিলকের সারা শরীর অজান্তে শিউরে উঠেছিল। কথা বাড়াতে সাহস পায়নি আর।

গোরাচাঁদকে নিয়ে কিছুদূর এগিয়েই থমকে দাঁড়ায় তিলক। বলে, গোরা রে, তুই ঘরে ফিরে যা। আমি কাঁহা-কাঁহা খুঁইজে বেড়াব উয়াকে, কত রাইত হবেক, বুড়াটা একলা রইবেক ঘরে...।

হাঁটতে হাঁটতে তিলক পাড়ার বাইরে চলে আসে। শালকাঁকির ডাঙার ওপারে হরিণ-মুড়ির বাঁক। অতদূর থেকে নদীটাকে দেখা যায় না বটে, কিন্তু চাঁদের ঝাপসা আলোয় তালগাছটা মাটির ওপর গাঁথা বর্শার মতো দৃশ্যমান। তিলক গাছটার শরীরে নজরখানা বিঁধিয়ে রেখে এগিয়ে যায় দ্রুত। মনটা কেন জানি ভারি অস্থির লাগছে ওর। এক ধরনের অশুভ আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে বুক। বুকের মধ্যে একটা ভয় পাওয়া জন্তু যেন গুঁড়ি মেরে মেরে হাঁটছে সন্তর্পণে। অগ্নির জন্য মনে মনে প্রার্থনা শুরু করেছে তিলক বাউরি।

গাছটা থেকে খানিকটা তফাতে গিয়ে দাঁড়ায় তিলক। হাঁফাচ্ছিল। অন্ধকারের বুকে তীরের মতো বিঁধে রয়েছে গাছটা। তলায় একটা কালো পুঁটলি মতো। স্থির। তিলক পুঁটলিটার দিকে দ্রুতবেগে এগোয়।

অগ্নি। গাছের তলায় একখণ্ড মাকড়া পাথরের মতো স্থির। ওর সামনে হরিণমুড়ির বাঁকের স্থির জল। এখন জলের রঙ নিকষ কালো। জলের ওপর দৃষ্টিখানি বিঁধিয়ে দিয়ে জলের মতোই স্থির হয়ে গিয়েছে অগ্নি। নিস্পন্দ। তিলক একেবারে পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। চাপা গলায় ডাকে, অগ্নি, অগ্নি, অগ্নি...। অগ্নি নিঃসাড়। পাথর।

এক সময় তিলক অগ্নির গায়ে হাত ছোঁয়ায়। একেবারে কানের কাছটিতে মুখ এনে খুব চাপা গলায় উচ্চারণ করে, অগ্নি...। অগ্নির হুঁশ ফেরে। এতক্ষণে ধীরে ধীরে মুখখানি তিলকের দিকে ফেরায় সে। তিলককে চিনতে পারার আভাষ ফুটে ওঠে তার চোখের তারায়। তিলক অগ্নির হাতখানি ধরে। আলতো টান মারে। অস্ফুট গলায় বলে, চ, ঘর চ।

অগ্নি মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়ায়। পা দুটি সচল হয়। কিন্তু গলা দিয়ে রা বেরোয় না। তিলকের কঠিন মুঠো থেকে নিজের হাতখানিকে খুলে নেবার কথাটাও তার মনে ঘাই মারে না বুঝি। সে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে থাকে। হাঁটতেই থাকে।

জানু-প্রদর্শনীর আসর

সুকুমার বলেছিল, অনাথ রায়ের জানু-প্রদর্শনীর মরসুম আইছে। স্বচক্ষে দেইখ্‌লেই বুঝবেন বেপারখান।

দিন গড়াতে গড়াতে একদিন সেই মরসুম এসে যায়। বুদ্ধদেব স্বচক্ষেই দেখে সেই প্রদর্শনী। পনেরোই আগস্টের সকালে। চুয়ামসিনা প্রাইমারি ইস্কুলের সামনের ডাঙায়, মউল গাছের তলায়।

সকাল থেকে উৎসব শুরু হয়েছিল সেখানে। সম্পন্ন বাড়ির ছেলেমেয়েরা পরিষ্কার পোশাক পরে হাজির হয়েছিল। প্রত্যেকের হাতে ছিল বাঁশের কঞ্চিতে চেটানো কাগজের পতাকা। বাড়ির মুনিশ-মাইন্দাররা ফরমায়েশ মতো বানিয়ে দিয়েছে। কোনটা তিনকোণা, কোনটা বর্গক্ষেত্র, কোনটা আয়তাকার। কারুর পতাকায় তিনটে রঙ, কারুর চারটে, পাঁচটা...। কারুর চক্র নেই, কারুর বা তিনটে। কারুর চক্র অমৃত্তির মতো, কারো বা কুলোপানা। গেরুয়া-সাদা-সবুজের স্ট্রাইপ, সব উল্টোপাল্টা। বড়দের অবশ্য বড় পতাকা। হরবল্লভ গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনে এনেছেন বিষ্টুপুর থেকে। সাদা ধবধবে ধুতির সঙ্গে খদ্দরের পাঞ্জাবি পরেছিলেন হরবল্লভ। মাথায় চড়িয়েছিলেন গান্ধীটুপি। হাজির ছিলেন চুয়ামসিনা আর লোখেশোল স্কুলের মাস্টারমশাইরা। প্রমথ গাঙ্গুলি, মহাদেব কয়াল, ঝাড়েশ্বর নায়ক, কামদেব দত্তর মতো সম্পন্ন মানুষেরা। শুরু হয়েছিল প্রভাত-ফেরি। দুটি স্কুলের সারিবদ্ধ ছাত্রছাত্রীদের সামনে হাঁটছিলেন হরবল্লভের দল। ওঁদের ঠিক পেছনেই গলায় হারমোনিয়াম দুলিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছেন সপারিষদ মহাদেব কয়াল। স্বাধীনতার গান। আজকে এ দেশ স্বাধীন হল, উঠল নুতন সূর্য...। কতদিন আগে বেঁধেছিলেন গানখানি। এখনও বছরে একদিন গাওয়া চলছে। কানের কাছে মুখ এনে একফাঁকে বলেন হরবল্লভ, এই একটা গান আর কদ্দিন গাইবে হে? এক কুমীর-ছা বচ্ছর বচ্ছর আর কত দেখাবে? নৈতন গান-টান বাঁধ। ছাত্র এবং ছাত্রতুল্য সহগায়কদের সামনে এমন কথা শুনে মহাদেব কয়াল অপমানিত বোধ করেন বুঝি। তাঁর গান বাঁধবার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয় তাঁর। তাও মুখে অমায়িক হাসি ঝরিয়ে বলেন, স্বাধীনতা তো একবারই এসেছে দেশে। প্রতি বছর তো একবার করে স্বাধীন হয় না দেশ। স্বাধীনতার জনম্‌লগ্নে বাঁধা গান, ফি-বছর বদলানো কি উচিত? মনে মনে আরও একটা মোক্ষম উদাহরণ খুঁজতে থাকেন মহাদেব। বলেন, তাহলে তো জাতীয় সঙ্গীতও বছর বছর নতুন করে লিখতে হয়। কিছু বস্তুকে পুরাতন হওয়ার সুযোগ দিতে হয় দাদা। হেন মতে, মহাদেব কয়াল নিজের লেখা গানকে জাতীয় সঙ্গীতের সমপর্যায়ে তুলে নিয়ে গিয়ে একধরনের আত্মশ্লাঘা বোধ করতে থাকেন।

গানের ফাঁকে ফাঁকে স্লোগান। মাস্টারমশাইরা ছিলেন দু'সারির মধ্যিখানে। স্লোগানের বোল দিচ্ছিলেন ব্রতচারীর মাস্টার হরিশ দাস। লম্বা করে 'বন্দেমা—তরম' বলছিলেন। তারপর একে একে বোল দিচ্ছিলেন, মহাত্মা গান্ধী কি—, জওহরলাল নেহেরু কি—, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস কি—, স্বাধীনতা
দিবস্ কি—, জাতীয় পতাকা কি—। অন্যেরা শুধু যন্ত্রবৎ 'জ্যায়' বলে উঠছিল। এক রাউন্ড স্লোগান শেষ হলে হরিশবাবু 'জ্যায় হিন্দ' বলছিলেন। তাতেই সবাই বুঝে ফেলছিল এখন সামান্য সময়ের বিরতি। বুদ্ধদেবও ছিল দলে। অনাথবন্ধুও। যে সব শিক্ষক দূরবর্তী গ্রাম থেকে যাতায়াত করেন, তাঁরা গতরাতে সিংহগড়েই ভুরিভোজ করে রাত কাটিয়েছেন। কারণ, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে গরহাজির থাকলে হরবল্লভ সিংহবাবু কাউকে ক্ষমা করবেন না। এমনিতেই তো চারপাশে কতই না রটনা। এ নাকি ঝুটা-আজাদী। দেশি পুঁজির সঙ্গে বিদেশি পুঁজির প্রণয়। কাজেই স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে কোনরূপ অবহেলা অন্তত হরবল্লভ সিংহবাবু সহ্য করবেন না।

কুন্তী এসেছে তসর রঙের বালুচরী পরে। কালো কুচকুচে এলোচুল কোমর অবধি লুটোচ্ছে। প্রভাতী হাওয়ায়, বেসামাল। গয়নায় ভরিয়ে নিয়েছে শরীর। কপালে টিপ পরেছে। একেবারে মা-দুগ্গার মতো লাগছে কুন্তীকে। শোভাযাত্রার একেবারে সামনের দিকে রয়েছে সে হরবল্লভের মেয়ে উমার সঙ্গে। দু'জনে পাশাপাশি হাঁটছে বটে, কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। লোখেশোল স্কুলের ছোকরা মাস্টারদের চোখ একেবারে বিঁধে গিয়েছে কুন্তীর শরীরে। হাঁটবে কি, বোল দেবে কি, কুন্তীর থেকে চোখ ফেরাতেই পারছে না ওরা।

সারা চুয়ামসিনা-লোখেশোল পরিক্রমা করে বেলা ন'টা নাগাদ মিছিলখানা ফিরে আসে চুয়ামসিনা স্কুলের চত্বরে। প্রচুর বকুলপাতা আর গেরুয়া-সাদা-সবুজ কাগজের শেকল বানিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে স্কুলের বারান্দায়, চত্বরে। স্কুলের সামনের উঁচু বেদিতে তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা পতপতিয়ে উড়ছে। দেখতে দেখতে বুদ্ধদেবের মনে পড়ে যায় সুকুমার আচার্যর গম্ভীর মুখের টিটকিরি। বলে, নাম তার তেরঙ্গা পতাকা। কারণ, সে তিন কিসিমের রঙ্গ দেখায়। পতপতিয়ে উড়লে তা দিয়ে হাতপাখার মতো হাওয়া খাওয়া যায়। দড়িখানি দিয়ে যাকে খুশি বেঁধে ফেলা যায়। আর বাঁশ দিয়ে বেধড়ক পেটানো চলে। চোখ কপালে তুলে বুদ্ধদেব বলেছিল, আপনাকে তো মশাই ভারতরক্ষা আইনে ধরা উচিত।

প্রভাত-ফেরির পরে বকুলতলায় সভা। উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইল কুন্তী। গলাটা দারুণ। গাইবার ভঙ্গিটিও বেশ মনোহারী। তবে শ্রোতা বড় একটা হয় নি। জনা ত্রিশেক ছাত্র-ছাত্রী-সহ সাকুল্যে জনা পঞ্চাশ। আসলে ভিড় বাড়বার সময় হয়নি এখনো। যারা ফি-বছর ছোলাসেদ্ধ-মুড়ির টানে আসে, তারা বিলক্ষণ জানে, সে পর্বের এখনো ঢের দেরি। এখন বক্তৃতা হবেক গান হবেক, অনাথদাদুর জাং দেখানো...। তারপর ছোলা-মুড়ি। একটা চেয়ারের ওপর মহাত্মা গান্ধীর ছবি। গুটি চারেক চেয়ার, একখানা টেবিল, টেবিলে চীনামাটির ফুলদানিতে টগর-জবা জাতীয় পাঁচমেশালি ফুল। ধূপ জ্বলছে ধূপদানিতে। চেয়ারে বসেছেন হরবল্লভ, প্রমথ গাঙ্গুলি, আর লোখেশোল হাইস্কুলের হেডমাস্টার মহাদেব কয়াল। সামনের শতরঞ্জিতে বসে স্কুলের বাচ্চারা। ওদের পেছনে বেঞ্চি পাতা। তাতে গাঁয়ের মধ্যবিত্ত সম্পন্ন মানুষদের কেউ কেউ, স্কুলের মাস্টারেরা এবং কুন্তী, উমা, দেবিদাস, প্রভঞ্জন, স্বপন ও রতন গাঙ্গুলির দল। কুন্তীর পর উমা গাইল স্বদেশ-প্রেমের গান। অনাথবন্ধু বসেছিলেন পেছনের বেঞ্চিতে। হরবল্লভের পাশে একখানা চেয়ার খালি রয়েছে, তাও কেউ ডাকল না ওঁকে। ব্যাপারটা খুবই বিসদৃশ ঠেকে বুদ্ধদেবের। সুকুমার থাকলে এতক্ষণে ফুটিয়ে দিত হুল। হুঁ-হুঁ, বাবা—, এ হইল্যাক কলিকালের ছড়া। রঘু পণ্ডিত ঘুঁট্যা দিচ্ছে, রঘুয়া চড়ে ঘোড়া।

গানের পর বক্তৃতা শুরু হল। এতক্ষণে চারপাশের পাড়াগুলো থেকে পিলপিলিয়ে মানুষ আসছে। বাচ্চা বুড়ো সবাই। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলছে বকুলতলাকে। কারণ, তারা দেখেছে সিংহগড়ের বড়কর্তা বক্তৃতা করছেন। কাজেই এখানেই বক্তৃতা-পর্ব শেষ। এ তল্লাটে সমস্ত বক্তৃতার আসরে কর্তাবাবুই শেষ বক্তা। তিনিই শেষ কথা। এরপর রইল আর একটিমাত্র কাজ। অনাথ রায়ের জাং দেখানো। সে তো সামান্য সময়ের ব্যাপার। তারপরই শুরু হবে আসল কাজ। ছোলা-মুড়ি বিতরণ। হরবল্লভের বক্তৃতায় ওদের মন ছিল না কারোরই। কেবল ওঁর দিকে তাকিয়েছিল, এই যা। মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখে নিচ্ছিল, রতিকান্ত গোস্বামীর নেতৃত্বে ইস্কুলঘরের বারান্দায় শালপাতার ঠোঙা বানানো, সেদ্ধছোলা সমরানো ইত্যাদি কাজগুলি কদ্দুর এগোলো।

হরবল্লভের বক্তৃতার শেষে সভার শেষ কার্যক্রম প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী, ইংরাজের বিরুদ্ধে আজীবনকাল আপোষহীন যোদ্ধা শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু রায়ের 'স্মৃতিচারণ'। হরবল্লভ খুব জম্পেশ করে গৌরচন্দ্রিকা করলেন অনাথবন্ধু সম্পর্কে। অনাথবাবুর আসবার ইচ্ছে ছিল না একেবারেই। কিন্তু যে স্বাধীনতার জন্য তাঁর আজীবনকাল এত লড়াই, এত ত্যাগ স্বীকার, সেই স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকলে লোকে বলবে কি? তাহলে কি যা রটে তার কিছু না কিছু বটে? অনাথ রায় কি তবে একটু একটু করে কম্যুনিস্ট হয়ে যাচ্ছেন? কাজেই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসতে হয়। হরবল্লভের সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং সালংকার গৌরচন্দ্রিকার পর পেছনের বেঞ্চি থেকে পায়ে পায়ে সসঙ্কোচে এগিয়ে যান সামনের দিকে। খুব ধীর গলায় বলতে থাকেন অগ্নিযুগের টুকরো টুকরো কাহিনী। একটুক্ষণ বলতে না বলতেই মাঝপথে বলে ওঠেন হরবল্লভ, ঠিক আছে, উসব তো বহুবার বলেছেন। বইতেও কিছু কিছু লেখা আছে। আপনি বরং উরুতে যে পুলিশের গুলি বিঁধেছিল, উই জা'গাটা দেখান বাচ্চাদের। উয়ারা বুঝবেক, কী সব দিন ছিল তখন! অনেকবারই দেখেছে, তবুও সবাই হৈ-হৈ করে বায়না ধরে। উরুতে গুলির দাগ দেখবার তরে নাছোড়বান্দা। লজ্জা-সঙ্কোচে লাল হতে হতে ধীরে ধীরে কাপড়খানা তুলতে থাকেন অনাথবন্ধু। উরু অবধি কাপড় তুলে কালচে আধুলির মতো দাগটা দেখান। সবাই ভুলভুল চোখে দেখে, এবং কাপড় পুনরায় নামিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে চড়চড়িয়ে হাতাতালি দিয়ে ওঠে। যেন যাদু-প্রদর্শনীর আসরে যাদুকরের একখানা আকর্ষণীয় আইটেম শেষ হল এইমাত্র।

সভা শেষ হতে না হতে মুড়ি-ছোলা বিতরণের জায়গায় বিষম হুড়োহুড়ি বেধে যায়। ইতিমধ্যে চারপাশের পাড়াগুলো থেকে ঝেঁটিয়ে এসেছে বাচ্চা-বুড়োর দল। তারা নিরাপদ দূরত্বে অপেক্ষা করতে থাকে পরম সহিষ্ণুতায়। স্বাধীনতা-দিবসের কুশীলবদের দেওয়া-থোওয়ার পর যদি কিছু বাঁচে তখন বিলি হবে এদের মধ্যে...।

মুড়ি-ছোলার লাইনে সামিল হবে না কুন্তী। সে চলে যায়। যাওয়ার আগে একফাঁকে বুদ্ধদেবকে বলে যায়, মা ডেকেছে। একবার আসবেন। জরুরি। ততদিনে কনকপ্রভার মহলে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেছে বুদ্ধদেব। দীপমালার অনুরোধকে উপেক্ষা করতে পারে নি কিছুতেই।

সেদিনই সন্ধের মুখে বাসায় ফিরছিল বুদ্ধদেব, পথে পাগল শিকারির সঙ্গে দেখা। সকালে হরবল্লভের থেকে একপ্রস্থ ধাঁতানি খেয়েছে বেচারা। প্রভাতফেরি করছিলেন হরবল্লভের দল। পাগল শিকারিরা যাচ্ছিল ক্ষেতের কাজে। এখন ধানের জমি নিড়নোর কাজ শুরু হয়েছে। হরিণমুড়ির পাড়ে হরবল্লভের আঠার বিঘার চাকখানা নিড়াতে চলেছে ওরা। অকস্মাৎ রাস্তার ওপর হরবল্লভের বর্ণাঢ্য বাহিনীকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। দু'চোখে জমাট কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকে শোভাযাত্রার দিকে। হরবল্লভ দূর থেকে দেখছিলেন ওদের। দেখতে দেখতে ভুসঙ্গমে ভাঁজ পড়ে। কাছাকাছি এসেই নিচুগলায় খেঁকিয়ে ওঠেন, ইখ্যেনে খাড়া হয়ে মজা দেখছু? সার্কিস? উদিকে ক্ষেতে নিড়ান দিবার সময় বয়ে যায়! যাহ্। পাগল শিকারিরা থতমত খায়। তড়িঘড়ি পা চালায় ক্ষেতের দিকে।

সন্ধ্যায় বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্তর বলে ওঠে পাগল শিকারি, 'হাঁ, রামসেবকবাবু, বিটিশ নাকি চইলে গেঁইছে এ দ্যাশ থিক্যে? সত্যি?'

হাসি মুখে মাথা দোলায় বুদ্ধদেব, 'সত্যিই তো। তুমি জান না?'

পাগল শিকারি অবাক মানে, 'কখন গেল্যাক? কী কইবে গেল্যাক? জাইন্‌থে লাইর্‌ল্যম।'

বুদ্ধদেব হাসে, 'তোমবা জানবে কী করে? ওরা কি এখানে থাকতো? ওবা থাকত দিল্লিতে। ওখান থেকেই চলে গেছে।'

ডিল্লি থেকে চলে গেলে অবশ্য অন্য কথা। পাগল শিকারিকে মানতেই হয় কথাটা। ডিল্লিতক্ক তো আর নজর চলে না। পর মুহূর্তে ঝাঁ করে শুধিয়ে বসে, 'আপনি যেতে দেইখেছেন?'

'দূর পাগল! আমি কি করে দেখব?'

'তেবে? কী কইরে বুঝলেন আপনি?'

বুদ্ধদেব ভাবনায় পড়ে যায়। কেমন করে কোন্ যুক্তিতে কথাটা বিশ্বাস করাবে পাগল শিকারিকে! সহসা পশ্চিম আকাশে নজর পড়ে। অস্তমিত সূর্যের লাল আভায় পশ্চিম আকাশটা গাঢ় রক্তিম। ঐ রক্তিমতার পটভূমিতে ইস্কুলের মাথায় পতপতিয়ে উড়ছে পতাকাটা। ঐদিকে আঙুল দেখিয়ে বুদ্ধদেব বলে, ঐ দ্যাখ, জাতীয় পতাকা। পাগল শিকারি চোখেমুখে হাজারো ধন্ধ নিয়ে তাকিয়ে থাকে উড়ন্ত পতাকাটির দিকে। চোখে-মুখে অবিশ্বাস গাঢ় হয়। ঐ একচিলতে 'পতোকা' দেখে বাবুমশায়রা কী করে বুঝে ফেললেন যে 'বিটিশ' চলে গেছে! কোন্ সূত্র ধরে হেন সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন উঁয়ারা! বাবু ভায়াদের কত বুদ্ধি মগজে! তার নাগাল পাওয়া কি পাগল শিকারির কম্ম!

পরপর দুটো তারিখে জামিন না পাওয়ার পর অবশেষে গতকাল জামিন পেয়েছে গোবিন মিস্তিরি। সুকুমারকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। সেজন্য অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে পার্টি-ফান্ড থেকে। পাগল শিকারির মুখ থেকেই জামিন পাওয়ার খবরটা শোনে বুদ্ধদেব। জামিন পেয়েও বাড়ি আসেনি গোবিন মিস্তিরি। পাগল জানায়, লজ্জায় নাকি ঘরমুখো হতে পারছে না সে। কেমন পাগল-পাগল ভাব করছে। কেবলই কাঁদছে আর বলছে, হায়, হায়, নৈতন বিয়া দিছি মেয়াটার। জামাইটা কী ভাববেক। হায় ভগবান।

'তো কোথায় আছে সে?'

'বিষ্টুপুর পার্টি অফিসে নাকি রয়্যেছে সে। পার্টির লোকজন বুঝাচ্ছে উয়াকে। পাখি পড়ান্ পড়াচ্ছে।'

বুদ্ধদেব জানে, গোবিন মিস্তিরির সংসারটাকে এ ক'মাসে পাখির ছানার মতো আগলে রেখেছে সুকুমাররা। চাল, আটা জুগিয়েছে, বুদ্ধি-ভরসা দিয়েছে। এখন আরও একখানা দায়িত্ব চাপলো ওদের ঘাড়ে। যত জলদি সম্ভব গোবিন মিস্ত্রিব বুকের মধ্যেকার দগদগে ক্ষতখানাকে সারিয়ে তোলা। মনের ক্ষত বিষম ক্ষত, কোনও মলমেই সারে না। হাঁড়ি ভাঙলে খপরা, মন ভাঙলে ফঁফ্রা। গোবিন মিস্ত্রির ভাঙা মনখানা জোড়া লাগলে হয়।

সন্ধেবেলায় চা খেতে খেতে হরবল্লভ এক সময় কথাটা তোলেন। বলেন, 'এলাকায় নুতন আইছেন, ভেবে চিন্তে কাজ করবেন, দেখেশুনে মিশবেন। উল্টাপাল্টা বহু মানুষ আছে এসব এলাকায়। আপনার সরকারি চাকরি। কোন্ ঝঞ্ঝাটে পড়ে যাবেন, তখন ..। মুৎসুদ্দিবাবু যে ছিলেন, তিনি তো আমাকে না জিজ্ঞাশা করে কোনও কাজই করতেন নাই। বড় ভাল মানুষ

ছিলেন তিনি। বড় সামাজিক।' একটুক্ষণ থামেন হরবল্লভ। তারপর ঝেড়েই কাশেন। 'এই যে, সুকুমার আচায্যি, শুনতে পাই, খোব মিলামিশা করছেন উয়ার সাথ। একেবারে ডেঞ্জার লোক। পাক্কা কম্যুনিস্ট। আপনারা সরকারি চাকরি করেন, আপনাদের তো কম্যুনিস্টদের সাথ মিলমিশা করা বারণ। সেদিন থানার থেকে খোঁজ লিচ্ছিল।'

বুদ্ধদেব সামান্য চমক খায়। থানার থেকে খোঁজ নিচ্ছিল? কেন? হরবল্লভ সামান্য থতমত খান। বলেন, 'এই, খোঁজ খবর লিচ্ছিল আর কি। উয়ারা ত সব খবরই পায়। আসলে আমি আপনার বয়োজেষ্ঠ্য। বিদেশে বিভুঁয়ে অভিভাবকতুল্য। আপনার একটা কিছো বিপদ হলে আমার তো খারাপ লাগবেক। বিডিও সাহেব তখন আমাকেই দুষবেন। আপনার এলাকায় পাঠালাম ছেইলাটাকে, সে কী করলেক, কার সাথ মিশলেক, টুকচান দেখলেন নাই?' সামান্য ঘনিষ্ঠ হয়ে আসেন হরবল্লভ। 'আরো একটা লোক, ঐ অনাথবন্ধু, খুব সাবধান। কমুনিস্ট লয় বটে, তবে ব্রিটিশ আমলের স্বদেশী করা, জেলখাটা লোক। আপনাকে খুব তাতাবেক। কান দিবেন নাই। চাকরি কত্তে আইছেন, চাকরি করবেন, চইলে যাবেন। এমনভাবে কাজ করবেন, যাতে চইলে যাবার পর এলাকার লোক নাম করে। মুৎসুদ্দিবাবু চলে গেছেন, কিন্তু এখনও অবধি তার নাম করি আমরা। শুনেছি খুব বড়লোকের ছেইলা আপনি, পড়াশুনায়ও ভাল ছিলেন, লোকজনদের সাথ মিলামিশা করবার সময় নিজের বংশমর্যাদার কথাটা ভাববেন। আর হ্যাঁ, উই গরুর হাড়গুঁড়া হিন্দুদের জমিনে ছড়াতে চাইছে সরকার। খু-ব সাবধান! ভুলেও উই ফাঁদে পড়বেন নাই। এলাকায় রক্তগঙ্গা বয়ে যাবেক। আর উই যে, ইউরিয়া। স্বদেশ কুণ্ডু আমাকে গোপনে বইলেছে, উটাও এক জাতের গরুর হাড়ের গুঁড়া। আচ্ছা বলুন তো, নেহেরু কি সত্যি হিন্দ্যার টাইটেল হয়? শুনেছি, উয়ারা কাশ্মীরের লোক। কাশ্মীরে ত চোদ্দআনা মুসলমান। আমার তো কেমন সন্দেহ হয় মশাই। নচেৎ হিন্দু হয়েও হিন্দুর জমিনে গরুর হাড়ের গুঁড়া ছড়ায় কেউ? তবে এ কথাটা কারোকে বলবেন নাই যেন। হাজার হোক নিজেদের দলের নেতা। জাতির চাচা...।'

চা-পান ও রেডিওতে খবর শোনা পর্ব শেষ হলে হরবল্লভ অন্দর মহলে চলে যান। বুদ্ধদেব রওনা দেয় কনকপ্রভার মহলের দিকে। কুন্তী সকালে এক ফাঁকে ডেকে গিয়েছে। আবার কিছু অঘটন ঘটল কিনা কে জানে!

গলার মধ্যে টোপগাঁথা বড়শি

একরাশ তিক্ততা নিয়ে বিডিও সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়েই যার সঙ্গে মুখোমুখি, তাকে দেখামাত্তর ভুরুতে ভাঁজ পড়ে বুদ্ধদেবের।

বামাচরণ।

বুদ্ধদেব থ হয়ে যায়। থ হয়ে যায় এই কারণে যে বামাচরণ ঘরের বাইরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আড়ি পাতছিল।

বুদ্ধদেবকে দেখামাত্তর থতমত খায় বামাচরণ। এক চিলতে কাষ্ঠহাসি হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে পিছু ফিরে হাঁটতে থাকে হলঘরের দিকে। করিডোরের মাঝ বরাবর পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে বুদ্ধদেব। স্মৃতিতে চরে বেড়ায় একদিনের একটি দৃশ্য। বামাচরণকে নিয়ে। সেদিনও বুদ্ধদেবের ভুরুতে এমনিতরো ভাঁজ পড়েছিল অজান্তে।

সেদিন গ্রামসেবকদের মিটিং শুরু হয়েছিল সাড়ে-তিনটেয়।

প্রথমেই এলাকার খবরাখবর নেন বিডিও সাহেব। হাঁস-মুরগির ছানা, নারকোল-সুপুরির চারা ইত্যাদি বিলি-বন্দোবস্তের চিত্রখানি একে একে আঁকে সবাই। সব সামগ্রীরহ

বিলি-বিতরণ শেষ। ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্টরা এসব কাজে তিলমাত্র বিলম্ব করেন না। চটপট লিস্ট তৈরি, ঝটপট বিতরণ শেষ। কিন্তু ধইঞ্চা বীজ বারোআনাই পড়ে রয়েছে। আর, ইউরিয়া এবং বোন-মিল একদানাও গছানো যায় নি।

'ক্যা-ন?' বিডিও সাহেব খাপ্পা।

'ধইঞ্চা বীজ কেউই নিচ্ছে না, স্যার। বলে, জমির সমস্ত সার খেয়ে ফেলবে। বলে, আগাছাকে খাওয়ানোর জন্য জমিতে গোবর সার ছড়িয়েছি নাকি আমরা? আর, ইউরিয়া কিংবা বোনমিলের কথা বলতে গেলেই মারতে আসছে। বলে, মাটি হল বসুমতী। মায়ের জাত। তার অঙ্গে ঐ সব বিজাতীয় জিনিস ছড়ালে মহাপাপ হবেক।'

'আরে, বোঝাও অদের।' বিডিও সাহেবের ভুরুজোড়া ধনুকের মতো বেঁকে যায়, 'ইয়ার নাম হইল এক্সটেনশন সার্ভিস। গাধা পিটায়ে ঘোড়া বানানোই আমাগো কাজ।' বলতে বলতেই নিমেষের মধ্যে প্রসঙ্গ বদলে ফেলেন, 'লোন বিলির খবর কি? কৃষিলোন, পশুলোন?'

'লোন বিলি হয় নি, স্যর।'

'প্রেসিডেন্ট সাহেবরা কেউ তালিকাই বানাচ্ছেন না।'

বিডিও সাহেবকে খুব একটা উত্তেজিত দেখায় না। বুদ্ধদেবের মনে হয়, উনি ব্যাপারটা জানেন। খুব গভীরে গিয়ে বোঝেন সমস্যাটা। খুব আলগোছে বলেন, 'তাইলে আর আমাদের দোষ কি?' বিডিও সাহেবকে যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত, ভারমুক্ত দেখায়।

'কিন্তু এলাকার ছোটছোট চাষীরা যে মারা পড়ছে, স্যর।' বুদ্ধদেব বলে, 'সময় মতো কৃষি ঋণটা পেলে চাষের কাজে লাগাতে পারত। পশুলোন পেলে হালের বলদ কিনতে পারত।'

'তাই বুঝি?' ভারি চশমার ফাঁকে বুদ্ধদেবকে এক ঝলক দেখে নেন বিডিও সাহেব, 'প্রেসিডেন্টরে বল্‌স সে কথা?'

'বলেছি। তিনি বলেন, আপনার এত মাথাব্যথা কিসের? আমার দায়িত্ব আমি বুঝব।'

হাত দু'খানা চেয়ারের দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে হাই তোলেন বিডিও সাহেব। বলেন, 'ভাদ্র মাসের শেষ। অহন আর কৃষি-ঋণ লৈয়া ডিসকাস কইরা লাভ কি? চাষবাস যা হবার তা-তো হৈয়া গ্যাসে গা।'

'কিন্তু এতগুলো টাকা, মানুষের কাজে এল না। কতখানি ক্ষতি হয়ে গেল।'

'গর্বনমেন্টের টাকা, গবর্নমেন্টের ঘরে ফেরৎ যাবে। ক্ষতির প্রশ্নই ওঠে না।' অলস চোখে তাকান বিডিও সাহেব।

বুদ্ধদেবের মনে হয়, সুকুমারের কথাই ঠিক। পাছে গ্রামাঞ্চলে নিজস্ব ঋণ-দাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেই কারণেই সরকারি ঋণ বিতরণের ব্যাপারে এতখানি অনীহা হরবল্লভদের। এই মুহূর্তে বুদ্ধদেবের মনে হচ্ছে, বিডিও সাহেব পুরো ব্যাপারটা বিলক্ষণ জানেন। শুধু জানেনই নয়, ব্যাপারটাতে ওঁর প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে।

একসময় প্রসঙ্গ বদলান বিডিও সাহেব।

'হ্যাঁ, যা কইসিলাম। ইয়ার নাম এক্সটেনশন ওয়ার্ক। গ্রাসরুট লেবেলে রইস তোমরা। দেখো, যেন গাঁ-গঞ্জের যাবতীয় কর্মযজ্ঞে নীচুতলার মানুষকে ইনভল্‌ব্‌ করা যায়। অরা যেন সব কাজে আগেভাগেই ঝাঁপাইয়া পরে। ক্লাব, লাইব্রেরি, নাইট স্কুল, মহিলা সমিতি, কৃষি, সমবায়—সব জায়গায় অদের ইনভল্‌ব্‌ কর। হেটাই তোমাগো ডিউটি। এনি কোয়েশ্চান?'

এসব কথায় সাধারণত কোনও কোয়েশ্চেন ওঠে না। সবাই বোঝে, এ হল বিডিও সাহেবের কনক্লুডিং স্পীচ। নিভে যাওয়ার আগে জ্বলে ওঠা। এনি কোয়েশ্চান-এর জবাবে 'না, স্যার' বললেই উনি বলবেন, দ্যাটস্ অল। আজও তেমনি করে শেষ হতে পারত মিটিংটা। কিন্তু ভণ্ডুল করে দেয় বুদ্ধদেব। সহসা সে বলে বসে, 'ওদের ইনভল্ব্ করা যাচ্ছে না, স্যার।'

'ক্যা-ন?' অকস্মাৎ তালভঙ্গে ভুরুজোড়া কুঁচকে ওঠে বিডিও সাহেবের। বুদ্ধদেবের দিকে দুর্বাশার চোখে তাকান তিনি।

কেমনভাবে শুরু করবে ভেবে পায় না বুদ্ধদেব। যা কিছু শুরু হয়েছে, কর্মযজ্ঞের নামে, গাঁয়ে-গঞ্জে, সবই তো তেলা-মাথায়-তেল-দেওয়ার গল্প। যাদের জমিই নেই, কৃষিঋণ তাদের কোন কাজে লাগে? যাদের পেটে এক অক্ষর বিদ্যে নেই, তাদের কাছে লাইব্রেরি এক বিকট তামাশা। খাটতে খাটতে যাদের কোমরের বাঁধন টুটে যায়, তারা ফুটবল খেলবে কখন, ক্যারাম পিটবেই বা কখন? রবীন্দ্রনাথ যাদের জন্য একখানা বাক্যও ব্যয় করে যান নি, তারা রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনে কতখানি উৎসাহী হবে! দেশ জুড়ে সেচের আয়োজন হলে ওদের কিই বা এল গেল! বেল পাকলে কাগেদের কি? কিন্তু বুদ্ধদেবের মনে হয়, কথাগুলো বিডিও সাহেবকে বলা বৃথা। তিনিও বোধ করি এসব জানেন। জেগে জেগে ঘুমোচ্ছে মানুষটা। কোন্ মন্ত্রবলে বুদ্ধদেব ভাঙাবে সে ঘুম! তবুও বুদ্ধদেব একটু একটু করে সমস্যাগুলোকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে।

বুদ্ধদেবকে পলকহীন দেখছিলেন বিডিও সাহেব। বিস্ময় ঝরে পড়ছিল তাঁর দু'চোখ থেকে। একসময় হুঁশে ফেরেন তিনি। সবাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'আপনেরা অহন আসেন গিয়া।' সবাই উঠে দাঁড়ায়।

বিডিও সাহেব বলেন, 'বুদ্ধ, থাকো একটু।'

বুদ্ধদেব বসে থাকে। চোখে মুখে এক ধরনের অনিশ্চিত ভাব।

ফাঁকা ঘরে একা একা বসে থাকে বুদ্ধদেব। বিডিও সাহেব একমনে ফাইলে সই করতে থাকেন। জানলা দিয়ে রাস্তাখানি দেখা যায়। পল্টু হাজরার মোটর-বাইকের পেছনে বসে করালী সোম কোথায় যেন বেরিয়ে গেল।

এক সময় মুখ তোলেন বিডিও সাহেব। থমথমে গলায় বলেন, 'তোমাগো একখান কথা কই।'

'বলুন, স্যার।'

'অই সুকুমার আচার্যির লগে মেলামেশাটা বন্ধ কর। উ ছোঁরা ভাল নয়। তোমার মাথাটা এক্কেরে চিবাইয়া খাস্‌সে।'

বুদ্ধদেব পাথরের মতো বসে থাকে।

বিডিও সাহেব বলেন, 'ইয়ার কারণেই হরবল্লভবাবু চটসেন তুমার ওপর। কমপ্ল্যান করসেন আমার লগে।'

অপমানে পুড়ছিল নিঃশব্দে, তবুও এমন কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না বুদ্ধদেব। সে শুধু একখানা তগীর টান অনুভব করতে থাকে। তীব্র টান. কে টানে, কেন টানে! ঐ মুহূর্তে তার মনে হয়, হরবল্লভ টোপ, বিডিও সাহেব বঁড়শি। আর মালিক? মালিকটিকে আতিপাঁতি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয় বুদ্ধদেব।

সহসা রূঢ় হয়ে ওঠে বিডিও সাহেবের গলা, 'তোমাকে ওখানে সরকারী কাজ কোরবার জন্য পাঠান হয়েসে। পোলিটিক্স করার জন্য নয়। এরপর আমি ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিতে বাধ্য হব। ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন বোঝো?'

চুপ করে বসে থাকতে থাকতে এক সময় উঠে দাঁড়ায় বুদ্ধদেব।

'আমি চলি, স্যর।'

'হ্যাঁ। আসো গিয়া। বুইঝা-সুইঝা কাম করো। সেইলামাইন্‌ষির বয়েস নাই তোমাগো।' বিডিও সাহেব পুনরায় ফাইলে মন দেন।

দরজার মুখে এসে রুমাল দিয়ে মুখ, ঘাড়, গলা ভাল করে মোছে বুদ্ধদেব। আর তখনই সে পুনরায় অনুভব করে তার সারা শরীরে এক অদৃশ্য শেকল। গলাব মধ্যে একটা টোপগাঁথা বড়শি। কেউ যেন অল্প অল্প টান মারছে অদৃশ্য সুতোয়। কে টানে, কেন টানে, কোন্ দিকে টানে!

ছোট্ট করিডোরখানা পেরিয়ে বাঁ দিকে মোচড় নিলেই বিডিও সাহেবের ঘরের পশ্চিম দেওয়াল। একখানা মাত্র জানলা, পশ্চিমের রোদ্দুর আসে বলে প্রায় সারাক্ষণই বন্ধ থাকে। বাঁয়ে মোচড় নিল বুদ্ধদেব, আর তক্ষুনি দেখতে পেল জানলায় কান ঠেকিয়ে বামাচরণ। আর তৎক্ষণাৎ তাব মনে ভেসে উঠল কিছু কথা, এবং একখানা ছবি।

ছবিখানা হপ্তা দুয়েকের পুরোনো, সামান্য ধুলো জমে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার শরীর। কিন্তু কথাগুলো বড়ই টাটকা। আজই দুপুর নাগাদ শুনেছে বুদ্ধদেব কৃষ্ণ নাগের ঘরে। পুরোনো, ধুলো-জমা ছবিটা আজকের কথাগুলির সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা এবং সেই সুতোর দুই প্রান্তেই বামাচরণ।

বামাচরণকে নিয়ে ব্লক অফিসে গবেষণার অন্ত নেই। তার নির্বুদ্ধিতা নিয়ে অনেক গল্প চালু রয়েছে বাজারে। সে নাকি কবে বিডিও সাহেবের সঙ্গে জীপে চড়ে যাচ্ছিল কোথাও। বিডিও সাহেব রাস্তার ধারে একখানা লেটার-বক্স দেখে গাড়ি থামিয়েছিলেন। একখানা পোস্টকার্ড বামাচরণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, বামা, এই চিঠিখানি ফেলাইয়া দাও ত। বামাচরণ নাকি চিঠিখানা নিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল রাস্তার ধারে। জেলা-সদব থেকে জেলাশাসকের পক্ষে অন্য ডেপুটি কালেক্টবরা অনেক চিঠি পাঠান। সইযেব তলায় লেখা থাকে 'ফর্ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট'। বামাচরণ নাকি সদরে গিয়ে 'ফর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের' ঘরখানা খুঁজতে খুঁজতে কাটিয়ে দিয়েছে এক বেলা। বিডিও সাহেব নাকি একদিন তাঁর চেম্বারে বসে হাঁক পেড়েছিলেন, কে আছ? ভবানী, কিশোরী, দেখ তো সি-সি (করেসপন্ডেন্স ক্লার্ক) আছে কি না। ভবানী, কিশোরী, তখন কেউ ছিল না কাছে পিঠে। কাজেই বিশেষ উদ্যোগী হয়ে বামাচরণ নাকি একখানা ঢাউস বোতল নিয়ে হাজিব হয়েছিল বিডিও সাহেবের চেম্বারে। বলেছিল, শিশি তো নেই স্যার, এই বোতলটাতে কাজ চলবে? এইসব নিয়ে সেদিন জোর মজলিশ বসেছিল কৃষ্ণ নাগের ঘরে। সব্বাই বামাচরণের নির্বুদ্ধিতার একাধিক ঘটনা পেশ করেছিল।

অন্যেরা যখন কথা বলে, কৃষ্ণ নাগ তখন না শোনার ভান করে নিজের কাজে ডুবে থাকবার ভাব করে। মানুষকে অবজ্ঞা করবার এও এক তরিকা। কিন্তু অখিল সরকার যখন বলল, 'ব্যাটা একটা ক্যাবলাকান্ত। হাঁদা গঙ্গারাম' তখন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না কৃষ্ণ নাগ।

'ক্যাবলাকান্ত! কে ক্যাবলাকান্ত? বামাচরণ?' কৃষ্ণ নাগ আকাশ থেকে পড়ে, 'শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! ওর মতো চতুর ব্যক্তি আর পাবে না হে। এক্কেবারে স্লাই ফক্স।'

অখিল সরকার ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। রহস্যের গন্ধ পেয়েছে।

'ও রাতের বেলায় জুয়ো খেলতে যায়, জান?'

এমন কথায় অনেকের বন্ধ তুবড়ি খুলে যায়।

'আরে, ব্যাটা মল্লিকার পেছনে লাইন মেরেছে। পাক্কা খবর।'

'বামাচরণকে ভাই আমি বহুদিন ভূতমুড়ির শ্মশানে দেখেছি, রাতের বেলায়।' করালী সোম বলে।

'তুমি সেখানে রাতের বেলায় কি করতে যাও মাণিক?'

'ঠাট্টা নয়। নাইট শো সিনেমা দেখে ফেরার পথে বহুবার ওকে শ্মশান থেকে বেরোতে দেখেছি। বিশ্বাস কর।'

করালী সোমের কথাগুলো একটা নতুন মাত্রা যোগ করে। ব্যাপারটাকে আর খুব হালকা করে দেখা যাচ্ছে না। রোজ রাত্তিরে শ্মশান থেকে বেরোনো কোনও স্বাভাবিকতার লক্ষণ নয়।

'চোরাই মালের কারবার-টারবারের সঙ্গে যুক্ত নাকি?'

'মনে হয় না। অত সাহস ওর নেই।'

'সাধনা-ফাধনা করে নাকি?'

'হতে পারে। দেখ না, কেমন সর্বদাই ঢুলুঢুলু চোখ। ভাঙ-সিদ্ধি খেলে এমনটা হয়।'

'আমি বাবা ওর পিছে আর লাগছি নে। ওরে ব্বাস, ওরা ক্ষেপচুরিয়াস হলে বাণ-ফাণ মেরে দিতে পারে।'

এক ধরনের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাতাবরণের মধ্যেই মজলিশটা উপভোগ করছিল সবাই। সাধু-সন্তদের ক্ষমতা নিয়ে জোর তর্ক বেধে যায়। অলৌকিক ক্ষমতাধর সাধুদের নিয়ে প্রত্যেকেই একটা করে অভিজ্ঞতার কথা জানাতে চায়। 'ভারতের সাধক' থেকে উদাহরণ গ্রহণের ধুম পড়ে যায়।

'ওসব কিছু নয় হে। তোমরা আসল ব্যাপারের ধারেকাছেও পৌছুতে পার নি। এসবের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর ও।'

কৃষ্ণ নাগের দস্তুরই এই। সে যখন হাসাতে চাইবে, হাসতে হবে সবাইকে। যখন ভয় দেখাতে চাইবে, ভয় পেতে হবেই। যখন শোনাতে চাইবে, শুনতেই হবে। কোন কিছু বিশ্বাস করাতে চাইলে, মানুষকে তা বিশ্বাস করতে হবেই। এমনই তার ক্ষমতা। ওর কথায় আচমকা জমজমাট আসরখানি দম আটকে বসে থাকে। আরও ভয়ঙ্কর? কী সেটা!

চোখের মণি তেরচা ছুটিয়ে কৃষ্ণ নাগ দেখে নেয় সবাইকে। তারপর প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে, 'ও পুলিসের ইনফর্মার।'

ঘরের মধ্যে বুঝি এ্যাটম বোম পড়ে। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায় পুরো জমায়েত। একেবারে পাথর হয়ে যায় মানুষগুলো। কেষ্টদা বলে কি! ঐ কোলকুঁজো, বেতো ঘোড়ার মতো লোকটা পুলিশের চর! কী আশ্চর্য!

ধীরে ধীরে সামলে নেয় ওরা। স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে। এবং সিদ্ধান্তে আসে যে, হতে পারে, এটা খুবই সম্ভব। পুলিশের ইনফর্মাররা এমনই হয়। আপাতদৃষ্টিতে অপদার্থ,

ক্যালাস, ক্যাবলাকান্ত মানুষগুলিই এ কাজের উপযুক্ত। দুনিয়ার সবাই যখন ওকে গোবর-গণেশ বলে হাসাহাসি জুড়েছে, ও তখন নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে চলেছে ওর শিকারের দিকে। কেউ ওকে গা করে নি, পাত্তাই দেয় নি। ঐ বোকাবোকা ভাবখানাই ওদের ক্যাপিট্যাল। ওতেই মানুষকে বোকা বানিয়ে দেয়। টিকটিকি যেমন পোকা ধরে।

সহসা শীতের রাত্রির মতো কনকনে শীতলতা নেমে আসে সারা ঘরময়। কাঁপিয়ে দেয় সবাইকে। ইস্, এ অফিসে একজন জলজ্যান্ত পুলিশের টিকটিকি রয়েছে! আমাদের যাবতীয় খবরাখবর সে নিয়মিত দিয়ে চলেছে পুলিশকে! আমাদের মধ্যেই সংগোপনে বাস করছে এমন এক বিপজ্জনক শত্রু! শুনে ভয় করে, শীত করে। পালঙ্কেব বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে খবর পেলাম বিছানার মধ্যেই কোথায় যেন লুকিয়ে রয়েছে দেয়াল-চিতি। ছোট্ট অবয়ব। অতি সাধারণ। বিছানার আধময়লা বালিশ-তাকিয়া-ওয়াড়, বিছানার রঙের সঙ্গে মিশে যাওয়ার মতো গায়ের রঙ। অতি ধীর-স্থির, সহিষ্ণু বিচরণ, অথচ জিভের তলায় উগ্র বিষ। এমন ঘটনায় সেই বিছানাতে গা ছোঁয়াতে যেমন ভয়ে শিউরে ওঠে মানুষ, আজকের অনুভূতিটা সেই জাতের। কাকে নিয়ে কী খবর এতদিনে পৌঁছে দিল পুলিশে কাছে, কে জানে! কার কতখানি কুকীর্তির খবর এ্যাদ্দিনে পৌঁছে গেল সরকারের কানে, তাই বা কে বলতে পারে!

'বিডিও সাহেব জানেন?'

'কেউ জানে না। আমিও জানতাম না। এই দিনকতক হল জেনেছি। জেনেছি আচমকা এক ঘটনায়।'

ঘটনাটা শোনার জন্য সবাই যখন উদগ্রীব, তখনই প্রয়াগ দাস এসে খবর দেয়, পল্টু হাজরা এসে বসে রয়েছে করালী সোমের ঘরে। ডাকছে।

কামেশ্বর হাজরার ছেলে পল্টু হাজরা, সিদ্ধেশ্বর হাজরার ভাইপো, এখন ব্লকের উঠতি কন্ট্রাক্টর। বিষ্টুপুরের এক নম্বর কংগ্রেস নেতা অন্নদা চক্রবর্তীর বাল্যবন্ধু হল কামেশ্বর হাজরা। একসঙ্গে নাকি স্বাধীনতার লড়াই করেছে দীর্ঘ দিন। বর্তমানে তার স্ট্যাটাস হল, প্রবীণ ফ্রিডম -ফাইটার-কাম-সিটিং এম-এল-এ'র দাদা। সেই সুবাদে পল্টু এখন অপ্রতিরোধ্য। ওকে অবজ্ঞা করবার উপায় নেই কারো।

'যাই।' অনিচ্ছা সহকারেও উঠে দাঁড়ায় করালী সোম, 'মোরাম সাপ্লাইয়ের অর্ডারটা নিতে এসেছে।'

'অর্ডারটা অবশেষে বাগাল তাহলে?'

'আর বলো কেন?' করালীর চোখে-মুখে প্রচ্ছন্ন উষ্মা, 'কামেশ্বর হাজরা আর রামকমল চক্রবর্তী তো লেগেই ছিল। গতকাল এম-এল-এ'ও ফোন করেছিল বিডিওকে।'

'পল্টু হাজরা নাকি একটা নতুন ক্লাব খুলেছে?'

'হুঁ। নাম দিয়েছে শক্তি সংঘ।'

'ওদের সেই সংস্কৃতি-সংসদের কী হল?'

'সংস্কৃতি-সংসদে ওর পোষায়? নিজের মতো গাট্টাগোট্টা গুটিকয় ছোকরাকে জুটিয়ে নিয়ে ও সংস্কৃতি-সংসদ থেকে বেরিয়ে এসেছে। টাইট প্যান্ট আর ছুঁচোলো জুতো পরে এখন চুটিয়ে গুণ্ডামি-মস্তানি করে বেড়াচ্ছে রসিকগঞ্জের মোড়ে। চাঁদা তুলছে জোর করে, মেয়েদের হিড়িক দিচ্ছে।'

'সরকারী গ্র্যান্ট চাইছে না?'

কৃষ্ণ নাগ আড়চোখে দেখে নেয় মহেন্দ্র সেন ওরফে বিপদবাবুকে। বলে, 'ক্লাবের ব্যাপার, ক্লাববাবুকেই শুধোও। বিপদদা, বল না।'

মহেন্দ্র সেন ব্লকের এস-ই-ও। সোস্যাল এডুকেশন অফিসার। গ্রামে-গঞ্জে ক্লাব গড়া, লাইব্রেরি, নাইট স্কুল গড়া, চীনে-লণ্ঠন দেখানো, মনীষীদের জন্মদিবস পালন করা-এসবই ওঁর কাজ। বয়স হয়েছে ঢের। খুব নিরীহ গোবেচারা ভিতু সম্প্রদায়ের মানুষ। নিপাট ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায়। সর্বদাই সব বিষয়ে নিদারুণ আতঙ্কে ভোগেন। সব দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা করেন প্রতি মুহূর্তে। বিশ্বাস করেন, মানুষ সবদিক থেকে এক বিপন্ন প্রজাতি। সহকর্মীরা ওকে বিপদবাবু বলে ক্ষেপায়। ক্লাবগুলোর কাজকর্ম দেখাশোনা করেন বলে, কৃষ্ণ নাগরা ওঁকে মাঝে মধ্যে 'ক্লাববাবু' বলেও ডাকে। কৃষ্ণ নাগের সঙ্গে একই ঘরে বসেন বিপদবাবু। কোনও কিছুতেই নিজেকে জড়াতে চান না। ওরা যখন কৃষ্ণ নাগের টেবিল ঘিরে আড্ডা মারছিল, বিপদবাবু তাঁর নিজের সীটে বসে একমনে নভেল পড়ছিলেন।

কৃষ্ণ নাগের কথায় নভেল থেকে মুখ তোলেন। নিপাট হাসেন। বলেন, 'চাইছে না আবার! কান ঝালাপালা। বিপদ! মহাবিপদ!'

বিপদবাবু ফের ডুবে যান নভেলে।

তখন থেকেই ছবিটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করেছিল বুদ্ধদেব। অল্প অল্প ফুঁ দিয়ে ছবির শরীরেব ধুলোগুলোকে ঝাড়ছিল। বিডিও সাহেবের ঘরে আড়ি পাতবার দৃশ্যখানি দেখবার পর ছবিখানা ওকে প্রায় সরাসরি আক্রমণ করে বসে।

হপ্তা দুই আগে বলক অফিস থেকে কাজকর্ম সেরে সমিতির অফিসে গিয়েছিল বুদ্ধদেব। কাছাকাছি পৌঁছে আচমকা দেখতে পায়, সমিতির অফিস ঘরের পেছন দিক থেকে পায়ে পায়ে পীচরাস্তার দিকে হেঁটে চলেছে বামাচরণ। অথচ অফিস ঘরের পেছন দিক দিয়ে কোনও রাস্তা নেই। ঝোপঝাড়ে ভরা ঐ জায়গায় কেন গিয়েছিল বামাচরণ, সেই ভাবনা বারেকের তরে বাসা বেধেছিল বুদ্ধদেবের মনে। কিন্তু বিষয়টিকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় নি। আজকের ঘটনা তার ভাবনাকে একটা বিশেষ দিকে চালিত করতে থাকে।

বুদ্ধদেব স্থির করে, কথাটা প্রণয়দাকে বলা উচিত।

হাগব নাই, মুতব নাই-এর দর্শন

চীন-ভারত যুদ্ধ চলাকালীনই শুরু হয়েছিল কম্যুনিস্টদের দুর্দিন। এখনও অবধি সেই পরিস্থিতি অব্যাহত। ১৯৪৮ সালে কাশ্মীরের যুদ্ধটা তেমন করে জমাট বাঁধেনি মানুষের স্মৃতিতে। বয়স্ক মানুষেরা এতদিন যুদ্ধ বলতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতিকেই বুকের মধ্যে আঁকড়ে রেখেছিল। তারই স্মৃতি রোমন্থনে বিভোর ছিল। বাপ্‌রে বাপ, সে সব কী দিন! আকাশে শুধু উড়াজাহাজের মালা। মালা হইয়েঁ আসে, মালা হইয়েঁ ফিরে যায়। আর, বাজারে আচমকা লেগে গেল আগুন। চাল নাই, চিনি নাই, কেরাসিন নাই, কিচ্ছু নাই। বোমা পড়ছে কোলকাতায়, সে খবর আসে। খবরের অনেক ডালপালা গজায়। টেরেন ভর্তি সিপাইরা কুথা থিক্যে কুথা চইলে যায় রোজ। আর, প্রত্যেক দিন গুজব রটে যায়, পূব দিক থিক্যে জাপানীরা এ দেশে

ঢুকো পড়েছে। যারা প্রথম দিকে হুঁকরাচ্ছিল, গোরাদ্যার নিজস্ব যুদ্ধে না এক পাই, না এক ভাই, একটি পয়সা অথবা একজন ভারতীয় সিপাই দিয়েও সাহায্য নয় ব্রিটিশকে, উয়ারাই পরে উল্টা গাইল্যাক। বাস্তবিক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের কম্যুনিস্টদের ভাবমূর্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। দু'মুখো নীতি গ্রহণ করে নাজেহাল হতে হয়েছে পার্টিকে। যে মুখে দু'দিন আগে বলেছে, এ হল সাম্রাজ্যবাদীদের নিজস্ব লড়াই। কাঁচামাল, বাজার আর নতুন-নতুন প্রযুক্তি দখলের লড়াই, এ লড়াইতে আমাদের কোনই স্বার্থ নেই, কাজেই এ যুদ্ধে আমরা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশকে সামান্যতম অর্থবল অথবা লোকবল দিয়ে সাহায্য করব না, সেই মুখে কিছুকাল বাদেই বলতে হয়েছে, রাশিয়া যোগ দেবার পর এ যুদ্ধ জনযুদ্ধের রূপ পেয়ে গেছে, কাজেই, এ যুদ্ধে এই মুহূর্তে ব্রিটিশ আমাদের বন্ধু। ব্রিটিশকে এ যুদ্ধে সর্বতোভাবে সাহায্য করা প্রতিটি ভারতবাসীরই উচিত। আর, ইতিহাস তো মানুষের চেয়ে লক্ষগুণ বেশি স্মৃতিশক্তির অধিকারী। সবকিছুই রেখে দেয় মগজে। বহুদিন বাদেও, প্রয়োজন পড়লে, তুলে আনে স্মৃতির নিরাপদ খোপ থেকে। ইতিহাস এক লোহার পাতে মোড়া সিন্দুক। তার থেকে কিছুই হারায় না, ফুরোয় না। সময় কিছু না বুঝেও যা ভরে রাখে সিন্দুকে, সেটাও মহাকালেব তা পেতে পেতে ক্রমশ বোধগম্য, অর্থবহ হয়ে ওঠে। ইতিহাসের ব্যাঙ্কে টাকা তুলে নেবার কোনই বন্দোবস্ত নেই। ঐ ব্যাঙ্কের লেজার-বইতে কেবল জমার দিকটাতেই অগাধ পৃষ্ঠা, খরচের দিকটা ফাঁকা। ইতিহাসের খাতায় জমা পড়ে গিয়েছে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মাত্র দু'তিন বছরের ব্যবধানে দু'টি পরস্পর-বিরোধী স্লোগান। আসলে, সাম্রাজ্যবাদীদের নিজস্ব যুদ্ধই ছিল ওটা। কম্যুনিস্টরা কখনোই চায়নি সে যুদ্ধের অংশীদার হতে। না সাহায্যকারীর ভূমিকায়, না বিরোধীর ভূমিকায়। আসলে, যুদ্ধে সাহায্যকারীর ভূমিকায় না থাকাটাই এক কিসিমের বিরোধিতা। তখন প্রতি মুহূর্তে, এতদিক দিক থেকে এত রকমের সাহায্যের প্রয়োজন হয়.. ! কম্যুনিস্টবা বুঝতে পারে নি, সাম্রাজ্যবাদীরা ওদের যুদ্ধের বাইরে থাকতে দেবে না, ওদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে।

'আসলে, পরিস্থিতি অনুসারে সিদ্ধান্তও বদলে যায়। ব্যক্তিব ক্ষেত্রেও এটা হয়।' সুকুমার এভাবেই বোঝায় ব্যাপারটা, 'ধরুন, আপনি বিষ্টুপুর যাবার একটা পথ ধরলেন, খানিক এগিয়ে দেখলেন, রাস্তা বন্ধ, আপনি তখন দুশরা পথ ধরবেন তো, না কি?'

সে যা হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনুভূতি জনমনে তত প্রত্যক্ষ ছিল না। যুদ্ধটা চলছিল সুদূর মুলুকে। কিন্তু চীন-ভারত যুদ্ধে ভারত সরাসরি আক্রান্ত। চীনেব লাল ফৌজ প্রতিদিন একটু একটু করে এগিয়ে আসছিল। দখল করে নিচ্ছিল ভারতের মাটি। খবরের কাগজগুলো গরমাগরম সে খবব ছাপছিল। রেডিওতে দিনভর চলছিল দেশভক্তির গান।

যুদ্ধটা যুগপৎ অনেকগুলো ঝাঁকি দিয়ে গেল। সামরিক শক্তিতে ভারত যে কতখানি দুর্বল, ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত নির্মমভাবে সেই সত্যটা আচমকা প্রকাশ হয়ে পড়ল। পঞ্চশীল নিয়ে নেহেরুর এতকালের এত বাণী, বিশ্বজুড়ে ঐ নিয়ে এত প্রচার, অকস্মাৎ মুখ থুবড়ে পড়ল। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল গালভরা তাসের প্রাসাদখানি। পুরো কংগ্রেস দলটা এক বেজায় অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিতে যাদের নিরঙ্কুশ রাজ্যপাট সেই স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকে, আচমকা এতখানি জাতীয় লজ্জার দায়ভাগ তো তাদের নিতেই হবে। নেহেরু একেবারে চুপসে গেলেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী, প্রাণের বন্ধু মেননকে কোরবানি দিয়ে কোনগতিকে পরিস্থিতিটা সামাল দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন তিনি। ভুগছিলেন অনেকদিন

থেকেই। শরীর-স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল আরও। এবং ১৯৬৪-তে আচমকা ওপারে চলে গেলেন নেহেরুজী। সারা দেশব্যাপী শোকের প্লাবন বয়ে গেল। মহাদেব কয়াল রাতারাতি গান বেঁধে, গেয়ে বেড়ালেন চুয়ামসিনার পথে পথে, গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে। অমিত শক্তি, অমিত শৌর্য, হে জহর তুমি কোথায় আজ, / অসহায় দেশ হতাশায় কাঁদে, বিনা মেঘে শিরে পড়েছে বাজ / দেশ প্রেমিক হে বীর সেনানী, বিশ্বকে দিলে শান্তির বাণী, / তোমার শতেক স্বপন-সাধনা সফল হল না, হে গিরিরাজ।

বছরটাক আগে ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই চলে গিয়েছেন বিধান রায়। মহাদেব কয়াল গান বেঁধেছিলেন তখনও। জাতিরে কাঁদায়ে কোথা চলে গেলে সন্ন্যাসী-রাজা বিধান রায়, / কেমনে ভুলিবে এ শোক ভারত, সারা মনপ্রাণ তোমাতে ধায়।' মাত্র এক বছরের মধ্যে যে তাঁকে পুনরায় বচনা করতে হবে নতুন শোকগাথা, তা বুঝি স্বপ্নেও ভাবেন নি মহাদেব। পরে শোক কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলে, রচিত শোকগাথার নানা ব্যঞ্জনা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন নানাজনকে। বিয়ে করেন নি বলে বিধান রায়কে যে সন্ন্যাসী-রাজা এবং কাশ্মীরে আদি মুলুক বলে জহরলালকে যে 'গিরিরাজ' আখ্যায় ভূষিত করেছেন, এটা জানবার পর তাঁর গুণগ্রাহীরা ধন্যধন্য রব তুলেছিল। নাহ্, আলটপকা রচনা লয়, পিঠার মধ্যে মধ্যে অনেক পূর্ রইয়েছে।

জাতীয় শোক পালিত হচ্ছে তখনও, নেহেরুর চিতাভস্ম উড়োজাহাজে ভরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সারা দেশে, সে ছাই তখনও ভাসমান ভাগ্যহত দেশের আকাশে-বাতাসে, মহাদেবের শোকগাথার সুরও চুয়ামসিনার বাতাসে পাক দিয়ে বেড়াচ্ছে তখনও, কাগজে কাগজে বেরোল কার্টুন, তামাশা, মশকরা, নেহেরু লেফট্ ক্যাশ ফর হিজ ডটার, অ্যাশ ফর হিজ কান্ট্রি, অ্যান্ড গ্যাস ফর দ্য ওয়ার্ল্ড।

অনেক হাসাহাসি হয়েছিল ঐ নিয়ে। কিন্তু ততদিনে কম্যুনিস্টদের অনেক বড়সড় ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। ক্রমাগত প্রচারের ফলে আপামর মানুষের মনে এমন ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে কম্যুনিস্টরা এদেশে বসবাস করলেও মনেপ্রাণে এ দেশীয় নয়। তারা চীনের দালাল। তারা যেন তেন প্রকারেণ দেশটাকে চীনের হাতে তুলে দিতে চায়। প্রথম সুযোগেই তারা চীনাদের এনে বসিয়ে দেবে এ দেশের গদিতে। হরবল্লভ সিংহবাবু তার সঙ্গে বাড়তি যোগ করেছেন, আর চীনারা এ দেশে রাজ কইর্‌লে সক্কলকে আশশুলা খেইতে হব্যেক। তখন নাক টিপ্পে আশশুলা খাবাব্যেক খ্যাঁদারা। কুনো কথাই শুইন্‌বেক নাই। এইসব সাতসতের রটনাকে কেন্দ্র করে সুকুমারের দল ভারি অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ, দেখা হলে হাসে, কথা কয়, কিন্তু চোখের মণিতে চাপা সন্দেহ। কী? না, ইয়ারা ভিতরে ভিতরে চীনের চর। দেশের সর্বনাশ চায় ইয়ারা। দেশটাকে বিদেশিদের হাতে বিকিয়ে দিতে চায়। তার জন্য চীন-সরকারের থেকে নিয়মিত টাকা পায় এরা। প্রচুর টাকা। ইদানীং প্রতিটি জনসভায় হরবল্লভের দল এই কথাটাই গলা ফাটিয়ে বলে বেড়াচ্ছে।... আর, যারা এই দেশের মাটিতে জম্মে, এই দেশের ভাতে-জলে, আলো-হাওয়ায় পুষ্ট হয়ে দেশমাতৃকার গলায় ছুরি চালাতে চায়, দেশটাকে বিদেশি শত্রুর হাতে তুলে দিতে চায়, দেশের মানুষ তাদের কোনদিনই ক্ষমা করবেক নাই। ওরা বেইমানি না করলে চীনাদের ক্ষমতাই ছিল না ভারতীয় বীর জোয়ানদের কেশাগ্র স্পর্শ করে। কিন্তু যেমন করে ঘরভেদী বিভীষণের বেইমানিতে সামান্য বানরসেনার হাতে পরাজিত হতে হয়েছিল ত্রিলোকবিজয়ী রাক্ষসরাজ রাবণকে, ঠিক তেমনই এই আধুনিক

বিভীষণদের চক্রান্তে জন্মভূমির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব আজ বিপন্ন। দেশের মানুষ এই বেইমানদের কথা যেন কখনই ভুলে না যায়...। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের দ্বিতীয় সারি থেকে পল্টু হাজরার দল স্লোগান তোলে, বেইমানদের চিনে নিন, এই মাটিতে কবর দিন। আসলে, চীনাদের কাছে গো-হারান হেরে যাবার যাবতীয় লজ্জা ও গ্লানিকে এই উপায়ে কম্যুনিস্টদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল হরবল্লভের দল। তারা সফলও হয়েছে। শুধু দেশের সাধারণ মানুষকেই নয়, পার্টির মধ্যেকার কর্মী ও নেতাদের মধ্যেও তৈরি করে দিতে পেরেছে চরম বিভ্রান্তি। পার্টি কর্মীদের একাংশ বিশ্বাস করেছে, চীন-ভারত যুদ্ধের প্রশ্নে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি যে কোনও কারণেই হোক দেশপ্রেমিকের ভূমিকা পালন করে নি। অন্য অনেক বিষয়ে পার্টির মধ্যে মতবিরোধ ছিলই, চীন-ভারত যুদ্ধের প্রশ্নে সেই ফাটলখানি শতগুণ বেড়ে গেল। এবং তারই পরিণতিতে পার্টিটা ভেঙে দু'ভাগ হয়ে গেল।

এ জেলার মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী, দিবাকর দত্ত, অশ্বিনী রাজের মতো প্রথম শ্রেণীর নেতাদের সঙ্গে সুকুমাররাও মাকর্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিতে চলে এসেছে। কিন্তু মনটা ভাল নেই সুকুমারের। এ ভাঙন কারোরই অভিপ্রেত ছিল না। এ ভাঙন দেশের গবীব মানুষের লড়াইকে দুর্বল করবে। কিন্তু এ ছাড়া কোনও উপায়ও ছিল না। চীনকে আক্রমণকারী না বলায় যখন দেশব্যাপী কম্যুনিস্টদের ধরপাকড় শুরু হল, তখন পার্টিরই একটা অংশ নিপুণভাবে গা বাঁচাল। লড়াইটা যেখানে এ দেশের গরীব মানুষের সঙ্গে রাজা-জমিদার, পুঁজিপতি মহাজনদের, তখন পার্টির ভেতর থেকেই তাদেরকে লড়াইয়ের বাইরে রেখে, বলা হল, লড়াইটা আগে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়ে নেওয়া দরকার। দু'গোষ্ঠী যখন সব বিষয়েই দু'দিকে হাঁটছে, তখন আব একসাথে চলার উপায় থাকে না।

সে যাত্রা সুকুমারকে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হয়েছিল। পালাতে পালাতে, লুকোতে লুকোতে একদিন ধরা পড়ে গেল পুলিশের জালে। জেল হাজতে ছিল প্রায় বছর খানেক। মকবুল আর হঠাৎ মুর্মুও ধরা পড়েছিল। সে বিহনে এলাকায় পার্টির কাজকর্মও থিতিয়ে পড়েছিল অনেক বেশি। সংগঠনটা যে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় নি, তার সবটুকু কৃতিত্ব পরীক্ষিত বাউরির।

পরীক্ষিত বাউরিই এ তল্লাটে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের পত্তন ঘটিয়েছিল প্রায় দু'দশক আগে। অন্তত সুকুমার আচার্যর ভাষ্য তাই। অনাথবন্ধু অবশ্য বলেন, তারও আগে, অনেক আগে, এই জঙ্গলমহলে ঘটে গিয়েছিল মেহনতি মানুষের আন্দোলন, লড়াই, যদিও আপনারা আজ আর তাকে কম্যুনিস্ট আন্দোলন বলবেন নাই। অনাথবন্ধু বুদ্ধদেবকে জঙ্গলমহলের হরেক লড়াইয়ের কাহিনী শোনান। সে লড়াইয়ের মহিমাও কিছু কম নয়, তবে কম্যুনিস্টদের আন্দোলনকে এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছিল পরীক্ষিত বাউরিই।

বাস্তবিক, পরীক্ষিত বাউরির চরিত্রে এক ধরনের রহস্যময়তা রয়েছে। যদিও তার বাড়ি চুয়ামসিনার লাগাও শালকাঁকি গাঁয়ে, কিন্তু ওর সঙ্গে ঐ এলাকায় সাক্ষাৎ ঘটেনি বুদ্ধদেবের। ইদানীং এলাকায় প্রায় থাকেই না মানুষটা। ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল দীপমালার বাসায়। দীপমালার সঙ্গে ওর সম্পর্কটাও কম রহস্যময় ছিল না। দীপমালা বিদুষী, অভিজাত ঘরের মেয়ে, আর পরীক্ষিত নিরক্ষর বাউরিসন্তান। কিন্তু মাঝে মাঝে দীপমালাকে এমন ধমকায় লোকটা যেন বড়ভাই বকছে ছোটবোনকে, কিংবা কড়া মাস্টার বকছে ছাত্রীকে, কখনও

বা বুদ্ধদেবের এমনও মনে হয়, বুঝি বাপ বকছে মেয়েকে। ইদানীং কথাবার্তা প্রায় বলেই না পরীক্ষিত। একেবারে বোবা বনে গেছে লোকটা। অথচ হঠাৎ মুর্মু যা বলে, লোকটা নাকি এককালে ছিল কথার যাদুকর। মা সরস্বতী নাকি ওর জিহ্বায় অষ্টপ্রহর অবস্থান করতেন, যদিও পেটে এক অক্ষর বিদ্যে ছিল না। অনেক ভাবের কথা বলত পরীক্ষিত। অনেক কাহিনী-গাথা প্রবাদ-প্রবচন, হরেক উপমা অনুষঙ্গ সহকারে।

হঠাৎ মুর্মু এ এলাকার ছোকরা নয়। ১৯৫৯-এর জলডুবি আন্দোলনে গিয়ে পরীক্ষিত বাউরিই ওকে নিয়ে আসে সঙ্গে করে। গোরাবাড়ির ড্যামের তলায় হারিয়ে গিয়েছে হঠাৎদের জনম্-ভিটে। এখন সেখানে থইথই জলের সমুদ্দুর। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন চারপাশে ডুংরি দিয়ে ঘেরা ঐ বিশাল এলাকা জুড়ে ছিল সবুজ সবুজ আদিবাসীদের গ্রাম। একদিন ট্যাঁড়া পিটিয়ে দিল সরকার। ডুংরিঘেরা সবগুলি গাঁ, বাড়ি-ঘর, ক্ষেত-জমিন, সরকারে খাস হয়ে গিয়েছে। গাঁয়ের মানুষ, জলদি ফাঁকা কর এ থান। অন্য কোথাও চলে যাও। এ থান গভীর করে খোঁড়া হবেক। চাষের জল জমা রাখা হবেক এখানে। সবাইকে এ জন্য ক্ষতিপূরণ দিবেক সরকার। কবে দিবেক, কত দিবেক, পরে জানানো হবেক। জনম-ভিটা ছেড়ে নড়তে চায় নি হঠাৎ মুর্মুর দল। কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তারা রুখে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিয়েছে। সরকারের বুল-ডজারের সামনে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। একদিন, চোদ্দপুরুষের ভিটা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে তাদের। ঝুপড়ি বানিয়ে আশ্রয় নিয়েছে আশেপাশের ডুংরিতে। তাদের জমিন-জিরাত গেছে, ক্ষেতি-খামার গেছে। রাতারাতি পথেব ভিখিরি হয়ে গিয়েছে বিশ-বাইশখানা গাঁয়ের মানুষ। অবশেষে, সরকারে মহানুভবতায় মাটি কাটার কাজ পেয়েছে ড্যামে। নিজেদের ভিটে-বাড়ি, ক্ষেত-খামারের মাটি কেটে কেটে সমুদ্দুর বানাতে হয়েছে তাদেরই। দিনের আলো ফুটলেই তারা কাতারে কাতারে ভিড় জমিয়েছে ডুংরীঘেরা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। 'কাজবাবু' তাদের মাপজোক করে বরাদ্দ করেছে কাজ। দিনের শেষে মাটি-মেপে নিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে সিলিপ। ডিলারের কাছে সেই সিলিপ দিয়ে গম পেয়েছে মাটি-কাটা মজুরের দল। আস্তে আস্তে, ওদেরই কোদাল-গাঁইতির ঘায়ে পুরো এলাকাটা একটু একটু করে একখানা গামলার রূপ পেয়েছে। প্রথমে অগভীর সানকি, পরে গভীর গামলা।

তেমনই এক মাটি কাটার সকালে, হঠাৎ মুর্ম তার বাপ-মায়ের সঙ্গে মাটি কাটতে গিয়ে আচমকা আবিষ্কার করে, যে জায়গাটা তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা তাদের নিজেদেরই ভিটে। যদিও ইতিমধ্যে বুলডজার দিয়ে বাড়িঘর, সবকিছু গুঁড়িয়ে সমতল করে দিয়েছে সরকারি বাবুরা, তবুও কিছু লক্ষণ তখনও লেগেছিল সমতল জমিনের খাঁজে খাঁজে যা দেখে ওরা চিনতে পারে নিজেদের সাত জনমের মাটিকে। ভূমির ওপর লুটিয়ে পড়ে কাটা পাঁঠার মতো ছটকাতে থাকে হঠাৎ মুর্মুর বাপ। ডুকুরে ডুকুরে মড়াকান্না কাঁদতে থাকে আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে। হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে রোদনের সুর। কংসাবতীর বাতাসকে ভারি করে তোলে। চারপাশের মানুষজন কোদাল থামিয়ে থমকে দাঁড়ায়। রোদনের উৎস সন্ধানে মগ্ন হয় তারা। দেখে শুনে প্রমাদ গোনেন 'কাজবাবু'র দল। রোদন ভারি সংক্রামক বস্তু। উথালপাথাল রোদনের ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে কয়েক হাজার কর্মরত কুলি-কামিনের মধ্যে। তারাও তো প্রকারান্তরে নিজেদের ভিটেগুলিকে সানকি বানাচ্ছে। সানকি থেকে গামলা। তাদের প্রত্যেকের স্মৃতিতেই তো টাটকা দগদগে ক্ষতস্থান। রোদন থেকে রোষ। যে কোনও মুহূর্তে বিপত্তি ঘটে যেতে পারে।

কাজবাবু'র দল ছুটে আসে। পিছু পিছু পুলিশ বাহিনী। হঠাৎ-এর বাপ আঁকড়ে থাকতে চায় তার সাতজনমের মাটিকে। আচম্কা কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা খাঁকিটির মাথায় বসিয়ে দেয় কোদালের ঘা। দ্বিতীয় ঘা'খানি বসাবার আগেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পুরো বাহিনী। নখে-দাঁতে ছিঁড়ে ফেলে ওকে। দিন তিনেক বেঁচেছিল বাঁকুড়া হাসপাতালে। পরীক্ষিত বাউরির চোখের সুমুখেই ঘটেছিল ঘটনাটা। বাঁকুড়া হাসপাতালে তিনদিন, তিন রাত অনেক দৌড়ঝাঁপ করেছিল সে। শবদাহরও বন্দোবস্ত করেছিল।

জলডুবি আন্দোলন একদিন শেষ হল। পিছুই হটতে হল ভিটেহারা মানুষগুলোকে। পরীক্ষিত ফিরে এসেছিল নিজের মুলুকে। সঙ্গে এনেছিল হঠাৎ মুর্মু এবং তার মাকে। কিছুদিন ছিল সুকুমার আচার্যর বারান্দায়। তারপর অনাথবন্ধুই তাঁর ভিটের এক কোণে ঝুপড়ি বানিয়ে দেন। ওখানেই থাকে হঠাৎ। খাটে-বাটে, পার্টির কাজকর্ম করে, উৎসবে-পার্বনে ফুর্তিফার্তা করে, কিন্তু পরীক্ষিত বাউরি টের পায়, বুকের ওপর একখানা বিশমণী পাথর চাপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হঠাৎ মুর্মু।

হঠাৎ মুর্মুই পরীক্ষিতের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি শোনায়। মানুষটাকে মাত্র ক'মাসে এতখানি চিনে ফেলেছে সে, পুরো একটা জনমেও তেমনটা চিনতে পারবে না অন্যরা। আসলে মানুষকে ঠিকঠাক চিনে নেবার মুহূর্ত খুব বেশি আসে না মানুষের জীবনে। যখন আসে, তখন এক লহমায় প্রকাশ পেয়ে যায় মানুষের আসল রূপ।

পরীক্ষিত বাউরিকে চিনে ওঠার প্রশ্নে সুকুমারই সার কথাটি উচ্চারণ করে। বলে, উড়া পাইখ্কে কে কবে চিনেছে? পরীক্ষিতদা কি একটা দিনের তরেও থিতু হয়েছে কোথাও যে মানুষজন ঠিকঠাক চিনবেক উয়াকে? সে স্বদেশী আন্দোলনে ছিল, তেভাগায় ছিল, বাঁধগাবায় ছিল, জলডুবিতে ছিল। সারাটা জীবন তো চরকির মতো দৌড়ে বেড়ালো লোকটা। ধরা কি দিল কাউকে, যে তাকে চিনবেক, বুঝবেক, এলাকার মানুষ!

বাস্তবিক, উড়ে বেড়ানো স্বভাবটা পরীক্ষিত বাউরির সারা জীবনেও গেল না। এখনও সে কেবলই পালিয়ে বেড়ায়। একদিন ঘরে থাকে তো, তিনদিন উধাও। কিন্তু কোনও লড়াই-আন্দোলনে আর নেই সে। তেভাগা আন্দোলনটা মুখ থুবড়ে পড়বার পর থেকেই একটু একটু করে ঝিমিয়ে আসছিল লোকটা। তাও পার্টির সঙ্গে সঙ্গে ছিল জলডুবি আন্দোলনতক। তারপর একেবারে বসে গিয়েছে। সুকুমার আচার্যরা অনেক চেষ্টা করেও তাকে তরতাজা করে তুলতে পারে নি। আসলে, তার মনের মধ্যে এমন ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, আটচল্লিশের পর থেকে সারা জেলাজুড়ে শক্তপোক্তভাবে গড়ে ওঠা কৃষক আন্দোলনটাকে বাবুভায়ারাই নষ্ট করে দিয়েছেন বেশি বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে। অত্যুৎসাহে, আন্দোলনটাকে ধরে রাখতে পারেন নি। অনেক কিসিমের হটকারিতা করেছেন। রোমন্টিক হটকারিতা। সঠিকপথে পরিচালনা করতে পারেন নি। অকারণেই বহু মানুষ মরেছে। সরকার সুযোগ পেয়ে গেছে ঝাঁপিয়ে পড়বার। সাধারণ মানুষ ভয় পেয়ে গেছে। গুটিয়ে নিয়েছে নিজেদের। আন্দোলনটা অকারণে ধাক্কা খেয়েছে। উনিশশো তেপান্নতে জমিদারি উচ্ছেদ আইন পাশ হল। কিন্তু তারপর, আজ অবধি বেনাম জমিন উদ্ধারের ক্ষেত্রে পার্টি তেমন করে উদ্যোগ নেয়নি। আজও জমিদাররা হাজার-হাজার বিঘে জমিনের মালিক। এক কাঠা জমিনও তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যায়নি। সুকুমাররা ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারে নি যে পার্টির মধ্যেও এই সব নিয়ে বিতর্ক

রয়েছে। পার্টির একটা বড়সড় অংশ এই নরম নীতির বিরুদ্ধে এককাট্টা হচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে পার্টি থেকে বেরিয়ে যেতে পারে ওরা। পরীক্ষিত বাউরি বুঝেও বুঝতে চায় নি কিছুই। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বসে গিয়েছে সে। জন-মজুর খেটে খায়। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। কদাচিৎ মিছিলে-টিছিলে যায়। কিন্তু সক্রিয় নয় একতিল। কেবল এই বছর-দু'তিন নিজের ঘরে অল্প অল্প থিতু হচ্ছিল সে। তাও মাসের মধ্যে দশ-বারো দিনের বেশি নয়। কিন্তু যেটুকু সময় পাড়ায় থাকত মুখে কুলুপ এঁটে থাকত। বিশেষত রাজনীতি নিয়ে প্রায় কোনও প্রসঙ্গেই মুখ খুলত না সে। ইদানীং যা একটু আধটু কথাবার্তা হত, তা কেবল নাতি গোরচাঁদের সঙ্গে। ওর সঙ্গে কখনো-সখনো একান্তে কথা বলত সে। ফিসফিসিয়ে। একান্ত গোপনীয় কথা সে সব। অগ্নিও টের পেত না সেই কথার বিন্দুবিসর্গ।

কিন্তু পার্টির ঘোর দুঃসময়ের দিনে সেই কিনা বুঝে নিল নিজের দায়-দায়িত্ব। কেউ তাকে বলে দেয় নি কিছুই। তবুও সুকুমার অজ্ঞাতবাস থেকে ফিরে এসে সবিস্ময়ে দেখল, পরীক্ষিত বাউরি তিলক, হঠাৎ, বাঁশিদের নিয়ে গভীর রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। বত্রিশভাগী, গামিরতলা, দাপানজুড়ি, কোনও জঙ্গলেই তাদের প্রতিনিয়ত জমায়েতের মসৃণ ভূঁইগুলোতে একটিও ঘাস গজাতে দেয় নি পরীক্ষিত।

পরীক্ষিত বাউরি যে পার্টির দুর্দিনে আচমকা অতখানি সক্রিয় হয়ে উঠবে, এমনটা কল্পনাও করে নি কেউ। সুকুমার খুব আপ্লুত গলায় বলে, 'পরীক্ষিতদাকে রহস্যময় লাগে এখানেই। এভাবেই মানুষ তার চরিত্রে রহস্যময়তাকে ধারণ করে। এই একই রহস্যময়তায় ঘন কালো মেঘের মধ্যে অকস্মাৎ আলো ঝলকায়।

পরীক্ষিত বাউরি একটা কথা মাঝে মাঝেই বলে।

বলে, 'যে যেমন দেখে দুনিয়াকে! যে যেমন ভাবে! কেউ ভাবে, শুধু খাবো, কিন্তু হাগবো নাই, মুতব নাই, তাহলে নাকি সব বাঁরাই যাবেক শরীর থিক্যে? কেউ ভাবে, বাহ্যি-পিসাব ভাল হলে ক্ষিদা বাড়ে, অধিক খাবার ক্ষ্যামতা জন্মায়।'

সুকুমারদের মনে হয়, এটাই পরীক্ষিত বাউরির একান্ত দর্শন। দুনিয়া থেকে সে যে প্রতিনিয়তই কিছু নিচ্ছে, তার প্রতিদানে প্রতিনিয়তই কিছু দেওয়া, দিতে থাকা, নইলে সমাজ সংসারের শরীর-স্বাস্থ্য ভাল থাকে না।

আজও দিচ্ছে, পরীক্ষিত বাউরি, উড়তে উড়তে দিচ্ছে, পালাতে পালাতেও।

নীল শাড়ির কারুময় আঁচল

কুন্তীর সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে অবধি বুদ্ধদেব বুঝতে পারে নি, তার ফল এমন সুদূরপ্রসারী হবে। এতদিকে এত ঝড় উঠবে, সে কল্পনাও করেনি। কুন্তীর সঙ্গে আলাপ করবার কথা কখনো তেমন করে ভাবে নি বুদ্ধদেব। দূর থেকে তাকে যতটুকু দেখেছে, অসম্ভব রূপসী আর ততোধিক দেমাকি বলেই মনে হয়েছে। তাছাড়া, কনকপ্রভার মহলের আদব-কায়দা, বিলাস-ব্যসন, ওদের জীবনযাপনের ধরন, কোনটাই বুদ্ধদেবকে ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে উৎসাহিত করে নি। বুদ্ধদেবের মনে হয়েছিল কুন্তীর মতো মেয়েকে কেবল দূর থেকে দেখাই সমীচীন। কনকপ্রভার মহলে স্বইচ্ছায় কোনওদিনও যেতে চায়নি বুদ্ধদেব। কিন্তু গোল বাধালেন দীপমালা।

একদিন সিংহগড়ে ঢোকার মুখেই বুদ্ধদেবকে দেখেন দীপমালা। তখন বিকেল। 'মিতালি সংঘ'র মাঠে প্রবল কলরোল তুলে বল খেলছিল প্রভঞ্জনদের দল। গামিরতলার জঙ্গলের মাথায় সূর্যটা ঝুলছিল।

বুদ্ধদেব ফিরছিল লোখেশোল থেকে। অনাথবন্ধু ইস্কুলের ঘর গড়ছেন। সুকুমার আচার্য, হঠাৎ মুর্মু, বাঁশি বাউরিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেওয়াল দিচ্ছেন স্বহস্তে। ইস্কুলে ঘরের অভাব পড়েছে ইদানীং। আরও দুটো কামরা গড়ে নিচ্ছেন তাই। টাকাপয়সা কিছু সংগ্রহ হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই যতটা সম্ভব সবাই মিলে গায়ে-গতরে সারছেন। যেমন মোরাম স্কীম মঞ্জুর করে সেই টাকায় প্রভঞ্জনদের 'মিতালি সংঘ'র বাড়িখানা গড়ে দিয়েছেন বিডিও সাহেব, তেমনই একটা স্কীমের জন্য দরবার করেছিল বুদ্ধদেব। বিডিও সাহেব একথা-সেকথা বলে এড়িয়ে গিয়েছেন। সেই কথাটাই জানাতে গিয়েছিল অনাথবন্ধুকে। অনাথবন্ধু হেসেছিলেন। বলেছিলেন, বিডিও সাহেবের দোষ নাই। এ আমাদের জাতীয় নীতি। শিক্ষার জন্য ন্যূনতম খরচ করা। কারণ, আমাদের জাতীয় নেতারা জানেন, চোখ ফুটে গেলে, ড্যানক্ শক্ত হলে কোকিলের দল আর একদণ্ডও থাকবে না কাগেদের বাসায়।

দীপমালা হাসেন, 'কোথায় চললে?'

'একটু বাউরিপাড়ায় যাচ্ছি দীপাদি।'

'বাউরিপাড়ায় আমিও যাব। অগ্নির সঙ্গে দরকার আছে। কনকদির সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোমার?'

বুদ্ধদেব সসঙ্কোচে মাথা নাড়ে।

'সে কি! কেন?' দীপমালা সামান্য বিস্মিত, 'চল, আজই আলাপ করিয়ে দিই। এতদিন পাশাপাশি রয়েছ, আলাপ কর নি কেন?' দীপমালার গলায় চাপা অভিমান, 'তুমি যে আমাকে কথা দিয়েছিলে, ওদের ওপর নজর রাখবে।'

বুদ্ধদেব জবাব দেয় না। যা সে ভাবে, খুলে বলতে পারে না দীপমালাকে। দীপমালা খুব মিনতি মাখানো গলায় বলেছিলেন, 'পাশাপাশি যদ্দিন আছ, ওদের প্রতি একটুখানি নজর রাখো। বদলোকেরা ওদের ল্যাজে খেলাচ্ছে।' বুদ্ধদেব রাজিও হয়েছিল। কিন্তু কনকপ্রভার মহলের কাণ্ডকারখানা দেখে আর আগ বাড়িয়ে আলাপ করতে কিংবা পরামর্শ দিতে সাহস পায় নি। সারাদিন গাদাগাদা লোকলস্কর পরিবৃত হয়ে থাকেন কনকপ্রভা। বিলাসে-ব্যসনে ডুবে রয়েছেন তিনি। পান্নালাল আর নিকুঞ্জপতির দল সর্বদাই ওঁকে ছুটিয়ে মারছে। নিজের মহলে তিনি ক'দিন বা থাকেন! তা ছাড়া, দূর থেকে দেখে যেটুকু মনে হয়েছে, এখনও ওদের শরীরের চারপাশে আভিজাত্যের জ্যোতির্বলয়। চোখে-মুখে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার। তাচ্ছিল্য। গরুর গাড়ির মিছিল সাজিয়ে পর্যটনে চলেছেন, বুদ্ধদেব পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, হয়তো বা পলকের তরে চোখাচোখি হয়েছে কনকপ্রভা অথবা কুন্তীর সঙ্গে। তৎক্ষণাৎ মুখ হয়ে উঠেছে পাথরের মতো কঠিন। মসৃণ মার্বেল-পাথরের মতো পিচ্ছিল, জৌলুষময়, মায়াবি, কিন্তু কঠিন। বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে, ওর বন্ধুত্ব ওঁরা তিলমাত্র কামনা করেন না। এতকথা দীপমালাকে বলা যায় না। তেমন চেষ্টা করেও নি বুদ্ধদেব।

দীপমালা স্থিরপলকে তাকিয়েছিলেন বুদ্ধদেবের মুখের দিকে। হয়তো বা পড়বার চেষ্টা করছিলেন ওর মনখানি। হয়তো বা পেরেওছিলেন পড়তে। একসময় খুব নরম গলায়

বলেছিলেন, 'এসো।' বুদ্ধদেবের মনের মধ্যে সহসা একরাশ দ্বিধা। আচমকা, এমনিভাবে, ঐ রহস্যপুরীতে ঢুকে পড়া সঙ্গত হবে কিনা, তাই নিয়ে নিদারুণ ধন্দে পড়ে যায় সে। বিড়বিড়িয়ে বলে, 'আজ না হয় থাক না, অন্য কোনও দিন...।' দীপমালা বুদ্ধদেবের কাঁধে আলতো হাত রাখেন। নরম করেন হাসেন, 'তুমি মিছিমিছি সঙ্কোচ করছ। ওরা মানুষ ভাল।'

দীপমালাকে সুনজরে দেখে না চুয়ামসিনার মানুষজন। তার অনেক কারণ। সবগুলো বোধগম্য নয়। বামুনের মেয়ে, বিয়ে হয়নি এখনতক্ক, গাঁয়ে গাঁয়ে ধিঙ্গিপনা করে বেড়ায়। আর আনাগোনা, মেশামেশির কোনও বাছবিচার নেই। বাউরিপাড়া, বাগদিপাড়া, সর্বত্রই গতিবিধি। মুসলমানদের ঘরে গিয়ে থাবড়ে বসে। ঘেন্নাপিত্তি নেই একতিল। জয়কিষ্টোপুরে বাঙালদের কলোনি। ওদের চালচুলো নেই। ওল, কচু, কন্দ, শুকটি মাছ, সব যায়। অথচ ওদের সঙ্গেই মেয়েটার অধিক দহরম মহরম। মেয়েটা সেই কবে থেকে আনাগোনা করছে চুয়ামসিনা গাঁয়ে। আনাগোনা, তাঁতবোনা। এই মাকু যায় তো, এই মাকু আসে। সেই যখন পনেরো-ষোল বছর বয়েস তার। সিংহগড়ের ঘরজামাইবাবুর ব্যাটা প্রিয়ব্রতর বয়স সামান্য বেশি। তখনই একদিন, বলা নেই কওয়া নেই, ওর সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটিতে সিংহগড়ে সে হাজির। জানা নেই, চেনা নেই, একটা আকাট ছোকরার সঙ্গে চলে আসা চলে একজন ভদ্দরঘরের প্রায়-যুবতী মেয়ার! পাঁচজনে পাঁচকথা তো ভাববেই। কী, না খোকাবাবুর সঙ্গে পড়ি আমি, তাই এল্যম। এটা একটা কথা হল! সেই থেকে মেয়েটা আসছেই। শোনা যায়, হাওয়ায় কথা ভাসে, মেয়েটার নাকি প্রেম-ভালবাসা ছিল সিংহগড়ের খোকাবাবুর সঙ্গে। ছিল তো ছিল, থাকতেই পারে। বড় ঘরের ছেইলা, সে পড়তে গিয়ে দু'চারটে মেয়ার সঙ্গে লটর-পটর করবেক, বুড়া-বইস অবধি ইখেনে-উখেনে রাসলীলা করে বেড়াবেক, এ আর কী এমন নতুন কথা। ভালবাসা করেছে, ফের বিয়া করে ফেলেছে অন্যজনাকে, তারপরেও অত আঠা কিসের? কেনই বা তারপরেও নিয়মিত আনা-গোনা, তাঁত বোনা! আচ্ছা, তাও না হয় হল, প্রেম-পিরীতের নেশা মরে গেলেও নাকি যায় না। সেই বানেশ্বর বৈরাগী গেয়ে বেড়ায় না, পিরীতি কাঁঠালের আঠা, লাগলে পরে ছাড়ে না? কিন্তু খোকাবাবু মরে যাওয়ার পরে তো সে আঠা তরল হবেক, না কি? তো, তারপরেও আসে মেয়া, নিয়মিত, এখনও আসছে। এ রহস্য, বাস্তবিক দুর্জ্ঞেয়। এ কোনও সরল, স্বাভাবিক আচরণ নয়। এ পিঠার মধ্যে অন্যতর কোনও পূর রয়েছে নির্ঘাৎ। সেই পূরখানাই কেউ খুঁজে পায় না। ফলে রহস্য বেড়ে যায়। হরেক কিসিমের ব্যাখ্যা চলে। কিন্তু সব ব্যাখ্যার সার কথা হল, মেয়াটা ভাল নয়। আসলে, দীপমালাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না চুয়ামসিনার কতিপয় মানুষ। যথা, হরবল্লভ। যথা, প্রভঞ্জন। প্রমথ গাঙ্গুলি, মহাদেব কয়াল। যথা, নিকুঞ্জপতি, রতিকান্ত, পান্নালাল এবং ওদের বশংবদ ব্যক্তিবর্গ। তাদের অনেক স্বার্থহানি হয় দীপমালার আনাগোনায়। কনকপ্রভাকে সর্বদাই সামাল দিতে চান দীপমালা। সংযত রাখতে চান। অধঃপতনের মুখ থেকে তাকে ফিরিয়ে আনবার আপ্রাণ প্রয়াস চালান। সেটাই ওদের গাত্রদাহর কারণ। দীপামালা, বাস্তবিকই, ওদের পথের কাঁটা। তাই, দীপমালা কনকপ্রভার মহলে পা দিলেই মুখ হাঁড়ি হয়ে যায় মহলের সবাইয়ের। কুন্তী যখন 'দীপা মাসি, দীপা মাসি' বলে উথলে ওঠে, সবাই আড়ালে মুখ বেঁকায়। বলে, আহা, ঢং! মাসি! ধান সম্পর্কে পুয়াল মাসি! বলে, মামার গুয়ালে বিয়াল্যাক গাই, সেই সম্পর্কে মামাতো ভাই, মরে যাই! দীপমালা এসব বুঝতে পারেন। কিন্তু গা করেন না একতিল। সময় পেলেই চলে আসেন।

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে, সেই প্রথম, দীপমালার পেছন পেছন কনকপ্রভার মহলে ঢোকে বুদ্ধদেব।

আচমকা বুদ্ধদেবকে দেখে খুবই অবাক হয়েছিলেন কনকপ্রভা। দু'চোখের তারায় বিস্ময়টা গাঢ় হচ্ছিল ক্রমশ। সঙ্গে সামান্য ক্ষোভের মিশেলও ছিল। একখানা সরু কালো পাড়ের দুধসাদা ধুতি পরেছিলেন কনকপ্রভা। গায়ে সাদা রঙের সেমিজ। গলায় সাধারণ সুতোহার। খুবই আটপৌরে সাজে ছিলেন কনকপ্রভা, কিন্তু তাও ওঁকে এতটাই সুন্দরী লাগছিল যে বুদ্ধদেবের চোখের মণিতে ছলকে উঠেছিল প্রশংসা। ততক্ষণে অবশ্য কনকপ্রভা আশ্চর্য নিপুণতায় চোখের মণি থেকে মুছে ফেলেছেন ক্ষোভ। খুবই আন্তরিক ভঙ্গিতে স্বাগত জানিয়েছিলেন বুদ্ধদেবকে। কনকপ্রভার পাশেই দাঁড়িয়েছিল কুন্তী। ভারি দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বুদ্ধদেবের দিকে। আকাশী রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছিল কুন্তী। সারা গায়ে গয়নাও ছিল বিস্তর। পিঠ বেয়ে কোমর অবধি নেমেছিল চুলের ঢল। আর, দু'চোখে ছিল নীরব প্রশংসা। সিংহগড়ে প্রথম যেদিন প্রবেশ করেছিল বুদ্ধদেব, কনকপ্রভার মহলের তেতলা ছাদে যাকে একটি ফুটন্ত গোলাপী পদ্ম বলে মনে হয়েছিল, আজ তাকে নীল শাড়ি পরা অবস্থায় মনে মনে একটি নীলপদ্ম বানিয়ে ফেলে বুদ্ধদেব।

দীপমালা বলেন, 'একে চেন, কনকদি?'

কনকপ্রভা মিষ্টি হাসেন, 'আমি চিনি। কিন্তু ও আমাদের চিনে না।'

বুদ্ধদেব অস্বস্তি বোধ করে।

দীপমালা বলেন, 'কতদিন ওকে বলেছি, কনকদির সঙ্গে আলাপ কর। তা, ছেলের কি লজ্জা।'

কনকপ্রভা ওদের বসতে দেন। দীপমালার কুশল সংবাদ নেন। কুন্তী ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে মায়ের পাশটিতে। ভেতর-ঘরে গান বাজছিল গ্রামোফোনে। আঙুরবালার গান। জানি, জানি গো, মোর শূন্য হৃদয় দেবে ভরে, / তুমি রাখবে না গো, আমায় চির কাঙাল করে / জানি জানি গো । বুদ্ধদেবের প্রিয় গান।

এই মহলে এর আগে কখনোই ঢোকে নি বুদ্ধদেব। বাইরের থেকে ভাঙাচোরা মনে হয়। কিন্তু দোতলায় এলে চোখ ফেরানো মুশকিল। লাল টকটকে মেঝে। এতটাই চকচকে যে মুখ অবধি দেখা যায়। বারান্দায় সাবেক কালের ভারি ভারি কুর্শি। কুলুঙ্গিতে রূপোর ফুলদানি। ঘরগুলোর যতটুকু অংশ বারান্দা থেকে দেখা যায়, দামি দামি পালঙ্ক আর হরেক কিসিমের আসবাবে ভর্তি।

শ্বেত পাথরের গেলাসে শরবত আনে বামুন-মাসি।

গানটা ওঘরে বেজে চলেছে। ফুল-ফোটানো ফাগুন সম / তোমার ছোঁয়া প্রাণে মম / ভরিয়ে দেবে সকল ব্যথা থরে থরে/জানি, জানি গো---। গানখানি অস্থির তোলপাড় তোলে বুদ্ধদেবের বুকে। কিছুক্ষণের জন্য বুঝি তন্ময় হয়ে যায় সে। নিজের মধ্যে হারিয়ে যায়। কুন্তীও নাকি ভাল গান করে। সুকুমার বলেছে। এই সব গানই কি গায় কুন্তী? শুনতে বড় সাধ হয় এসব গান, যন্ত্রে নয়, কারুর সুমুখে, মুখোমুখি বসে।

এক সময় দীপমালা বলেন, 'ও কিন্তু আমার দেশের ছেলে। কাঁথি শহর থেকে সামান্য দূরে ওর বাড়ি। ওরা বেশ বড়লোক। বাপ মায়ের এক ছেলে। লেখাপড়ায় অসম্ভব ভাল।

বাহিরি হাইস্কুল থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। তিনটে বিষয়ে লেটার। প্রভাতকুমার কলেজ থেকে আই-এ পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিশনে। বি-এ পড়ছিল। মাঝপথে সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে চাকবি করতে চলে এসেছে বাপ-মায়ের অমতে। কেন বল তো?'

কনকপ্রভা জিজ্ঞাসু চোখে তাকান।

'দেশের কাজ করতে। ওর ধারণা হয়েছে, গ্রামসেবকের চাকরি নিলে দেশের সেবা করা হবে।' দীপমালা যে ঠাট্টা করছেন সেটা তাঁর মুখের হাসিতেই বোঝা যায়।

কনকপ্রভা খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন বুদ্ধদেবের দিকে। তারপর দীপমালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'তোমাদের ওদিগকার মানুষগুলোর এত দেশসেবার বাতিক কেন, বল তো? অরিজিতকাকা, তুমি, বুদ্ধদেব—।'

দীপমালা হেসে ওঠেন। এবং বুদ্ধদেব আড়চোখে এক ঝলক তাকিয়ে দেখে নিতে পারে কুন্তীর ঠোঁটের কোণে চাপা কৌতুক।

সেদিন ভরপেট জলখাবার খেয়ে বুদ্ধদেবরা যখন বেরোল তখন সন্ধে নেমে এসেছে। দীপমালা রাতে কনকপ্রভার মহলেই থাকবেন।

বলেন, 'একটু অগ্নির সঙ্গে দেখা করে আসি কনকদি। অনেকদিন দেখা হয়নি। গোরাচাঁদেরও খবর পাই নি কিছু।'

সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ায় চারজনায়। প্রায় শেষ মুহূর্তে কুন্তীর মুখের ওপর একঝলক পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে বুদ্ধদেব। কুন্তীর দু'চোখের পাতা সামান্য ক্ষণের জন্য স্থির হয়ে যায়। অকস্মাৎ ঠোঁটদুটি নড়ে ওঠে বুদ্ধদেবের, 'সায়গল আছে? কুন্দনলাল সায়গল?' দীপমালা কনকপ্রভার সঙ্গে কথা সেরে নিচ্ছিলেন। বুদ্ধদেবের অকস্মাৎ প্রশ্নখানিতে মুখ ফেরান বুদ্ধদেবের দিকে। দু'চোখের তারায় চাপা হাসির ঝিলিক। এক সময় ফিক করে হেসে ফেলেন। আর তখনই দেখতে পান কুন্তী তার নীল সিল্কের শাড়ির কারুকার্যময় আঁচলটি জড়িয়ে দ্রুত ঢেকে ফেলছে শরীর।

ওরা সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসে নিচে। পেছন থেকে কনকপ্রভা বলে ওঠেন, 'ছেলের যদি লজ্জা ভেঙে থাকে তো মাঝে মাঝে এসো।'

বুদ্ধদেব নিঃশব্দে মাথা দোলায়। মায়ের পেছনে আধো-আঁধারে দাঁড়িয়ে থাকবার দরুন কুন্তীর মুখখানা আর দেখতে পায় না।

ইদানীং মাঝে মধ্যেই কনকপ্রভার মহলে যাচ্ছিল বুদ্ধদেব। চুয়ামসিনার মানুষজনের নজর এড়ায় নি সেটা। সাধারণত সন্ধ্যের দিকেই যেত এবং অবাক কাণ্ড, যে মহলে একটি সন্ধ্যাও জলসার বিরাম থাকে না, বুদ্ধদেব গেলেই কনকপ্রভার নির্দেশে জলসার আসর বন্ধ থাকত সেদিনের মতো। কনকপ্রভা আদর করে বসাতেন বুদ্ধদেবকে। এটা ওটা খাওয়াতেন। অনেক গল্প করতেন। পুরোনো দিনের গল্প সব। নিজের কথা, বাপ-মায়ের কথা, স্বামীর কথা, শাশুড়ির কথা...। এবং বুদ্ধদেবের কেন জানি মনে হত, স্মৃতি-রোমন্থনের মুহূর্তগুলিতে কনকপ্রভা তাঁর জীবনের অনেক দুঃখ-বেদনাকে সযত্নে আড়াল করে চলেছেন। কুন্তীও এখন অনেক সহজ হয়ে উঠেছে বুদ্ধদেবের সামনে। এখন হাসে, কথা কয়, অনুরোধ করলে গান শোনায়। কনকপ্রভা জানতে চান বুদ্ধদেবের কথা। তার ঘর-বাড়ি, বাবা-মা, সবাইয়ের সবকিছুর কথাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেন। এবং বুদ্ধদেব লক্ষ করেছে, কুন্তী একটুখানি

বেশি মাত্রায় মনোযোগী হয়ে শুনছে সব কিছু। বুদ্ধদেব সম্পর্কে একধরনের চাপা ঔৎসুক্য তৈরি হয়েছে তার মনে। বুদ্ধদেব বুঝতে পারে।

একদিন আচমকা প্রস্তাবটা দিয়ে বসলেন কনকপ্রভা।

কলহমুখর দু'ডালের দুটি কাক

অর্জুনগাছের মগডালে বসে দুটো কাক ঝগড়া করছিল অনেকক্ষণ। বুদ্ধদেবের যেহেতু কাগেদের ভাষা জানা নেই, বুঝতে পারছিল না, কী নিয়ে ঝগড়া। বুদ্ধদেবের কাছে কোনও একটি বিষয় পরিষ্কার না হলে তার মগজের কল্পনালতায় কচি কচি ডাল বেরোয়। ডালগুলো শনৈশনৈ লতিয়ে বেড়ে যেতে থাকে। সে এক মজার অথচ কষ্টকর খেলা। নিজের মনোমতো কথাগুলি একটা কাকের চঞ্চুতে বসিয়ে দিয়ে, বিপরীত যুক্তি বসায় অন্য কাকটির ঠোঁটে। এইভাবে দুই কাকে মিলে প্রবল তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। গাছের ডাল থেকে কাকদুটো নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে বুদ্ধদেবের মগজের মধ্যে।

কাকদুটো সেদিনও ঢুকে পড়েছিল বুদ্ধদেবের মগজে। ইতিমধ্যে দু'দুটো বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। গোবিন মিস্তিরিকে অকস্মাৎ বেঁধে নিয়ে গেছে বিষ্টুপুর থানার পুলিশ, এবং এক গোলমেলে প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে বুদ্ধদেবের ঘোরতর তর্কাতর্কি হয়ে গেছে সুকুমারের সঙ্গে।

অনাথবাবু বলেন, রাজা-রাজড়াদেরই শাসন চলছে এদেশে। এখনও। কাজেই রাজদ্রোহের শাস্তি তো পেতেই হবে প্রজাকে। যেদিন গোবিন্ মিস্তিরিকে পুলিশ রাজদ্রোহের অপরাধে ধরল, কোমরে দড়ি বেঁধে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে চলল থানায়, সেদিন তিলক বাউরির উঠোনে বসে, নাইট-স্কুল কেমন করে পুরোদমে চালানো যায়, সেই আলোচনাতেই মগ্ন ছিল বুদ্ধদেবরা। সঙ্গে ছিল সুকুমার, হঠাৎ মুর্মু আর মকবুল। অকস্মাৎ খবরটা পেল বাতাসী মারফৎ। তিলকের বোন বাতাসী, উঠোনের মধ্যে বসে গর্ত খুঁড়ছিল। চোদ্দ-পনেরোর কিশোরী, মুখখানি ঢলঢল, মাথায় উসকো-খুসকো চুল, ফুরফুরিয়ে উড়ছিল হাওয়ায়। পুণ্যিপুকুর ব্রত করছিল বাতাসী। সারা বোশেখ মাস রাঢ়ভূমের অসংখ্য কুমারী মেয়ে এই ব্রত পালন করে। উঠোনের মধ্যে পুকুরের আদলে গর্ত বানিয়ে ঢেলে দেয় জল। বিড়বিড় করে শোলোক আওড়ায় : তুমাকে পুজল্যম দুব্বা-ফুলে / বাড়ুক লক্ষী বাপের কুলে / পুণ্যিপুকুরে ঢালল্যম জল/বাপ-ভায়ের দেখি মঙ্গল। এই ব্রতব টানে নাকি সারা রাঢ়ভূমিতে সুবর্ষণ হয়। দেখতে দেখতে সুকুমার মৃদু হেসেছিল। ব্রত করে কিচ্ছুটি ত হচ্ছে নাই রে, বাতাসী? আকাশের ছাতি তো ফাইট্‌ছে নাই। বাতাসী ঘাড় গুঁজে বসেছিল। এতগুলি মানুষের উপস্থিতিতে সামান্য জবুথবু ভাব। নীচু গলায় বলেছিল, হব্যেক গো। সবুর ধর্। সুকুমার শুধিয়েছিল, তিলক কুথা রে? আর তখনই বাতাসী একেবারে নিরাসক্ত গলায় বলেছিল, ডাঙার দিকে গেইছে। গোবিন মিস্তিরিকে পুলুশ ধইরেছে যে। সুকুমার প্রথমটা বুঝে উঠতে পারে নি ব্যাপারখানা। গোবিন মিস্তিরি শান্ত, নিরীহ মানুষ, অকামে-কুকামে কদাপি থাকে না, মুখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত কারুর দিকে। খালি সারাক্ষণ মাথা নীচু করে গরুর গাড়ির চাকা, ধুরি, ওদোল, জুয়াল বানিয়ে চলে। সুকুমারদের মিটিং-মিছিলে নিয়মিত যায় মানুষটি। জমায়েতের পেছনে বসে নির্বাক শুনে যায় সবকিছু। এমন মানুষকে পুলিশের ধববার হেতু কি? প্রাথমিক বিস্ময়টুকু কাটিয়ে উঠে ওরা সদলবলে হাঁটা দিয়েছিল শালকাঁকির ডাঙার দিকে। আব, পথিমধ্যে বাঁশি বাউরির সঙ্গে দেখা। উত্তেজনায় থমথমে বাঁশি বাউরির মুখ। তার থেকেই শোনা গেল ঘটনাটা।

পুলিশ কোমরে দড়ি বেঁধে হিঁচড়াচ্ছে গোবিনকে। সে এক মহাঅপরাধ করেছে। খোদ হরবল্লভ সিংহবাবুর মুখের ওপর চোপা করেছে। বাঁশি বাউরি সবিস্তারে শোনায়। এ মাসে শালুকা গাঁয়ের তিনজন মাত্র 'ডাই ডোল' পেয়েছে। তিনজনই হরবল্লভের বাঁধা মাইন্দার, মুড়িভাজনি, গুয়াল-কাড়নি। গোবিন মিস্তিরি বলেছিল, তিনটা ডাইডোলই লিজ্যার মুনিশ-মাইন্দারকে দিলেন আইজ্ঞা, আমরা কি না খেঁইয়ে মরব? আমার বুড়ি মা'টা, কানে নাই শুনে, চখে নাই দেখে, কোমর ভেইঞ্জে হরধনু, উয়াকে বাদ দিয়ে ইন্দ্র বাগদির বাপকে দিলেন ডাইডোল! উ শালা, ইখনও মাঝরাতে ছাঁকনি-জাল, পলুই, লচেৎ তগী লিয়ে ঘুরে বেড়ায় এ পুকুর, সে পুকুর। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বোধ করি অরুন্ধতী শুনতে পেয়েছিলেন এসব কথা, কিম্বা কেউ সময় মতো তুলে দিয়েছিল তাঁর কানে। হরবল্লভের চেয়ে তিনিই বেশি কাঁই হয়েছেন। ঘটনাটা ঘটেছিল মাস কতক আগে। ফলটা ফলল এত দিনে। এমন একটা তুচ্ছ কারণে আবার গ্রেপ্তার করা যায় নাকি মানুষকে? বুদ্ধদেব বিস্মিত। সুকুমার তেতো হাসে। এখন কি আর তুচ্ছ রয়েছে? গোবিন মিস্তিরির কথার সেই ছোট্ট চারাগাছটি থিক্যে কত ফ্যাঁকড়া গজাই গিয়েছে এতক্ষণে। কত ডালপালা, শাখাপ্রশাখা....। বারোয়ারি পুকুরের মাছ ধরতে যেমন কারুকে কৈফিয়ত দিতে লাগে না, এদেশে মানুষকে ধরে ফাটকে পুরতে পুলিশকে কারো কাছেই কৈফিয়ত দিতে হয় না। সুকুমার আচার্য বাঁশির দিকে তাকায়, কেসটা কী দিয়েছে? বাঁশি বলে, চুরির কেস। মালও নাকি পাওয়া গেছে গোবিন মিস্তিরির ঘরে। সুকুমার খরচোখে তাকায় বুদ্ধদেবের দিকে, শুনলেন ত?

বুদ্ধদেবের কোনও ধারণা ছিল না এ বিষয়ে। তার দু'চোখে বিস্ময়টা স্থায়ী হয়। স্বাধীন দেশে, শুধু সামান্য অভিযোগ জানানোর জন্য কাউকে গ্রেপ্তার করে ফাটকে ভরে দেওয়া যায়! বলে, 'কিন্তু সাজানো চুরির কেস, আদালতে গিয়ে তো টিকবে না।'

'ক্যানে টিকবে নাই? মাল ত পাওয়া গেছেই। তা বাদে বিচার হবেক সাক্ষীর উপর। সাক্ষী উয়ারা জুটাই ফেলাবেক।' সুকুমার সামান্যক্ষণ থামে, 'আর না টিকলেই বা, তিনচাব বছর কেস চইল্‌লে উয়ার হাজতবাস, হয়রানি, খরচ-খরচা, বদলাম, যা হবার, সে তো ষোল-আনা হইয়ে যাবেক। এরপর বিচারে নির্দোষ পরমাণ হইলেই বা কি? তার যা ভোগান্তি সবই ত হইয়ে গেল্যাক। নির্দোষ মানুষ ত এদেশে এমন প্রশ্ন তুইল্‌তে পারে না যে, ক্যানে তাহলে আমাকে ধরা হইল্যাক, হাজতে রাখা হইল্যাক, অত লতি-লাঞ্ছনা করা হইল্যাক? ক্যানে তবে আমার মান-সন্মান লিয়ে খেলা কইর‌্ল্যাক পুলিশ? এ দেশের পুলিশকে কখনই কুনো বেআইনি কাজের জন্য কারুর কাছে কৈফিয়ত দিতে লাগে না।'

গোবিন মিস্তিরির জন্য এক ধরনের উদ্বেগ জমছিল বুদ্ধদেবের মনে। সামান্য কারণে নিরীহ মানুষটার ভোগান্তি হচ্ছে, এটাই তাকে বিঁধছিল। সুকুমার ফের তেতো হাসে, 'এখন উয়ার হয়েছে কি? এ তো সবে কলির সইন্ঝা। এখন দিনকতক হাজতবাস করবেক। পুলিশ আচ্ছাসে গুমসাবেক। জামিন দিবার কোউ না থাইক্‌লে হাজতেই পইচে মইর‌্বেক। বিচারে সাজা হলে, বছর কতক জেলের ঘানি টানবেক। ফিরে এইসে দেইখ্‌বেক, সিংহবাবুরা উয়ার ভিটামাটি সমান কইরে দিয়েছে। উয়ার বউ-বাচ্চা সিংহগড়ে লচেৎ গাঙ্গুলিদ্যার বাখুলে পেটভাতায় খাইট্‌ছে।'

শালকাঁকির ডাঙায় কলরোল তখন থেমে গিয়েছে। তার বদলে একটা মিহি কান্নার সুর। একটানা কেঁদে চলেছে কোনও রমনী। সম্ভবত গোবিন মিস্তিরির বউটাই কাঁদছে।

সুকুমার হঠাৎ মুর্মুর দিকে তাকায়। বলে, 'জলদি চইলে যা বিষ্টুপুর। দিবাকরদাকে সব বইল্‌বি। গোবিন্‌দাকে জামিনে ছাড় করাতে হবেক আজই। মকবুলও সঙ্গে যা।'

ওরা চলে যাওয়ার পব সুকুমাররা কামারপুকুরের পাড়ে একটা অর্জুন গাছেব ছায়ায় বসে। তিলক কেন ফিরে এল না, বুদ্ধদেব সেটাই ভাবছিল। সুকুমাবের ধারণা, তিলক পুলিশের পিছু পিছু বিষ্টুপুর অবধি গেছে। হয়ত বা মকবুলরা পৌঁছবার আগেই সে পৌঁছে যাবে দিবাকরদার পাশ। সুকুমারকে কিন্তু ততখানি বিষণ্ণ লাগছিল না। বুদ্ধদেব লক্ষ করে, কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর মুখ, বেশ ফুরফুরে গলায় কথা বলছে। ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক লাগে বুদ্ধদেবের চোখে। সরাসরিই শুধোয় সুকুমারকে, 'গোবিন মিস্তিরির এই দুর্ভোগে আপনার কষ্ট হচ্ছে না?' সুকুমার বেশ কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে। একসময় খুব আত্মস্থ গলায় বলে, 'কষ্ট অবশ্যই হচ্ছে। আবার ভালও লাইগ্‌ছে।' বুদ্ধদেবের মনে বিস্ময়ের পারদখানা চড়ছিল। সে ফ্যালফাল করে তাকিয়ে থাকে সুকুমারের দিকে। সুকুমার বলে, 'গরীব মাইন্‌সের উপর এই অকারণ জুলুম নৈতন কিছো লয় এদেশে। হাজার হাজার মানুষ এ দিগ্‌দারি সইছে লিত্যিদিন। গোবিন মিস্তিরি উই হাজার জনের একজন। কিন্তু হাজার জন যেটা পারে নাই, গোবিন মিস্তিরি সিট্যা পেইরেছে। সে হরবল্লভের মুখোমুখি খাড়া হইয়ে, উয়ার চোখে চোখ রেইখে কথাটা জিগাতে পেইরেছে, ক্যানে সঠিক লোক ড্রাইডোল পাবেক নাই। এই জিগাতে পারার মূল্যটাও কিছো কম লয়।' বলতে বলতে সহসা সুকুমারের চোখ আটকে যায় পুকুরের বিপরীত পাড়ে। হনহনিয়ে হেঁটে আসছিল নিকুঞ্জপতি। খালি গা, গায়েব ফরসা রঙ তেতে পুড়ে তামাটে। বুক ভর্তি ভালুকেব মতো লোম। মোটা পৈতের গাছি ঝুলছে বুকেব এপাশ-ওপাশ বরাবব। পরণে ময়ূরকণ্ঠী লুঙ্গি। বাঁ-হাতে ঝুলছে এক জ্যান্ত ষাঁড়া-মোরগ। লোহারপাড়ার দিক থেকেই আসছে নিকুঞ্জপতি। পুকুরের পাড় দিয়ে নির্বিকার হেঁটে চলেছে। সুকুমাব এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বিড়বিড়িয়ে বলে, 'এ শালা ফেব কার ঘাড় ভাঙলেক আজ! লুহাবপাড়ায আনাগুনাটা দেখছি বন্ধ হয নাই ইখনতক্ক।'

'কী কইরে হব্যেক?' বাঁশি বাউবি চোখ মটকে হাসে, 'শিয়াল পেইয়েছে ভাঙা বেড়ার খোঁজ।'

নিকুঞ্জপতিব চবিত্র নিয়ে নানান বটনা বযেছে এলাকায। স্ত্রী-পবিবার থাকে পৈত্রিক ভিটে মশিয়াড়ায। নিকুঞ্জপতি মাঝে মধ্যে গিযে দেখে আসে। কনকপ্রভাব মহলে আজ এক যুগেবও ওপর এক একা রয়েছে লোকটা। পুবো যৌবনটা তাব খোযাব হয়ে গেল এখানে। মানুষজনের বিশ্বাস, দীর্ঘকাল নিজের স্ত্রীলোকটিব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে থাকতে এতদঞ্চলেই সখ-সাধ মেটাবার মতো মেয়ামানুষ জোগাড় কবে নিয়েছে নিকুঞ্জপতি। মূলত, লোহারপাড়াতেই ওর ঘাঁটি। লোহারপাড়ার একাধিক যুবতীব সঙ্গে তার লটরপটবের কথা তল্লাটেব সকলেই জানে। এ ব্যাপারে চপল লোহারের বউটাকে নিয়েই অধিক রটনা। চপল লোহার কনকপ্রভাদের গো-শকটবাহিনীর একজন গাড়োয়ান। কনকপ্রভার আধডজন গরুর গাড়ির মধ্যে যেটি সেবা, স্বয়ং কনকপ্রভা চড়েন যেটায, সেই গাড়িখানিই চালায় সে। তাই নিয়ে তার গুমোর। কর্তা-মা প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘোরেন। চপলকেও ঘুরে বেড়াতে হয় তাই। চপলের বউ একা থাকে বাড়িতে। মেয়েটার শরীরের বাঁধুনি দেখলে যে কোনও পুরুষের জিভে লালা ঝরবে। বেশ কিছুদিন মেয়েটা ঝি-এর কাজ করেছে কনকপ্রভার মহলে। ইদানীং কাচ্চা-বাচ্চা বেড়ে যাওয়ায় বাড়িতেই থাকে। মহলে থাকাকালীন চপলের বউয়ের সঙ্গে এক

ধরনের আঁখি-ঠারাঠারির সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল নিকুঞ্জপতির। সেটা গড়িয়েছিল অনেক দূর। সেই টানে এখনও সুযোগমতো লোহারপাড়ার দিকে হাঁটা দেয় নিকুঞ্জপতি। চপল লোহার বুঝতে পারে না। পারলেও মুখে কুলুপ দিয়ে রাখে। মহলের এই টালমাটালের দিনে, যে যতখানি পারছে লুটেপুটে নিচ্ছে। আর, হরিরলুটের বাতাসাগুলি তো এখনও অবধি নিকুঞ্জপতির হাতে। কনকপ্রভা কখনই অর্থ সম্পদ নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁর চাই বল্গাহীন আমোদ, ফুর্তি। আরাম, বিলাস, বিনোদন, আকণ্ঠ পান করতেই আগ্রহী তিনি। কলসিতে কতখানি জল, আরও কে কে কতখানি খেল, এসব তাঁর কাছে অবান্তর। তাছাড়া কনকপ্রভার সঙ্গে নিকুঞ্জপতির অবৈধ সম্পর্ক নিয়েও কানাঘুষো রয়েছে চারপাশে। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না, তবে গুজবটা রয়েছে। প্রিয়ব্রত মারা যাওয়ার দু'বছর বাদে আচমকা গুজব উঠেছিল, কনকপ্রভা অন্তঃস্বত্ত্বা। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল সেটা, যখন কেবল শরীর দেখে সাদা চোখে কিছু বোঝা যায় না, একেবারে অভিজ্ঞ চোখ ছাড়া। কেউ বিশ্বাস করেছিল, কেউ করে নি। শোনা যায়, ঐ সময়টাতে অধর ঝারমুনিয়া নাকি ঘনঘন যাতায়াত জুড়েছিল কুম্ভস্থলীর ভরত কোবরাজের কাছে। গরুরগাড়ির মিছিল বানিয়ে একদিন চুয়ামসিনা ছেড়েছিলেন কনকপ্রভা। নাগাড়ে তিন-চার মাস বাইরে বাইরে ছিলেন। কেউ বলে, তিনি রয়েছেন খড়্গপুরে বাপের বাড়িতে। কেউ বলে, বিষ্টুপুরে ওমপ্রকাশ আগরওয়ালের ময়রাপুকুরের বাড়ির দোতলায় ঘাপটি মেরে রয়েছেন। যখন ফিরে এলেন বড়ই রোগা আর দুর্বল লাগছিল ওঁকে। মানুষজনের কারো কারো ধারণা, পেট নামিয়ে সুস্থ হয়ে, তারপর ফিরেছেন তিনি। কনকপ্রভার সেই ভোগান্তির জন্য এখনও অবধি নিকুঞ্জপতিকেই দায়ী করে এলাকার মানুষ। আরও একজন রয়েছে কনকপ্রভার মহলে। পান্নালাল। নিকুঞ্জপতির চেয়ে ঢের বেশি সুদর্শন সে। গানের গলাটিও খাসা। বেশ কার্তিক-কার্তিক চেহারা। খুব মিষ্টি হাসি। সন্দেহভাজনদের তালিকায় প্রথম দিকে পান্নালালই ছিল এক নম্বরে। কিন্তু এক সময় তাকে নিয়ে যাবতীয় রটনা, গুজব, থিতিয়ে গিয়েছে একটু একটু করে। তার চরিত্র নিয়ে এখন আর কোনই সন্দেহ নেই মানুষের মনে। বরং কেমন করে যেন তাকে ঘিরে অন্য গুজবের অঙ্কুর গজিয়েছে। অঙ্কুর থেকে বৃক্ষ। মহীরুহ। পান্নালাল নাকি আগাগোলা বৃহন্নলা। সে নাকি সূচে সুতো পরাতেই পারে না। তবুও যে কেন কনকপ্রভা তাকে এতকাল ধরে মিছিমিছি পুষছেন, এ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। তো, নিকুঞ্জপতি, যদি এলাকার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা গুজবটা সত্যি হয়, তবে নানা ফুলে মধু খেয়ে চলেছে। সাবেক সিংহগড়ের রানী-ফুলটি ছাড়াও লোহারপাড়ায় তার একাধিক ফুলের বসতি। একদিন সুকুমারের নেতৃত্বে ঘোর বিপদে পড়ে গিয়েছিল নিকুঞ্জপতি। চপল লোহার কনকপ্রভাকে নিয়ে বাইরে গিয়েছিল। সেই ফাঁকে নিকুঞ্জপতি ঢুকে পড়েছিল ওর ঘরে। তক্কেতক্কে ছিল সুকুমারের দল। বাইরের থেকে শিকল তুলে দিয়েছিল। ঘরের মধ্যে আহত শেয়াল, নিকুঞ্জপতি, আর এক চপলা মেয়ামানুষ। দৃশ্যখানা দেখবার জন্য ভিড় জমে গিয়েছিল চপল লোহারের উঠোনে।

সে যাত্রা বড় কষ্টে রেহাই পেয়েছিল নিকুঞ্জপতি। কিন্তু অবাক কাণ্ড, চপল লোহার ফিরে এসে, সব শুনে, পুরোপুরি নির্বিকার। যেন কিছুই ঘটে নি। যেন তার অবর্তমানে বউয়ের ঘরে অন্য পুরুষের ঢুকে পড়াটা কোনও ধর্তব্যের বিষয়ই নয়। সবাই চপল লোহারকে দুষে। স্বজন-শুভাকাঙক্ষীরা বাখান দেয়। শালা, আয়ান ঘোষ হইয়ে গেলু নাকি রে! বউ পর-

পুরুষের সাথ নাঙ্ করে, কেমন পুরুষ বটে তুই! চপল লোহার নিঃশব্দে হাসে। তাতে করে সবাইয়ের বিশ্বাস হয়, বুঝি বা চপলেরই প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে এতে। নিকুঞ্জপতিকে তুষ্ট রেখে কনকপ্রভার মহল থেকে তালেগোলে কিছু বাগিয়ে নেবার মতলব তার। সবাই আব একপ্রস্থ বাখান দেয়, খালমুয়া, তুয়ার মইর্তে জল নাই জুটে? ফাঁসি ঝুইল্তে রশি নাই জুটে? চপল লোহার নিঃশব্দে হেসে চলে। বলে, রাজা যুধিষ্ঠিরও বউকে বাজি রাখ্যেছিল্যাক, মাউসীগ, আমি ত কুন ছার! কিন্তু চপল লোহার চাইলে কী হবে, সুকুমারের নজরদারিতে ইদানীং অনেক সতর্ক হয়ে গিয়েছে নিকুঞ্জপতি। এখনো আনাগোনা রয়েছে, তবে পেঁচার মতো নিঃশব্দে।

পুকুরের পাড়খানাকে বেড় দিয়ে সুকুমারদের কাছাকাছি চলে এসেছে নিকুঞ্জপতি। আপন খেয়ালে হাঁটছিল। সহসা গাছের তলায় সুকুমারদের দেখে থতমত খায়। কেঠো হাসি ছুঁড়ে দিয়ে অপ্রস্তুত ভাবখানাকে আড়াল করতে চায়। মিড়িক মাছের মতো সুচোলো করে তোলে মুখখানা। বলে, কী-গরম! মুরগিটাকে থিরপলকে দেখছিল সুকুমার। বলে, কার থিকে আন্লে? নিকুঞ্জপতি ততক্ষণে অনেকখানি সামাল দিয়ে ফেলেছে নিজেকে। কাছাখোলা ভাবখানি লুকিয়ে ফেলেছে বেমালুম। আর, বলো নাই। হচ্ছে বুড়া যত চিমড়া, গুড়মুড়িতে মন ভরে না। সেই যে বলে না, আপনি মজালে কুল, বাঁশির কি দুষ? আর, আমার ত হইল্যাক, ষাঁড়ে ধান খায়, তাঁতী বাঁধা যায়। (বলে), কার খাব, কার মন যুগাব, কারে কইর্ব দোষী/ মাঝখানেতে গড়াল মাইর্ছে যার যতক্ষণ খুশি।

সুকুমার নিকুঞ্জপতির চোখে চোখ রাখে। কটমট করে তাকায়। আমি তুমাকে কী জিগাল্যম? কী জিগালে? জিগাল্যম, মুরগীটা কার থেকে আনলে? মুরগীটা? নিকুঞ্জপতি এক ঝলক দেখে নেয় মুরগীটাকে, ঐ যে বলল্যম, আমার হাতে মালা, পায়ে বালা। এগালেও বান্চোত, পিছালেও বানচোত। সেই বলে না, মুলা শাক সিজাব কত, কালাকে বুঝাব কত! যত বলি, বুঝে চল বৌদি, সমঝে চল, এমনতরো খচ্চা কইর্লে সমুদ্রের বালিও ফুরাই যাবেক। ত, কী সাপে দংশিল মাকে, ওঝার মন্তর খাটে না। ঐ যে বলল্যম, হিতা মানলে গীতা, লচেৎ ভাগবতও তিতা। আসলে, সেই বলে না, অধিক সন্নিসীর গাজন-মেলা, সব্বাই গুরু, নাইকো চেলা। আমি কী কইর্ব? আছি-আছি, নাই-নাই। আচ্ছা চলি, এ্যাঁ, ইস্ কী গরম! নিকুঞ্জপতি সহসা হাঁটতে শুরু করে। পেছন থেকে সুকুমার বলে, শুন। নিকুঞ্জপতি ভারি অনিচ্ছা সহকারে থমকে দাঁড়ায়। ঘাড় ঘোরায় সুকুমারের দিকে। যেন, এক্ষুনি কোনও রায় শোনানো হবে আসামীকে। সুকুমার বলে, বহুত শোলোক ত আউড়ালে, আমারও একটা শোলোক শুইন্যে যাও। সিটা হইল্যাক, শুয়ারের পিছে মূলা শুইজ্লে কি শুয়ার হাতি হয়? মুহূর্তের মধ্যে ভয়ে, আশঙ্কায় এবং অপমানে বিবর্ণ হয়ে ওঠে নিকুঞ্জপতি। কী কইরে হবে? তাই ফের হয়? ইস, কী গরম! বলতে বলতে ফের হাঁটতে শুরু করে নিকুঞ্জপতি, ওস্তাদ তবলচীর মতো হাঁটার লয়খানি খুব দ্রুত দ্বিগুণ, এবং দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণ করে তোলে। হারিয়ে যায় টিকরার আড়ালে। এতক্ষণ বহুকষ্টে হাসি চেপে বসেছিল বাঁশি বাউরি, এবার খ্যা-খ্যা করে হাসতে থাকে। শালা, সুকুমারদাকে যমের পারা ডরায়। বুদ্ধদেব এটা আগেও লক্ষ করেছে একবার। সর্বদা লম্বা-চওড়া কথা বলতে থাকা নিকুঞ্জপতি সুকুমারকে দেখলেই নিমেষে মিইয়ে যায়। সুকুমারও এতক্ষণে মিটিমিটি হাসছে। বাঁশি বলে, উ হইল্যাক মুরগি-ভাড়ির ভাম। আর সুকুমারদা হইল্যাক ভামের যম কাঠ-পিঁপড়্যা।

তেমনি সময়ে টিকরার আড়াল থেকে অগ্নিকে দেখা যায়। অগ্নি হাঁটছিল, আর ঘনঘন পিছু ফিরে ফিরে দেখছিল। সামনে সুকুমারদের দেখে তার সারা মুখ পিচ্ছিল হাসিতে ভরে যায়। বলে, তাই ভাবি গ, নিকুঞ্জঠাকুর অমন বাতুয়া ঘড়ার পারা তিন ঠাং-এ দৌড়ায় ক্যানে? ত, তুমরা রয়্যেছ ইখ্যেনে? বলতে বলতে পাশটিতে এসে দাঁড়ায় অগ্নি। আকাট যুবতী। ছেঁড়া-ফাটা শাড়ির আড়ালে তার উদ্ধত যৌবন যেন বাঁধ মানছে না কিছুতেই। কাছে এসেই বাঁশের পেত্যাখানি মাটিতে নামায়। সারা শরীর ভিজে গিয়েছে ঘামে। শাড়ির আঁচলখানা কোমর থেকে খুলে নিয়ে মুখখানা মুছতে মুছতে সে অপাঙ্গে তাকায় বুদ্ধদেবের দিকে। কুথা গেছলু রে, অগ্নি? সুকুমার শুধোয়। সে কথায় সহসা মুখখানি কালো হয়ে আসে অগ্নির। হা, দ্যাখ্ না বাবু, কাল মাটি কাটার কাজ করাল্যাক, মজ্‌রি দিল্যাক আইজ। বিচারটা দ্যাখ বাবুদ্যার। মানুষ আইজ খাইট্‌বেক, দিয়ে কাল খাব্যেক? একখানা মাটি কাটার কাজ চলছে। শালুকা থেকে জয়রামপুর অবধি কাঁচারাস্তার কাজ। প্রমথ গাঙ্গুলির ব্যাটা স্বপন গাঙ্গুলি পে-মাস্টার। সুকুমাররা দেখতে পায়, অগ্নির পেত্যার মধ্যে সেরটাক গম।

সহসা সুকুমারের দিকে তাকিয়ে ঝামটে ওঠে অগ্নি, 'তুই বড় মিছা কথা কউ, সুকুমারদা।'

'মিছা কথাটা কী বলল্যম?'

'সেদিন বইল্‌লি, সরকারের ঘরে মাটি কাটলে দেড়সের গম দিবেক। তো, একসের দিলেক ক্যানে?' অগ্নির কালো চোখের তারার রোষ। সুকুমারের প্রতি।

তেতো হেসে বুদ্ধদেবের দিকে তাকায় সুকুমার।

বলে, 'দেখলেন, যুগটা কেমন উল্টিপাল্টি খাচ্ছে? সত্যিটা মিচ্ছা হয়ে যাচ্ছে, আর, মিচ্ছা হচ্ছে সত্যি।' বলতে বলতে ঠাণ্ডা চোখে অগ্নির দিকে তাকায় সে। বলে, 'আচ্ছা, আমি না হয় মিছাবাদী হয়েই রইল্যম তুয়ার চোখে, কিন্তু দু'দিন বাদে তুয়ার ছেইলা পড়ালিখা শিখবেক, তখন উয়াকে বলক আপিসে গিয়ে জেনে নিতে বলিস, বলকের বাবুরা তুয়াকে কতটা গম দিয়েছে, আর সরকারি কাগজে লিখ্যেছে কতটা।'

এসব গূঢ় কথা অগ্নির মাথায় ঢোকে না। তার বেলা বয়ে যায়। খাঁচার ভেতরে পাখিটা হয়ত বা ক্ষিদের জ্বালায় প্রলয় কাণ্ড বাধিয়েছে। ঘরে বুড়া ঠাকুর্দা নিশান বাউরি অভুক্ত রয়েছে। ঢেঁকিতে গম কুটে সিদ্ধ করলে বুড়াটা খাবে। ঠাকুরর্দা নয়, নিশান তো অগ্নির ছেলেই। মাঝেমাঝেই তো আদরে-আবদারে, অভিমানে, দাদু নয়, অগ্নির সুমুখে একটি বাচ্চা ছেলে বনে যায় নিশান।

পেত্যাটা মাথার ওপর তুলে নেয় অগ্নি।

সুকুমার বলে, 'তিলককে একটা কথা বইল্যে দিতে পারবি?'

অগ্নি পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়ায়, 'কী কথা?'

'বলবি, মধ্যিরাতে চাঁদ উঠ্যেছে, হরিণমুড়ির কুল/শুকনা শালে ফুল-ফুটবেক, কাঠ-টগবের ফুল। এ'টা বললেই সে বুঝতে পারবেক।'

অগ্নি কী বোঝে কে জানে! সহসা দুনিয়ার লজ্জা ওকে চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধরে যেন। বলে, 'ইটার মানে কী?'

'মানে জেন্যে লাভ কি তুয়ার? এ আমাদের পার্টির গুহ্যভাষা।'

অগ্নি অবিশ্বাসে তাকায়। ঝামটে ওঠে। বলে, 'পার্টির কথা ত তুই লিজে গিয়ে বল্ ক্যানে? আমার অত সময় নাই।' বলতে বলতে সারা শরীরে অপূর্ব ঝাঁকুনি তুলে হাঁটতে থাকে সে।

সুকুমার মিটিমিটি হাসছিল। বুদ্ধদেবের দিকে তাকায় সে। বলে, 'মেয়েটার ফাটা কপাল। একদিন বলব আপনাকে। কপালটা জোড় লাগাতে চাইছি আমি।'

পেত্যাখানি মাথায় তুলে নিয়ে গুটিগুটি হাঁটতে শুরু করে অগ্নি। পেছন থেকে সুকুমার বলে, 'লুহারপাড়ার পাশ দিয়েই ত যাচ্ছু, চপল লুহারকে দেইখ্‌লে পাঠাই দিবি ত। একটা কথা পষ্টাপষ্টি জিগাতে চাই উয়াকে।'

অগ্নি হাঁটার গতি শ্লথ করে। ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, 'উয়াকে পাড়ায় কুথা পাব গ? উয়াকে ত দেইখ্‌ল্যাম, কিলাপ-ঘরের চাল ছাইছে।' •

শুনেই অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে যায় সুকুমার। আর, বুদ্ধদেবের একটা কথার খেই ধরে শান্ত পরিস্থিতি অকস্মাৎ রুদ্র হয়ে ওঠে।

ইদানীং সুকুমারের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঘোরতর তর্ক বেধে যায় বুদ্ধদেবের। বুদ্ধদেব খুব শান্ত গলায় কথা বলে, কিন্তু সুকুমারের ত পেতল-চোঁয়া রাগ, কোনও বিষয় তার মনঃপুত না হলেই ঝাঁ করে ক্ষেপে ওঠে। সেদিন তর্ক এমনই চরমে উঠেছিল যে হপ্তাটাক দু'জনের মুখ-দেখাদেখি বন্ধ। তর্কটা যে বেধে যাবে, এক মুহূর্ত আগে অবধি তার কোনও আঁচ মেলে নি। মেঘ গুরলায় নি, হাওয়া বয় নি, অকস্মাৎ কড়াক্কড় বাজ আর ঝমাঝঝম্ বৃষ্টি। চপল লোহার ক্লাবঘরে কাজ করছে শুনে বুদ্ধদেব খুব নিরীহ গলায় বলেছিল, ভালই হল, চপলটা একদিন কাজ পেয়ে গেল। কালই আমার কাছ থেকে একটা টাকা চাইছিল। ওর বউয়ের নাকি খুব অসুখ। বুদ্ধদেবের কথা শেষ না হতেই সুকুমার ওর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল, যেন এক আজব প্রাণীকে দেখছে। কাঠের মতো ঠকঠকে গলায় বলল, উই আনন্দে থাকুন। মনে মনে দু'গণ্ডাপিঠা খেয়ে পেট ভরান। কেন? বুদ্ধদেব অবোধ চোখে তাকায়। কেন কী? কিলাবের কাজে মজুরি আছে নাকি? বেগার খাইট্‌বার কাজ। বুদ্ধদেবের দু'চোখে ছিল অবিশ্বাস, বেগার কেন? বাহ্! ইট্যা হইল্যাক 'দেশের কাজ', সুকুমারের গলায় ঝাঁঝাল শ্লেষ, কিলাবঘর বলে কথা! সেক্রেটারি কে? না, খোদ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের ব্যাটা। চারপাশের মাতব্বরদ্যার ছেইলা-পুইলারা উয়ার মেম্বর। বড়ঘরের ছেইলা সব, উয়াদ্যার কুনো কাজ নাই ঘরে, মুনিশ-মাইন্দাররাই করে উয়াদ্যার যাবতীয় ঘর-গিরস্থালির কাজ। উয়ারা কী করেই বা সময় কাটায়! কাজেই, উয়ারা কিলাবঘর গড়েছে। বল খেলে, তাস খেলে, ক্যারম খেলে। গরমেন্ট বল দিয়েছে, ক্যারম দিয়েছে, হ্যাচাক দিয়েছে, শতরঞ্চি দিয়েছে, টেবিল-চিয়ার-আলমারি দিয়েছে, রাত পাহারার টর্চ আর বল্লম দিয়েছে থানা থিক্যে। গরমেন্ট যাত্রা-থিটার করবার টাকা দেয়, স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের টাকা দেয়। উইসব লিয়ে বেশ ফূর্তিতেই আছে উয়ারা। বুদ্ধদেব একটুক্ষণ ভাবে। তারপর খুব ভারিক্কি গলায় বলে, ভাবতে গেলে ব্যাপারটা কিন্তু খারাপ নয়। দেশের যুবশক্তিকে সংগঠিত করা দরকার। সুকুমার তেরচা চোখে তাকায়। ঠোঁটের কোণে ভাঙচুর হয়। বলে, হাঁ, বাবুদের ফূর্তিফার্তার তরে যুবশক্তির মদত চাইই। বুদ্ধদেব বলে, শুধু বাবুদের ফূর্তিফার্তার কথা উঠছে কেন? ক্লাব তো সকলের জন্য। সবাই যেতে পারে। সহসা ঝাঁ করে ক্ষেপে যায় সুকুমার। বুদ্ধদেবের কথা শেষ না হতেই

একেবারে বাঘের ঝাপট নেয়, আপনি ত ভারি একখান ন্যাকাপনা কথা কন। দিনভর খাইট্যতে খাইট্যতে যাদের কোমরের কষি খুইলে যায়, সাঁঝের বেলায় বাঁওড় আলু সিজিয়ে খেইয়ে যারা বেঁইচে থাকে, উয়ারা যাবেক বল খেইল্যতে? ক্যারম পিটতে? ফিস্টি কইর্যতে? বাবুদ্যার সাথ এক আসনে বুইস্যবেক উয়ারা? চুদ্দোপুরুষ যাদের মধ্যে চাকর-মালিক সম্পক্ক—।

'সেই সম্পর্কটা ঘুচিয়ে ফেলতে হবে।' বুদ্ধদেব বলে।

'কে ঘুচাব্যাক? আপনি?' সুকুমার আরও কাঁই হয়।

বুদ্ধদেব খুব প্রত্যয়ী গলায় বলে ওঠে 'সেটাই তো ইচ্ছে। সেটাই তো আমার চাকরি।'

সুকুমারের নাকের পাটা ফুলে ফুলে ওঠে। কপাল টানটান। চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। গলায় তীব্র গরল। বলে, 'আর কিছো দিন সিংহগড়ের রাবড়ি পেটে পড়ুক , তারপর শুইন্যব আপনার বাণী।'

সেদিন তীব্র অপমানবোধে পুড়তে লেগেছিল বুদ্ধদেব। শান্ত গলায় যথা সম্ভব কাঠিন্য এনে বলেছিল, 'দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে বিষয়কে খারাপ ভাবাটা একজাতের মানসিক রোগ। ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করানো দরকার।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। ধীরপায়ে চলে এসেছিল সিংহগড়ে। মগজের মধ্যে দু'ডালের দুটি কাক তখনও তাদের ঝগড়া চালিয়ে যাচ্ছিল সমানে।

হাততালি দিয়ে কাক উড়োনো

স্বাধীন দেশের একজন মন্ত্রী যখন রাস্তা দিয়ে আনাগোনা করেন, তখন তাঁর গাড়ির আগে-পিছে ডজনখানেক সরকারি ও বেসরকারি গাড়ি। সাইরেনে অবিরাম শকুনের কান্নার মতো কোঁ-কোঁ-আওয়াজ। মাথার ওপর লালবাতিওয়ালা মুকুট। পুলিশের গাড়ি ছুটতে ছুটতে ঝাড়ুদারের মতো ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেয় রাস্তার মানুষজন, গাড়িঘোড়া...। এমন জাঁকজমকপূর্ণ সফর দেখলে প্রাক্তন প্রভু ইংরেজরা অবশ্যই চমৎকৃত হতেন, আহা, এরা আমাদেব সার্থক উত্তরাধিকারী। কিন্তু স্বাধীন দেশের একজন থানান্তরের রাজপুরুষের চেম্বারে ঢোকার আগে প্রজাসাধারণ বাইরে জুতো খুলে যাবে, এমনটা, বাস্তবিক, স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ইংরেজরাও হয়ত বা অতখানি ভাবে নি। কিন্তু বুদ্ধদেব তাও দেখেছে। বিডিও সাহেবের চেম্বারের বাইরে কয়েক জোড়া পুরোনো জরাজীর্ণ জুতো দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল সে। বাইরে অত জুতো কেন? খাস-পিয়ন ভবানী, সর্বদাই একটা ব্যস্ত ব্যস্ত ভাব, নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা, জানায়, আগুনকুমারী থিকে জনাকয় ভদ্দরলোক আইছেন, সাহেবের পাশ আর্জি জানাতে। তো, জুতো বাইরে কেন? ই বাব্বা! ভবানী দু'চোখ কপালে তোলে, সাহেবের ঘরে জুতা পইরে ঢুকবেক? অত সাহস? বুদ্ধদেব তেতো হাসে, সাহেব বুঝি ভগবান? আর চেম্বারখানা বুঝি মন্দির? ঝাঁ করে পাগল শিকারির মুখখানি মনে পড়ে যায়। প্রায় আলাপ পরিচয়ের দিনগুলোতে একদিন বুদ্ধদেবকে শুধিয়েছিল, হাঁ বাবু, বিটিশ নাকি চইলে গেঁইছে? সত্যি? আচমকাই শুধিয়েছিল প্রশ্নটা। বুদ্ধদেবকে কোন রকম প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ না দিয়েই শুধিয়েছিল। অনাথবন্ধুকেও পরোক্ষে এই প্রশ্নটাই বুঝি কামড়ায়। সবই তো বহাল রইল, আগের মতোই। রাজ্য, রাজ্যপাল, রাজভবন...। সেই পুরোনো আইনকানুন, পুলিশ-আমলা, হাঁকডাক, জাঁকজমক, বিলাসব্যসনের ধুম...। সেই তেলামাথায় তেল ফেলা, ন্যাড়া মাথায় বেল ফেলা ..। সব কিছুই তো এক এবং অবিকৃত রইল। শুধু মধ্যরাতে রাজ্যবদল। বাকি সব কী

বদলাল? কতটুকু বদলাল? অনাথবন্ধু বলেন, সেই ইতিহাসের আদি যুগ থেকেই ভাবতবর্ষে চলছে ধারাবাহিক রাজতন্ত্র। আজও তা সমানভাবেই অব্যাহত। বলেন, হ্যাঁ, রাজতন্ত্রই চলছে এখনও। হিন্দু রাজাদের যুগ গেছে, শুরু হয়েছে মুসলমান বাদশাদের রাজত্ব। তারপর এল ব্রিটিশ-রাজ। ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পরও এদেশের বুকে ফিরে এল রাজা-রাজড়া-জমিদার-সামন্তদের বংশানুক্রমিক শাসন, পুনরায়, সামান্য নাক ঘুরিয়ে পার্লামেন্টের মাধ্যমে। দেখো, জহরলালের পর গদিতে বসবে ইন্দিরা, তারপর ইন্দিরার ছেলে, মিলিয়ে নিও। অন্য যেসব রাজা-রাজড়ারা নির্বাচনের পথ ছুঁয়ে 'জনপ্রতিনিধি' সেজে বসে গিয়েছে গদিতে, ওরাও বিদায় নেবার আগেই নিজেদের ছেলেপুলেদের যথারীতি প্রতিষ্ঠিত করে যাবে গদিতে। এ এক এমনই ফুলপ্রুফ 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা', এমনই মজার কল একটি, এমনিই তার পরতে পরতে পাকা বন্দোবস্ত যে যুগযুগ ধরে কাঁটা লাগানো জুতো তলায় যারা নিপীড়িত, তারা, কিমাশ্চর্যম, নিপীড়নকারীদেরই নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করবেই। যে রাজা-রাজড়া, জমিদার-সামন্তদের শাসন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সাত মন তেল পুড়িয়ে প্রজাতন্ত্রের পত্তন হল, এই মজার কলটিতে পড়ে প্রজারা তাদের সেই চিরশত্রুদেরই নির্বাচিত করে পাঠিয়ে দিচ্ছে সংসদে, বিশ্বাস না হয়, খোঁজ নিয়ে দেখ। প্রজাতান্ত্রিক এই দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংসদের যে নির্বাচন হয় তাতে মোট সাংসদের নব্বই ভাগ রাজা-জমিদার-সামন্ত কেন? কেমন করে তারাই মানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠল? এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই তো শাসনব্যবস্থায় এত রদবদল, প্রজাতন্ত্রের পত্তন, নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধির হাতে শাসনব্যবস্থা তুলে দেবার এত মহার্ঘ আয়োজন। তবে? পাগল শিকারি উপস্থিত থাকলে এবং এই মজার কলটিকে চিনতে পারলে, বলত, যেই ধোবাকে সেই ধোবা, শুধুমুদু বোষ্টম হবা। হায় গ!

আর, সেই প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের শাসনব্যবস্থায় চলে আসছে বনিক-শ্রেণীদের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ। আজও সেই একই ব্যবস্থা কায়েম। প্রাচীন কালে পছন্দের রাজপুরুষটিকে সিংহাসনে বসানোর জন্য কিংবা অপছন্দেব রাজপুরুষটিকে সরিয়ে দেবার জন্য ধারাবাহিক চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেত বনিক-শ্রেণীরা, দু'হাত দিয়ে টাকা ছড়াত সেজন্য। পলাশীর যে যুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য নাকি ডুবে গিয়েছিল গঙ্গায়, সেই যুদ্ধেও বনিকগোষ্ঠীর বিরাট ভূমিকা ছিল। সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে, থাকবে। রাজা-রাজড়ারাই শাসন করবে দেশ। নতুন নতুন রূপে। ঘুরিয়ে নাক দেখাবে সর্বদা। নাকই। আর বনিক-সম্প্রদায় অন্তরাল থেকে কলকাঠি নাড়বে। কিছুই বদলায় নি, এই ঐতিহ্যময়ী ভারতভূমিতে। কিছুই বদলায় না।

অনাথবন্ধুর মধ্যে একটা দ্রুত পরিবর্তন আসছে। বুঝতে পারে বুদ্ধদেব। একটা ঝড় বইছে মনে। কোনও কথাই আর রেখেঢেকে বলতে পারছেন না। যে দলে কাটালেন আজীবনকাল, তাকেই প্রকাশ্যে 'রাজা-রাজড়ার পার্টি' বলছেন। বাঁকুড়া জেলায় গেল-নির্বাচনে সব জোড়াবলদ অর্থাৎ কংগ্রেস এম-এল-এরা জিতেছে বলে জেলার নামকরণ করেছেন 'বলদভূম'। এসব সীমাহীন অস্থিরতার লক্ষণ। কংগ্রেস-নেতাদের কানে যাচ্ছে এসব। তারা অস্বস্তিবোধ করছেন। লোকটাকে নিয়ে কী করা যায় ভাবছেন। এক বিশাল গৌরবোজ্জ্বল অতীত অনাথবন্ধুর। আজকের ভুঁইফোঁড়দের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। কথায় কথায় মুখের ওপর দুমদাম বলে দেন, দু'দিনের যোগী তোমরা, ভাতকে তাই বলছ অন্ন। বুঝবে কি, কেন এমন বলছি। শুনেটুনে জেলা-নেতৃত্ব বলে, বুঝতে তো পারছি সবকিছু, কিন্তু করি কি?

অতুল্যদা, প্রফুল্লদা, অজয়দা, সবাই যে অন্য চোখে দেখেন লোকটিকে। কিছু বলতে গেলেই উল্টে বকুনি খাব। মানিয়ে নাও একটুখানি। ক'দিনই বা বাঁচবে? বরং ক্ষ্যাপা-ট্যাপা, বয়স হয়েছে, মাথার ঠিক নেই, নিজের নামই ভুলে যান ইত্যাদি বলে-টলে একটা হালকা গোছের ইমেজ তৈরি কর ওর। যাতে ওর কথা ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারাতে থাকে জনমনে। পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়' এসব হল জেলার প্রবীণ নেতা ব্রজরাজ সামন্তর চানক্যনীতি। কূটনীতিবিশারদ হিসেবে সারা জেলায় ভারি নাম। নিন্দুকেরা ঝোপের আড়াল থেকে বলে, ব্রজ সামন্তর মাথায় পেরেক পুঁতল্যে ইস্কুলুপ হয়ে বারাই আসে।

বুদ্ধদেবের কথায় ভবানী সামান্যক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তার দু'চোখের মণিতে রোষ জমে, 'সেই তরেই ওবাস্যিয়ারবাবু বলে ঠিক কথাটি।'

'ওভারসিয়ারবাবু কী বলে?'

'সে আর শুইন্যে কী হব্যেক?' ভবানীর রুষ্ট গলা। বলে, 'আপনি নাকি বড্ড লাফাতে লেগেছেন শূন্যে। বলে, অকালে বাড়ে, সকালে মইর‍্তে। বলে, অল্পজলের তিতপুঁটি, তাইতে এত ছটফটি।'

শেষের প্রবচনটা সম্ভবত ভবানীর নিজস্ব সংযোজন। বুদ্ধদেবের কপালে অজান্তে ভাঁজ পড়ে। করালী সোম তবে বেজায় ক্ষেপেছে। অনেকেই অনেক কারণে ক্ষিপ্ত বুদ্ধদেবের ওপর। বুদ্ধদেব বোঝে।

প্রাণের বন্ধু ত্রিভঙ্গ। আচারে-ব্যবহারে, গমনে-দর্শনে কিছুতেই বুদ্ধদেবের সঙ্গে মিল নেই তার। তবুও ত্রিভঙ্গর প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা মনে মনে পোষণ করে বুদ্ধদেব।

ত্রিভঙ্গ বলেছিল, 'টিলিয়ে ক্যাঁগলাস গায়ে তুলছ বাপ। বড্ড উড়ছ।' বুদ্ধদেবের ভাল লাগে নি কথাগুলো। এরা সব চলতি-হাওয়ার-পন্থী। শুকনো বাঁশপাতার দল, হাওয়ার গতি অনুসারে উড়ে চলে। হাওয়ার বিপরীতে যাওয়ার ক্ষমতা নেই ওদের। ত্রিভঙ্গর সতর্কবাণী, 'বুঝতে পারবে ফল, জলদিই মালুম হবে সেটা।' ত্রিভঙ্গ এ জেলায় অনেক দিন রয়েছে। গ্রামসেবক হিসেবে বছর দু'তিনের বেশি নয়। কিন্তু তার আগে দীর্ঘদিন ইউনিয়ন অ্যাসিস্টেন্টের চাকরি করেছে। হরবল্লভ যখন লায়েকবাঁধ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, তখন ত্রিভঙ্গ বেশ কয়েক বছর ওঁর অধীনে কাজ করেছে। চুয়ামসিনার সিংহগড়েই থাকত। ওখানেই ছিল ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস। হরবল্লভের সঙ্গে তার ছিল মধুর সম্পর্ক। হরবল্লভের মেয়ে উমা আর ছোটছেলে দেবিদাসকে কিছুদিন পড়িয়েছিল চাকরির অঙ্গ হিসেবে। বয়স অনুপাতে সে অনেক বেশি পরিণত। তার মধ্যে আবেগের কোনও স্থান নেই। সে হাওয়ার গতিপথ আগাম মালুম করতে পারে।

ত্রিভঙ্গর সতর্কবাণী বুদ্ধদেবকে খুশি করতে পারে নি। তাই দেখে ত্রিভঙ্গ বলেছিল, 'আমার আর কি? আদা খাবে যে, ঝাল বুঝবে সে।' এটা ত্রিভঙ্গর রোষের প্রকাশ ছিল না। প্রচণ্ড অভিমানের বশে এমন কথা উচ্চারণ করেছিল সে। কারণ, ওর কাজকর্মকে যতই না অপছন্দ করুক, বুদ্ধদেবকে মনে মনে ভালবাসত ত্রিভঙ্গ।

আসলে, বুদ্ধদেব বুঝতে পারে, সে এক নিস্তরঙ্গ দীঘিতে দু'একটা ছোট্ট নুড়ি ছুঁড়েছে। তাতেই এমন বিপত্তি। সে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার দিতে চাইছে, স্রোত তো তাকে বাধা দেবেই। কাজেই সীতাশাল চালের নরম ভাতের মধ্যে সে এক মূর্তিমান কাঁকরদানা।

গেল-হপ্তায় বিডিও সাহেবের চেম্বারে গ্রামসেবকদের মাসিক বৈঠক বসেছিল। এলাকার খরা পরিস্থিতি এবং রিলিফের কাজকর্মের খোঁজখবর নিচ্ছিলেন বিডিও সাহেব। এ ধরনের বৈঠকের যা হয় আর কি, একে একে সমস্ত গ্রামসেবক তোতাপাখির মতো আউড়ে গেল চেনা বাক্যগুলি। এলাকায় খরার প্রকোপ বেড়েছে, তবে রিলিফের কাজকর্মও চলছে পুরোদমে। খয়রাতি সাহায্যও পাচ্ছে অভাবী মানুষ। পানীয় জলের অভাব রয়েছে বটে, তবে কুয়ো কাটানোর কাজও চলছে। পুরোনো কুয়োগুলোকে ঝালানোও হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে নাইট-স্কুলগুলো চলছে ঠিক ঠিক। তেমন কোনও সমস্যা নেই। তবে মাটি কাটার কাজ আরও কিছু বাড়াতে পারলে ভাল হয়।

'এবং দেখা দরকার, যাতে রিলিফের কাজগুলো কারুর বৈঠকখানায় বসে কাগজে-কলমে শেষ হয়ে না যায়।'

অকস্মাৎ পুরো বৈঠক স্তব্ধ হয়ে যায়। গ্রামসেবকেরা নির্বাক। অকস্মাৎ ঘরে মধ্যে বায়ুহীনতাজনিত দম আটকানো অনুভূতি। বিডিও সাহেব একখিলি পান ভরতে যাচ্ছিলেন মুখে, মাঝপথে আচমকা থেমে যায় হাত।

'মানে?'

'মানে, গামীরতলার যে রাস্তার কাজটা চলছিল, সেটা দশদিন চলবার কথা ছিল, তিনদিনেই শেষ। রাস্তায় সিকি মাটিও পড়ে নি।'

থমথম করছিল বিডিও সাহেবের মুখ। নাকের ডগায় মিহি ঘাম। বুদ্ধদেবের মুখ থেকে কিছুতেই নজর সরাতে পারছিলেন না। বুদ্ধদেবের মনে হয়েছিল, অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর চোখ দুটি গোখরো সাপের মতো প্রতিশোধপ্রবণ।

একটা কাক উড়ে এসে বসেছিল জানলার রেলিং-এ। বিডিও সাহেব এমন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন ওটার দিকে, যেন কত কালের চেনা। কাকটাকে দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন। পানের খিলিখানা মুখে পুরেছিলেন। চিবোতে চিবোতে পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল চোখমুখ।

খুব ঠাণ্ডা গলায় বলেছিলেন, 'শ্যাষ হয়্যা গেল ক্যান? লেবার কি বেশি সিলো?'

'তিনদিনে মোট ন'শো মত লেবার ছিল। অথচ ঐ স্কীমে আড়াই হাজার ম্যান-ডেজ।'

'তুমি ইস্কিমের কাগজপত্তর দ্যাখসো?'

'দেখি নি, তবে টাকার অঙ্কটা শুনেছিলাম অফিসে।'

বিডিও সাহেব সামান্য সময় থমকে থেমে রইলেন। কাকটাকে আরও কিছুক্ষণ দেখলেন। এক সময় বেল বাজিয়ে বললেন, 'করালীরে ডাক।'

করালী সোম আসে। বিডিও সাহেব গলায় খুব উদ্বেগ মিশিয়ে বলেন, 'করালী, গামিরতলার ইস্কিমে কত ম্যান-ডেজ?'

করালী সোম সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। আড়চোখে এক ঝলক দেখে নেয় বুদ্ধদেবকে। সামলে নিয়ে বলে, 'দেখে বলতে হবে।'

বিডিও সাহেব বেশ ভারিক্কি গলায় বলেন, 'পুরো ইস্কিমটা ম্যাজারম্যান্ট কইরা রিপোর্ট দিবা আমারে।' বলতে বলতে হাততালি দিয়ে উড়িয়ে দেন কাকটাকে।

বুদ্ধদেবের মনে হয়, বিডিও সাহেবকে সব কিছু খুলে বলে। বলে যে, বেড়ালের ওপর মাছচুরির বিচারের ভার দেওয়াটা হাস্যকর। বলে যে, সরষের ভেতরেই ভূত নাচে। কিন্তু

করালীর সামনে কথাগুলো বলতে ভদ্রতায় বাধে। তাছাড়া বুদ্ধদেবের মনে হয়, বিডিও সাহেব জেগে ঘুমোচ্ছেন। যে জেগে ঘুমোয় তাকে তো জাগানো মুশকিল।

তবুও বুদ্ধদেব বলে, 'আপনি স্বয়ং একবার চলুন না স্যার।'

'আমি!' বিডিও সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়েন, 'আমাগো সময় কই?'

'একদিন। একটুখানি সময়। আপনি স্কীমটা দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।' বুদ্ধদেব ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

'পাগোল। সারা ব্লক জুইরা রিলিফ অপারেশন। আমাগো বলে দম ফেলনের টাইম নাই—। করালী তো যাস্যেই।'

হতাশ হয়ে করালী সোমের দিকে তাকায় বুদ্ধদেব। বলে, 'কবে যাবেন করালীদা?'

করালী তেমন পাত্তা দেয় না বুদ্ধদেবকে। খুবই আলগোছে বলে, 'দেখি, কবে যেতে পারি। গাদাগাদা কাজ চলছে সর্বত্র। রাশিরাশি এ্যাডজাস্টমেন্ট আসছে রোজ। সেগুলো চেক করতে হচ্ছে। গাদাগাদা স্কীম বানাতে হচ্ছে রোজ—।'

'যদি আগে থেকে জানিয়ে যান, আমিও উপস্থিত থাকতে পারি।'

করালী সোমের চোখ মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠেই নিভে যায়। ঠোঁটের ডগায় স্মিত হাসি ফুটিয়ে বলে, 'সে রকম ডেট দেওয়া তো ভারি মুশকিল। সামনের হপ্তায় একদিন সময় করে চলে যাব।'

বিডিও সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই বুদ্ধদেবকে ধমক লাগায় ত্রিভঙ্গ।

'বড্ড বাড়াবাড়ি করছ হে। একেবারে ভীমরুলের চাকের দিকে ঢিল তুলেছ। ভুগবে।'

বুদ্ধদেবকে অসহায় লাগে। বলে, 'চোখের সামনে হরবল্লভেরা পুকুর চুরি করবে, আমি বসে বসে দেখব?'

'বসে বসে দেখবে কেন? তোমার অন্য কোনও কাজ নেই?'

'এটাও তো আমার কাজের মধ্যে পড়ে।'

'না পড়ে না। এটা তোমার কাজ নয়।'

'কোনটা তবে আমার কাজ?'

ত্রিভঙ্গ তার রাগী রাগী মুখখানা সহসা বদলে ফেলে। তরল গলায় বলে, 'কতবার তো বলেছি তোমায়। তুমি সিংহগড়ে বসে বসে দুধ-ঘি, ছানা-মাখন সাঁটাবে। হরবল্লভের এঁচোড়ে-পাকা ছেলেটার সঙ্গে তাস-পাশা-ক্যারাম খেলবে। লাইব্রেরিতে অনেক রগরগে প্রেমের বই রয়েছে, নিয়ে পড়বে।' বাঁ-চোখখানি সামান্য টিপে বলে, 'এর পরেও সময় পেলে পাশের মহলের ডবকা ছুঁড়িটার সঙ্গে প্রেম-ট্রেমও করতে পার। যা কাঁচা কার্তিকের মতো চেহারা তোমার!'

বুদ্ধদেব জ্বলন্ত চোখে তাকায়।

ওর রোষের খবর পেয়ে যায় ত্রিভঙ্গ। গায়ে হাত ছোঁওয়ায়। মৃদু গলায় বলে, 'আমি তোমার ভালর জন্যই বলছি এসব। রাগ করো না। এ সব ব্যাপারে কারা যে কত গভীরে ডুবে ডুবে জল খাওয়ায় মত্ত, তুমি তো বুঝতেও পারবে না। অযথা বধ হয়ে যাবে।'

বিকেলে যখন দুজনে সাইকেলে চড়ে রওনা দেয় কর্মক্ষেত্রের দিকে। কাঁকিলার কাছাকাছি এসে সাইকেলের গতি কমিয়ে আনে ত্রিভঙ্গ। বলে, 'আমি একটুখানি কাঁকিলায় ঢুকব। দরকার আছে। তুমি এগোও।'

'এখন আবার কাঁকিলায় কি কাজ তোমার?'

'আমার নয়, প্রেসিডেন্টের কাজ। ওর খাতকগুলোকে একটু তাগাদা দিয়ে যাই।'

বুদ্ধদেব নির্বাক হয়ে যায়। পলকহীন তাকিয়ে থাকে ত্রিভঙ্গর দিকে।

'কি? ভূত দেখছ নাকি?'

'তুমি প্রেসিডেন্টের গোমস্তার কাজ করছ?'

ত্রিভঙ্গ হাসে। একটু ঘনিষ্ঠ হয়। বলে, 'দ্যাখ, আমি হলাম গ্রামসেবক। গ্রামের সেবা করাই আমার কাজ। তো, গ্রামের হাজার হাজার মানুষের সেবা করতে হলে নির্ঘাৎ মারা পড়ব। এই দু'পা-দু'হাতে কুলোবে না। তাই প্রেসিডেন্টের সেবা করে যাচ্ছি। ওর সেবা করলেই সবার সেবা করা হল। ওই তো সকলের প্রতিনিধি। গোড়ায় জল ঢাললেই পুরো গাছখানা পাবে।'

সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দেয় ত্রিভঙ্গ। খাটোগলায় বলে, 'এখনও কনফার্মেশন হয় নি। কোন গতিকে চাকরিটা চলে গেলে খেতে পাব না। জানোই তো, চাকরি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই।'

চোখের মণিতে অবাধ্য বালুকণা

ইদানীং মানুষজনকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে পরীক্ষিত বাউরি। মানুষেব মুখোমুখি হতে ভাল লাগেনা তার। তবুও, অগ্নির মুখোমুখি হতেই হয় তাকে। আসলে, অগ্নিই ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। স্বদেশে, প্রবাসে, নিদ্রায়-জাগরণে অগ্নির থেকে রেহাই নেই পরীক্ষিত বাউরির। যত দূরেই যাক, যত গোপন গর্তে গিয়ে খরগোশের মতো লুকিয়ে রাখুক মুখ, অগ্নি তার সুমুখে এসে দাঁড়াবেই। তার চোখ চোখে রেখে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে অগ্নি। বাপ-মেয়েতে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে পরস্পরের দিকে। অগ্নির স্থির চোখের মণি পরীক্ষিতের চোখের মণিকে বিদ্ধ করে ফেলে। বড় অসহায় হয়ে পড়ে পরীক্ষিত। অগ্নির থেকে চোখ সরিয়ে নিতে চায় প্রাণপণে। কিন্তু অগ্নিই তা হতেই দেয় না। পরীক্ষিতের মনে হয়, অগ্নি তার জীবনের যাবতীয় দিগদারির জন্য মনে মনে ওকেই দায়ী করে। চরম হটকারিতায়, না জেনে না শুনে, এক লম্পট লোকের হাতে ওকে তুলে দিয়েছিল পরীক্ষিত। ওরই চরম ঔদাসীন্যে তার জঠরজাত সন্তান এই শিশুবয়েসেই দু'মুঠো ভাতের জন্য ভর্তি হয়েছে গাঙ্গুলিদের বাখুলে। সেখানে অষ্টপ্রহর খাটতে খাটতে দিনদিন জীর্ণ খাঁচাসার হয়ে যাচ্ছে ঐ টুকুন বাচ্চার শরীর। পরীক্ষিত কেবল উড়ে বেড়ায়, পালিয়ে বেড়ায়, আর, ওর অনুপস্থিতিতে এই দুরন্ত যৌবন বয়ে বেড়াতে গিয়ে অগ্নিকে প্রায়ই পড়ে যেতে হয় হায়েনা-হুঁড়ারদের থাবার মধ্যে। এককালের দুরন্ত বিপ্লবী পরীক্ষিত বাউরির আজ আর তিলমাত্র মুরোদ নেই নিজের মেয়েকে অহরহ লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচায়। অগ্নি যখন নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে পরীক্ষিতের দিকে, তখন পরীক্ষিতের মনে হয়, নীরব দৃষ্টিবাণ শানিয়ে অগ্নি বুঝি এইসবই বলছে। অথচ মেয়েটা তো জানে না, ওকে নিয়ে পরীক্ষিতের কী এক অহরহ দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা। কত আর বয়স, বড় জোর পঁচিশ। বাউরিদের ঘরে এমন রূপ, গুণ আর দুর্দান্ত যৌবন বড় একটা দেখা যায় না। বাইরে সীমাহীন তেজ আর দেমাক দেখালেও, আড়ালে আসল মেয়েটির খোঁজ বুঝি একমাত্র পরীক্ষিতই রাখে। ওর বাইরেটা যত জেদী, ভেতরটা তত নরম। ইদানীং বড় কাঁদে মেয়েটা। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। কারণে-অকারণে।

পরীক্ষিত সেটা বুঝতে পারে। দূরে, অনেক দূরে, পরিচিত জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর বাইরে একটা ভাল ছেলে দেখে অগ্নিকে দ্বিতীয়বার পাত্রস্থ করবার চেষ্টা চালিয়েছিল পরীক্ষিত। কিন্তু কোনও ফল হয় নি তাতে। অগ্নিকে দেখে শুনে পছন্দ করে যাওয়ার পরপরই ওরা কেমন করে যেন জেনে ফেলত নিশান বাউরির জাতিচ্যুত হওয়ার খবরটা।

অগ্নি ইদানিং আর এসব নিয়ে বড় একটা ভাবে না। সমস্ত আশার ফুল শুকিয়ে গেছে তার জীবনে। এখন গোরাকে নিয়েই তার যাবতীয় ভাবনা। কচি শালপাতার মতো টসটসে শরীরখানা নিয়ে সে দূর-দূরান্তে খাটতে যায়। সওদাপাতি করে। কাঠকুঠো কুড়োয়। রাস্তায়-ঘাটে তার দিকে লোলুপ নয়নে তাকিয়ে থাকে কত হায়েনা-হুঁড়ার। কত ভদ্দরঘরের জানোয়ার ছোকরা তাকে ইশারায় ডাকে। ঝনঝনিয়ে পয়সা বাজায়। বত্রিশভাগীর জঙ্গলের দিকে নিয়ে যেতে চায়। অগ্নি রুদ্ররূপ ধরে নিমেষে। খরিশ সাপের পারা ফণা তুলে দাঁড়ায়। লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায় পুরুষসিংহের দল। ঘরে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ে অগ্নি। একলাটি কেঁদে যায়, সারা দুপুর, বিকেল।

দিন কয়েক আগে জয়রামপুরের ডাঙায় হরবল্লভ সিংহবাবুর ছেলে প্রভঞ্জন দলবল নিয়ে ওর রাস্তা আগুলে দাঁড়িয়েছিল। অগ্নির মাথায় ছিল বাঁশের পেত্যা। তাতে ছিল কয়েক আঁটি খেঁট্যা শাক। ঠা-ঠা দুপুরে কেউ ছিল না ধারে-কাছে। বিপন্না অগ্নি প্রমাদ গুনেছিল। আচমকা পেত্যাখানি প্রভঞ্জনের মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরে দৌড় দিয়েছিল ঘরের দিকে। আচমকা এমন প্রতিক্রিয়ায় একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রভঞ্জনের দল। সম্বিত যখন ফিরল, অগ্নি ততক্ষণে নাগালের বাইরে। ঘরে এসে সারা বিকেল গুমরে গুমরে কেঁদেছিল অগ্নি। রান্নাবান্নাও চাপায় নি। বাবুরা পথ আগুলেছেন, অশ্লীল ইঙ্গিত করেছেন, হাত ধরে টেনেছেন, বাউরি-জীবনে এসব বড়ই মামুলি ব্যাপার। এ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না কেউই। কেবল অগ্নিই এ ব্যাপারে একেবারেই স্বতন্ত্র।

মেয়েটা সত্যিই অন্যরকম। নিশান বাউরি তো নয়ই, পরীক্ষিতও বুঝি ঠিকঠিক চিনতে পারে না নিজের মেয়েকে। মা বিহনে আজ কত বছর পরীক্ষিতই ওর মা-বলো-মা, বাপ-বলো-বাপ। কিন্তু এ মেয়ে যেন অন্য ধাতুতে গড়া। যেন পাতালঅতল কুয়া একটি। তল পাওয়া দায়। এই সব চেনা-অচেনা কারণে অগ্নিকে নিয়ে পরীক্ষিতের সর্বক্ষণের ভয়, আশঙ্কা, কখন যে কী করে বসে, কী বাধিয়ে বসে অবুঝ আর জেদী মেয়েটা!

ভয়ের আরও একটা কারণ ঘটেছে। দিন কতক ধরে ঘন ঘন পুলিশ আসছে পাড়ায়। রাতের বেলাতেই ওরা আসে। এর-ওর আগড়ে ধাক্কা মারে। মাঝে মাঝে অভিলাষ চৌকিদার এসে তত্ত্বতালাশ নেয়। তিলক বাউরি, বাঁশি বাউরি আর হঠাৎ মুর্মুর খোঁজ করে। সুকুমার আচার্যর হাল-হদিশ জানতে চায়। সুকুমারদের ওপর পুলিশের সর্বক্ষণের নজরটা তো রয়েছেই, ইদানীং তিলক আর হঠাতের ওপরও নজরটা পড়েছে। কারণটা পরীক্ষিত বোঝে। এ সবকিছুর মূলে রয়েছে হরবল্লভ সিংহবাবু। সে এখনও এ তল্লাটের তাবৎ মানুষকে তার প্রজা বলে মনে করে। কারোর বেয়াদপি সে সহ্য করে না। তিলকরা দিন-কতক হলো একটুখানি বেয়াদবি শুরু করেছে। সুকুমার আচার্যর সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে। রাতের বেলায় বত্রিশভাগীর জঙ্গলের মধ্যে মিটিং করছে। হরবল্লভদের কানে সবকিছুই আসে। ছোটলোকদের সাহস বাড়ছে দিন-কে-দিন। কুঁজোরা সব চিৎ হয়ে শোবার চাচ্ছে। সেদিন গোবিন মিস্তিরি মুখের ওপর শুনিয়ে দিল কড়া কড়া কথা। এসব বাড়তে দেওয়া যায় না।

অঙ্কুরেই নির্মূল করা বিধেয়। হাতির দাঁত একটিবার বেরিয়ে গেলে হাজার মুগুরের ঘা মেরেও সেঁধানো যাবেক নাই পুনরায়। কাজেই, এই তিলক বাউরি, হঠাৎ বাউরিদের ড্যানক গজাবার আগেই ছেঁটে দিতে হব্যেক। থানার সঙ্গে হরবল্লভদের চিরকালই গা ঘষাঘষি। পাইক-লেঠেলরা হার মানলে তখন থানা এসে দাঁড়ায় ওর পাশে। এবারেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি। 'এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে' হরবল্লভ এইসব সর্বনাশা কাণ্ডকারখানার খবরটা জানানো মাত্রই গোঁফে মোচড় দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন বড়বাবু। সাজো-সাজো রব উঠেছে। হরবল্লভের মতে 'দ্বিতীয় বাঁধগাবার' প্রস্তুতি চলছে চুয়ামসিনা এলাকায়। ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নেওয়া চলে না কিছুতেই। কাজেই শুরু হয়েছে নৈশ-অভিযান। সুকুমার আচার্যকে ধর। তিলক বাউরি আর হঠাৎ মুর্মুকে বাঁধো। যে কোনও মূল্যে এলাকার শান্তিপ্রিয় মানুষকে তাদের 'শান্তি' ফিরিয়ে দিতে হবে। এটা সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য।

পরীক্ষিতের ভয় করে। সে ইদানীং বিশ্বাস করে, এ তল্লাটে হরবল্লভের রোষ উদ্রেক করে কেউ টিকতে পারবে না। অতবড় বাঁধগাবা লড়াইয়ের পরিণতিটা স্বচক্ষে দেখেছে পরীক্ষিত। সুকুমার-তিলকের আয়োজন সে তুলনায় নগণ্য। হরবল্লভ আর তার পুলিশবাহিনীর সঙ্গে দু'দণ্ডও ওরা টিকতে পারবে না। ভাবতে গিয়েই মনটা খারাপ হয়ে যায় পরীক্ষিতের। ছোকরাগুলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে চাইছে। মানুষকে জাগাতে চাইছে। একদিন সেও এমনই এক অসম যুদ্ধে নেমেছিল সিংহগড়ের বিরুদ্ধে। পরীক্ষিত তো তার জীবনের বারো আনাই লড়ে গেল ইংরাজ আর সিংহগড়ের বিরুদ্ধে। তিলকদের বয়েসে বুকের মধ্যে আগুনটা যে কী তীব্র হয়ে জ্বলে, এই আটান্ন-ষাট বছর বয়েসেও তা ভালভাবেই মালুম করতে পারে পরীক্ষিত। সে এক সর্বনাশা আগুন। সেই আগুনের জ্বালায় পাহাড় থেকে শূন্যে ঝাঁপ মারতে চায় মানুষ। পরিণাম চিন্তা করে না। তাও দু'একবার ইঙ্গিতে সুকুমারদের নিরস্ত করতে চেয়েছে পরীক্ষিত বাউরি। কিন্তু ফল হয়নি কিছুই। কী করে হবে? পরীক্ষিত তো নিজেই জানে, বুকের মধ্যে ঐ আগুনটা যখন জ্বলে, তখন তার হু-হু আওয়াজে চারপাশের তাবৎ শব্দ, সতর্কবাণী চাপা পড়ে যায়। কোনও কিছুই তখন কানে ঢোকে না।

অগ্নির তরে নিশানের ভয়টা আরও বেশি। সেদিন কত্তাবাবুর ছেলের গায়ে পেত্যা ছুঁড়ে এসেছে। কথাটা শোনা ইস্তক বুকের মধ্যে কম্প শুরু হয়েছিল নিশানের। কালসাপের ল্যাজে পা দিয়ে এল মেয়া, এখন উয়াকে বাঁচাই ক্যাম্‌নে?

যেদিন ঘটনাটা ঘটাল অগ্নি, সেদিনই পরীক্ষিত ফিরেছিল ঘরে। নিশান ছেলেকে বলেছিল সবে খুলে। বলেছিল, বাঁচতে চাউ তো মেয়াকে লিয়ে সজ্জা চইলে যা সিংহগড়ে। কত্তাবাবুর পায়ের তলায় ফেলে দে উয়াকে। পরীক্ষিতেরও মনে হয়েছিল তেমনটা। আশ্চর্য, সত্যিই হরবল্লভের কাছে আত্মসমর্পণের ভাবনাটা চরে বেড়াচ্ছিল তার মতো লোকের মগজে। আসলে, বড়ই ক্লান্ত লাগে পরীক্ষিতের ইদানীং, বড়ই অবসন্ন। হতাশ। কিন্তু বাদ সেধেছিল সুকুমারের দল। বলেছিল, অগ্নি তো ঠিকই করেছে। যেমন ঠাকুরের তেমন পূজা। পরীক্ষিত ওদের প্রাণপণে বোঝাতে চেয়েছিল। সে কখন থাকে, কখন থাকে না, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। ঘরে সর্বক্ষণ বাস করে একটা যমের দুয়ারে-পা-বাড়িয়ে-থাকা-বুড়া, আর এক যোবতী মেয়া। অগ্নি কত দূর দুরান্তে খাটতে যায়। রাতে-ভিতে ফেরে। বাবুদের হাজার ছল। লক্ষ কৌশল। যদি একদিন সত্রিশভাগীর জঙ্গলের মধ্যে, কিংবা হরিণমুড়ি খালের ধারে

একলাটি পেয়ে—। তা বাদে, সে মেয়ার বুকের কলিজাটি ফের গাঙ্গুলিদের গড়ে বাঁধা রয়েছে। সিংহের থাবার তলায় রয়েছে তার আট বছরের শিশুটি। যদি কোনদিন থাবাখানি সামান্য একটু থাবড়ে দেয় তো ঐ টুকুন বাচ্চার ইতি।

ঐ নিয়ে তুমুল তর্ক বেধেছিল।

সুকুমারের দল গলা চড়িয়ে বলেছিল, তুমি না পরীক্ষিত বাউরি? তুমি না এককালে স্বদেশী করেছ, বাঁধগাবার লড়াইতে সামিল হয়েছ? জলডুবি আন্দোলন করেছ? তুমিই না একদিন তল্লাটের সব গরীবকে জোটবদ্ধ করে অষ্টমীর ভোজ খাওয়া বন্ধ করতে চেয়েছিলে?

পরীক্ষিত ওদের কথা কানেই তোলে নি। বালখিল্য ছোকরার দল, দুনিয়ার রীতি-কানুন জানতে ঢের বাকি ইয়াদ্যার।

শেষ অবধি সুকুমাররা পুরো ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়েছিল অগ্নির ওপর। অগ্নিই বল্‌ক, কী উয়ার মনের ইচ্ছা।

পরীক্ষিত বাউরি উন্মাদের মতো ফুঁসে উঠেছিল। উ কী বইল্‌বেক? উ মেয়াছেইলা। উয়ার গিয়ান-বুদ্ধি কতটুকু? আমি উয়ার বাপ বটি। উয়ার ভালামন্দর ভার আমার উপর। পরীক্ষিতের শেষ কথাটি শোনামাত্র অগ্নি থিরপলকে তাকিয়েছিল বাপের দিকে। পরীক্ষিতের দু'চোখের মণিতে বিঁধিয়ে দিয়েছিল তার পাথরের মতো স্থিরদৃষ্টি। পরীক্ষিত অস্বস্তি বোধ করেছিল।

শেষমেষ বহুকষ্টে সামাল দেওয়া গেছে পরীক্ষিতকে। অগ্নিই বেঁকে বসেছিল শেষ অবধি। পরীক্ষিত হার মেনেছিল মেয়ের জেদের কাছে। সে কিছুতেই বোঝাতে পারে নি, কাল-সাপের সঙ্গে লড়াই করাটা কী ভয়ঙ্কর এক খেলা। এ ক'দিন কত কথাই না উড়ে আসছে চতুর্দিক থেকে। অগ্নিকে নাকি পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে কোনও এক নিশিরাতে। তারপর, উয়াকে যপেরোনাস্তি ভোগ করে বিকে দিবেক রানীগঞ্জের কানাগলিতে। এমন কথা কানে এলে বাপের সারা শরীরে তো দলদল কাঁপুনি শুরু হবেই। শুনে অবধি পরীক্ষিত বাউরি বাড়িতেই রয়েছে আজ দিন সাতেক। সারাক্ষণ ভয়ে আশঙ্কায় থাকে বেচারা। রাতের বেলায় চোখের পাতনি এক দণ্ডের তরেও জোড়া লাগে না। সর্বদাই ঘরের চারপাশে, পিছ-প্যাঁদাড়ে, গাং-দিয়ালিতে ফিসফিসানি কথাবার্তা, খসখস পায়ের আওয়াজ শুনতে পায়।

ইদানীং পরীক্ষিত বাউরির চোখের পাতনি সদা-সর্বদা তির তির করে কাঁপে। মনে হয়, চোখে বালি ঢুকে স্থায়ী হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষিত বালিটাকে বের করতে চায় প্রাণপণে। সেই কারণেই অত দৌড়ে বেড়ায় মানুষটা। নিজের ঘরে বন্দী হয়ে থাকার দরুণ তার চোখের মধ্যেকার বালির কণাটি অবাধ্য হয়ে ওঠে।

কনকপ্রভার মহলে পায়েসের সৌরভ

কনকপ্রভার মহলে ঢোকার মুখেই বুদ্ধদেব গন্ধটা পেল। বেশ ভুরভুরে গন্ধ ছেড়েছে। একেবারে ম-ম করছে পুরো মহল। বুদ্ধদেব নাক দিয়ে সুগন্ধটা নিতে নিতে এগিয়ে চলে। কীসের সৌরভ এটা? বাসমতি চাল আর ছোট এলাচ, তেজপাতা দিয়ে রাঁধা পায়েসের ভুরভুরে গন্ধের মতো মাতিয়ে দিচ্ছে, সারা মহল। সুগন্ধটা, শৈশবের স্মৃতির মতো, নেশা ধরায় মনে।

—তারপর দীর্ঘদিন অনাহারে তপস্যা করিতে করিতে যখন গৌতম ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় মৃতপ্রায়, তখন সুজাতা নাম্নী এক যুবতী তাঁহার জন্য এক থালা পরমান্ন লইয়া উপস্থিত হইল। সেই পরমান্ন গ্রহণ করিয়া তরুণ তপস্বী গৌতম অতি শীঘ্র বুদ্ধদেব হইলেন।

—তাহার পরও সুজাতা বুদ্ধদেবকে নিয়মিত পরমান্ন খাওয়াইতে লাগিলেন।

—অতিরিক্ত পরমান্ন সেবনে তাঁহার শরীরখানি হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি হইয়া উঠিল।

—অবশেষে তিনি এক দিবস সুজাতাকে কহিলেন, ভদ্রে, নিত্যদিন পরমান্ন খাইতে খাইতে আমার অরুচি ধরিয়া গিয়াছে। নিরামিষ খাদ্যে আর রুচি বোধ করিতেছি না।

—সুজাতা কহিল, প্রভু, রাজার তনয় আপনি, নিত্যদিন নিরামিষ আপনার রুচিবে কেন? আজ্ঞা করুন, আপনার নিমিত্ত হরিণের মাংস লইয়া আসি।

—বুদ্ধদেব কহিলেন, হরিণের মাংস অতীব সুস্বাদু। কিন্তু তাহার জন্য তোমার অন্যত্র যাইবার আবশ্যক দেখি না। তোমার তুল্য হরিণী থাকিতে আমি অপর হরিণের মাংস কেনই বা ভক্ষণ করিতে চাহিব? অদ্য আমি তোমাকেই খাইব।

বলতে বলতে হেসে লুটিয়ে পড়ে প্রভঞ্জন আর স্বপন গাঙ্গুলির দল। ওদের 'মিতালি সংঘে'র নতুন নাটকের রিহার্সেল চলছে। অনেকক্ষণ নাটকের পার্ট রপ্ত করবার পর সামান্য বিশ্রাম পর্ব, আর ঐ ফাঁকে চলেছে নাটকের পার্ট বলবার ভঙ্গিতে এবংবিধ মস্করা।

ত্রিভঙ্গ একদিন ব্লক অফিসে এক ফাঁকে শুধিয়েছিল, 'খুবই নাকি পায়েস খাচ্ছ কনকপ্রভার গড়ে? কুন্তী নাকি রোজদিনই পায়েস খাওয়াচ্ছে তোমায়?'

বুদ্ধদেবের কানের ডগা নিঃশব্দে তেতে ওঠে।

বলে, 'তোমায় কে বলল?'

'খবর হাওয়ায় ভাসে রে ভাই।' ত্রিভঙ্গ চোখ টেপে, 'খুবই ভাল কাজ এটা, মহৎ কর্ম। তোমার মতো কাঁচা কার্তিক হলে আমি তো বিডিও সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে পোস্টিং নিতাম চুয়ামসিনায়। এবার একটা অনুরোধ, বিপ্লবটা ছেড়ে দাও। রোমান্স আর বিপ্লব একসঙ্গে হয় না, ব্রাদার। একেবারে কাবাব মে হাড্ডি। মেয়েটাকে ভাল করে গেঁথে তোল দেখি। বড্ড দেমাক মেয়েটার। একবারই সেটা হাড়েহাড়ে বুঝেছিলাম। একবার যদি গেঁথে তুলতে পার, এখনও যা রয়েছে ওদের, রাজকন্যার সঙ্গে রাজ্যলাভ হবে।'

বুদ্ধদেব বোঝে, কনকপ্রভার মহলে ওর যাতায়াত নিয়ে অনেক রসাল খবর ছড়িয়েছে হাওয়ায়। প্রভঞ্জনই খবরটা চাউর করেছে বাজারে। মূল খবরের শরীরে অনেক গয়নাগাঁটি পরিয়েছে। এমনিতে কনকপ্রভার মহল হল পাগল শিকারির কথায়, শুণুকপাহাড়ির হাট। শুণুকপাহাড়ির হাট ফি-সোমবারে বসে, আর কনকপ্রভার মহলের হাটটি রোজদিন বসে। আর, হাটের মধ্যে টুঁ—কইরে পাদলেও মুখে মুখে সে আওয়াজ বাড়তে বাড়তে গগনবিদারী হয়ে ওঠে, তেমনি, কনকপ্রভার মহলে কোথাও সামান্য কথার সৃষ্টি হলেই তা তিল থেকে তাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। ঐ মহলে যাদের আনাগোনা, ওঠাবসা, তাদের অধিকাংশই মহলের মধ্যে আম খেয়ে, আঁটিখানা বাইরে ফেলতেই অভ্যস্ত। কনকপ্রভার টাকায় কনুই ডুবিয়ে ভোগ করে, আবার বাইরে এসে সেই কেচ্ছার কথা রসিয়ে রসিয়ে বলে বেড়ায়। তবে, বুদ্ধদেবের ধারণা, কনকপ্রভার মহলে তার যাতায়াতের কথাটা নিকুঞ্জপতি মারফত রতিকান্তর হাত ঘুরে প্রভঞ্জনদের কাছে পৌঁছেছে।

কনকপ্রভার মহলে বুদ্ধদেবের আনাগোনাটা যে ইদানীং খুব বেড়েছে, এটা অবশ্য মিথ্যে নয়। দীপমালার অনুরোধে বুদ্ধদেব মাঝে মধ্যে গিয়ে ওদের খোঁজ খবর নিয়ে আসছিল। আচমকা একদিন কনকপ্রভা ঐ প্রস্তাবটা দিলেন। কনকপ্রভার দিক থেকে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে এল প্রস্তাবটা। দীপমালা অবশ্য পরে শুনে একটুও অবাক হননি। বরং খুব আত্মবিশ্বাস সহকারে বলেছিলেন, আমিও এমনই কিছু একটা আশা করেছিলাম। মেয়েটা মাঝে মাঝেই ইদানীং বলছিল কথাটা, 'তেমন সুবিধে পেইলে আবার শুরু কইর্‌তে ইচ্ছা করে মাসি।' কুন্তী প্রায়ই বলছিল।

'তোমাকে একটা অনুরোধ করব, ভাবছিলাম ক'দিন।' আচমকা কথাগুলো উচ্চারণ করলেন কনকপ্রভা।

ঘন ক্ষীরের পায়েস, খুব তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল বুদ্ধদেব। সামান্য তফাতে বসেছিল কুন্তী। পায়েস থেকে মুখ তোলে বুদ্ধদেব। তাকায়।

'কুন্তীটাকে একটুখানি পড়িয়ে দেবে?'

বুদ্ধদেব আচমকা বিষম খায়। সামলে নেয় বহুকষ্টে। কুন্তী জলের গেলাস এগিয়ে ধরে সুমুখে।

কনকপ্রভা কথা বলেন অলস হাতে সুপুরি কুচোনোর ভঙ্গিতে। বলেন, 'কুন্তীর খুব ইচ্ছে, প্রাইভেটে স্কুল-ফাইন্যালটা দেয়। লোখেশোলের স্কুল থেকে এইট অবধি পড়ে, বসে রয়েছে বাড়িতে। এখন মেয়ের ইচ্ছে হয়েছে, পড়বে।'

বুদ্ধদেব বিস্ময়টাকে একটু একটু করে সমে ফেরায়। ধাতস্থ হওয়ার পর কুন্তীর সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জেনে নেয়।

কুন্তী ক্লাস এইটে পাশ করবার পর, দীপমালার ইচ্ছে ছিল ওকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেন বিষ্টুপুর হাইস্কুলে। নিজের কাছেই রাখতে চেয়েছিলেন ওকে। কিন্তু সাত-পাঁচ ভেবে নিজেই পিছিয়ে যান। চুয়ামসিনার এই বিশাল গড়ে কনকপ্রভার নিজে বলতে কেবল কুন্তীই। ও চলে গেলে একেবারেই একা হয়ে যাবেন কনকপ্রভা। দীপমালার ইচ্ছে, চুয়ামসিনার সবকিছু বেচে দিয়ে বিষ্ণুপুরে চলে আসুন কনকপ্রভা। ঐ গণ্ডগ্রামের মধ্যে একাএকা দুটি মেয়ের থাকাটা মোটেই নিরাপদ নয়। হরবল্লভরা নানাভাবে শত্রুতা করে চলেছে। এলাকার সুযোগসন্ধানী, ধান্দাবাজ লোকেরা নানা অছিলায় ওঁদের নিঃশব্দে চুষছে। দীপমালার পক্ষে রোজ রোজ গিয়ে সে সব ঠেকানো সম্ভব নয়। বিষ্ণুপুরে বসবাস করলে দীপমালা ওঁদের বেশি করে দেখাশোনা করতে পারবেন। কিন্তু সব কিছুতে বাদ সাধছেন কনকপ্রভা নিজেই। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তিনি চুয়ামসিনা ছাড়তে একেবারেই নারাজ। অথচ, পাশের গড়ে হরবল্লভরা একটু একটু করে শহরের দিকে এগোচ্ছেন। বিষ্ণুপুরের হাজরাপাড়ায় ইতিমধ্যেই বানিয়ে ফেলেছেন দোতলা বাড়ি। উমা আর দেবিদাস ঐ বাড়িতে থেকে শহরের ইস্কুলে পড়াশুনো করে। রান্নাবান্না, কাজকর্মের জন্য পাকাপাকিভাবে লোক রাখা হয়েছে সেখানে। অরুন্ধতীও গিয়ে থাকেন, মাসের মধ্যে আট-দশদিন। শুধু হরবল্লভই নন, চারপাশের সম্পন্ন মানুষেরা দ্রুত শহরমুখী হচ্ছে। গ্রামে ক্ষেত-খামার অটুট রেখে, শহরেও একখানা বিকল্প বাসস্থান গড়ে তুলছে প্রায় সবাই। অনেকেই তো গাঁয়ের জমি-জায়গা কমিয়ে আনছে। তার বদলে শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা ঢালা শুরু করেছে। দূরদর্শী মানুষেরা আগামী দিনের কথা ভেবে আখের গুছোচ্ছে নিঃশব্দে। কেবল কনকপ্রভার মতো কিছু অপরিণামদর্শী মানুষ এখনও অবধি গ্রামের নেশায় বুঁদ।

সেই সন্ধ্যায়, সেই কায়মনোবাক্যে পায়েস খাওয়ার মুহূর্তে অনুরোধটা জানিয়েই কনকপ্রভা নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকেন বুদ্ধদেবের মুখের দিকে। বুদ্ধদেব কী জবাব দেবে ভেবে পায় না। এক ঝলক নজর ফেলে কুন্তীর মুখের ওপর। ওর মনে হয়, কুন্তীও মনে মনে কামনা করছে, বুদ্ধদেব ওকে পড়াক।

সেদিন তাৎক্ষণিকভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি বুদ্ধদেব। বলেছিল, 'আমি একটুখানি ভেবে দেখি।'

কিন্তু খুব বেশি ভেবে দেখবার আর উপায় রইল না। বারবার অনুনয় ঝরে পড়ল দীপমালার গলা থেকে, 'বলছেন যখন পড়াও। একজন পড়তে চাইছে, তুমি পড়াবে না?' কাজেই, একরকম বাধ্য হয়েই বুদ্ধদেব শুরু করেছিল। অনেক দিন যাবৎ পড়াশোনার সঙ্গে কুন্তীর সম্পর্ক না থাকায় অনেক বিষয়ে নতুন করে শুরু করতে হয়েছিল বুদ্ধদেবকে। ফলে কনকপ্রভার মহলে আনাগোনাটা নিজের অজান্তেই বেড়ে গেল। বুদ্ধদেব যে কুন্তীকে পড়াচ্ছে এ খবর মল্লিকা অবধি পৌঁছে গিয়েছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। দু'একজন মানুষ-মাছি তা তৎক্ষণাৎ মুখে করে বয়ে নিয়ে উড়ে গিয়েছিল বিষ্টুপুরের দিকে। পায়েস খাওয়ার খবর আগেই পৌঁছেছিল, তখন থেকে একটু একটু করে গম্ভীর হচ্ছিল মল্লিকা, ভাল করে কথা বলত না বুদ্ধদেবের সঙ্গে। পড়াবার খবরটা পাওয়ামাত্র বাক্যালাপ পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। এবং কিছু একটা আন্দাজ করেই স্বদেশ কুণ্ডুর বেশভুষায় পুনরায় ফিরে এল পুরোনো দিনের জৌলুষ। কনকপ্রভার মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াবার ফলে বুদ্ধদেবের জীবনে ক্ষতি হয়েছে অনেকখানি, কিন্তু লাভ যে একেবারেই হয়নি তাও নয়। কনকপ্রভার মহল থেকে যেটুকু লাভ হয়েছে তার, সেগুলি তার জীবনে কম সঞ্চয় নয়। একটা নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছিল বুদ্ধদেব, এই জগতটাকে সে বাস্তবিকই চিনত না।

পায়েসের মতো ভুরভুরে গন্ধটা নিতে নিতে এগিয়ে চলে বুদ্ধদেব এবং সিং-দরজা অতিক্রম করবামাত্র সে গন্ধটাকে অল্প অল্প চিনতে পারে। এ মহলে আবার লক্ষ্মীর আগমন ঘটতে চলেছে। এ তারই সৌরভ। ছড়িয়ে পড়েছে সারা মহল জুড়ে।

সিং-দরজায় ঢোকার আগেই তিনতলার ছাদে চোখ চারিয়েছিল বুদ্ধদেব। এটা তার ইদানীং কালের অভ্যেস। ইদানীং বিকেল নাগাদ কুন্তী এসে দাঁড়ায় তিনতলার ছাদে। বুদ্ধদেবের সঙ্গে চোখাচোখি হলে হাসে। আজ কুন্তী নেই ছাদে। তার বদলে, বুদ্ধদেব দেখতে পায়, রাশি রাশি দামি পোশাক-আশাক লম্বা দড়িতে ঝুলে শুকোচ্ছে। তার মধ্যে কুন্তীর বেনারসী এবং কনকপ্রভার গরদ মিলে দশ-বারোখানা। এছাড়া শায়া, ব্লাউজ তো রয়েছেই। কিন্তু যা দেখে বুদ্ধদেব কিঞ্চিৎ বিস্ময় বোধ করে, এই রাশি রাশি পোশাক-আশাকের মধ্যে কয়েকখানা শালও রয়েছে। অকস্মাৎ এতগুলি পোশাক এই ঘোর বৈশাখে রোদ্দুরে দেওয়ার উপলক্ষটি কী হতে পারে, সেটাই তাকে মহাভাবনায় ফেলে দেয়।

সিং-দরজা পেরিয়ে বিশাল উঠোনের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেই দোতলায় কুন্তীকে দেখতে পায় বুদ্ধদেব। কুন্তী ঠোঁট টিপে হাসছিল। ইঙ্গিতে বুদ্ধদেবকে সোজা দোতলায় চলে আসার নির্দেশ দেয়।

দোতলায় পৌঁছে যে সামগ্রীগুলির ওপর প্রথমেই বুদ্ধদেবের চোখদুটি আটকে যায়, তা হল, তিনচারখানা বড় সাইজের টিনের তোরঙ্গ। তোরঙ্গগুলিকে বুদ্ধদেব চেনে। ওগুলো

সাধারণত দোতলার একেবারে কোণের ঘরে ডাঁই করে রাখা থাকে। কনকপ্রভা যখন পর্যটনে বেরোন তখনই ওগুলোকে বের করা হয়। সেই মুহূর্ত থেকে বুদ্ধদেব গন্ধটা বেশি করে পেতে শুরু করে। কনকপ্রভা সদলবলে আবার কোথাও বেরোচ্ছেন। এবং গন্ধটাকে অনুসরণ করতে করতে বুদ্ধদেব পৌঁছে যায় একটি আশঙ্কার জায়গায়, কনকপ্রভা খুব শিগ্‌গিরই আবার জমি বেচতে চলেছেন।

গত কার্তিক থেকে কনকপ্রভা তিন-চার কিস্তিতে জমি বেচেছেন। বৃন্দাবনে রাস উৎসব দেখতে গেলেন কার্তিকে। হোলি-উৎসব দেখতে গেলেন ফাগুনে। প্রতি বারেই পর্যটনের খরচ বাবদ বেচে দিয়েছেন দু'চাকের মোট বিঘা বিশেক জমি। এ ছাড়া এই বিশাল এস্টেটের রাজকীয় খরচ মেটাতেও জমি বেচেছেন বার-দুই। সহসা দীপমালার মুখখানা ভেসে ওঠে। এদের প্রসঙ্গ উঠলেই আজও দীপমালার চোখ ছলোছলো হয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায় দীপমালার শেষ অনুনয়, পরিবারটিকে তুমি বাঁচাও, বুদ্ধ। প্রিয়ব্রতর কথা মাথায় রেখে শেষ চেষ্টাটা অন্তত কব তুমি।

কুন্তী এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। বুদ্ধদেব কুন্তীর চোখে চোখ রাখে।

বলে, 'এসব কী? তোরঙ্গ বেরিয়েছে, কাপড় রোদ্দুরে দিয়েছ —, কেন?'

কুন্তী লাজবতী তাকায়, 'আমরা বাইরে যাচ্ছি।'

এটা আগেই আশঙ্কা করেছিল বুদ্ধদেব। তার সারা মুখে জমে ওঠে অপ্রসন্নতার মেঘ। বলে, 'কোথায়?'

'দার্জিলিং। সেখান থেকে—।' কুন্তী কথা শেষ করবার আগেই কনকপ্রভা আসেন। কুন্তী মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'দাজির্লিং থেকে আমরা কোথায় কোথায় যেন যাব মা?'

কনকপ্রভা মেয়ের দিকে তাকিয়ে কপট ভর্ৎসনা করেন, 'ছেলেটা আসার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিস্তি দিতে বসেছ? যা, গিরিবালাকে বুদ্ধর জন্য শরবৎ বানাতে বল্। বড্ড গরম পড়েছে।'

কুন্তী ছুটতে ছুটতে চলে যায়। কনকপ্রভা নক্সাকাটা চেয়ারে বসেন। বুদ্ধদেবকে বলেন, 'বোসো বাবা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

বুদ্ধদেব বসে।

'দার্জিলিং যাচ্ছেন?' বুদ্ধদেব সরাসরি প্রসঙ্গে চলে আসে।

'ভাবছি একবার ঘুরে আসি। মেয়েটা ক'দিন ধরে বড্ড লাফাচ্ছে।'

বলতে বলতে গিরিবালাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে কুন্তী।

এবং বুদ্ধদেব লক্ষ্য করে, কনকপ্রভা এবং কুন্তীর সারা মুখে উড়ন্ত পাখির উচ্ছ্বাস। আকাশে মেলে দেওয়া ডানায় রোদ্দুর মাখবার সাধ।

বুদ্ধদেব কথা বলে না। ধীরেসুস্থে শরবত খায়।

এক সময় বলে, 'একটা কথা বলতে চাই, যদি অনুমতি দেন।'

কনকপ্রভার মুখ দেখে বোঝা যায়, বুদ্ধদেব কী বলতে চাইছে সেটা তাঁর অজানা নেই।

খুব সুন্দর করে হেসে বলেন, 'বল না, সঙ্কোচ করছ কেন?'

'দার্জিলিং যে যাবেন, খরচ আসবে কোত্থেকে? নিশ্চয়ই এবারেও কিছু জমি বিক্রি করতে চলেছেন?'

কনকপ্রভা খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বুদ্ধদেবের সোজা প্রশ্নে সামান্য থতমত খান। নিজেকে সামান্য গুছিয়ে নিয়ে বলেন, 'ধরেছ তুমি ঠিকই। আসলে, ঐ যে কপালভাতির

একখানা চাক রয়েছে কোথায় যেন, আমি বাবা ওসব জানিই না, আমাদের কোন্ জমি যে কোন্ দিকে..., তো নিকুঞ্জপতি বলছিল, জমিটা নাকি সেই কোন্ তেপান্তরে। চাষবাসও নাকি ভাল হয় না। তো, ভাবলাম, কী লাভ এমন জমিন রেখে—।' কথাটা শেষ অবধি অসমাপ্ত রেখেই থেমে যান কনকপ্রভা। বুদ্ধদেবের চোখেমুখে কাঠিন্য বেড়ে যাচ্ছে দেখে আরও অস্বস্তিতে পড়ে যান তিনি।

অনেকক্ষণ গম্ভীর মুখে বসে থাকে বুদ্ধদেব। একসময় বলে, 'আমার মনে হয়, এভাবে জমি বেচে দেশ-বেড়ানো বন্ধ করা উচিত। এবং—।' বুদ্ধদেব একটুখানি সময় নেয়। এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে কনকপ্রভার প্রতিক্রিয়াটা দেখে নেয়, 'এবং লোকজনের সংখ্যাও কিছু কমিয়ে ফেলা উচিত।'

কনকপ্রভা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন বুদ্ধদেবের দিকে। বলতে গেলে কোনই সম্পর্ক নেই, বয়েসে সাত ছোট, ধনে-মানে-আভিজাত্যে একাসনে বসবার যোগ্যই নয়, এমন একটা ছেলের গলা চিরে বেরিয়ে এল একেবারে অভিভাবকতুল্য নিষেধাজ্ঞা, কনকপ্রভা বুঝি মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে যান। বুদ্ধদেব দেখতে পায় কনকপ্রভার দু'চোখ থেকে বিস্ময় ঠিকরে পড়ছে।

সেদিন বুদ্ধদেব আর কোনও কথাই বলে নি। উঠে দাঁড়িয়ে সটান চলে এসেছিল। কিন্তু যতক্ষণ না সে কনকপ্রভার মহল থেকে বাইরে আসে, সারাক্ষণ কনকপ্রভার বিস্ময়ঝরানো দৃষ্টি তাকে পেছন থেকে অনুসরণ করেছিল। পেছন না ফিরেও সেটা বুঝতে পারছিল বুদ্ধদেব। সাধারণত বুদ্ধদেব ঐ মহল থেকে চলে আসবার সময় কুন্তী এসে দোতলার বারান্দায় দাঁড়ায়। একবারের তরেও পিছনে না তাকাবার দরুন বুদ্ধদেব বুঝতে পারে নি ঐ বিকেলে কুন্তী যথারীতি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল কিনা।

দিনকয় বাদে দীপমালা এলেন কনকপ্রভার মহলে। বুদ্ধদেব তাঁকে অনুপুঙ্খ বলে এসেছিল। আগে থেকে বলে রেখেছিলেন দীপমালা, তাই যথাসময়ে বুদ্ধদেবও হাজির হয়েছিল কনকপ্রভার মহলে।

তারপর, সারা বিকেল অনেক কথাবার্তা, যুক্তি-তর্ক, রশি টানাটানির পর বহুকষ্টে সে যাত্রা নিরস্ত করা গিয়েছিল কনকপ্রভাকে। কপালভাতির বারো বিঘে জমি সে যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিল রতিকান্ত ও নিকুঞ্জপতির লোলুপ দৃষ্টি থেকে।

নিকুঞ্জপতি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খবরটা পেয়ে গিয়েছিল। রতিকান্ত পেল দিন দুই বাদে। এবং রতিকান্ত মারফৎ হরবল্লভও।

সৎমানুষের সঙ্গে কেঁদগাছের তফাৎ

বিডিও সাহেব বলেছিলেন, 'তোমারে আমি ম্যাডেল দিমু।'

বুদ্ধদেব চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করেছিল। গ্রহণ না করবার কোনও হেতু ছিল না। এলাকার সব মানুষই দেখেছে, কেমন করে কাজটা শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে গেল।

পরের হপ্তায় স্কীমটা মাপজোক করতে যাবে বলেছিল করালী সোম। ব্লকে পা দিয়েই বুদ্ধদেব খবর পেল, গেল-রোববার, ছুটির দিনে গিয়ে মেপে এসেছে। স্কীমের রিপোর্ট দেওয়ার পাশাপাশি আরও কিঞ্চিৎ আগুন যে উগরে দিয়েছে বিডিও সাহেবের সামনে, সেটা ভবানীর মন্তব্য শুনেই বুঝতে পারে বুদ্ধদেব। এবং পরে, বিডিও সাহেবের কথায়। তোমারে আমি ম্যাডেল দিমু।

ওকে দেখেই চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে অকারণে দোল খেতে শুরু করেন বিডিও সাহেব।

'কই বুদ্ধ, তুমি সেদিন কইলা, গামিরতলার ইস্কিমে চুরি হইসে, করালী তো ম্যাজারম্যান্ট কর্‌সে, ঠিকই তো আসে।'

বুদ্ধদেবের কানজোড়া সহসা গরম হয়ে উঠেছিল। সত্যিই জেগে জেগে ঘুমোয় লোকটা। এ ঘুম ভাঙে না।

বলে, 'আমি না হয় ভুল বলেছি। এলাকার মানুষজনকে জিজ্ঞেস করুন না। তারা তো সবাই রাগে ফুঁসছে।'

থমথমে হয়ে ওঠে বিডিও সাহেবের মুখ। পরক্ষণে খুব নাটকীয় গলায় বলে ওঠেন, 'বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ কইসেন, লোক নয় পোক। পোকার সঙ্গে তুমিও নাইচো না।'

'আমি না হয় না নাচলাম। কিন্তু হাজার কয়েক পোকা যদি নাচতে নাচতে ব্লক অফিসে হাজির হয়?'

বিডিও সাহেব পলকহীন তাকিয়ে থাকেন বুদ্ধদেবের মুখের দিকে। পাথরের মতো কঠিন হয়ে ওঠে মুখ।

সহসা নড়ে চড়ে বসেন তিনি। এক খিলি পান মুখে পুরতে পুরতে মুখমণ্ডলের পেশী স্বাভাবিক করে নেন।

বলেন, 'বেশ। হাজার-কয় লোকের দরকার নাই। তুমি পাঁচটা লোক এই ইস্যুতে লইয়া আস তো। করালীরে আমি সাসপেণ্ড করুম। ন্যাতা, কমরেড, ঐ, যে ক'জনার সঙ্গে তোমার ওঠবোস, ওগো চল্‌ব না। এক্কেরে সাধারণ মানুষ, যারে কয় কমন-পিপুল। লইয়া আস দেহি পাঁচ পিস।' তারপরেই ঘোষণা করলেন বিডিও সাহেব, 'তোমারে আমি ম্যাডেল দিমু।'

'বেশ, তাই আনব। দু'দিনের মধ্যেই।'

উঠে দাঁড়ায় বুদ্ধদেব। পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসতেই দেখে, করালী সোম দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথরের মতো। বুদ্ধদেবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মিষ্টি করে হাসে, 'ভাল আছ তো?' রাগে রি-রি করে ওঠে বুদ্ধদেবের সর্বাঙ্গ। এর যথাযোগ্য জবাব দেবে, এমন প্রতিজ্ঞা করে বসে মনে মনে।

কিন্তু না, পারে নি বুদ্ধদেব। বিডিও সাহেব সেদিন গামিরতলা স্কীমের চুরি নিয়ে যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, তা গ্রহণ করলেও জিততে পারে নি। এলাকায় গিয়ে অনেকের কাছেই প্রস্তাবটা রেখেছিল বুদ্ধদেব। কী গো রাস্তার কাজটা কেমন হল? তোমরা সন্তুষ্ট? কেউ বলেছে, ইট্যা একটা কাজ রামসেবকবাবু? ইয়ারে কাজ কয়? বলেছে, আড়াই হাজার লেবারের কাজ করবার কথা? হায় ভগবান, আটশোও পারায় নাই, হলফ কইর‍্যো কইতে পারি। কেউ বলেছে, সরকারি ইস্কিমে চুরি হবেক্‌ই, দুধে জল মিশাবেকই গোয়ালা, কিন্তু এ একটা কাজ হইল্যাক? এযে জলের সাথ দুধ মিশানো। কেউ প্রবল অভিমানে বলেছে, সরকারি কাজ, যেমনটি হবার তেমনটি হয়েছে। এ তো আমাদ্যার হক লয়। আমরা ত, বটে, ট্যাক্সো দিই না। সরকার ত দয়া পরবশ হইয়ে ভিখ দিচ্ছে আমাদ্যারকে। ভিখের চাল, তার আবার কাঁড়া-আঁকাড়া! কেউ বা বলেছে, কপাল কইরে আসতে হয় রামসেবকবাবু, কপাল বিনা উসব হয় না। স্বাধীনতাব আগে, যখন জমিদারি ছিল, তখন একভাবে লুইটেছে,

স্বাধীনতার পর জমিদারি গেল, ইখন অন্যভাবে লুইট্‌ছে। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি, উয়াদ্যার কুনো ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই। বুদ্ধদেব বলেছে, তোমাদের ট্যাক্সের টাকা এমন নয়ছয় হচ্ছে, তোমাদের রাগ হচ্ছে না? রাগ হলেই বা কী বটে? কাষ্ঠহাসি হাসে মানুষগুলো, লিজের ঘরে গিয়ে দু'মুঠা ভাত বেশি খেয়ে লিব রাগের চোটে। আর, কীই বা কইর্‌বার আছে আমাদ্যার? আমাদ্যার কথা শুনবার মানুষ আছে এ দুনিয়ায়? আছে। চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বলে উঠেছিল বুদ্ধদেব। বিডিও সাহেব তোমাদের ডেকেছেন। তোমাদের কথা শুনতে চেয়েছেন। আমাদের ডেকেছেন? মানে আমাকে? সহসা যেন হুঁশ হয় মানুষটার। কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তার অবস্থান বুঝতে চারপাশটা দেখে নেয়। এই দ্যাখ দিখি, আপনার সাথ গল্প মাইর্‌তে গিয়ে আমার না অন্ধকারে থাইক্‌তে হয় আজ। কেন? আরে, ঘরে এক ফোঁটা কেরাসিন নাই। রাসবিহারী তুঙ্গ বলেছে, জলদি, জলদি গেলে টুকচান দিবেক। বলতে বলতে হনহনিয়ে হাঁটা দেয় মানুষটি। কেউ বা, অই দ্যাখুন, আপনার সাথ গল্প কইর্‌ছি, গরুটা যে আমার এতক্ষণ কদ্দুরে গেল্যাক। গরুটাকে সকাল থিকে খুঁইজে পাচ্ছি নাই। সারা সকাল খুঁইজেছি। ইস, আমার যে মাঝে মাঝে কী হয়! তাড়া খাওয়া গরুর গতিতে দৌড়য় লোকটি। দিন দুয়েকের মধ্যেই বুদ্ধদেব বুঝে যায়, বিডিও সাহেবের কাছে একজনও যেতে রাজি নয়। শুধু তাই নয়, বুদ্ধদেবের প্রস্তাবে, চাপাচাপিতে, কেমন ভয় পেয়ে গেছে মানুষগুলো। এলাকায় এত মানুষ থাকতে কেন যে তাকেই হরবল্লভের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য নির্বাচিত করল বুদ্ধদেব, তাই ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে ওরা। বুদ্ধদেবকে স্পষ্টতই এড়িয়ে চলে এখন। মিঠা মিঠা কথা বলে কৌশলে বংশদণ্ডটি দিতে চাইছে লোকটা, কায়দা করে হরবল্লভের সঙ্গে লড়িয়ে দিতে চাইছে, এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে বুদ্ধদেবের প্রতি শত্রুভাবাপন্নও হয়ে উঠেছে কেউ কেউ। শালা, জলে বাস কইর‍্যে কুমীরের সাথ কাইজ্যা করে কেউ? রামসেবকটা আমাদ্যারকে উজবুক ঠাওরেছে।

শুধু ওই ঘটনাই নয়, পরবর্তী অনেক ঘটনায় বুদ্ধদেবের তিলতিল ধারণা হয়েছে, এলাকায় কিছু কিছু সৎ মানুষ রয়েছে। ভাল মানুষ। কিন্তু তারা নির্বিরোধ। ভীতু। পলাতক। টিলিয়ে ক্যাঁগলাশ গায়ে তুলতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। বদ লোকেরা যতখানি সংগঠিত, তাদের মধ্যে তলে তলে যতখানি ঐক্য, এদের মধ্যে তার তিলমাত্র নেই। ওরা ঝুট-ঝামেলা পরিহার করে চলতে চায়। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা—নীতিতে আজীবন বিশ্বাসী। দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার নিয়ে এদের আক্ষেপের সীমা-পরিসীমা নেই, কিন্তু সেই দুর্নীতি রোধ করতে তিলমাত্র উদ্যোগ নেই এদের মধ্যে। এরা হরিণমুড়ির পাড়ের ঠুঁটো কেঁদ গাছটার মতোই নিঃসঙ্গ এবং নিষ্ক্রিয়।

ওদিকে হরবল্লভ সিংহবাবুর কাছে অব্যর্থভাবে পৌঁছে যায় কথাটা। রামসেবকবাবু আপনার বিরুদ্ধে লোক ক্ষেপাচ্ছে। তখন থেকেই মনে মনে ফুঁসছেন হরবল্লভ। তখন থেকেই ওকে প্যাঁচে ফেলবার ঘুঁটি সাজাচ্ছেন।

পাগল শিকারি মাঝে মাঝেই একটা কথা বলে।

বলে, 'গরীবের আইজ্ঞা বাপের ঠিক নাই। শালারা যে পায়ের লাথ খায়, সেই পা' দুটি আঁকড়াই ধরে।

আরো অনেক কথাই বলে পাগল শিকারি। গরীবরা তার মতে কাদার খুঁটি। যেদিকে টান পড়ে, সেদিকেই হেলে পড়ে। চোদ্দপুরুষ মরে আছে, তবুও তাদের মৃত্যুভয় যায় না। ঐ

ভয়েই কেঁচো। বোবা। দাস। তারা কোনও কিছু দীর্ঘ সময় আঁকড়ে থাকতে পারে না। তারা শপথ নিতে পারে না, নিলেও তা রাখতে পারে না। তারা কোনও বিষয়ে এক হতে পারে না, হলেও সে একতা ধরে রাখতে পারে না! সবচেয়ে বড় কথা, তারা নিজেদের ভাল-মন্দটাই তেমন করে বোঝে না। বলে, আমি লিজেও তেমনই এক বোকচন্দর। এসব হল পাগল শিকারির অভিজ্ঞতালব্ধ তত্ত্ব। ঐ নিয়ে সারাক্ষণ গাল পাড়ে স্বজাতিদের উদ্দেশ্যে। আবার ক্ষণে ক্ষণে ওকালতিও করে ওদের সপক্ষে। বলে, কী কইর্‌বেক, আইজ্ঞা। পেটের জ্বালা বড়ই জ্বালা। যে জানে, সে জানে। ভাল-খ্যারাপ, ইহকাল-পরকাল সবই ভুলাঁই দেয়।

গ্রামসেবকদের বৈঠক শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ এলোমেলো আলোচনা। তারই মধ্যে বিডিও সাহেব আচমকা শুধিয়ে বসেন কথাটা।

'কি বুদ্ধ, তুমি যে গামিরতলা ইস্কিমে চুরির ব্যাপারে লোক আন্‌বা কইসিলা? কই?'

বুদ্ধদেব মাটির সঙ্গে মিশে যায়। তাও কোনও গতিকে বলে, 'ওরা কেউ হরবল্লভবাবুর ভয়ে আসতে চাইছে না স্যর।'

'হুম,' বিডিও সাহেব চেয়ারের গায়ে এলিয়ে পড়েন। চোখে-মুখে দুনিয়ার বিস্ময় ফুটিয়ে বলেন, 'তবে যে কইসিলা সবাই ফুঁসত্যাছে!'

মেঝের দিকে মুখ নামায় বুদ্ধদেব।

ঝকঝক করছিল বিডিও সাহেবের চোখমুখ। প্রায় জেরা করবার ভঙ্গিতে বলেন, 'রাস্তাটা কার লগে? বল?'

'ওদের জন্যই তো।'

'তো, যাদের লগে রাস্তা উয়াদ্যার হুঁশ নাই, সামনে আইসিয়া কমপ্ল্যান করবার চায় না, এদিগে তুমি দুনিয়াশুদ্ধ মাইন্‌ষের এনিমি হয়্যা যাচ্ছ। বলে, যার বিয়া তার মনে নাই, পারা-পরশির ঘুম নাই।'

বুদ্ধদেব বোঝে, আজ বিডিও সাহেবেরই কথা বলবার দিন।

অফিস থেকে বেরিয়ে আসছিল বুদ্ধদেব। পেছন থেকে মল্লিকা ডাকে।

পাশটিতে এসে বলে, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'কি কথা?'

'এখানে বলা যাবে না। চল অন্য কোথাও বসি।'

'কোথায়?'

মল্লিকা সামান্য সময় ভাবে। বলে, 'চল, দীপাদির বাসায় যাই, অনেকদিন যাইনি।'

মল্লিকাকে খুব বিষণ্ণ লাগছে। কোনও বিষয়ে খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছে সে।

এবং বুদ্ধদেবের সঙ্গে কতদিন বাদে কথা বলল মল্লিকা!

দীপমালার বাড়ির উদ্দেশ্যে দু'পা এগিয়েই থমকে দাঁড়ায় মল্লিকা। বলে, 'দীপাদির বাড়িতে নয়, অনেক লোকজন আসছে ইদানীং ওঁর কাছে। চল, বাড়িতেই যাই। বলতে বলতে দু'চোখের ভারি মণিদুটি বুদ্ধদেবের মুখের দিকে তুলে ধরে মল্লিকা, 'তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে তো?'

বুদ্ধদেব বোঝে, গভীর অভিমান থেকেই এমনটা বলছে মল্লিকা। বুদ্ধদেব আস্তে আস্তে মল্লিকার হাতে হাত রাখে।

সেদিন মল্লিকা বুদ্ধদেবকে নিয়ে চলে গিয়েছিল নিজেদের বাড়িতে। একান্তে জানিয়েছিল খবরটা। তার থেকেই বুদ্ধদেব আন্দাজ করে নিতে পেরেছিল হরবল্লভের রোষ এবং প্রতিহিংসার ধরন। দিন কয়েক আগে ব্লক অফিসে এসেছিলেন হরবল্লভ। বিডিও সাহেবের সঙ্গে বুদ্ধদেব সম্পর্কে অতি একান্তে অনেক কথাই হয়েছিল তাঁর। হরবল্লভ ঠিক বাঁশমুগরা সাপের মতো হিসহিসিয়ে উঠেছিলেন। আমার গায়ে সিংহবাবু বংশের রক্ত। বেয়াড়া মানুষকে জব্দ কইর্‌বাব হাজার বুদ্ধি আমার মগজে মজুত। দু'একটা খুন-খ্যারাবিও সিংহবাবুবংশের লোকের কাছে জল-ভাত। সাফ সাফ বলে দিচ্ছি, ছগরাকে একদিন খতম করাঁই দুবো আমি। জঙ্গলে লাশ ফেলে দিলে সারা জনমেও কেউ হদিশ পাবেক নাই উয়ার। শুনতে শুনতে শক্ত হয়ে উঠেছিল বিডিও সাহেবের মুখ। খুব চাপা গলায় বলেছিলেন, খবর্দার। অমন কথাডা আর দ্বিতীয় বার য্যান না শুনি। পোলার গায়ে যেন কুটার আঁচর না পড়ে। হরবল্লভ বুঝি বিস্মিত হয়েছিলেন সেদিন। বুদ্ধদেবেব ওপর তো বিডিও সাহেব বিরক্ত। ওর গায়ে কুটাব আঁচড় পড়াতে ওঁর তবে এত আপত্তি কেন? বিডিও সাহেবই ধন্দ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন হরবল্লভকে। বলেছিলেন, শোনেন মশায়, আমি অর্ কন্ট্রোলিং অফিসার। পানিসমেন্ট দিতে হলে আমি দিমু। আমারই হক সিট্যা। অরে পানিশমেন্ট দিবার রাইট আপনার নাই গা। শুনতে শুনতে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল হরবল্লভের। বলেছিলেন, ছগবাব তরে তলেতলে ভারি দরদ তো আপনাব! বিডিও সাহেব খুব শীতল চোখে তাকিযেছিলেন হরবল্লভেব দিকে। খুব নিরুত্তাপ গলায় বলেছিলেন, দরদের প্রশ্ন নয়, প্রিন্‌সিপুলের প্রশ্ন হেটা। এরে কয়, প্রোফেশন্যাল কোড অফ্ কনডাক্ট। আপনি বুঝবেন না।

সেদিন অনেকক্ষণ ধরে বিডিও সাহেব ব্যাপাবটা বুঝিয়েছিলেন হরবল্লভকে। সরকারি কর্মচাবী, তা সে যেই হোক, যেমনই হোক, তার গায়ে হাত দিলে, খোদ গভর্নমেন্টকেই মাবা হয়। কারণ, সে রাজপুরুষ। রাজার লোক। কাকে মাবা হল, কেউ দেখবে না। সবাই জানবে, রাজপুরুষ পাবলিকের হাতে মার খাইসে। তাছাড়া, এখন যিনি ডি-এম রইসেন, ভারি কড়া। কারুকেই স্পিয়ার কবেন না তিনি।

শেষ পর্বে হরবল্লভকে প্রবোধ দিয়েছিলেন বিডিও সাহেব, ছগরা, বাপের হুটেলে খাইত, উইরা বেরাইত, কাণ্ডজ্ঞান কিঞ্চিৎ কম। দু'চারড়া ধাক্কা খাইলে—।

—কিন্তু সে ধাক্কা দিবেন কবে? উদিগে যে আমার মান লিয়ে টানাটানি।

—মানী লোকেব মান অত জলদি যায় না মশায়। বিডিও সাহেব মিষ্টি হাসেন, ঠিক সময়ে অবে ধরবো। অসময়ে ফলে না বৃক্ষ, সময়েতে ফলে। সঠিক সময় নির্বাচন্‌ডাই আসল। শ্রীকৃষ্ণ কি আরও আগে কুরুক্ষেত্তর যুদ্ধডা বাধাইয়া পাণ্ডবদের দুঃখ ঘুচাইতে পারতেন না? বিডিও সাহেব এমন ভাবে তাকান, যেন এমন মোক্ষম উদাহরণের পর হরবল্লভের আর একটি শব্দও উচ্চারণ করা উচিত নয়।

শুনতে শুনতে বুদ্ধদেবের চোখে পলক পড়ে না। বিডিও সাহেবকে তার ক্রমশ দুর্জ্ঞেয় মনে হয়।

মল্লিকার চোখে মুখে কিন্তু তখনও অবধি জমাট আতঙ্ক। বলে, 'এদের তিলমাত্র বিশ্বাস নেই। স্বার্থে ঘা লাগলে এরা নিজের বাপকেও ছাড়ে না। বিডিওকেও বিশ্বাস নেই। আজ একরকম, বদলে যেতে কতক্ষণ।' শেষ দিকে ছলছলিয়ে ওঠে মল্লিকার চোখ। অনুনয় ঝরে পড়ে। বলে, 'তুমি খুব সাবধানে থেকো। সম্ভব হলে বদলি নিয়ে চলে এসো। ওখানে

তোমার কিসের এত টান! অন্য কোনও এলাকায় পোস্টিং নাও। রাতের ঘুম ছুটে গেছে আমার।'

নির্বাক বসেছিল বুদ্ধদেব। এক সময় মল্লিকার দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকায় সে। ওর বুকের ভিতর অবধি পৌঁছে যেতে পারে অবলীলালায়। 'ওখানে তোমার কিসের এত টান'—মল্লিকার এই মন্তব্যটা বুদ্ধদেবের কানে আলাদা মাত্রাসহকারে ঢোকে। এমন মন্তব্যের পেছনে যে মৃদু খোঁচাটি রয়েছে, সেটা বুদ্ধদেবকে সইতে হয়। আশ্চর্য, মল্লিকাও সময় সময় কেমন নিছক এক মেয়ে হয়ে যায়, কেমন অতি সাধারণ স্তরে নেমে আসে।

বুদ্ধদেব আগের প্রসঙ্গে চলে যায়। বলে, 'তুমি নিজের কানে শুনেছ এসব?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে মল্লিকা, 'আর একজন।'

'কে?' বুদ্ধদেব উৎকর্ণ হয়।

মল্লিকা সামান্য সময়ের জন্য ইতস্তত করে। তারপর বলে, 'পরে বলব। তবে সে খুবই নির্ভরযোগ্য। তার মতো নির্ভরযোগ্য অফিসে আর একজনও নেই।'

সেদিন পুরো ব্যাপারটাকে রহস্যে মুড়ে রেখে দিয়েছিল মল্লিকা। কিছুতেই জানায় নি সেই মানুষটির নাম। নাম অবশ্যি বুদ্ধদেব জেনেছিল পরে। তাতে করে কিন্তু রহস্য কমে নি একতিলও। বরং বেড়ে গিয়েছিল।

সিংহগড়ে দাদন উৎসব

আশ্বিন মাসের শেষ দিনটাকে বলে নল-সংক্রান্তি।

ওল, ধান ফোল্, মাহাদেবের বোল, হরি বো—ল—।

সারা মাঠ কাঁপিয়ে বোল তুলেছে চাষীরা। নল-সংক্রান্তির ভোরে মন্ত্রঃপূত নল পুঁতে দিচ্ছে ধানের ক্ষেতে। ধানের বুকে ক্ষীর জমবে। দানাগুলি পুষ্ট হবে। ফলন হবে দ্বিগুণ। আগের দিন নলকাঠি কেটে মন্ত্রঃপূত করে রাখা হয়েছিল। নলের গায়ে বাঁধা হয়েছিল মন্ত্রঃপূত মসলা, কাঁচা-হলুদ, কেঁউ...। সেই নলের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে নল-সংক্রান্তির দিনে মাঠ প্রদক্ষিণ করেছে চাষীরা। শেষ রাতে মন্ত্রঃপূত জল তোলা হয়েছে পদমপুকুর থেকে। ডাকের জল। সর্বরোগহর। মাঠ থেকে ফিরে এসে কাঁচা হলুদ, নুন সহযোগে ঐ জল পান করবে সবাই।

কার্তিকের ভোর। চারপাশে ঘন কুয়াশা আর হিমেল বাতাস। ধান গাছের পাতা এবং আলের ঘাসগুলি ভিজে গিয়েছে ওষে। ভিজে ধানগাছের গোছ সরিয়ে সরিয়ে আল বরাবর হাঁটছে উদোম চাষার দল। কোমর অবধি ভিজে গিয়েছে শিশিরে।

কম জমির মালিকেরা নিজেরা নল পুঁতছিল নিজেদের জমিনে। জোতদারদের জমিতে নলের বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মাহিন্দারে দল। মালিকের জমিতে ধান ফুললে, ক্ষীর জমলে ওদের কোনও ফায়দা নেই। তাও কোমর অবধি শিশিরে ভিজিয়ে গলার শিরা ফুলিয়ে বোল দিচ্ছিল, ওল—ধান ফোল—মাহাদেবের বোল....।

মালিকেরাও অবশ্যি বসে নেই আজ। তাদেরও আজ খুবই ব্যস্ততার দিন। আজ থেকে মজুর-কামিনদের মধ্যে দাদন বিলি শুরু হবে। রাঢ়ের দীর্ঘদিনের প্রচলিত নিয়ম।

সকাল থেকেই হরবল্লভের দুয়োরে ভিড়টা বাড়ছিল। চারপাশের পাড়াগুলো, শালকাঁকি বাউরিপাড়া, শিকারিপাড়া, লোহারপাড়া, শালুকাব আদিবাসীপাড়া, ঝেঁটিয়ে আসছিল দাদন নেবার জন্যে। লাল বাঁধানো খাতা নিয়ে তৈরি হয়েছে রতিকান্ত। পাগল শিকারি গোলা

থেকে ধান নামিয়ে চূড় করেছে দাওয়ায়। বুদ্ধদেব তার নিজস্ব কুঠরি থেকে বেরোতেই হাঁক পাড়ে রতিকান্ত, ও গ্রামসেবকবাবু, জলদি আইসেন। একলা যে সামলাতে লারি। বুদ্ধদেব শুনেও না শোনার ভান করে। ধীর পায়ে বেরিয়ে যায় গড়ের বাইরে। রতিকান্ত পলকহীন তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। ধীরে ধীরে মুখমণ্ডল শক্ত হয়ে ওঠে। আগের গ্রামসেবকটি কত ভাল ছিল। মুৎসুদ্দিবাবু। বাবুদের কাজে-কর্মে কত সাহায্য করত। এ শালা বড্ড টেটিয়া। জমিনের থিকে এক ইঞ্চি ওপরে ওপরে হাঁটে।

রতিকান্ত ফিরিয় নেয় মুখ। দাদন বিলি শুরু করে। লখিন্দর বাউরি, গেল সনে লিয়েছিলি দশ পাই। পাঁচটা মজুরে পাঁচ পাই শোধ। বাকি রয়েছে পাঁচ পাই। সুদে-আসলে দশ। শালা, আরও তুয়ার দাদন চাই? ভাগ্। নীলাম্বর টুডু—গেল শনের এক পাই বাকি। সুদে-আসলে দু'পাই। এবারে কত চাউ? এক শুলি? গেল-সনে পাঁচটা মজুরের দাদন লিয়েছিলি, চারটার বেশি দিতে পারিস নাই। এবারে চাউ কুড়িটা মজুরের দাম? পাগল, উয়াকে পাঁচপাই দে। কঁড়া সোরেন—কত চাই? দশ পাই? হবেক নাই, হবেক নাই, উয়াকেও পাঁচ পাই দে। শম্ভু বাউরি—তুই ফের ইখ্যেনে কিসের লেগে রে শালা! তুই তো ইদানীং সুকু ঠাকুরের চেলা হয়্যেছু! খোব মিছিল-টিছিল করছু, শুনতে পাই। ভাগ্ শালা। দাদন লিতে হয় উয়ার পাশ লে গে যা।

বেলা বাড়লে পরে হরবল্লভ আসেন অন্দরমহল থেকে।

রতিকান্ত তার এতক্ষণের চেপে রাখা রোষ উগরে দেয় ভেদবমির মতো, 'রামসেবকবাবু গদিতে বুইস্‌ল্যাক নাই। আমার কথাটায় মুত্তে দিয়ে চইলে গ্যালাক।'

শুনে পাথরের মতো শক্ত হয়ে আসে হরবল্লভের মুখখানি। রাগে-অপমানে থমথম করতে থাকে। পিঁপড়ার তবে পাখনা গজিয়েছে !

চিরকাল সিংহগড়ে দাদন হয়েছে ধানে। এবছরই প্রথম দাদন চলছে নগদেও। অঙ্কটা পরিষ্কার। এখন আশ্বিন-কার্তিকে ধানের দাম আকাশছোঁয়া। সেই দামেই দাদন চলছে নগদে। পৌষে, যখন ধান বিকোবে জলের দরে, তখন টাকায়-টাকা সুদসহ পুরো কর্জ শোধ করতে হবে ধানে। যারা আগামী ধান কাটার মরসুমের জন্য দাদন নিচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। এক পাই ধানে একটা মজুর পাওয়া যায় পৌষে। আশ্বিন-কার্তিকে একপাই ধানের যা দাম সেই পরিমাণ টাকা দাদন পাচ্ছে মাইন্দারের দল। টাকায়-টাকা সুদসহ পৌষে যে পরিমাণ টাকা ফেরৎ পাওয়া কথা, সেই টাকায় ঐ মরসুমে যত পাই ধান কেনা চলে, ততগুলি মজুর দিতে হবে। সব মিলিয়ে হিসেব যা দাঁড়ায়, এক পাই ধানের মূল্যে পৌষে কমপক্ষে চারদিন মজুর খাটলে তবেই শোধ হয় দাদন। এতকালের নিয়ম ভেঙে ধানের পাশাপাশি নগদেও দাদন চালু করবার পেছনে একটাই কারণ। চুয়ামসিনা কৃষি-উন্নয়ন সমবায় সমিতি, গাঁয়ের মানুষ যাকে বলে 'সুমতি'। দীর্ঘকাল যেটিকে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে চলেছিলেন হরবল্লভ।

হরবল্লভের অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল, চুয়ামসিনা গাঁয়ে একটা সমবায়-সমিতি গড়েন। ইতিমধ্যে বাঁকাদহ, উলিয়াড়া বেলশুলিয়া সর্বত্রই সমবায় সমিতি হয়েছে। কিন্তু এখনও অবধি চুয়ামসিনায় একটা সমিতি বানানো হল না, এ আক্ষেপ রাখবার জায়গা নেই হরবল্লভের। সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য ভারি মহৎ। সেদিন ব্লক অফিসে প্রাঞ্জল করে বোঝালেন কো-অপারেটিভ ইন্‌সপেকটর হেরম্ববাবু। তিনি ব্লকের সি-আই সাহেব। গাঁয়ের সমস্ত চাষী শেয়ার কিনে মেম্বার হবে সমিতির। চাষের মরসুমে ওখান থেকেই দাদন পাবে। চাষ উঠলে শোধ দেবে। সুদও নাকি বেজায় কম।

হরবল্লভ মিষ্টি হেসে বলেছিলেন, 'তো, আমাদের চুয়ামসিনায়ও গড়ে দ্যান একটা সমিতি। গরীব মাইন্‌ষের কত উপকার হয় তাতে।'

সি-আই সাহেব বলেছিলেন, 'একদিন যাব আপনাদের গাঁয়ে।'

কিছুদিন বাদে এলেনও তিনি। হরবল্লভের গড়ে ঠাঁই নিলেন। এলাকার বাছাবাছা চাষীদের খবর দিয়ে রেখেছিলেন হরবল্লভ। তারা সব প্রশস্ত বারান্দায় শতরঞ্জির ওপর গায়ে গা ঠেকিয়ে বসল। সি-আই সাহেব চেয়ার চেপে বোঝাতে লাগলেন সমবায়ের মহিমা। বললেন, গাঁগুলোকে মহাজনের দল অক্টোপাশের মতো চতুর্দিক থেকে বেঁধে ফেলেছে। সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। সুদে-আসলে মিলে পাহাড়প্রমাণ ঋণ চেপে বসেছে গরীব মানুষের ঘাড়ে। অভাবী মানুষের জমি-জমা, ভিটে-পুকুর টিপসইয়ের আকার নিয়ে ঢুকে পড়ছে মহাজনের সিন্দুকে। এসব নিয়েই ভাবছেন সরকার। কেবল গাঁয়ে গাঁয়ে সমবায় সমিতিই গরীব মানুষকে বাঁচাতে পারে। এ হবে তাদের নিজেদের ব্যাঙ্ক। নিজেরাই হবে তার মালিক। নিজেরাই চালাবে। বেশ তরিবত করে বললেন সি-আই সাহেব। কথাগুলো বেশ পছন্দ হল সবাইয়ের।

কথাবার্তা পাকা হল। দরখাস্ত লেখা হল। সি-আই সাহেব ভরসা দিলেন। সমস্যা দেখা দিয়েছিল সমিতির ঘর নিয়ে। এত জলদি ঘর বানানোর সময়ও নেই, অত টাকাওনেই। তীরে এসে তরী প্রায় ডুবুডুবু। অবশেষে মুশকিল আসান করলেন হরবল্লভই। তাঁর কাচারি-বাড়ির একখানি ঘর তিনি সানন্দে ছেড়ে দিলেন সমিতি জন্য। হাজার হোক, দেশের কাজ এটা। গ্রামের উন্নতির প্রশ্নটি এর সঙ্গে জড়িত। এবার তবে কমিটি গঠন। সমিতির বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ নির্বাচন। আগে থেকেই লিস্টিটা মোটামুটি বানিয়ে রেখেছিলেন হরবল্লভ। সি-আই সাহেব কথাটা তুলতেই ধরিয়ে দিলেন ওঁর হাতে। হরবল্লভ ছাড়াও, স্ত্রী অরুন্ধতী, ছেলে প্রভঞ্জন, গোমস্তা রতিকান্ত, ঝাড়েশ্বর নায়ক, হেডমাস্টার মহাদেব কয়ালদের নিয়ে পনের জনের বোর্ড। প্রায় সকলেই হরবল্লভের আত্মীয় কিংবা অনুগত মানুষ। সি-আই সাহেবের উপস্থিতিতে প্রাথমিক সাধারণ সভা হল ঐ পনের জনকে নিয়ে। কাচারি ঘরেই হলো সে মিটিং। চেয়ারম্যান হলেন সর্বসম্মতিক্রমে হরবল্লভ স্বয়ং। সেক্রেটারি এবং ম্যানেজার নির্বাচিত হল যথাক্রমে প্রভঞ্জন ও রতিকান্ত। নিজের পরিবার থেকেই সব পদ পূরণ করা উচিত নয়। কাজেই ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে রাখা হল মহাদেব কয়ালকে।

এবার এল শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা তৈরির পালা। হরবল্লভের পরিবারের সকলেই তো বটেই, মুনিশ-মাইন্দার, বর্গাদার, গাড়োয়ান, ধোপা, নাপিত অবধি সবাই হল শেয়ারহোল্ডার। হরবল্লভই ওদের শেয়ার কেনার টাকা নিজের পকেট থেকে দিয়ে দিলেন। তা বাদে, এলাকায় হরবল্লভের বশংবদ সবাই শেয়ার কিনে সদস্য হল। স্থির হল, আগা মাসের কোনও এক শুভদিন দেখে সমিতির দ্বারোদঘাটন হবে। সদর থেকে সমবায়ের বড়সাহেব আসবেন উদ্বোধন করতে। সি-আই সাহেবই বড়সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দিনক্ষণ স্থির করবার দায়িত্ব নিলেন। হরবল্লভ বায়না ধরলেন, উদ্বোধনের দিন বিডিও সাহেবকেও আনতে হবে। হাজার হোক তাঁরই এলাকায় এই শুভ কর্ম ঘটতে চলেছে। ঠিক হল, হরবল্লভ—মহাদেব কয়ালরা একদিন দল বেঁধে গিয়ে বিডিও সাহেবকে রাজি করাবেন।

পাগল শিকারি বেজায় খুশি। অনেকদিন বাদে আবার চুয়ামসিনা গাঁয়ে গণ্যমান্যদের পায়েরধুলো পড়বে। ভোঁ-ভোঁ করে ছুটে আসবে জীপ। জমায়েত হবে। শাঁখের শব্দ, ফুলের

মালা, কম্বুকণ্ঠে বক্তৃতা...। লুচি-টুচির গন্ধ—। পাগল শিকারির ভারি ভাল লাগে এসব দেখতে। মনে মনে তেমনই একখানা ছবি এঁকে চলেছে পাগল শিকারি। আর, যখন লুচি-টুচি দিয়ে ভুরিভোজে বসলেন বাবুরা, বাবুদের অনুগত বশংবদ জনেরা, পাগল শিকারিও এক ফাঁকে গুটিকয়েক আলগা রেখার সাহায্যে, ঠিক যেমন করে ধূর্ত বেড়াল বাড়ির গৃহিনীর ক্ষণিক অন্যমনস্কতায় অপ্রশস্ত ঘুলঘুলি দিয়ে একটিমাত্র নিঃশব্দ লম্ফে ঢুকে পড়ে আধো-অন্ধকার পাকশালে, ঢুকে পড়ে স্বরচিত ছবিটির ঘেরাটোপে। এমনটা সে পারে।

যথাসময়ে সমবায় সমিতি তৈরি হল। জয়রামপুরের ডাঙায় সিংহবাবুদের কাচারি ঘরে, সমিতি-ঘর হল। চাষের মরসুমের আগেই এ-আর-সি-এস অফিস থেকে ক্রেডিট-লিমিটও পাশ করিয়ে আনল সমিতির ম্যানেজার রতিকান্ত গোস্বামী। চতুর্দিকে রব উঠল, এবারে চাষের মরসুমে গরীব চাষী 'সুমতি' থেকে 'লুন' পাব্যেক। খবরটা চৈত্রের দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশের গাঁয়ে। দশটাকা দিয়ে সুমতির মেম্বর হলেই 'লুন' মিলবেক পাঁচশো, হাজার, দু'হাজার। ঘটি-বাটি, কলসি-গাগরা লয়, সোনাদানা লয়, শুধু নিজের জমিনের দলিল-পড়চা জমা রাখলেই চলবেক। এলাকার চাষীবাসীরা সুদিনের স্বপ্ন দেখে মনে মনে। দুর্দিনে নামমাত্র সুদে সরকার থেকে লোন পাওয়া, জ্বলন্ত খরার দিনে এক পশলা বর্ষণের তুল্য। এরপর আছে ব্লকের কৃষি-ঋণ। ফি-বছর এলাকার দু'দশ জন পায়। তপ্ত চাতালে দু'চার ফোঁটা জলের মতো। এবারে নাকি আরো ঢের বেশি মানুষকে কৃষিলোন দেবে ব্লক থেকে। এক কাঁড়ি টাকা নাকি এসেছে সেই বাবদ। এবারে তো তাহলে গরীব চাষাভুষোদের আর সিংহবাবু কিংবা গাঙ্গুলিদের গড়ে গিয়ে দাদনের আশায় বসে থাকতে হবে না তীর্থের কাকের মতো। নাহ্। সরকারের বিবেচনার তুলনা নেই।

সেবারে যথাসময়ে সুবর্ষণ হয় রাঢ়ভূমে। মাঠঘাঠ ভরে যায় জলে। বত্রিশভাগী আর গামিরতলার জঙ্গলধোয়া জল নীচালি পথ বেয়ে ধেয়ে যায় হরিণমুড়ির দিকে। আর, সেই সুবাদে, হরিণমুড়ি সহসা ফুঁসে ওঠা বাঁশমুগরা সাপ!

ক্ষেতে ক্ষেতে হালচষার ধুম পড়ে যায়। চষিপোকার দল চারপাশের গাছ-গাছালিতে বসে বসে চি-চি আওয়াজে ভরিয়ে দেয় দশ দিক। এমনি সময়ে রতিকান্ত এসে খবর দেয় 'সুমতির অধিকাংশ মেম্বর 'লুন' লিতে চাচ্ছে নাই।'

হরবল্লভ বসে বসে শ্রাবনের জলভরা আকাশ দেখছিলেন। রতিকান্তর কথায় আকাশে নয়, হরবল্লভের ঠোঁটের কোণে মুহূর্তের তরে ঝিলিক মারে হাসি। ঝিলিক মেরেই মিলিয়ে যায়।

যথাসম্ভব গম্ভীর ও চিন্তাচ্ছন্ন মুখে শুধোন, 'ক্যানে?'

'কে —জানে!' রতিকান্তর চোখে মুখে নিদারুণ বিরক্তি মানুষগুলোর এমন নির্বোধ হটকারী সিদ্ধান্তে। বলে, 'উয়ারা সরকারের ঘরে দলিল-পড়চা রাইখ্তে ভয় পাচ্ছে।'

সর্প হইয়া দংশ তুমি, ওঝা হইয়া ঝাড়। রতিকান্তর হয়েছে সেই ব্যাপার। গেল একমাস ধরে সে কৌশলে মানুষগুলোর মনের জমিতে ভয়ের বীজ পুঁতেছে সংগোপনে। সার-জল দিয়েছে, নিড়িয়েছে। বলে, সরকারের ঘরে জমিন বাঁধা রাইখ্তে হবেক কিন্তু। আর পৌষ-মাসে টাকা শোধ দিতে লাইর্লে, লিলাম হইয়ে যাব্যেক জমিন। ভেইবে-চিন্তে কাম লাও। শেষে রতিকান্ত গুঁসাইকে দোষের ভাগী কইরো নাই। কথায় বলে, ভাবিতে উচিত বটে

প্রতিজ্ঞার কালে। কথাগুলো ভারি সংক্রামক। নিমেষের মধ্যে নিদারুণভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ে মানুষজন। ঠিক। সরকারের ঘরে জমিন রাখা, আর যমের দোরে ছেইলা রাখা একোই কথা বটে। তা বাদে, আরও এক সন্দেহের কথা আছে এর মধ্যে। ব্লক থেকে ফি-বছর কৃষি লোন বিলি হয়। গুরুপ লোন, পশু লোন...। সেখানে তো জমিন বাঁধা রাখতে হয় না। 'সুমতি'র নামে কী এক কল বানাল্যাক হে সরকার। দলিল বাঁধা রাইখ্‌তে চায় ক্যানে? কী উদ্দেশ্য অন্তরে? এই ভয়টাই কুরে কুরে খায় মানুষগুলোকে। কাজ নেই আমার অন্য ধনে। সরকারের ঘরে সর্বস্ব বাঁধা দিয়ে লোন নাই লিব আমরা। অত সুখে প্রয়োজন নেই আমাদের। সুখের চাইতে, বাছা, স্বস্তি ভাল।

যথাসময়ে বুদ্ধদেবের কানে এসেছিল কথাটা। পুরো ব্যাপারটাতে একটা ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছিল সে। গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় মানুষজনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল ঢের। কিন্তু ভবি ভোলে নি। আসলে, সরকার সম্পর্কে মানুষের চিরকালীন ভয়টাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল। প্রতাপলাল, হরবল্লভ কিংবা প্রমথ গাঙ্গুলিদের চোখে দেখা যায়। সরকারকে তো চর্মচক্ষে দেখা যায় না। আর, যাকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না, তাকে নিয়েই তো মানুষের যত ভয়। না জানি অদৃশ্য অবয়বে সে কতই না মারাত্মক। চুয়ামসিনার শিবতলার বকুল গাছে যে পুরষা ভূতটার বসবাস, তাকে কেউ বড়-একটা দেখে নি বলেই না অত আতঙ্ক মানুষের। তার আকার-অবয়ব, আচার-আচরণ নিয়ে অত গবেষণা। সরকারও আসলে পুর্ষা-ভূতের তুল্য। কোনও নির্দিষ্ট আকার নেই তার। কখনও মনে হয় হরবল্লভ সিংহবাবুই সরকার। কখনও মনে হয় বিডিও সাহেব। কখনও বা থানার বড়বাবু। কখনও বা এদের সবাইকে ছাড়িয়ে এক বিশাল বিমূর্ত অবয়ব, যার সম্পূর্ণ শরীরখানা কখনই বোধগম্য হয় না সাধারণ মানুষের কাছে। শুধু হরবল্লভ সিংহবাবুই যদি সরকার হতেন, তেমন একটা দুর্বোধ্য ভয়ের ব্যাপার থাকত না সে ক্ষেত্রে। তিনি তল্লাটের সবাইয়ের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। রাখলে রাখেন, মারলে মারেন। কিন্তু তাঁকে দেখা যায়। মার খেতে খেতেও তাঁর পা'জোড়া জাপটে ধরা যায়। সরকারের পা কুথায় রে বাপ, যে, জুলুমের মুখেও জাপটে ধরবেক মানুষ। সত্যি সত্যি যদি সরকারের ঘর থেকে জমিনের দলিল-পড়চাগুলো আর ফেরৎ না পায় মানুষ, তবে কার দুয়োরে গিয়ে কাঁদবে? রতিকান্ত বলবে, আমি কী জানি? তুমরা সরকারের পাশ যাও। হরবল্লভ বলবেন, আমার পাশ কী? সরকার লিয়েছে সরকারকে মাগ্। তো, সরকার বলতে কার কাছে যাবে মানুষ? সে কে? কোথায় থাকে? সত্যি, অমন ধোঁয়াটে বস্তুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন।

দেখে শুনে হাল ছেড়ে দিয়েছিল বুদ্ধদেব। গাঁয়ে-গঞ্জে মহাজনী প্রথা লোপ পাওয়ার একটা সুযোগ এসেছিল। রতিকান্তরাই কৌশলে কেঁচিয়ে দিল সেটা।

চাষীরা পিছিয়ে গেল বটে, তা বলে সমিতির লোন বিলি কিন্তু বন্ধ রইল না। বোর্ড অব্ ডিরেক্টরের মিটিং-এ হরবল্লভ অকাট্য যুক্তি সহকারে পেশ করলেন তাঁর বক্তব্য। নতুন সমিতি। ক্রেডিট লিমিটও পাশ হয়ে এসেছে। এখন যদি লোন না বিলি করা যায় তো অত কষ্টে গড়া 'সুমতি'টা উইঠ্যে যাব্যেক নাই? কিছু লোন তো বিলি করতেই হব্যেক।

প্রমথ গাঙ্গুলিদের মতো কিছু সম্পন্ন মানুষ দ্বিগুণ চতুর্গুণ পরিমাণ লোন পাশ করিয়ে নিল ডিরেক্টরদের মিটিং-এ। হরবল্লভই উৎসাহ জুগিয়ে পাশ করালেন। নাম মাত্র সুদে লোন

পাচ্ছ, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে কেউ? হরবল্লভ নিজেও নিলেন। তাও প্রচুর টাকা পড়ে রইল 'সুমতি'র ফান্ডে। এরপর শুরু হল আসল খেলা। সিংহগড়ের যত মুনিশ-মাইন্দার, খাস-ঝি, ঠিকে ঝি, চারপাশের বাউরি-বাগদি পাড়ার যত অনুগত-বংশবদ মানুষজন সবাইয়ের নামে মঞ্জুর হল লোন। তাদের প্রত্যেকের নামে জমিন আছে, সে জমিনের কবলা আছে, খাজনার রসিদ আছে, পড়চাও আছে অনেকের, কিন্তু সবই রয়েছে সিংহগড়ের কাচারিতে। মানুষগুলো তার বিন্দুবিসর্গও জানে না। সে সব কবলা রসিদ-পড়চা পেশ করা হল গোপনে। মানুষগুলো শুধু নির্দেশ মতো টিপসই দিল যথাস্থানে। লোনের টাকা জমা পড়ল সিংহগড়ের সিন্দুকে।

সেই টাকাতেই দাদন চলছে আজ সিংহগড়ে। যারা 'সুমতি'র ঘরে লোনের কাগজে টিপছাপ দিয়েছে তাদের মধ্যে বারো আনা মানুষই আজ দাদন নেবার জন্য উপস্থিত। দেখেশুনে পাগল শিকারি মুচকি হেসে প্রবচন আওড়ায়। যেই ধোবাকে সেই ধোবা, শুধুমুদু আমার বোস্টম হবা। সেই তো আশ্বিন মাসে বাবুর দুয়ারে বস্তা পাইত্‌লি বাপ, সুমতি কইরে তেবে কী লাভটা হইল্যাক তুয়াদ্যার!

সমিতি থেকে লোন দেবার ব্যবস্থাটা এভাবে ভেস্তে যাওয়ায় বুদ্ধদেব ব্লকের কৃষি-লোন বিলির ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী লোন-প্রাপকদের তালিকা বানাবেন প্রেসিডেন্ট। গ্রামসেবক 'ইদকুয়ারি' করে রিপোর্ট দিলে লোন মঞ্জুর করবেন বিডিও সাহেব। এবং একদিন ব্লক অফিসে কয়েকশো মানুষের মেলা বসবে। হুড়োহুড়ি ভিড় জমবে ক্যাশিয়ার অখিল সরকারের ঘরের দরজায়। দিনভর চলবে লোনবিলি-উৎসব। নানা অজুহাতে প্রত্যেকের থেকেই দু'পাঁচ টাকা কেটে নেবে অখিল সরকার। লোকগুলো নীরবে মেনে নেবে সেই ব্যবস্থা। তত দিনে চাষবাসেব কাজ শেষ। আশ্বিনের দুঃসময় ঘিরে ধরেছে লোকগুলোকে। ব্লক অফিস থেকে বেরিয়ে তারা চাল কিনবে, মসলা কিনবে, বউ-বাচ্চার তরে এক-আধটা লৈতা-ছৈতা, গামছা...। কেউ কেউ আনন্দের আতিশয্যে বহুদিন বাদে রসিকগঞ্জের ঠেক-এ বসে আকণ্ঠ পচাই গিলবে। এভাবেই শেষ হয় ব্লকের বাৎসরিক লোন-বিতরণ উৎসব।

বুদ্ধদেব ক্রমাগত তাগাদা দিতে থাকে হরবল্লভকে, লোনের লিস্টখানা বানিয়ে দিন। আর কবে লোন পাবে মানুষ? 'আজ দিচ্ছি, কাল দিচ্ছি' বলে কেবলই সময় খেতে থাকেন হরবল্লভ। বিডিও সাহেবের কাছে অভিযোগ করেও কোনও ফল পায় নি বুদ্ধদেব। বিডিও সাহেবের সাফ জবাব, প্রেসিডেন্ট লিস্টি না দিলে আমি কী করুম? আফটার অল, হি ইজ দা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ। এলাকার মানুষের কী দরকার, কতটা দরকার, কখন দরকার, সেটা ঠিক করবার ভার ওর উপরই দিয়েসে গভর্নমেন্ট। আমি তো নিজেই লিস্টিখান্‌ বানাইয়া ফ্যালতে পারি না। বুদ্ধদেব আর চেপে রাখতে পারে নি নিজেকে, আসল কথাটা ফাঁস করে দেবার ভঙ্গিতে বলেছে, প্রেসিডেন্ট তো চায় না, এলাকায় সরকারি লোন বিলি হোক, দুর্দিনে সরকারি রিলিফের কাজকর্ম চলুক। তাহলে তার নিজস্ব মহাজনী যে মার খাবে। বিডিও সাহেব বেশ খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন বুদ্ধদেবের দিকে। এক সময় বলেন, 'বুদ্ধ, তুমি এক কাম কর। সরকারি চাকরি ছাইরা-ছুইরা দিয়া, তুমি ইলেকশনে কনটেস্ট কইরা প্রেসিডেন্ট হইয়া যাও গা। সরকারি চাকরি তোমাগো সুট করত্যাসে না।' লোন বিলির জন্য বুদ্ধদেবকে অতখানি উতলা হতে দেখে রতিকান্ত ফুট কাটে, 'যার বিয়া তার মনে নাই, পাড়া-

পড়শির ঘুম নাই। গ্রামসেবকবাবুর হয়েছে সেই অবস্থা। মাইনষের ভোটে যিনি পিসিডেন্ট হয়েছেন, তাঁর যত না চিন্তা, গ্রামসেবকবাবুর চিন্তা তার চাইতেও বেশি। সেই বলে না, মা'র চাইতে মাউসির দরদ!' হরবল্লভ শুনে মুখ টিপে হাসেন। বলেন, 'আসলে, কি জান রতিকান্ত, সরকারি টাকা বিলি-টিলি হইলে, কর্মচারীরাও দু'চারটা পয়সার মুখ দেখে। চাকরিতে আর ক'টা পয়সাই বা পায় উয়ারা!'

সেই রাতেই প্রথম চাকরিটা ছেড়ে দেবার কথা ভেবেছিল বুদ্ধদেব।

ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে জমজমাট মেলা ও নাটক

সেবার ব্লক অফিসের সামনে জমজমাট মেলা বসল। মেলা উপলক্ষে জমজমাট নাটকও হল। বুদ্ধদেবের কাছে খবর পৌঁছুল সন্ধে নাগাদ।

এমনিতে আশ্বিন-কার্তিক মাস যমরাজের মাস, রাঢ়ের প্রাচীন প্রবাদ। গরীব মানুষের মরণের মাস। এ বছর ভাদ্র মাস থেকেই কার্তিকের টান শুরু হয়ে গিয়েছে । চাষের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই পুরো রাঢ় বেকার। যারা চাষের মরসুমে নাবালে গিয়েছিল খাটতে তারাও ফিরে এসেছে। এখন ধান-চালের দাম আকাশছোঁয়া। গেরস্তের ঘরেও কাজকাম নেই। এ সময় দিনগুলো যেন কাটতে চায় না কিছুতেই। উপোসী মানুষ পথ চলতে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। কংকালসার শরীরখানাকে টেনে টেনে হাঁটে। কোটরের অতলে চোখের মণিদুটি কেঁপে কেঁপে জ্বলতে থাকে, যেন গভীর ইদাঁরার জলে আলো পড়েছে। তারা টলোমলো হেঁটে চলে, চিঁ - চি করে কথা কয়, তাদের শরীরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায় দণ্ডে-দণ্ডে, পলে-পলে এক-একটি খাদ্যহীন দিন। ওদিকে আদিগন্ত সবুজ মাঠে ধানের কচি চারার মাথায় হাওয়াদের হিল্লোল বয়ে যায়। এক আদিগন্ত সবুজ সমুদ্রে ছলাৎ ছলাৎ সবুজ রঙের ঢেউ। হরিণমুড়িতে থইথই জল। চুয়ামসিনার পাথুরে ডিহি জুড়ে সবুজ ঘাসের চাপড়া গজিয়েছে। সবুজের মধ্যে মধ্যে খয়েরি মাকড়া পাথর মুখ দেখিয়েছে এখানে ওখানে, যেন সবুজ মাঠের এখানে ওখানে পানের পিক ফেলেছে কেউ। প্রকৃতির এমন ভর-ভরন্ত রূপের মধ্যে শীর্ণকায় মানুষগুলো দিনভর পেটের জ্বালায় আগল-বাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায়। শাকপাতা, গুগলি-শামুক, বুনো ওল-কচু আর জলায় জলায় বুকজলে ভেসে ভেসে পানিফল খুঁজে বেড়ায়। জঙ্গলেবাঁওড়-আলু খোঁড়ে মাটির তলা থেকে। এ সময়টা হরবল্লভদের রমরমা। সকাল না হতেই দাদনের আশায় ভিড় করে উপোসী মানুষ। সবাইকে দাদন দেওয়া চলে না। বেছে বেছে দাদন দেন হরবল্লভ। একপাই ধানে, অঘ্রাণ-পৌষে একটা মজুর। এক পাই মানে কিছু কম একসের ধান। অথচ ধান কাটার মরসুমে নগদ মজুরি তিন পাই ধান। জলের দরে নিজেদের গতর হরবল্লভদের কাছে আগাম বেচে দিয়ে কোনও গতিকে প্রাণ বাঁচাবার প্রয়াস চালায় ওরা। তবুও ভোরের আলো ফুটলেই জঠরে আগুন জ্বলে ওঠে। হা-অন্ন, হা-অন্ন রবে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে আসে।

বুদ্ধদেব পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। সব কিছু প্রত্যক্ষ করে। উপোসী মানুষগুলো চিঁ-চিঁ করে বলে, 'একটা কাজকাম এ তল্লাটে খুলবেক নাই সরকার? হাঁ-বাবু? আর যে সইতে লারি।'

বিডিও সাহেব বললেন, 'টি-আর স্কীমের টাকা তো এসেছে, কিন্তু কোথায় কাম হইবে? সর্বত্র তো ধান, নয়তো জল। মাটি এ্যাভেলেবুল?'

বুদ্ধদেব বুদ্ধি জোগায়। নানা জায়গায় ছোট ছোট কাজ খুললে মাটি পাওয়া যাবে, স্যর। গাঁয়ের ভেতরের রাস্তাঘাটগুলোতে পেটি-রিপেয়ারিং করা যেতে পারে। তাছাড়া রাস্তাগুলো যেখানে ধুতমা ডাঙার কিংবা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে, সেখানে তো রাস্তার দুধারে প্রচুর মাটি।

বিডিও সাহেব বলেন, 'এ'তো আপনার কথা। প্রেসিডেন্ট যে অন্য কথা কয়। সেই তো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ।'

হরবল্লভ শুনে বলেন, 'বুদ্ধদেববাবু যদি মনে করেন, মাটি মিলবেক, তো উনিই করান। আমি সরকারি টাকা লয়-ছয় করতে লারবো।'

বুদ্ধদেব বুঝতে পারে, এ সময় এলাকায় কোনও সরকারির কাজকর্ম চান না হরবল্লভ। এখন তাঁর দাদন-বিলির সময়। এখন ভুখা মানুষগুলো অন্য কোথাও সামান্য সাহারা পেয়ে গেলে তাঁর দাদন বিলির বড়ই ক্ষতি হয়ে যাবে। বুদ্ধদেব খুব জোর গলায় বলে, 'আমি কথা দিচ্ছি মাটি পাওয়া যাবে। এবং টাকাও নয়ছয় হবে না।'

বিডিও সাহেব খুব উদাস গলায় বলেন, 'দেখি, করালীরে জিগাই। আমি তো টেক্‌নিক্যাল কতি পারি না।'

করালীও হরবল্লভের কথায় সায় দিয়েছিল। এখন কাজ করলে মাটি কাটবার জায়গা পাওয়া যাবে না। সর্বত্র ফসল কিংবা জল। শুধু শুধু সরকারি টাকার অপচয় হবে। কাজেই বিডিও সাহেব দু'হাতের চেটো নেড়ে তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেন প্রস্তাবটা।

ব্লক অফিসের সামনে মেলাটা বসেছিল বেলা দশটা নাগাদ। সে মেলায় হাজির হয়েছিল হাজার খানেক উদোম দোকানদার। তাদের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ দুই ছিল। তারা সঙ্গে এনেছিল ঝুড়ি আর কোদাল। অফিসের সামনে তাদের পণ্যের পসরা সাজিয়ে তারা একযোগে হাঁকছিল, হল্লা তুলছিল, আমাদের মাল কিনতে হবেক। মাল না বিকে আমরা আজ যাব নাই এ মেলা থেকে। কিন্তু অত বড় মেলায় খদ্দের মাত্র একজন। এবং তিনি তখনও মেলায় আসেনই নি। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল খদ্দেরটি কখন আসে। পুরুষ দোকানদাররা বসে বসে ভকভকিয়ে চুটি টানছিল। কাঁচা শালপাতার তৈরি চুটি, ধোঁয়ায় কাঁচা পাতার গন্ধ, ছড়িয়ে পড়ছিল হাওয়ায়। মেয়ে দোকানদাররা চুপচাপ বসে ছিল মাটি-থাবড়ে। কেউ কেউ কান্না থামাবার জন্য শুকনো স্তনের বোঁটা গুঁজে দিয়েছে কচি বাচ্চার মুখে। সূর্যটা গুঁড়ি মারতে মারতে এগিয়ে আসছিল আকাশের মাঝ বরাবর। ভাদ্রের পচা গরমে ভাঁপছিল মানুষগুলো। উপোসী পেটগুলো মোচড় মারছিল বেলা বাড়ার সাথে সাথে।

এ এক আজব মেলা। শয়ে শয়ে ঝুড়ি-কোদাল মেলাময় ছড়ানো, কিন্তু এ ঝুড়ি-কোদালের মেলা নয়। ওরা বিক্রি করতে এসেছে অন্য কিছু।

নাটকটা শুরু হয়েছিল বেলা দুটো নাগাদ। সে এক জম-জমাট নাটক। রহস্যে-রোমাঞ্চে ভরপুর। ব্লক অফিসের চারপাশের মানুষজন ভিড় করে দেখেছিল সে নাটক। দেখতে দেখতে শিউরে উঠেছিল।

বেলা এগারোটা নাগাদ অফিসে ঢুকতে গিয়ে এক সঙ্গে এতগুলো কালো-চামড়ার মানুষকে দেখে বিডিও সাহেবের ভুরুতে ভাঁজ পড়ে।

বুদ্ধদেব বাউচরণকে শুধোন, 'এরা কি চায়?'

'কাজ, স্যার। মাটি কাটার কাজ।'

'কাজ!' নিজের চেম্বারের দিকে এগোতে এগোতে বিডিও সাহেবের সরস মন্তব্য, 'ওদের বল, কাজের একটা গাস পুঁতিসি। জল দিত্যাসি রোজ। বড় হোক, ফল ধরুক, তহন দিমু।'

তখন বললেন বটে, কিন্তু সুকুমার যখন জনা-পঞ্চাশেক বাছা বাছা লোক নিয়ে ঢুকে পড়ল ওঁর ঘরে এবং ঘরের বাইরে যখন আরও শ'দুয়েক লোক কলকল করতে লাগল সমানে, তখন বিডিও সাহেবের চোখে-মুখে সেই আগেকার ফুর্তি আর রইল না।

মানুষগুলো জ্বলন্ত চোখে তাকায়। কোটরের মধ্যে আগুনের টিকিয়ার মতো মণিগুলো নড়েচড়ে বেড়ায়। কাজের প্রয়োজনটা বোঝাতে বেশি সময় লাগে না সুকুমারের। দু'চার কথার পরই করালী সোমের ডাক পড়ে।

'হ্যাঁ করালী, এ্যাতো মানুষ কইত্যাসে মাটি মিলবো, প্রেসিডেন্ট তবে ঠিক কয় নাই।'

এমন ন্যাকা ন্যাকা কথায় গা জ্বলে যায় করালীর। গেল হপ্তায় হরবল্লভই যে টিপে দিয়ে গিয়েছে নিজস্ব দাদনের স্বার্থে, যাতে এই মুহূর্তে তার এলাকায় কাজকর্ম শুরু না হয়, করালী কেন, কারুরই অজানা নেই সেটা। আকস্মিক রাগটাকে গিলে ফেলে করালী। বলে, 'হবে হয় তো।'

'তাহলে কাম শুরু করতে বল প্রেসিডেন্টকে।' সহসা যেন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন বিডিও সাহেব, 'এলাকায় এ্যাকিয়ুট ডিস্ট্রেস রইসে যখন—।' পরমুহূর্তে বলেন, 'এ কেমন প্রেসিডেন্ট মোশাই? এলাকার লোকের পাল্‌স্ বোঝে না!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফোন করা হয় এস-ডি-ও কে, এ্যাকিয়ুট ডিস্ট্রেস ইন দ্য রুর‍্যাল এরিয়াজ। প্রায় হাজার মানুষ ঘিরিয়া ফ্যালসে আমায়। জলদি ফান্ড চাই, স্যার। এখন এক মুহূর্তও নষ্ট করনের উপায় নেই। এক্কেরে ওয়ার-ফুটিং-এ কাম চালাইতে হইব। কুইক স্যার।

ফোন রেখে বিডিও সাহেব হুকুম করেন করালীকে, 'করালী, যাও যাও, স্কীম বানাও। জলদি। বিডিও সাহেবের নির্দেশখানা নিমেষে বুঝে ফেলে করালী সোম। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

সুকুমারের বুক জুড়ে উপচে পড়ছিল আনন্দ। অত তাড়াতাড়িও হয়! সরকারি কাজকর্ম এমন মন্ত্রের মতো হয়ে যায়! বিডিও সাহেব ভেতরে ভেতরে এতখানি করিতকর্মা!

'ল্যান।' বিডিও সাহেবের মুখের কালো মেঘখানা সরে গিয়ে ঝলমলে। কাঁধউচু চেয়ারের গায়ে এলিয়ে পড়েন আয়েশে, 'ফান্ড রেডি, স্কীমও রেডি, এবার পে-মাস্টার আর মোহরাব এ্যাপয়েন্ট কইরা কাজটা কাল-পরশু থিকা স্টার্ট কইর‍্যা দ্যান দিখি।'

বেশ মোলায়েম লাগছিল বিডিও সাহেবের মুখখানি। সুকুমার অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওঁর দিকে। মানুষটা এতখানি উদার হয়ে গেল কেমন করে!

সন্ধে নাগাদ খবরটা পায় বুদ্ধদেব।

সে ভারি মর্মান্তিক খবর।

মিছিলের ওপর আচমকা লাঠি চার্জ করেছে পুলিশ। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে বেধড়ক পিটিয়েছে। সুকুমারের মাথা ফেটেছে। তিলক বাউরির বাঁ হাত ভেঙেছে। গরুর-মার খেয়েছে বহু মানুষ। যারা পালাতে পেরেছে কোনগতিকে, তারাই কেবল বেঁচেছে। বিষ্ণুপুর

হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সুকুমার আর তিলক। বাকিরা খোঁড়াতে খোঁড়াতে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে কোন গতিকে ফিরে এসেছে। খবরটা শোনামাত্র একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় বুদ্ধদেব। পেটে যাদের এক দানাও খাবার নেই, তাদের এমন নির্দয়ভাবে মারা চলে? মারেব চোটে তো মরেও যেতে পারত কেউ কেউ।

সন্ধ্যায় হরবল্লভের বৈঠকখানায় হাসির হর্‌-রা। মিলিত হয়েছে প্রমথ গাঙ্গুলি, কামদেব দত্ত, মহাদেব কয়ালের দল। তাদের কথা থেকেই বুঝে নিতে পারে বুদ্ধদেব, সুকুমারের নেতৃত্বে কাজের দাবীতে যে মিছিল যাচ্ছে ব্লক অফিসে, সে খবরটা হরবল্লভই আগাম জানিয়ে দিয়েছিলেন বিডিও সাহেবকে। জানিয়ে ছিলেন, আপনার জীবন বিপন্ন। ওরা আপনাকে এ্যাসল্ট করবে আজ। পার্টির তেমনই নির্দেশ ওদের ওপর।

দিনকয় বাদে গ্রামসেবকদের মাসিক বৈঠকের পর খোশগল্প চলছিল। এ মাসের রসাল গল্প বলতে একটাই। কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে বিডিও সাহেবেব যুদ্ধজয়। বিজয়ী বীরের মতো বসেছিলেন বিডিও সাহেব। মিটিমিটি হাঁসছিলেন। গল্পের টানে একে একে এসেছিল কৃষ্ণ নাগ, করালী সোম, হেরম্ব বোস। বিডিও সাহেব বারণ করেন নি কাউকেই। কারণ তিনি জানেন, এরা সব বিডিও সাহেবের জয়গাথা শোনার জন্যই হাজির হয়েছে। গ্রামসেবকরা তো ব্লক অফিসে ছিল না ঐ দিন। দেখে নি সেই পরিস্থিতি। দেখে নি কতখানি ঠাণ্ডা মাথায় লড়াই করে একখানা হেরে যাওয়া যুদ্ধকে জিতে নিয়েছেন বিডিও সাহেব। এ ক'দিনে বারে বারেই এরা আসছে। আসছেন হরেক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টরা। আর সুযোগ পেয়ে কৃষ্ণ নাগ, করালী সোমের দল বিডিও সাহেবের জয়কে সেলিব্রেট করছে কিস্তিতে কিস্তিতে।

কৃষ্ণ নাগ বলে, 'আমার তো বুকখানা ধুকপুক করছিল। মনে হচ্ছিল অফিসখানা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে ঐ দিন।'

'লণ্ডভণ্ডই তো হইসে।' মুখের কথা কেড়ে নেন বিডিও সাহেব, 'পুরা অফিস এক্কেরে র‍্যানস্যাক্‌ড্‌ হইয়া গ্যাসে গা। ডি-এম'-এর কাসে কী রিপোর্ট পাঠাইচি, দ্যাখ নাই? পইড়া ফ্যালাও প্রত্যেকে। বরবাবুর কাছে রইসে কপি। এনকুয়ারি-ফুয়ারি হইলে তোমরাই তো উইট্‌নেস।'

ব্যাপারটা বোধগম্য হয়ে যায় সবাইয়ের।

হেরম্ব বোস বলেন, 'কিন্তু আমি শুধু আপনারর নার্ভটাকে দেখলাম। কী ঠাণ্ডা মাথায় ট্যাকল করলেন সবকিছু। কেমন কোড ল্যাংগুয়েজে সব কিছু জানালেন এস-ডি-ওকে! অন্য কেউ হলে কাপড়ে-চোপড়ে হয়ে যেত, স্যার।'

বিডিও সাহেবের সাবা মুখে আত্মপ্রসাদের মাখন জমে। চেযারে শিশুর মতো দোল খেতে থাকেন পুলকে। বলেন, 'নার্ভ আমার চিরকালই ইস্ট্রং।' বলতে বলতে সহসা নিজের মধ্যেই ডুবে যান তিনি। একটু বাদে শুরু করেন আত্মজীবনীর বহুকথিত সেই অংশটি। পূর্ববঙ্গে দাঙ্গার সময় কেমন প্রতি পদে পদে ঠাণ্ডা মাথাটি খাটিয়ে, বহুবার বেশভূষা বদলে, শত্রুপক্ষের চোখে অদ্ভুত কৌশলে ফাঁকি দিতে দিতে চলে এসেছিলেন এদেশে। রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ গল্পের মতো লাগে সে কাহিনী। নিশুত রাত, মোস্‌লার দল ঘিরিয়া ফ্যাল্‌সে বারিখানি। হল্লা করত্যাসে চারপাশ থিক্যা। বারিখান য্যান লখিন্দরের লৌহবাসর। সে বাসরঘবে তবু একটা ছিদ্র সিলো। আমার তাও নাই। পোলাপানরা কান্দে, তোমাগো ম্যামসাহেব কান্দে। আমি কই, বিপদে, সঙ্কটে মাথাখান্‌ ঠাণ্ডা রাখন লাগে। চুপ মার। ভাবতে দাও।

তারপর ঠাণ্ডামাথায় ভাবতে ভাবতে কেমন করে তিনি বের করেছিলেন ছিদ্রপথ, কেমন করে বউ-বাচ্চা নিয়ে পালিয়েছিলেন শেষ রাতে, কেমন করে দিনে লুকিয়ে, রাতে হেঁটে, বোরখা পরে, নৌকোয় চড়ে, মিঞাসাহেব সেজে ট্রেনে উঠে, প্রায় মাসাধিক কাল বাদে পৌঁছে ছিলেন বর্ডারের এপারে, সে এক শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনী। কিন্তু এইখানেই তো শেষ নয়, এ তো মাত্র অর্ধেক। বাকিটুকু রোমাঞ্চ দ্বিতীয় পর্বে। সেটা তাঁর উদ্বাস্তু জীবন। রিফ্যুজি ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ। একসের চালের জন্য দিনভর দৌড়োদৌড়ি। একফোঁটা কেরোসিন বিহনে নিকষ অন্ধকারে রাত্রি যাপন। একমাত্র পুত্রের অসুস্থ শরীরখানাকে বয়ে বয়ে ডাক্তারের দোরে দোরে ঘোরা। এইভাবে এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্প, এক কলোনি থেকে অন্য কলোনি। কত রকমের বৃত্তি গ্রহণ। সাদা, কালো, সোজা-বেঁকা....। বলেন, 'আজ আর তোমাগো কইতে বাধা নাই, ডাকাত হয়্যা যাইতে পারতাম, ইস্‌মাগ্‌লার হয়্যা যাইতে পারতাম।' কিন্তু সে সব নাকি হন নি তিনি। মাথা ঠাণ্ডা রেখে, সব কিছুর মধ্যেও ঘুরে বেড়িয়েছেন চাকরির খোঁজ। চেনাজানা মুরুব্বি খুঁজেছেন দিনের পর দিন। তোয়াজ, তোষামোদি, হাতে ধরা, পায়ে ধরা....। অবশেষে, বহু ঘাটের জল খেয়ে ফুডে চাকরি। ফুড্‌ থেকে 'সিটেলমেন্ট'। সেখান থেকে আজ এখানে, অতখানি উচ্চতায়। এত ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও যে তিনি সততা হারান নি, নীতিহীনতার কাছে বিকিয়ে দেন নি নিজেকে, সে নাকি তাঁর উচ্চবংশ আর সুশিক্ষারই ফল। কৃষ্ণ নাগেরা জানে, এরপর বিডিও সাহেব তাঁর ওপারে ফেলে আসা ভূ-সম্পত্তির, সোনাদানার এক লম্বা ফিরিস্তি দেবেন।

গ্রামসেবকরা কেউ কেউ বেরিয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধদেব যায় নি। সে মুখ বুজে শুনছিল। সেদিনের পুরো ব্যাপারটা যে পূর্ব-পরিকল্পিত, সাজানো, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকে না ওর।

বিডিও সাহেব কপালে দু'চোখ তুলে দিয়ে বলেন, 'তবে, এস-ডি-ও সাহেবও সেদিন প্রম্পট্‌ এ্যাকশন নিয়েছেন। আগে থেকে বইলা রাখছিলাম বটে, তাও, অত জলদি পুলিশ আসবে, ভাবি নাই।' বলতে বলতে আচমকা বুদ্ধদেবের চোখে চোখ রাখেন বিডিও সাহেব। বলেন, 'কী? তোমাগো ফ্রেন্ড ক্যামন আসে? সুকুমার আচার্য? বিপ্লব কইর্‌তে আইসিল। বিপ্লব ঘুচাইয়া দিসি। অরে কইয়ো, এবারে জলখাবারের উপর দিয়া গেল। পরের বারে ভুরিভোজ দিমু। অবিনাশ ভৌমিকরে উ চিনে নাই।'

বিডিওর ঘর থেকে বেরোতেই ত্রিভঙ্গর সঙ্গে দেখা। বড়বাবুকে ডিম ভেট দিয়ে তিনমাসের টি-এ বিল পাশ করিয়ে ফিরছিল সে। বুদ্ধদেবকে দেখে হৈ-হৈ করে ওঠে। এই যে কর্মবীর, দেখা নেই যে! আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে। গড়গড় করে আউড়ে যায় ত্রিভঙ্গ।

বুদ্ধদেব বলে, 'তুমি নাকি প্রণয়দাকে কথা দিয়েছ সংগঠন করবে? তবে গেল হপ্তায় সংগঠনের মিছিলে যাও নি কেন? প্রণয়দা তোমায় খুঁজছিল।'

'বাপ্‌স্‌! এখন আমার দম ফেলবার জো আছে? এখন বস-এর ইন্‌ভেস্টমেন্ট চলছে।'

'বস? বস মানে?'

'বস মানে প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্তবাবু নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। আর ইন্‌ভেস্টমেন্ট মানে, দাদন।'

চাতুর্যে এক চোখ ছোট হয়ে আসে ত্রিভঙ্গর।

'প্রেসিডেন্টের দাদন, তাতে তোমার কাজটা কী?'

'আমার কাজ এ্যাকাউন্টেন্টের।'

বটতলায় দুঃখহরণের চায়ের দোকানে আঁচ দিয়েছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকাব। চেরা বাঁশের বেঞ্চিতে বসে দুজনে।

বুদ্ধদেব গুম মেরে ছিল। দেখে হাসি পায় ত্রিভঙ্গর। বলে, 'ভাবছ বুঝি ত্রিভঙ্গ পুরকায়েতটা পুরোপুরি শ্লেভ বনে গিয়েছে?'

বুদ্ধদেব জবাব দেয় না।

ডান হাতখানা বার দুই নেড়ে ত্রিভঙ্গ বলে, 'মোটেই তা ভেবো না। এতে আমারও ইনটারেস্ট রয়েছে।'

বুদ্ধদেব এক ঝলক তাকায়, দৃষ্টিতে এক ঝলক অগ্নিবর্ষণ।

ত্রিভঙ্গ গায়ে মাখে না। বলে, 'ঐ ফাঁকে আমিও কিঞ্চিৎ সাইড-ইনকাম করি।

'সাইড ইনকাম!'

'ইয়েস। মাস্টাররা টিউশনি করে, ডাক্তারবা প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করে, আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি?'

'প্রেসিডেন্ট তোমায় ঐ বাবদ মাইনে দেয়?'

'মাইনে? মাইনে তো সরকার দেয়।'

'তবে, প্রেসিডেন্ট তোমায় কী দেয়?'

'প্রেসিডেন্ট আমায় কিছুই দেয় না। কেবল মর‍্যাল সাপোর্ট দেয়। আসলে—।' ত্রিভঙ্গ ব্যাপারটা খোলসা করে, 'গেল-বছর পৌষে মন-দশেক ধান কিনে রেখেছিলাম। এখন সেটাই, লগ্নী করছি পাড়ায় পাড়ায়। খুব প্রফিটেব্ল্ মাইরি।'

ত্রিভঙ্গ ওকে ব্যাপারটা হিসেব কষে বোঝায়।

আগে ছিল এক গুলি অর্থাৎ কুড়ি সের ধানে দশ সেব সুদ। এখন অবশ্যি সুদ আর ঐভাবে হিসেব হয় না। এখন ধর, তুমি কুড়ি সের ধান কর্জ নিলে। হিসেবটা হবে টাকায়। আশ্বিন-কার্তিকে ধানের সের একটাকা। তাহলে তুমি নিলে কুড়ি টাকাব ধান। মাঘ মাসে শোধ দেবার সময় কুড়িটাকায় যতখানি ধান হয়, ততটা ধান ফেরত দেবে তুমি। মাঘ মাসে কুড়ি টাকায় চল্লিশ সের ধান হয়... ।

'কুড়ি সের ধান দিয়ে তিন মাসে কুড়ি সের সুদ! একেবারে ডবল!'

'সুদ কোথায়? এটাতো আসল। কুড়ি টাকা দিয়েছি, কুড়ি টাকাই ফেরত পেলাম। কেবল নগদে না পেয়ে ধানে পেলাম। এবার আসছে সুদের প্রসঙ্গ। হ্যাঁ, সুদ অবশ্যি সামান্য নিতে হয়। প্রতি টাকায় মাত্র একসের ধান সুদ। অর্থাৎ কুড়ি টাকার জন্য কুড়ি সের। ব্যস।'

'বাহ্ চমৎকার! কুড়ি সের ধান কর্জ দিয়ে তিনমাসে ষাট সের ধান ফেরত পাওয়া! তোমাদের চেয়ে জোঁকরাও বুঝি অধিক বিবেচক।'

'আরে আমার আর ক' মুঠো ধান? মোটে তো দশ মন। লাল হয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রেসিডেন্ট। এ মরসুমে প্রায় পাঁচশো মন ধান কর্জ দিয়েছে।'

বলতে বলতে সহসা মিইয়ে যায় ত্রিভঙ্গ, 'মাত্র দশ মন ধান ছড়িয়েছি এ বছর। এক্সপেরিমেন্ট বলতে পার। কত ঝুঁকি! আদায় না হলেই গেছি। হঠাৎ ট্রানস্‌ফার হয়ে গেলে...। অবশ্যি নরনারায়ণবাবু রয়েছেন। খুবই ব্রড-মাইন্ডেড মানুষ। বনেদি রক্তের গুণ যাবে কোথায়!'

আচমকা অন্য প্রসঙ্গে আসে ত্রিভঙ্গ।

'তুমি নাকি আজকাল ক্ষেত-মজুরদের নিয়ে আন্দোলন করছো?'

'আন্দোলন? মানে?'

'মানে, খুবই নাকি 'কাজ চাই, খাদ্য চাই, নইলে বিডিওর মুণ্ডু চাই' করছ আজকাল?'

বুদ্ধদেব ক্রুদ্ধচোখে তাকায়।

'তোমার এলাকায় কাজের দরকার নেই?'

'কাজ চালাবার জায়গা কোথায়? এখন ক্ষেতে বিলে ফসল, বাঁধে-জোড়ে জল...।'

বলতে বলতে ফিক করে হেসে ফেলে ত্রিভঙ্গ।

ওর দিকে কটমট করে তাকায় বুদ্ধদেব। বলে, 'তোমার এলাকায় অভাব নেই?'

'থাকবে না কেন? আমরা দাদন আর কর্জ দিয়ে সেই অভাব দূর করবার চেষ্টা করছি।' বলতে বলতে ত্রিভঙ্গর বাঁ চোখখানা অজান্তে ছোট হয়ে আসে। ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি উঁকি মেরেই মিলিয়ে যায়। বলে, 'এখন এলাকায় সরকারি কাজ আমদানি করলেই রসভঙ্গ হবে। যাকে বলে গুরু-চণ্ডালি দোষ।'

বুদ্ধদেব বলে, 'এলাকায় কৃষিঋণ বিলি করলে কী করে?'

'কেন? প্রেসিডেন্ট লিস্ট বানিয়ে দিল, আমি বিলি করে দিলাম।'

'প্রেসিডেন্ট কাদের লিস্ট বানাল? তারা কারা?'

'সে আমি জানি নে। আমি ভাই আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজে আমার কী দরকার, বল?'

বুদ্ধদেব স্থিরপলকে তাকিয়ে থাকে ত্রিভঙ্গর দিকে। ওর চোখের ওপর চোখ রেখে শুধোয়, 'বোন-মিল আর ইউরিয়াগুলো সত্যি সত্যি ছড়িয়েছ?'

'মা কালী। ছড়িয়েছি।'

'চাষীদের ক্ষেতে?'

'না!' বলেই চারপাশটা আড়চোখে দেখে নেয় ত্রিভঙ্গ। বলে, 'তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তাই বলছি। কথাটা ভুলেও ফাঁস কোর না যেন। সমস্ত সার ছড়িয়ে দিয়েছি দ্বারকেশ্বরের জলে। প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে একখানা সার্টিফিকেট নিয়ে জমা দিয়ে দিয়েছি স্বদেশ কুণ্ডুর কাছে।' বলতে বলতে পুনরায় এক চোখ ছোট করে হাসে ত্রিভঙ্গ। বুদ্ধদেবের পিঠে একখানা চাপড় মেরে বলে, 'এবার একটুখানি প্র্যাকটিক্যাল হও দেখি ব্রাদার। ঐ দ্যাখ, তোমার প্রাণেশ্বরী আসছেন।'

বুদ্ধদেব ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, মল্লিকা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে বটতলার দিকে।

ত্রিভঙ্গ ফিসফিসিয়ে বলে, 'স্বদেশ কুণ্ডু কিন্তু তোমার ওপর বেজায় ক্ষেপেছে। ওর প্রাণেশ্বরীকে বেমালুম কেড়ে নিলে তুমি! আমি হলে তো তোমায় খুন করে ফেলতাম।'

কারবুরেটরে ময়লা

দুর্গাপূজাটা চিরকালই সাড়ম্বরে করেন চুয়ামসিনার সিংহবাবুরা। দু'মহলে দু'টো পুজো। কনকপ্রভার মহলে দেবী দশভূজা, প্রতাপলালের মহলে সিংহবাহিনী। আড়ম্বরে কে কাকে কতখানি টেক্কা দিতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা চলে ফি-বছর। আমোদ-আহ্লাদ, আলোর রোশনাই, ভূরিভোজ, যাত্রাগান, কোন কিছুতেই কোনওপক্ষ পিছিয়ে থাকতে রাজি নন। কনকপ্রভা ফি-বছর পুজোর সময় বিঘে-পাঁচেক জমি বেচে দেন কেবল পুজোর খরচ জোগানোর জন্য। হরবল্লভ ওপথে কস্মিনকালেও হাঁটেন না। বরং তিনি একেওকে দিয়ে উসকে দেন, যাতে আড়ম্বরটা অধিক করতে গিয়ে কনকপ্রভা পাঁচের বদলে দশ বিঘে জমি বেচেন।

এবারের ধূমধামটা একটু বেশি। তার কারণও বর্তমান। পঞ্চায়েত নির্বাচনে হরবল্লভ প্রধান হয়েছেন। লায়েকবাঁধ অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান।

তেষট্টির শেষ নাগাদ সারা তল্লাটে রটে গেল, দেশে এবার পঞ্চাৎ হব্যেক। ইউনিয়ন বোর্ড আর থাইক্ব্যেক নাই। তার বদলে পঞ্চাৎ। গাঁ-ঘরের শাসন যাবে পঞ্চাতের হাতে। দেশের সর্বসাধারণ ভোটের মাধ্যমে গড়বেক সেই পঞ্চাৎ। গাঁ-ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম, বিচার-আচার সরকার সর্বসাধারণের হাতে তুইলে দিতে চায়। একটা চাপা উত্তেজনা তখন থেকেই তৈরি হচ্ছিল গাঁয়ের মাতব্বরদের মধ্যে। পঞ্চাতের ভোটে সবকিছু নাকি উলোট-পালোট হইয়েঁ যাব্যেক। ভারি ভারি মাথাগুলান থেকে খুলে যাবেক তাজ। রামা-ভীমার মাথায় চড়বেক সেসব। মানুষের রায়েই ঘটবেক এসব। ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি চলছিল সেই তখন থেকে।

তারপর, চোষট্টিতে শুরু হল পঞ্চাতের ভোট। তিনস্তরের পঞ্চায়েত। গাঁয়ে গ্রামসভা, তার ওপরে অঞ্চল পঞ্চায়েত, থানাস্তরে আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলাস্তরে জেলা পরিষদ। নাগাড়ে মাসটাক ধরে চলল সে ভোট। এবং ভোটের ফলাফল যখন বেরোল, দেখা গেল চোদ্দ আনা ভারি মুগুর ওপর অটুট রয়েছে তাজ। যাঁরা সব ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার ছিলেন, সবাই পঞ্চাতের কোনও না কোনও স্তরের মেম্বার হয়েছেন। যে সব ভারি ভারি মাথায় এ যাবৎ কোনও তাজ চড়ে নি, এই ভোটে চড়ল। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদের ভেতর থেকে যে দু'চারজন ভোটে জিতে এল, তারা প্রায় সবাই বাবুভায়াদের অনুগত-বশংবদজন। যারা সত্যিকারের বিরোধী, তারা সংখ্যায় এতই মুষ্টিমেয় যে তাদের কোনও কথাই কানে না তুললেও কিছুই আটকে থাকবে না কোথাও।

হরবল্লভ সিংহবাবু প্রধান হলেন। উপপ্রধান প্রমথ গাঙ্গুলি। ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস-খানাই অঞ্চল প্রধানের অফিস হয়ে সিংহগড়ে থেকে গেল। গ্রামসভার অধ্যক্ষ হলেন, দাপান-জুড়িতে কামদেব দত্ত, বৈদ্যায় শশধর ধল্ল, পাথরবেট্যায় ঝাড়েশ্বর নায়ক, লোখেশোলে মহাদেব কয়াল...। গ্রামসভার অধ্যক্ষ হয়ে ঝাড়েশ্বর নায়ক বেজায় খুশি। একে ওকে শুধোয়, এলাকার পড়ালিখা-ছোকরাদের, অধ্যক্ষ মানে কী রে বাপ? প্রভঞ্জন ভেবেচিন্তে বলে, অধ্যক্ষ মানে প্রিন্সিপাল। বিষ্টুপর কলেজের যিনি হেড, তাকে বলে প্রিন্সিপাল। বাংলায় তিনিই অধ্যক্ষ। প্রভঞ্জনকে দিয়েই এক জোড়া রাবার স্ট্যাম্প বানিয়ে এনেছে ঝাড়েশ্বর নায়ক। একটা বাংলায়। ঝাড়েশ্বর নায়ক, অধ্যক্ষ, পাথরবেট্যা গ্রামসভা। অন্যটা ইংরেজিতে। ঝারেশ্বর নাইয়ক, প্রিন্সিপ্যাল, পাথরবেট্যা ভিলেজ পঞ্চায়েত ইদানীং গাঁ-ঘরে খুব সার্টিফিকেট নেবার চল

হয়েছে। চাকরি-বাকরি, স্কুল-কলেজে ভর্তি, পুলিশের কনস্টেবল পদে ইনটারভিউ..., সব কিছুতেই পঞ্চায়েতের সার্টিফিকেট চাই। অঞ্চল প্রধান আবার গ্রামসভার অধ্যক্ষর সার্টিফিকেট ছাড়া এক কলমও লিখবে না। ইদানীং তাই খুব সার্টিফিকেট দিতে হয় ঝাড়েশ্বরকে। বাংলা রবার স্ট্যাম্পটা পড়েই তাকে। ঝাড়েশ্বর বাংলাতে সই করে, তার তলায় ইংরেজী রবারস্ট্যাম্পটা লাগাতেই পছন্দ করে। ঝারেশ্বর নাইয়ক, প্রিন্‌সিপ্যাল, পাথরবেট্যা ভিলেজ পঞ্চায়েত।

কৃষ্ণ নাগ, পঞ্চায়েত অফিসার, ইলেক্‌শন নিয়ে ক'মাস বড়ই ঝক্কি গেছে তার। বড়ই অনিয়ম আর ক্ষয় সয়েছে তার শরীর। এখন সুদে-আসলে পুষিয়ে নিচ্ছে। নবগঠিত পঞ্চায়েত থেকে নিয়মিত আমন্ত্রণ আসছে। বিজয়োৎসব পালিত হচ্ছে প্রতিটি পঞ্চায়েতে। বিডিও সাহেব এবং পঞ্চায়েত অফিসার যথাক্রমে এক নম্বর এবং দু'নম্বর অতিথি। উৎসব বলতে, এন্তার খানাপিনার আয়োজন। একটু একটু করে সমে ফিরছে কৃষ্ণ নাগ। পুনরায় কথায় কথায় সেই পুরোনো তালে বেজে ওঠা। সেই ছিপিখোলা সোডার বোতলের ঝাঁঝ।

বলে, ফিরে এল তো সেই একই টিম। ওল্ড ওয়াইন ইন এ নিউ বোতল।

অখিল সরকার বলে, সেই ওল্ড ওয়াইন এবার পানীয় হবে তোমার। তুমি তো পঞ্চায়েত অফিসার।

হেরম্ব বোস হাসে, ওল্ড ওয়াইনেরই তো দাম বেশি।

—হ্যাঁ, বনেদী মানুষেরাই এলেন। কৃষ্ণ নাগের গলায় এক ধরনের স্বস্তির আমেজ। —বনেদিয়ানার একটা দাম আছে। পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে।

—শুধু চাল নয়, করালী সোম আলোচনায় যোগ দেয় এতক্ষণে, মদ তো রয়েছেই, এছাড়া পুরোনো চাকর, পুরোনো শাল...।

—কী, কী, পুরোনো হলে খারাপ বল তো? কৃষ্ণ নাগ কাউকে অবারিত খেলতে দিতে চায় না কোনও মাঠে। বলে, বল দেখি?

—আমি এক নম্বরটা বলি? অখিল সরকার ক্লাসের ফার্স্টবয়ের মতো হাত তোলে, বউ।

—আরও একটা রয়েছে, চোখ নাচায় কৃষ্ণ নাগ, বলি?

—বল।

—বস।

সে কথায় সবগুলি চোখের তারা বিঁধে যায় কৃষ্ণ নাগের মুখের ওপর, তুমি কি বিডিও সাহেবকে মিন করছ ব্রাদার?

বিডিও সাহেবের একটা বদলির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে কিছুদিন যাবৎ। মাস ছয়েক আগে একটা বদলির অর্ডার এসেছিল। হরিপাল ব্লক। জেলা হুগলি। বিডিও সাহেব শ্রীরামপুরে বাড়ি করেছেন। অর্ডারটা আসামাত্তর হৈ-হৈ করে ওঠে আপামর ব্লক স্টাফ, বাড়ির কাছে বদলি, লটারির ফার্স্ট প্রাইজ, সেলিব্রেট করুন। খাওয়ান। কারা বেশি উচ্ছ্বসিত, কাদের চোখ আনন্দে হাজার-পাওয়ার হয়ে জ্বলছে, মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন বিডিও সাহেব। সবাইকে একেবারে চুপসে দিয়ে বলেন, দেখি। আমাগো তো আবার হার্টের ব্যামো। এ তথ্যটি প্রথম শুনল ব্লক-স্টাফ। বিডিও সাহেবের যে কস্মিন কালেও হার্টের কোনও অসুখ আছে, এর আগে কাকে-পক্ষীতেও তেমন খবর শোনে নি কেউ। তাছাড়া, সত্যিই যদি তাই হয়, তবে

বাড়ির কাছাকাছি যাওয়া তো আরো সুবিধাজনক। বউবাচ্চা রয়েছে শ্রীরামপুরে। এখানে একা একা। ভবানীর হাতের রান্না গিলতে গিলতে বেঁচে থাকা। কৃষ্ণ নাগ বলে, একেবারে একান্ত জনদের মধ্যে, ব্যাটা ঘুঘু, মনে মনে লাফাচ্ছে। মুখে এমন ভাব করছে, যেন, বেড়াল বলে মাছ খাবো না, আঁশ ছোব না.., কাশী যাব।

কিন্তু বিডিও সাহেব সত্যিসত্যিই মাছ খেলেন না, আঁশও ছুঁলেন না। হরিপালে গেলেন না। বার-দুই কোলকাতা দৌড়ঝাঁপ করে অর্ডারটা বাতিল করিয়ে ছাড়লেন। কী করেই বা যাবেন? হার্টের ব্যামো। ডাক্তার বলেছে, হারি, ওরি, ক্যারি—এক্কেবারে বারণ। অথচ শ্রীরামপুর থেকে হরিপাল অবধি রোজ ডেলি-প্যাসেঞ্জারি। রোজ ট্রেন ধরতে দৌড়নো, উৎকণ্ঠা আর পরিশ্রমের চূড়ান্ত, হাতের ঢাউস ব্রীফকেসটিকে বয়ে বেড়ানো...। না. এসব তাঁর কাছে আত্মহত্যার সামিল। ডাক্তার বলেছে। মাস তিনেক বাদে আবার বদলির অর্ডার। এবার খোদ শ্রীরামপুর। সঙ্গে ট্রানস্ফার টি-এ'র অ্যালটমেন্ট অবধি এসে হাজির। বড়বাবু দুটো অর্ডার একসঙ্গে নিয়ে মহানন্দে ঢোকেন সাহেবের ঘরে, ল্যান, আমও দিল্যাম, কোকিলও দিল্যম, এবার পাদান্ আর খান। পুনরায় উৎসবে মাতে ব্লক স্টাফ। এবার না খাওয়ালে আর ছাড়ছি নে কিছুতেই। কপাল বটে আপনার! তিন মাসের মধ্যে দু'দুটো সোনায় বাঁধানো অর্ডার। আগেরটা যদিও বা চোদ্দ-ক্যারট হয়, এবারেরটা এক্কেবারে বাইশ ক্যারাট। বিডিও সাহেব আবারও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, কার কার মুখে হীরে চমকাচ্ছে। লম্বা করে হাই তোলেন, দেখি। আমাগো তো আবার হার্টের ব্যামো। উদ্ভট প্রশ্নপত্র দেখে যেমন মাথা ঝিমঝিম করে পরীক্ষার হলে, তেমনই পাগল-পাগল অবস্থা ব্লক স্টাফের। এ কী দুর্জ্ঞেয় রহস্য!

বিডিও সাহেব এবারেও বাতিল করালেন অর্ডারখানা। বলেন, কী কইর‍্যা যামু? অফিসখান দোতলায়। এদিকে ডাক্তার কইসে, হার্টের অবস্থা এক্কেরে ভাল না। ভুঁড়ি-বিড়ি-সিঁড়ি - পুরোপুরি নিষেধ। বোঝো ব্যাপারখান্ । রোজ রোজ সিঁড়ি ভাইঙ্গা দোতলায় ওঠা! শুনলে, ডাক্তার আমারে ত্যাজ্যপুত্তুর করবে। কৃষ্ণ নাগ মুখ টিপে হাসে। দু'চোখে অতল রহস্য খেলা করে। জনান্তিকে বলে, বুঝে গেছি। এমন উর্বর তিন-ফসলা শোল-জমিন ছেড়ে কেউ কাঁকুরে ডাঙা কিনতে চায়!

নতুন পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর, নব-নির্বাচিত পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নে সম্প্রতি বিডিও সাহেবেব সঙ্গে কৃষ্ণ নাগের সামান্য মনকষাকষি হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদ তৈরি হয়েছে ব্লক-লেভেলে। চেয়ারম্যান হয়েছেন দ্বারিকার শিবশঙ্কর গোস্বামী। ইস্কুলের মাস্টার। কে ওকে বুঝিয়েছে, আইন মতো তিনিই নাকি বিডিওর বস। বিডিওর ওপর সব রকমের খবর্দারি করবার পূর্ণ অধিকার নাকি তাঁর রয়েছে। ছড়ি ঘোরানো শুরু করেছেন ইতিমধ্যেই। বিডিওর ট্যুর-ডায়েরি তলব করেছেন। মাঝে মধ্যে ব্লকের গাড়িখানা চেয়ে পাঠাচ্ছেন। একটু আধটু ধমকে দিচ্ছেনও বিডিওকে। বিডিও সাহেবের বিশ্বাস, কৃষ্ণ নাগই তলে তলে কলকাঠি নাড়ছে। সে-ই চেয়াম্যানকে ফোলাচ্ছে। তাতাচ্ছে। যখন তখন চলে যাচ্ছে চেয়ারম্যানের বাড়িতে। অতি খাতিরে পেট ডাগর, চেয়ারম্যানের বাড়াবাড়ি নিয়ে বিডিওর মন্তব্য। বলেন, অঘটির ঘটি হল, জল খেতে খেতে প্রাণ গেল। সভাপতির ওপর ক্রমশ চটছেন তিনি। তারও বেশি পঞ্চায়েতে অফিসারের ওপর। ঠেস দিয়ে কথা বলেন সুযোগমতো, পিঁপড়ার পাখা গজাইসে। একে ওকে একান্তে শুধোন, কাল সাপটা আমার লগে কিসু বলে?

পুরোনো বস ভাল নয়, কৃষ্ণ নাগের এ হেন মন্তব্যে জমায়েতে কিঞ্চিৎ উৎসাহের সঞ্চার হয়। সবাই একযোগে চেপে ধরে। এর অন্তর্নিহিত টিকা-ব্যাখ্যা দাবি করে। মন্তব্যটা করা মাত্রই কৃষ্ণ নাগ বুঝে ফেলেছিল, একখানা বেফাঁস কথা আচমকা বলে ফেলেছে সে। নির্বোধের মত কাজ একখানা। কথাটা গিলে ফেলা দরকার। পাকা ঘুঁটিটা কাঁচিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলে, তোমাদের শকুনের দৃষ্টি কেবল ভাগাড়ের দিকে। আমি বলছি টপ-বস। ওপরওয়ালা। ভগবান।

কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ। এবারে পুজোটা বেশ দেরিতেই পড়েছে। অষ্টমীর রাতে হরবল্লভের গড়ে রাতভর হৈ-হৈ, জমজমাট ব্যাপার। চারপাশের মানুষজন, পংক্তিভোজনে সামিল হবে। বাদ যাবে না কেউই। এলাকার সম্ভ্রান্ত মানুষেরা আমন্ত্রিত। বিষ্টুপুর থেকে এসেছেন শরদিন্দু উকিল। থানার বড়বাবু সদলবলে। ব্লক অফিস থেকে বিডিও সাহেব এসেছেন। সঙ্গে অফিসারবৃন্দ। এন্তার খানাপিনার বন্দোবস্ত। বয়স এবং পদাধিকারের ভিত্তিতে জোট বেঁধেছেন এঁরা. সারা সদরমহল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছেন। পান-ভোজন চলছে। তাসপাশার আসর জমে উঠেছে। কোথাও বা স্রেফ গুলতানি। বৈঠকখানার প্রশস্ত ঘরে জাজিম আর ফরাস পাতা হয়েছে পরিপাটি করে। তার ওপর তিনদিকে তাকিয়ার ব্যূহ রচনা করে জুত করে বসেছেন বিডিও সাহেব। পাশটিতে সমতুল ব্যূহের মধ্যে থানার বড়বাবু। গিরিন বক্সী। হরবল্লভ বসেছেন সামান্য তফাতে, পৃথক আসনে। তাঁর অবশ্যি সারাক্ষণ বসে থাকবার উপায় নেই। পূজাস্থলে মাঝে মধ্যেই ডাক পড়ছে। তাও যতটুকু সময় সঙ্গ দেওয়া যায় মাননীয় অতিথিবৃন্দকে। তাঁর অবর্তমানে প্রভঞ্জনই সামলাচ্ছে অতিথি আপ্যায়নের যাবতীয় ঝক্কি-ঝামেলা।

সামনের বর্ণাঢ্য পানপাত্রের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে প্রথমে মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন বিডিও সাহেব, বয়স হইসে। এখন আর তেমন সয় না। লিভারটা এক্কেরে গ্যাসে গা। এখন তাঁর দু'চোখ বেশ ঢুলুঢুলু আদুরে। সবাইয়ের দিকে বেশ মেদুর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। অকারণে হাসছেন মৃদুমৃদু। গিরীন বক্সী, তের বছর থানা চালাচ্ছেন, অত জলদি নেতিয়ে পড়েন না, খুব স্বাভাবিক গলায় বলেন, ঘুম পাচ্ছে, স্যর?

—এ্যাঁ? নাহ্। বিডিও সাহেব রুমাল দিয়ে মুখ মোছেন ঘনঘন। বলেন, ভিতরে একটা জার্ক হইত্যাসে।

—কারবুরেটরে ময়লা জমেছে, স্যর। মাংসের কুচি। গিরীন বক্সী রসিকের মতো হাসেন, দুঢোক গলায় ঢেলে কারবুরেটরের ময়লাটা সাফ করে নিন, স্যর।

রসিকতাটা বোঝার মতো অবস্থায় ছিলেন বিডিও সাহেব। হাসলেন। এমন মুহূর্তে মনটা অনেক উদার হয়ে আসে। নিজের মানুষকে কাছে পেতে সাধ জাগে। বিডিও সাহেব মোলায়েম গলায় শুধোন, করালী কই গেলা? কৃষ্ণ, উদয়, মহেন্দ্রবাবু, স্বদেশ —এরা সব গেলা কই?

—উয়ারা সব ঠিক আছে। হরবল্লভ আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করেন, 'মিতালি সংঘ'র ঘরে আড্ডা মারছেন উয়ারা। ছেলা-ছগ্‌রার দল, আপনাদের পাশাপাশি ভাল লাইগবেক কেন?

তাও যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না বিডিও সাহেব। কেবলই এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন উশখুশ।

হরবল্লভ বলেন, ভাববেন নাই। উখ্যেনে প্রভঞ্জন রয়েছে। খাতিরযত্নের ত্রুটি হবেক নাই।

—হাঁ—অদের একটু দেখভাল করবেন মশাই। বিডিও সাহেবেব চোখে সীমাহীন উদারতা, অরা আবার ভীষণ সেন্টিমেন্ট্যাল। ভাববে, কেবল বিডিও সাহেবকেই—।

রাতভর পংক্তিভোজন চলবে। সিংহগড় এরাতে দুচোখের পাতা এক করবে না। বালিঘাই থেকে এসেছে ধাওয়া পার্টি। 'মহিষাসুরমর্দিনী' পালা গাইবে।'

হরবল্লভ বলেন, আসর পাতা হয়েছে, স্যর। চলুন। যাতরা শুনবেন নাই?

বিডিও সাহেব ভুলভুল করে তাকিয়ে থাকেন হরবল্লভের দিকে। প্রস্তাবটা মগজের মধ্যে খেলাবার চেষ্টা চালান।

গিরীন বক্সী বাঁ হাতখানি মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে নাড়ান, আসরে যাবার কি দরকার? এই তো এখানেই বেশ আছি আমরা। এখান থেকেই দেখতে পাব বেশ।

—হাঁ-হাঁ। এখানে থেকেই দেখন যাইব। মুদে আসা চোখদুটি বারেকের তরে খোলেন বিডিও সাহেব।

বিশাল আসরেব মধ্যিখানে জমে ওঠে যাত্রাগান। অর্কেস্ট্রার চড়া আওয়াজে নৈশ বাতাস ছিন্নভিন্ন। শুনতে শুনতে বিডিও সাহেবের এক ধরনের ঘোর জমে চোখে। গেলাসের অবশিষ্ট তরল বস্তুটি এক নিঃশ্বাসে গলাঃধকরণ করেই আচমকা চেঁচিয়ে ওঠেন . রোমান্‌স্‌, কান্ট্রিমেন, এন্ড লাভার্স। হিয়ার মি ফর মাই কজ, এন্ড বি সাইলেন্ট, দ্যাট ইউ মে হিয়ার। বিলিভ মি ফর মাইন অনাব, এন্ড হ্যাভ রেসপেক্ট টু মাইন অনার দ্যাট ইউ মে বিলিভ। সেন্সর মি ইন ইয়োর উইজডম্‌, এন্ড এ্যাওয়েক ইয়োর সেনসেস্‌...ইয়োর সেনসেস....ইয়োর...।

সবাই চমকে উঠেছিল। সামলে নেয় পরমুহূর্তেই। গিরীন বক্সী মিটিমিটি হাসছিলেন। একজিকিউটিভ অফিসারদের অমন কাছাখোলা অবস্থায় দেখলেই মনে বড় পুলক জাগে তাঁর। এই বিডিও আবার এক বস্তুবিশেষ। কোনও ব্যাপারে কিছু বলতে গেলেই আগেভাগে বলে ওঠে, বুঝসি, বুঝসি। কওন লাগব না। ফুডে সিলাম, সিটেলমেন্টে সিলাম, কোনও কিসুই আননোন নাই আমার।

বিডিও সাহেব পার্ট থামাতেই হাততালি দিয়ে ওঠেন গিরীন বক্সী, ব্রেভো, ব্রেভো।

লাজুক হাসেন বিডিও সাহেব, সিলো, সিলো, ভিতরে মাল সিলো। বুইলেন? অহন না হয় সাইড়া-সুইড়া দিসি গা।

উনি যখন গলার শিরা ফুলিয়ে ব্রুটাসের পার্ট কবছিলেন, সেই সুযোগে ওঁর গেলাসখানি ভরে দিয়েছেন গিরীন বক্সী। অন্যমনস্কভাবে গেলাসখানা তুলে নিতে নিতে বিডিও সাহেব বলেন, কলেজে আমার ব্রুটাসের পার্ট শুইন্যা প্রিন্সিপ্যাল আমারে একখান সোনার কলম দিসিলেন। আর কইসিলেন, ভৌমিক, তুমি ফিউচারে গিরীশ ঘোষ হইবা গা।

মিটিমিটি হাসছিলেন গিরীন বক্সী। এসব বেহেড মানুষকে দেখতে তাঁর ভালই লাগে। বলেন, গিরীশ ঘোষ হলেন না কেন?

—কই আর হইলাম! একটা আলতো হেঁচকি তুলে বিডিও সাহেব বলেন, দ্যাশে দাঙ্গা বাধল, এ দ্যাশে আইলাম, তারপর সাত ঘাটের জল খায়্যা, শ্যাষম্যাষ ফুড ডিপার্টমেন্টে জয়েন করলাম, সেখানে ডিলার প্যাঁদাইতে প্যাঁদাইতে ভিতরের সব মাল হাপিস হইয়া গেল গা। ফুড থেকে সিটেলমেন্টে, সেহান থিকে—।

দ্বিতীয় অঙ্কের পর একটা নাচ।

অর্কেস্ট্রা বাজছিল বেশ মনোহারী চটুল সুরে। বৈঠকখানায় বসে বসে তালেতালে মাথা দোলাচ্ছিলেন বিডিও সাহেব। ভেতর থেকে এক ধরনের রোমান্টিক বায়ুনিঃসরণ হচ্ছিল ঘনঘন। ঝলমলে পোষাক পরে জরির বুটি দেওয়া ওড়না দুলিয়ে লাস্যময়ী নর্তকীবেশী ছোকরাটি নেচে চলেছে তুখোড়। ঠিক সেই মুহূর্তে গাঁয়ের উত্তর দিক থেকে ভেসে আসে হল্লা। মুহূর্তে আসর ঢিলেঢালা। জমায়েত চঞ্চল। গাঁয়েগঞ্জে ডাকাতি হচ্ছে খুব। দলে দলে উঠে পড়ে মানুষ। দৌড় দেয় দেউড়ির দিকে।

কে যেন খবর দেয়, মাঝের পাড়ায় ডাকাতি হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নড়েচড়ে বসেন গিরীন বক্সী। নেশা ছুটে যাবার জোগাড়। কোমরবন্দের চারপাশে হাত চারিয়ে পিস্তলখানার হদিশ পান। এলোপাতাড়ি টুপিখানা খুঁজতে থাকেন তাকিয়াগুলো সরিয়ে দিয়ে। অবশেষে টুপিখানাও পাওয়া যায়। কোনমতে ওটা মাথায় চড়িয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই ফের বসে পড়েন। নাহ্, বড় বেশি হয়ে গেছে। এ অবস্থায় ডাকাত ধরতে যাওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। বেকুবি। সেপাইগুলোর কথা ফিকে ফিকে মনে পড়ে। সন্ধ্যে থেকে ওরা সব কোথায় হাওয়া হয়েছে, কে জানে! এতক্ষণ কি আর হুঁশে আছে কেউ! বহুদিন বাদে এমন সরেস বস্তুর অপরিমিত সাপ্লাই পাওয়া গেছে। একেবারেই বিলাইতি। থাক্‌গে। গিরীন বক্সী তাকিয়ায় এলিয়ে বসেন। কাল সকালে কিছু এ্যারেস্ট-ফ্যারেস্ট করলেই চলবে। ঐ বাউরিপাড়ার শালাদেরই কাণ্ড। এই অজ গাঁয়ে ডাকাতি করতে কি বিলেত থেকে লোক আসবে! ঐ জ্ঞানা, কৈলাস, নুটু,—এরাই, আবার কে! সঙ্গে ঐ বখাটে সুকুমারটাও থাকতে পারে। সুযোগমতো ওকে কোনও একটা কেসে ফাঁসিয়ে দেবার কথাটা মাঝে মাঝে মনে হয় গিরীন বক্সীর। ব্যাটা বড্ড উড়ছে। গরীব-রাজ কায়েম করবে! এই প্রকারে ভাবতে ভাবতে এ্যারেস্ট, ইনভেস্টিগেশন থেকে চার্জসীট অবধি একটা কাঁচা খসড়া ছকে নিয়ে আবার গেলাসে মাল ঢালেন গিরীন বক্সী।

চিৎকার-চেঁচামেচি-হল্লাকে অনুসরণ করে কাতারে কাতারে মানুষ হাজির হয় উত্তর-পাড়ায়। সেখানে জগন্নাথ মণ্ডলের বাড়ির খিড়কিতে একটা মাঝারি জমায়েত। ধ্বস্তাধ্বস্তি। ঠেলাঠেলির আওয়াজ।

—কি বেপার হে?

—চোর হে, চোর। জলসি আস।

পা চালিয়ে হাঁটে সবাই।

—কই, কুথা চোর?

—এই তো, এই যে।

মানুষগুলো পায়েপায়ে হাজির হয় অকুস্থলে।

নরম মাটির ওপর দু'তিনটি মাঝারি সাইজের গর্ত।

—ইখ্যেনে গর্ত কিসের হে? কে খুঁড়ল্যাক?

—কে আবার, চোর।

সবাই দেখে চোরকে। শিকারিপাড়ার গুঁইরাম শিকারি। খাঁচার মতো ধুকপুকে বুকখানি কান্নার দমকে ওঠানামা করছিল। এরওর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল বারবার।

গুঁইরামের বয়েস প্রায় চল্লিশ। বছর দুই যক্ষারোগে শয্যাশায়ী। ঘরে বউকে নিয়ে প্রায় সাত-আটজনের সংসার। প্রতি রাতেই কান্নার রোল ওঠে তার ঘরে। সারাদিন বহুকষ্টে

পেটকে সামাল দিয়ে সন্ধের পর বুক ফাটিয়ে কান্না জোড়ে বাচ্চাগুলো। তখন গুঁইরাম একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে পাগলের মতো পেটাতে থাকে বাচ্চাগুলোকে। বউকে। তারপর রাতভর চলে তার একনাগাড়ে কাশি। খক্‌খক্ করে কেসেই চলে সে।

—তুই ত টুকচান আগেই বাবুদ্যার গড়ে ভোজ খাচ্ছিলু রে।

—হঁ, আইজ্ঞা। ব্যাকুল গলায় বলে ওঠে গুঁইরাম।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বোধগম্য হয়েছে সবাইয়ের। চুরির মাল পড়ে রয়েছে পাশেই। গর্তগুলোর অর্থও পরিষ্কার। জগন্নাথ মণ্ডলের খিড়কির জমিন থেকে গোটা তিনেক ওল খুঁড়েছে গুঁইরাম শিকারি। একেবারে বুনো ওল। অজস্র ফলেছে পুরো খিড়কি জুড়ে। কেউ লাগায় নি। এমনি এমনি হয়েছে বুনো ওলের জঙ্গল। তক্কেতক্কে ছিল গুঁইরাম। আজ সন্ধেপ্রহরে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে বউ চলে গেছে সিংহগড়ে। গুঁইরামও গিয়েছিল। প্রথম পংক্তিকে খেয়ে নিয়েছে। বউ-বাচ্চার জায়গা হয়নি। কতক্ষণে হবে জানে না কেউ। গুঁইরাম বলে, তুয়ারা খেইয়েঁ-দেইয়ে আয়, আমি চলল্যম। এই রুগ্ণ শরীর লিয়ে আর বসতে লারি। মণ্ডলের বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই বুদ্ধিটা খেলল মগজে। বাড়ি গিয়ে একখানা বোঁচা কোদাল নিয়ে ফিরে এল মণ্ডলের ভিটেয়। মণ্ডলের বাড়ির লোকজন সব সিংহগড়ে। কিন্তু ধরা পড়ে গেল পথ-চলতি মানুষজনের হাতে। ওরা যাচ্ছিল যাত্রাখান শুনতে সিংহগড়ের দিকেই।

ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদছিল গুঁইরাম শিকারি। রক্তহীন স্যাঁতাপড়া মুখে করুণ ভাবখানা ইদানীং আর তত ফোটে না। তাও ইনিয়েবিনিয়ে ব্যাখ্যা করছিল তার অবস্থা। মণ্ডলদের এক রাত্তিরের অনুপস্থিতির সুযোগে সে তার পুরো পরিবারের এক হপ্তার খোরাক সংগ্রহ করে নিতে চেয়েছিল। কাজটা হয়েও যেত। কিন্তু গোল বাধাল্যাক উই ব্যাধা (জারজ) কাশ। কোদাল চালাতে চালাতে আচমকা কাশ উঠল্যাক। আর তাতেই ওর সাড়া পেয়ে গেল পথচলতি মানুষজন।

সাকুল্যে তিনটে ওল। কেজি পাঁচেক ওজন হবে। ছেড়ে হয়ত দেওয়া যেত দু'চার ঘা লাগিয়ে। কিন্তু অভিলাষ চৌকিদার আজ সারা সন্ধে পাগ-পেটি পরে তৈরি হয়ে রয়েছে। থানার বড়বাবু আজ অবস্থান করছেন গাঁয়ে। অভিলাষের সহসা কাজ দেখাবার সাধ জাগে। দক্ষতা প্রমাণ কবার এতবড় সুযোগ বড় একটা মেলে না। মণ্ডলের গোয়াল থেকেই সে খুঁজে-পেতে আনে একটা গরু বাঁধবার রশি। গুঁইরামের কোমরে পরপব তিনটে প্যাঁচ মারে। চুরির যাবতীয় মাল ওর ঘাড়ে চাপায়। তারপর বিজয়গৌরবে রওনা দেয় সিংহগড়ের দিকে।

যথাসময়ে সিংহগড়ের বৈঠকখানায় খবরটা এসে পৌঁছোয়।

বাবুদের নেশা তখন তুঙ্গে। অমন জমজমাট ঘটনার এমন হাস্যকর পরিণতি দেখে হো-হো করে হেসে ওঠেন গিরীন বক্সী। দেখাদেখি বিডিও সাহেবও হাসতে থাকেন। হাসতে হাসতে এর-ওর গায়ে এলিয়ে পড়তে থাকেন।

—এন্টি-ক্লাইমেক্স! এন্টি-ক্লাইমেক্স! ব্যাটা এক্কেরে বেরসিক। বলতে বলতে পুনরায় ঢলে পড়েন বিডিও সাহেব।

আসরে পুনরায় অর্কেস্ট্রা বেজে ওঠে। জমায়েত ঘন হয়ে বসে। নর্তকীবেশী ছোকরা ওড়না দুলিয়ে নাচতে থাকে। উঠোনের এককোণে গুঁইরামকে বসিয়ে পাহারা দিতে থাকে অভিলাষ। আজ তার অগ্নিপরীক্ষার রাত।

কার্তিকের হিম ঝরছে আকাশ থেকে। ভিজে যাচ্ছে গুঁইরামের সারা শরীর। বুকের খাঁচা থেকে উঠে আসতে চায় দমকে দমকে কাশি। প্রাণপণে চেপে রখাবার চেষ্টা করে সে। এখন তার কাশাও বারণ। অপরাধ বেড়ে যাবে তাতে।

শিকল টানে ভুখা মানুষ

কাজটা অবশেষে শুরু হতে চলেছে আজ। মাঝের ডিহির কুচলাগাছ থেকে সাঁওতাল পাড়া অবধি মাইলটাক রাস্তার কাজ।

কাজের দাবিটাকে যত নির্দয়ভাবে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেদিন, ততোধিক নাটকীয়ভাবে কাজটা শুরু হল আবার। সেদিন, গ্রামসেবকদের বৈঠকে বিডিও সাহেব যখন আত্মপ্রসাদে ফুলতে ফুলতে বলছিলেন তাঁর মাথা ঠাণ্ডা রেখে পূর্ববঙ্গ ছাড়বার রোমাঞ্চকর কাহিনী, ঠিক সেই মুহূর্তে আরও রোমাঞ্চকর কিছু ঘটছিল অন্তরালে, ব্লক অফিসে বসে কেউই বুঝতে পারেন নি সেটা। একটুবাদে যখন এস-ডি-ওর চেম্বারে ডাক পড়ল বিডিও সাহেবের এবং মিনিট কতক বাদে যখন করালী সোমেরও ডাক পড়ল, তখন জানা গেল ব্যাপারটা। এস-ডি-ও সাহেবের ঘর থেকেই বিডিও সাহেব ফোনে নির্দেশ দিয়েছিলেন বুদ্ধদেবকে। বুদ্ধ, যাইও না। আরজেন্ট ইনিস্ট্রাকশন ওয়েট্স্ ফর ইউ। পরবর্তীকালে টুকরো টুকরো যেটুকু কানে এসেছে বুদ্ধদেবের, তাকে জোড়া দিলে যা দাঁড়ায়, তা হল, কাজের দাবিতে ভুখা মানুষের ওপর লাঠিচার্জ হয়েছে এ খবরে নতুন ডি-এম খুবই রেগে যান। এস-ডি-ওকে ধমকান সেজন্য। কম্যুনিস্টপার্টির জেলান্তরের নেতারা পুরো ঘটনার তদন্ত দাবি করেন। কর্মচারী সমিতিও দেখা করে ডি-এমের সঙ্গে। সুবিচার দাবি করে। সুকুমার আর তিলককে বাঁকুড়ার হাসপাতালে ট্রানস্ফার করতে হয়েছিল। শোনা যায়, ডি-এম নাকি স্বয়ং হাসপাতালে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন ওদের অবস্থা। তারপরই নির্দেশ দিয়েছেন, কাজের দাবিতে যারা এসেছিল সেদিন, মার খেয়ে ফিরে গেছে, তাদের জন্য অবিলম্বে কাজের বন্দোবস্ত করতে হবে বিডিওকে। টাকা জেলা-ফান্ড থেকে দেওয়া হবে। ব্যাপারটা ছিল এস-ডিও, বিডিও, হরবল্লভ এবং স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের কাছে মৃত্যুদণ্ডের সামিল। ওপরের দিকে প্রবল ঘৃণায় ছুঁড়ে দেওয়া থুথুখানি নিজেদের ওপরে পড়বার উপক্রম। এরপর তো মুখ দেখানো দায় হবে মানুষের কাছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানোই দায় হবে। লোকে টিটকিরি দেবে আড়ালে। এস-ডি-ও সাহেব একটা গ্রহণযোগ্য ফর্মুলা পেশ করেছিলেন ডি-এম'এর কাছে। কাজ হোক, তবে ঐ এলাকায় নয়। চুয়ামসিনা ইউনিয়ন বোর্ড এলাকায় তো আরও অনেক গ্রাম রয়েছে। তেমন কোনও এলাকায় একটা কাজ শুরু করা যেতে পারে। তাতে এরাও পেতে পারে কাজ। তাতে করে অন্তত এমন ধারণা হবে না যে, সেদিনের কাজের দাবিটাকেই মেনে নেওয়া হল। ফেলে দেওয়া থুথুটাকে পুনরায় জিভ দিয়ে চাটতে হল। ডি-এম কর্ণপাত করেন নি সে প্রস্তাবে। তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল। যে এলাকার মানুষ এসেছিল সেদিন, ঐ এলাকায় কাজটা করাতে হবে। যে রাস্তাটার জন্য এসেছিল ওরা, ওটাই শুরু করতে হবে। মুখ পুড়িয়ে এক হপ্তার মধ্যেই কাজটা শুরু করতে হয়েছে বিডিওকে। কিন্তু হরবল্লভের বেজায় গোঁসা হয়েছে তাতে। নিদারুণ অপমানিত বোধ করেছেন তিনি। তিনি দোর্দন্ড প্রতাপশালী জমিদারের সন্তান। ছোটলোকদের মুখে বিজয়ীর হাসি দেখতে অভ্যস্ত নন একেবারেই। সবিনয়ে বিডিওকে বলেছেন, আপনারা চাকরি করতে আইছেন, ডি-এম-এর কথা আপনাদের মানতেই হবেক। আমি এত অপমান মানতে অক্ষম। মান-সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের কাজ কইব্তো অক্ষম

আমি। আপনারা এ কাজ অন্য কারুকে দিয়ে করান। এইসব নীলরক্তওয়ালা লোকগুলোকে বিডিও সাহেব ভালই চেনেন। এরা ভাঙবে, তবু মচকাবে না। তিন কাঠা জমির দখল নিতে এরা তিরিশ বছর মামলা চালাতে রাজি, তিবিশ হাজার টাকা খসাতে তৈরি। এমনি ওদের কচ্ছপের জেদ। বলে, লাগাও খুঁটি, বাইরে শুবো।

সুকুমারের চোট তত মারাত্মক নয়। মাথায় গোটাদশেক সেলাই পড়েছে। হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে ওকে। ঘা এখনও পুরোপুরি শুকোয় নি, তবে মাথায় ফেট্টি বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। তিলক বাউরিই কেবল হাতে প্লাস্টারবাঁধা অবস্থায় শুয়ে রয়েছে হাসপাতালে।

বাধ্য হয়ে সুকুমারকেই ডেকে পাঠান বিডিও সাহেব। বলেন, 'কেউ যখন রাজি নয়, আপনিই কাজটা চালান। পে-মাস্টার হন আপ্নেনি। একজন মোহরার জুটাইয়া লন গা। আর বুদ্ধদেব ত রইসেই। অই হবে স্কীমটার অফিসার-ইন-চার্জ।' দু'চোখ নাচিয়ে বিডিও সাহেব বলেন, 'একখান কাজ করাইয়া দ্যাখাইয়া দ্যান দেহি। সরকারি কাজের তো শুধুই বদনাম। সক্কলে নাকি চুরি কইর‍্যা ফাঁক কইর‍্যা দেয়। একটা ইনস্টেন্স রাখেন দেহি।'

কাজটা শুরু হচ্ছে শুনে পাড়ায় পাড়ায় খুশির বন্যা বয়ে যায়। তারপর সুকুমার আর বুদ্ধদেবের ওপর কাজটা করানোর দায়িত্ব পড়েছে জেনে মানুষজন আহ্লাদে আটখানা। হঠাৎ মুর্মূকেই মোহরার হিসেবে বেছে নিয়েছে সুকুমার। কেবল, এতখানি সুখেব মধ্যে একটুখানি কাঁটা খচখচ করে বিঁধতে থাকে গলায়। তিলকটা পড়ে রইল হাসপাতালে। এই আনন্দের ভাগটুকু নিতে পারল না বেচারা।

ডি-এম'এর ভূমিকায় একেবারে আপ্লুত হয়ে রয়েছে সুকুমার। বলে, 'আপনাদের প্রশাসনে এমন মানুষ আর ক'জনা আছে?'

'বেশি নেই।' বুদ্ধদেব জবাব দেয়, 'এমন মানুষ বেশি থাকে না। বেশিদিনও থাকে না।'

'বেশিদিন থাকে না মানে?'

বুদ্ধদেবকে সামান্য বিমর্ষ দেখায়, 'এই মানুষটি কোথাও বেশিদিন থাকতে পারেন না। মানে, থাকতে দেওযা হয় না।'

'আপনি উয়াকে চিনেন?'

মাথা নেড়ে সায় দেয় বুদ্ধদেব, 'চিনি।'

'কেমন কইর‍্যে?'

'আমাদের কাঁথির এস-ডি-ও ছিলেন উনি। তখন থেকেই খবরের কাগজের দৌলতে বিখ্যাত। কাগজে দেখে থাকবেন নাম। খুর্শিদ আলম।'

সুকুমার মনে করতে পারে না। বলে, 'খবরের কাগজে কী লিখেছিল ওঁকে নিয়ে?'

'সে এক মজার ঘটনা।' বুদ্ধদেব সংক্ষেপে ঘটনাটা শোনায়।

তখন আলম সাহেব নতুন গিয়েছেন এস-ডি-ও হয়ে। আর মতীশ জানা কিনা কাঁথির এক নম্বর নেতা। একেবারে মুকুটহীন সম্রাট। বিধান রায়, অতুল্য ঘোষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন ফোনে।

তো, বাহিরি হাইস্কুল কাঁথি মহকুমার প্রাচীন স্কুল। খুব নামডাক তার। সেই স্কুলে রবীন্দ্রজয়ন্তী হচ্ছে। মতীশ জানা সভাপতি, আলম সাহেব প্রধান অতিথি। পাশাপাশি বসে রয়েছেন মঞ্চে। একসময় মতীশ জানা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন আলম সাহেবকে। মৃদু পিঠ চাপড়ে বললেন, 'হ্যালো ইয়ংম্যান, কাঁথি কেমন লাগছে?'

আলম সাহেব তখন সদ্য আই-এ-এস। শরীরের রক্ত টগবগিয়ে ফুটছে। কাউকেই কেয়ার করেন না। সর্বসমক্ষে একজন রাজনৈতিক নেতার পিঠচাপড়ানি তাঁর মোটেই ভাল লাগল না। খুবই অপমানিত বোধ করলেন তিনি। খুব কঠিন চোখে তাকালেন মতীশ জানার দিকে। মতীশ জানারও ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হয় নি। কিন্তু ডাঃ রায়, অতুল্য ঘোষদের আস্কারা পেয়ে তিনিও তখন মাটির থেকে একহাত ওপরে হাঁটেন। আলম সাহেবের রোষকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না তিনি। বরং মুচকি হেসে বললেন, 'পিঠ চাপড়ালাম বলে রাগ করো না, ইয়ং ম্যান। এই মতীশ জানার পিঠ চাপড়ানি খেয়ে কত এস-ডি-ওর প্রমোশন হয়ে গেল।'

সাপের রাগখানি বুকের মধ্যে পুষে নিয়ে সে সন্ধ্যায় ফিরে গেলেন আলম সাহেব। ঠিক সাতদিনেরর মাথায় বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে মতীশ জানার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। কী? না, আপনার ধানের গোলা দেখব। খবর আছে, আপনি সিলিং বহির্ভূত ধান মজুত করে রেখেছেন। ততক্ষণে বিস্ময়ে থ' হয়ে গিয়েছেন মতীশ জানা। বলেন, 'আপনার সাহস তো কম নয়! আমার একটি টেলিফোনে আপনার চাকরি চলে যেতে পারে, তা জানেন?'

—জেনে আমার কাজ নেই। আগে তো আইন মোতাবেক এই কাজটা শেষ করি। তারপর আপনি না হয় আমার ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দেবেন।

প্রতিটি গোলার থেকে ধান নামানো হল, ওজন হল। মোট বাইশ-শো মন অতিরিক্ত ধান পাওয়া গেল। সমস্ত ধান সীজ করে, মতীশ জানাকে কোমরে দড়ি পরিয়ে কাঁথির জনাকীর্ণ এলাকা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন নিজের কোর্টে। সেখানেও তাঁর জামিন মঞ্জুর করলেন না। কোমরে দড়িবাঁধা অবস্থায় মতীশ জানা চলে গেলেন থানা-লক-আপে। শোনা যায়, সেই দিন আলম সাহেবের নির্দেশে কিছু দাগী চোরকে এনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল একই লক-আপে। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল, লক-আপের মধ্যে যেন মতীশ জানাকে যৎপরোনাস্তি হেনস্থা করে। ওরা নাকি সারা রাত কিস্তিতে কিস্তিতে ওকে মারধোর করেছিল। এমন কি ওর গায়ে নাকি পেচ্ছাবও করেছিল।

'তারপর?' বিস্ফারিত চোখে শুধোয় সুকুমার।

'তারপর আর কি?' ধান সীজ করাকালীন মতীশ জানাকে কোনও ফোন করতে দেওয়া হয় নি কোলকাতায়। কিন্তু ওকে হাজতে পুরে দেওয়ার পর পুরো কাঁথি শহর জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। একে একে ফোন করে খবরটা জানানো হয় ডি-এমকে, কোলকাতায় রাজ্য- নেতাদের, এমন কি ডাক্তার রায়কেও। মতীশ জানার মতো মানুষ হাজতে বন্দী, এমন খবরে জেলা-অফিস থেকে খোদ রাজধানী অবধি কেঁপে ওঠে। ডি-এম-এর ফোন আসে আধ ঘন্টার মধ্যে। করেছ কি? কাকে ধরেছ জানো? কোনও ধারণা আছে তোমার? ইমিডিয়েট্‌লি ছেড়ে দাও। খুব নম্র গলায় আলম সাহেব জবাব দেন, নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ধরা হয়েছে ওঁকে। কোর্ট ওকে জামিন দেয় নি। আমি কী করে ছাড়ব? শুনে ডি-এম ক্ষেপে ফায়ার। রসিকতা করো না। এক্ষুনি ওকে জামিন দিয়ে দাও। এবার কঠিন হয়ে ওঠে আলম

সাহেবের গলা, আপনি কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দিচ্ছেন স্যার। আমি কি আপনার কথার জুডিসিয়াল কগনাইজেন্স নেবো? ফোন নামিয়ে রাখেন ডি-এম। কিন্তু অল্পক্ষণ বাদেই ফোন আসে খোদ রাজধানী থেকে। কার ফোন জানেন? খোদ ডাঃ রায়ের। কিন্তু তখন এস-ডি-ও কোথায়? কাউকে কিছু না বলে তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন ট্যুরে। কোথায় গিয়েছেন, কখন ফিরবেন, কেউ তা জানে না।

হো-হো করে হেসে ওঠে সুকুমার, 'খুব ত্যাঁদোড় লোক তো!'

গভীর রাতে নিঃশব্দে বাংলোয় ফিরে আসেন আলম সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রায়ের ফোন। বাধ্য হয়ে ফোন ধরেন আলম সাহেব। ডাঃ রায় ওকে খুব করে ধমকান। তারপর বলেন, আইন মোতাবেক ঠিক কাজই করেছ তুমি। কিন্তু আমাদের দিকটাও তো দেখতে হবে। ছেড়ে দাও ওকে। জামিনেই ছাড়। আলম সাহেব তো চান না রাতের আঁধারে সবার অলক্ষ্যে বাড়ি ফিরে যাক লোকটা। বলেন, রাত্রিতে জামিনে ছাড়া নিরাপদ হবে না স্যার। আমাকে উল্টো ফাঁসিয়ে দিতে পারে। কাল ভোরেই ছেড়ে দেব। সেই রাতের মধ্যেই থানার ওসিকে দিয়ে অনেক লোক আমদানি করলেন আলম সাহেব। ভোরের আলো যখন ফুটল, থানার সামনে তখন কাতারে কাতারে মানুষ। জামিনে ছেড়ে দেওয়া হল মতীশ জানাকে। ধুলি-ধূসরিত শরীরখানিতে সারারাত্রির উজাগরের ক্লান্তি। উসকোখুসকো চুল। আর লজ্জায় অপমানে তাঁর মুখে যেন গাঢ় একপোচ কালি মাখিয়ে দিয়েছে কেউ। হাজার মানুষের সামনে লক-আপ থেকে বেরোলেন তিনি। মানুষের ভেতর দিয়ে পথ করে করে হাঁটতে লাগলেন বাড়ির উদ্দেশ্যে।

'তারপর?' সুকুমার যেন বিস্ময়ে কথা বলতে পারছিল না।

'তারপর? চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বদলির অর্ডার এসে গেল আলম সাহেবের। পরের দিনই তিনি জয়েন করলেন ঝাড়গ্রামে।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সুকুমার। যেন এতক্ষণ রূপকথার গল্প শুনছিল সে।

উজ্জ্বল চোখে বুদ্ধদেব বলে, 'সারা কাঁথি এখনো করে সেই গল্প। রাতারাতি মানুষটি সারা এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে 'হিরো' বনে গিয়েছিলেন।'

'কিন্তু অতখানি রাগী বলে তো মনে হল না।' সুকুমার বলে,' আমাদের যেদিন দেখতে গেলেন হাসপাতালে, দিব্যি হাসিখুশি শান্ত ভাব। কত কথা বললেন, গল্প শোনালেন।'

বুদ্ধদেব হাসে। বলে, 'হীরে দেখে কি বোঝা যায় ওটা মোটা মোটা কাচকে বেমালুম কেটে ফেলতে পারে?'

রাত না পোহাতেই মাঝেরডিহির কাঁকুরে ডাঙায় হাজার মানুষের জমায়েত। ঝুড়ি-কোদালের পাহাড়। মানুষগুলো শুধু হুকুমের অপেক্ষায় ক্ষণ গোনে।

ডাঙায় পৌঁছেই সুকুমারের চোখ ছানাবড়া। এ যে প্রায় চার-পাঁচটা গাঁ ভেঙে এসেছে! রাতারাতি এদের খবর দিল কে? বুদ্ধদেব বলে, আমি দিই নি। হাঁদা মুর্মু বলে, আমি দিই নি। হঠাৎ মুর্মু বলে, আমিও লয়। তবে?

সুকুমারের দু'চোখ ছোট হয়ে আসে সন্দেহে। একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পায় সে। জনে-জনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। মুখে মুখে কেমন করে যেন চাউর হয়ে গিয়েছে খবরটা।

কেউই সঠিক কিছু বলতে পারে না। সবাই শুনেছে পড়শির কাছ থেকে। পড়শি শুনেছে তার পড়শির কাছ থেকে। সে শুনেছে জয়রামপুরের হাটে। আপাতত অনুসন্ধানপর্ব মুলতুবি রাখে সুকুমার। ডিহির ওপর একটা উঁচু টিকরার মাথায় চড়ে চিৎকার শুরু করে। একশো জনের বেশি কাজ হবেক নাই আজ। মাঝেরডিহি বাদে বাকি সব ঘরে ফিরে যাও।

সে কথায় সোরগোল পড়ে যায় সর্বত্র। সারা ডিহি উত্তাল হয়ে ওঠে। কাজ দিত্যে হবেক হে। সুকুমারের দিকে এগিয়ে আসে কাতারে কাতারে মানুষ। কাজ বিহনে ভোখে মইর্‌বো নাকি? বিপন্ন বোধ করে সুকুমার। এত মাইন্‌ষের ত দাঁড়াবারই জা'গা মিলবেক নাই। কাজ করবে ক্যামন করে?

—দাঁড়াই যাব হে। সে ভাবনা আমাদের। তুমি শুধু সিলিপটা দাও না জলদি। বেলা বাড়ে।

হট্টগোল, চিৎকার, হৈ চৈ চলতে থাকে সমানে। কেউ কারো কথা শোনে না, কেউ কাউকে মানে না। একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। বলক অফিসে লিয়ে গেলি, এখন কাজ দিবি নাই?

অফিসার ইন-চার্জ হিসেবে এই প্রথম একখানা স্কীমের দায়িত্ব পেয়েছে বুদ্ধদেব। ভুখা জনতার এমন রুদ্ররূপ সে আগে কখনো দেখে নি। অসহায় দৃষ্টিতে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

সেদিন প্রায় ঘন্টা-দুয়েকের প্রচেষ্টায় অবস্থা আয়ত্তে আনতে পেরেছিল সুকুমার। মানুষকে বোঝাতে পেরেছিল, কত লড়াই করে এই কাজটুকু আদায় করতে হয়েছে। বোঝায়, একদিনে অত মানুষ কাজ করলে, শুধু ঠেলাঠেলি ধ্বস্তাধ্বস্তিই হবে। কাজ কিছুই হবে না। চুরির বদনাম উঠবে সবাইয়ের নামে। বলক থেকে 'ইদ্‌কুয়ারি' হবে। চুরি দায়ে জেলে যেতে হবে সব্বাইকে।

স্থির হয়েছিল, এক-একদিন এক-এক পাড়ার মানুষ কাজ পাবে। কোন্‌দিন কোন পাড়া কাজ করবে, স্থির হয়েছিল ঐ দিনই। মাঝেরডিহি বাদে অন্য পাড়ার লোকজন ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু সারাক্ষণ এক গূঢ় ধন্দের মধ্যে ছিল সুকুমার। কে রাতারাতি চারপাশের পাড়াগুলোতে কাজের খবর পৌঁছে দিল! কে! কে! কে!

সন্ধে নাগাদ হয়েছিল সেই ধন্দের মীমাংসা।

দিনভর কাজ চলে।

সুকুমার আর হঠাৎ মুর্মু সারাক্ষণ দৌড়ে বেড়ায় রাস্তার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। বুদ্ধদেবও সারা সকালবেলা থাকে। কাজ এগোচ্ছে চমৎকার।

টেস্ট রিলিফের কাজ অবশ্যি কোনদিনও ষোল আনা হয় না কোথাও। অর্ধেক কাজ হলেই যথেষ্ট। গামিরতলার কাজটা চলাকালীন, যখন বুদ্ধদেব অভিযোগ করল বিডিও সাহেবের কাছে, কবালী সোমই নিজমুখে বলেছিল কথাটা। টেস্ট রিলিফের কাজ তো আর পুরো হয় না স্যর। কোনও ব্লকেই হয় না। বুদ্ধদেববাবু নতুন এসেছেন। তাই—

'ঠিক।' বিডিও সাহেব লুফে নিয়েছিলেন কথাটা, 'নাম কি তার? না, টেস্ট-রিলিফ।' বিডিও সাহেব জ্ঞানবর্ষণের সুযোগ পেয়ে যান, 'মানে জান?'

'মানুষকে রিলিফও দেওয়া, এলাকার কাজকর্মও করা।'

'রং। এবসোলুটটি রং। এলাকায় রিলিফের দরকার আছে কিনা টেস্ট কবা। পিপুলের অভাব কতখানি? অত লো রেটেও কত মানুষ কাম করতে আইল? হুঁ-হুঁ, এসব ব্রিটিশের মগজ থিক্যা বাহির হইসে। আমরা সব ওই ডাঙাইয়া খাইতেসি।'

অথচ এই স্কীমটা যখন মঞ্জুর হল, যখন বুদ্ধদেবকে অফিসার -ইন-চার্জ করা হল, করালী সোম মিষ্টি হেসে বলেছিল, 'আপনাব প্রথম কাজ। কাজ কিন্তু ভাল হওয়া চাই।'

ভুখা পেটে মাটি কাটছে মানুষগুলো। দিনভর উপোসে গা-বাজা মানুষ সব। নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে বটে, তবে ভয় হয়, যে কোনও মুহূর্তে টাল খেয়ে পড়ে যেতে পারে মুখ থুবড়ে। তবে হঠাৎ মুর্মুকে বলে দিয়েছে সুকুমার, কাজের শেষে মাটি মেপে তবেই স্লিপে সই করতে। কোন ঢিলেমি যেন না থাকে সেই মাপজোকে। আসলে, করালী সোম আর বিডিও সাহেবকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, গাঁয়ে-গঞ্জে যে সরকারি কাজ ষোল আনা হয় না, তাতে লেবারদের দায় সামান্যই। ওপরওয়ালা চাইলে কাজ করে ওরা দেখিয়ে দিতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেবারদের সামান্য কনসেসন দিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করে দিতে চায় চোরের দল। সেই ফাঁকে বারোআনাই মেরে দেয়। শুধু ওপরওয়ালাকেই নয়, চারপাশের মানুষজনকেও ব্যাপারটা বোঝাতে চায় ওরা। আরও অনেক কাজ হয়েছে এতদঞ্চলে। গ্রামের মানুষ দেখে নিক, সেগুলোর সঙ্গে এই কাজের তফাৎ কতখানি। বুঝুক, সদিচ্ছা থাকলে ভাল কাজ করা যায়।

মাটি মাপতে মাপতে বিকেল গড়িয়ে যায়। মানুষগুলো ভাজাভাজা মুখে অপেক্ষা করে ধৈর্য ধরে। দেখতে থাকে মাটির মাপ। স্লিপে সই নেয়। তারপর ধীরপায়ে হাঁটা দেয় সুকুমারের কাছে। ওধারে ডিহির ওপর চাকোল্‌তা গাছের তলায় সুকুমার বসেছে আসর বিছিয়ে। স্লিপ দেখে দেখে টাকা দিচ্ছে, টিপসই নিচ্ছে মাস্টাররোলে।

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে আসে। পাখ-পাখালের ডানায় ভর করে আঁধার নেমে আসে ডিহি জুড়ে। চারপাশের সবুজ ধানক্ষেতের মধ্যে সাদা কাশফুলের ঢেউ শেষ বারের মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হবিণমুড়িব দু'পাড়ে। একটা দিন শেষ হয়। দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে একটি দীর্ঘ খাদ্যহীন দিন।

স্লিপ নিতে নিতে বাতাসী হাসে। সারাদিনের পরিশ্রমে ওপড়ান লতাব মতো ঝামরে গিয়েছে মুখখানি। হাসিখানি ঝরে যাওয়া কুড়চি ফুলের মতো। বলে, 'তুয়ারাই বটে কাজ দেখালি বাবু। অমন সইন্‌ঝাপহরতক্ক মাটি কাটার কাজ করি নাই মোর বাপের জন্‌মে।'

'কিন্তু রাস্তাখান কেমন হচ্ছে, সেটা বল্‌।' সুকুমার চোখ নাচায়, 'ঐ রাস্তা দিয়ে যখন দিনেরাতে হাঁটবি? তখন.?' বলতে বলতে বাতাসীর দিকে অল্প ঝুঁকে পড়ে সুকুমার, 'এমন রাস্তা দিয়ে যখন গরুর গাড়ি চেপে, বাদ্যি-বাজনা বাজিয়ে বর আইবেক তুয়ার? তখন?'

বাতাসীব সারামুখ লজ্জায় ভরে যায়। টাকাগুলো নিতে নিতে আহ্লাদি গলায় বলে, 'অমন ভোখেব টাইমে উসব কথা মাথায়ও আসে তুয়াদ্যার!' বলতে বলতে টাকা ক'টি মুঠোয় চেপে দৌড়ে পালায় বাতাসী।

সুকুমার চিৎকার করে শুধোয়, 'হা-ই বাতাসী, অগ্নি কুথা রে? সে যে, বড়, কাজে আসে নাই?'

'সে তো দাদাকে দেইখ্‌তে বাঁকুড়ার হাসপাতালে গেঁইছে গো—।' দূর থেকে জবাব সেরেই মিলিয়ে যায় বাতাসী। বুদ্ধদেবের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসে সুকুমার।

কাজের শেষে হঠাৎ মুর্মু জানায়, গড়ে তিনপোয়া মাটি মিলেছে আজকের কাজে। শুনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সুকুমারের মুখ।

মাটি কাটছে ভুখা মানুষ, শিকলখানা টানছে। টানছে।

উবুর-ডুবুর পানকৌড়ি

কথাটা শোনা মাত্তর হরবল্লভ থম মেরে থাকেন কিছুক্ষণ। রতিকান্তর দিকে তাকিয়ে থাকেন পলকহীন।

উড়া উড়া অনেক কথা বেশ কিছুদিন ধরেই কানে আসছিল। তেমন একটা আমল দেন নি। তবুও একবার থানায় গিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা সেরে এসেছেন। একদিন রতিকান্তকে দিয়ে সেরখানেক গাওয়া ঘি আর একটা পাকা রুই পাঠিয়েছেন বড়বাবুর কোয়ার্টারে। কেমন জানি মনে হচ্ছিল, মশা মারতে কামান দাগা হয়ে যাচ্ছে। শালাদ্যার অত সাহস হবেক নাই।

রতিকান্তর দিকে তাকিয়ে ফের শুধোন হরবল্লভ, 'তুমি ঠিক বইল্‌ছ ত হে?'

'আইজ্ঞা, বেঠিক লয়।' রতিকান্ত খুব প্রত্যয় মাখানো মুখে বলে, 'লগদা দু'টাকা আর একপাই চাল না পেলে ধান কাটতে আইবেক নাই কোউ। সুকুমার-ঠাকুর মিটিং কইরে ঠিক করে দিয়েছে রেট। অধর ঝারমুনিয়া কাঁচা খবর দিবার লোক লয়।'

হরবল্লভ পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকেন।

শিব মন্দিরের কাছে ন্যাড়া বেলগাছটার একখানা রোগাপানা ডালে একটা কাক অনেকক্ষণ তারস্বরে ডেকে চলেছে। সদর মহলের বারান্দায় বসে কর্কশ আওয়াজখানা শুনতে পাচ্ছিলেন হরবল্লভ। আওয়াজখানা মগজের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে তোলপাড় তুলছিল। মগজের শিরায় শিরায়, রক্তের মধ্যে মিশে যাচ্ছিল অজান্তে। মাঝউঠোনে গরুর গাড়িতে ধুরি লাগাচ্ছিল পাগল শিকারি আর ইন্দ্র বাগদি। সহসা ওদের দিকে তাকিয়ে বোমার মতো ফেটে পড়েন হরবল্লভ। শালারা কালা নাকি? কাকটাকে তাড়াতে লারছু? পাগল শিকারি দৌড়োয়।

আসলে রতিকান্তর মুখ থেকে খবরটা শোনা অবধি মনটা আচমকা তেতো হয়ে গেছে হরবল্লভের। এমন খবরের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। এখন ক্ষেতে ক্ষেতে ধান গাছের শীষে সোনালী রঙ ধরেছে। ঊর্ধ্বমুখ শিষগুলো শস্যের ভারে নুইতে শুরু করেছে। এলাকার তাবৎ সম্পন্ন গেরস্থ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। প্রস্তুত হচ্ছে ফসল কাটবার জন্য। উঠোন চেঁছে-ছুলে পরিষ্কার করা। গরুর গাড়ির চাকা, ধুরি, জুয়াল, টাঙ্গা বাঁধাবাঁধি চলছে। যথাসময়ে ফসল বয়ে আনার জন্য ব্যবহৃত হবে তারা। চাকার হাল নতুন করে পেটানো চলছে। লিগা বাঁধা, তেল মাখানো, আরা, পুঁটা পিটিয়ে শক্তপোক্ত করা, ওদোলের সঙ্গে চ্যাতলাকে শক্তপোক্ত করে বাধা,—কত কাজই যে এখনও অবধি বাকি! বাড়ির মেয়েদের মধ্যে অন্যতর ব্যস্ততা। প্রতি বেস্পতিবার রাতে, ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে সারা ঘর কামিন দিয়ে

নিকানো করাচ্ছে। মেঝের ওপর পিটুলি জল দিয়ে মা-লক্ষ্মীর পা আঁকছে, ধানের গোলা থেকে ঠাকুরঘর অবধি। পা'গুলি সব ঘরের মধ্যে ঢুকেছে, বেরোয় নি একটাও। এর মধ্যে এক রাতে সিংহগড়ের বামুনমাসি আচমকা কয়েক জোড়া পা এঁকে ফেলেছিল, বাইরের দিকে আঙুলগুলি, অর্থাৎ কিনা পা চলেছে ঘরের থেকে বাইরের দিকে। তাই না দেখে অরুন্ধতী বাঘের ঝাপট নেন। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেইকেছে তুমার বামুনমাসি, কুন্ আক্কেলে লক্ষ্মীর পা বাইরের দিকে আঁকলে? মা-লক্ষ্মী যে তাইলে বারাঁই যাবেক, সে খিয়াল আছে? বাস্তবিক, রাঢ়ভূমির একটা বাচ্চাও জানে, অঘ্রাণ-পৌষে গেরস্তের ঘরে-দোরে-উঠোনে যখন মা-লক্ষ্মীর পা আঁকা হয় সব পা'ই ভিতরমুখী, যাতে বোঝা যায় মা-লক্ষ্মী এই যে সেঁধালেন গেরস্থের ঘরে, আর বেরোবেন না।

এ সময়টায় হরবল্লভ ভারি ব্যস্ত থাকেন। মূলত স্বপ্ন দেখতেই ব্যস্ত থাকেন তিনি। চুয়ামসিনা বাদেও বিষ্ণুপুর এবং সোনামুখী থানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাঁর আধ-ডজন খামারবাড়ি। স্বনামে-বেনামে অনেক জমি রয়েছে সেখানে। চাষ করবার লোকও মজুত রয়েছে। মরসুমে রতিকান্ত গিয়ে মাঝে মাঝে খবরদারি করে আসে। এই মুহূর্তে খামারবাড়িগুলোতেও জোর কদমে লেপাপুছা চলছে। দু'দিন বাদে ধানকাটা শুরু হবে। পাহাড়প্রমাণ ধান ডাঁই হবে খামারবাড়ির উঠোনে। বর্গাদাররাও আনবে বাঁকে করে ধানের আঁটি। খামারবাড়িতেই মাড়াই হবে। অর্ধেক ধান নিয়ে চলে যাবে বর্গাদাররা। হরবল্লভের জন্য থেকে যাবে অর্ধেক ধান এবং পুরো বিচালি। এই ব্যবস্থাটাকে বদলে দেবার জন্য কত আন্দোলনই না করছে শালারা কতদিন ধরে! কি না, তিনভাগের দু'ভাগ ফসল চাই, আর বর্গাদারের উঠানে মাড়াই হবেক ধান। মালিক ভাগ লিবেক বর্গাদারের উঠান থেকে। হরবল্লভ মনে মনে একটা কাঁচা খেউড় করেন। শালা, মালিকেরা তুয়াদ্যার বাপের চাকর নাকি যে বস্তা লিয়ে তুয়াদারে উঠানে গিয়ে ভাগ-ধানের তরে ধর্না দিতে হবেক! জমিনটা কার বটে? তুয়াদ্যার, না মালিকের?

হরবল্লভ সদরমহলের বারান্দার দোলনায় বসে বুঁদ হয়ে গিয়েছিলেন। বেশ ক'বছর বাদে এ বছর সর্বত্র চাষটা ভালই হয়েছে। হরবল্লভ মনে মনে একটা খসড়া হিসাব কষছিলেন, কোন্ মহাল থেকে কত ধান পেতে পারেন এ বছর।

শুধু স্বপ্ন দেখলেই পেট ভরে না। এ সময়টা হরবল্লভদের ব্যস্ততারও অন্ত থাকে না। ধান কাটা শুরু হলেই আরম্ভ হয়ে যায় সেই ব্যস্ততা। তখন প্রতিটি মহালে গিয়ে তত্ত্বাবধান করা, পিছিয়ে পড়ছে কিনা ধান কাটবার গতি, বর্গাদাররা সবাই ঠিক ঠিক ধান হাজির করছে কিনা মহালের উঠোনে, ঝাড়াই-মাড়াইয়ের পর কত ধান মিলছে রোজ, সব কিছু গুনে-গেঁথে হিসাবপত্তর রাখতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যান হরবল্লভ, প্রভঞ্জন এবং রতিকান্ত। যেন একটা মাস ওদের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়। অবশ্য মধুর ঝড় সেটা। লক্ষ্মীর আগমনজনিত ঝড়। শরীরের ধকলটা বাদ দিলে মনে অবশ্য খুশির প্লাবনই বয়ে যায়। রাশি রাশি সোনালি ধানে যখন ভরে ওঠে গোলাগুলো, তখন একটা সুমন্দ হাওয়া বয় অন্তরে। ধানগুলোকে গোলায় গচ্ছিত রাখা নিয়েও কত ভাবনাচিন্তা। অহরহ। হিংচিলেবুটা ছোট গোলায রাখ। মাসে মাসে চিঁড়ে বানাবার জন্য বের করতে হবে। কিলাশ ধান আর চালি ধান, যদিও দুটোতেই মুড়ি হবে, কিন্তু এক গোলায় রাখা চলবে না। মুড়ির ধান তো আরও রইল। ভূতমুড়ি, লাল নাগরা, এসব ধানে হবে বাবুদের

জন্য মুড়ি। কিলাশ ধান আর চালি ধানের মুড়ি মজুর-কামিনদের জন্য। যদিও কিলাসধানের মুড়ি ঢের বেশি মিষ্টি, কিন্তু ভদ্দরজনেরা তো খেতে পারেন না অমন কৌলিন্যহীন ধানের মুড়ি। বাদশাভোগ আর কালোজিরা ধানের সুগন্ধ পৃথক পৃথক। অভিজ্ঞ নাকে ধরা পড়ে। পায়েস হয়, পিঠা হয়, নিরামিষ খিচুড়ি হয়। এক গোলায় রাখলে সুগন্ধ মেশামেশি হয়ে যাবে। সীতাশাল আর ঝিঙ্গাশাল অতি সরু চাল—বাবুরা সম্বৎসর খাবেন। পোলাও হবে। কাখরি, লক্ষ্মীকাজল, মোটা ধান। মজুর-মাইন্দার-ভাতুয়াদের জন্য। সরু চাল ওদের পেটে যেতে না যেতে মিলিয়ে যায়। সিংহগড়ের মাহিন্দার-কামিনরা একাধিকবার কবুল করেছে, সরু চালের ভাতে আমাদ্যার পেট নাই ভরে। তো, এত রকমের এত এত ধান ঠিকঠাক ওজন করে জায়গা মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা, তার জন্য কত ভাবনা-চিন্তা, কল্পনা, দূরদৃষ্টির প্রয়োজন। শালারা শুধু জমিনগুলাই দেখে, হ্যাঁপাগুলা দেখে না। ওরা তিনজন বাদেও অবশ্য বন্ধু-স্বজনের দল এগিয়ে আসে। স্বেচ্ছায় তুলে নেয় দায়িত্ব। নইলে হ্যাপা আরও বেড়ে যেত। শ্যামাপদ পণ্ডিত গিয়ে ধনশিমলার মহালটা সামলে আসে। পোস্টমাস্টারবাবু, যিনি সিংহগড়েরই একটা ঘরে থাকেন, এ সময়টা খাতা-টাতা লিখে দিয়ে সাহায্য করেন। আগের গ্রামসেবকবাবুটি, মুৎসুদ্দিবাবু, যতদিন ছিলেন, জান লড়িয়ে দিতেন। নতুনটি আবার একেবারেই উল্টো। একেবারে অন্য ডালের পাইখ। তো সে যাই হোক, যে দেশে হরি ঘোষ নাই, সে দেশে কি আখ চাষ হয় না? কাজেই গ্রামসেবক সাহায্য না করলেও কাজ কি আর আটকে থাকে? এ দুনিয়ায় কারুর জন্য কিছু আটকে থাকে না। একজনের অভাব অন্যে পূরণ করে দেয়। শূন্যস্থান বলে কিছু থাকে না। সবই ভরাট হয়ে যায়। এবারেও তার ব্যত্যয় হবে না। নির্বিঘ্নেই ফসল উঠে যাবে ঘরে। ভরে যাবে গোলাগুলো। বিশাল বিশাল গাদি পড়বে খামারগুলোতে। ফসল ভাল হয়েছে। এবারে গাদির সংখ্যা বাড়বে। এইসব পাঁচ-মেশালি ভাবনায় বিভোর ছিলেন হরবল্লভ। বুকের গভীরে এক ধরনের সুখকর হাওয়া বইছিল। রতিকান্ত এসে স্বপ্নখানা ভাঙিয়ে দিল, হাওয়াখানি থামিয়ে দিল।

শরীরের অভ্যন্তরে কোথায় যেন অবিরাম বিছের কামড়। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলতে লেগেছে। শরীরের তাবৎ শিরা-উপশিরায় নীলরক্তের উন্মত্ত দাপাদাপি। হরবল্লভ স্থির চোখে রতিকান্তকে দেখেন। যেন রতিকান্তই এই কুকর্মের হোতা। বলেন, 'সুকুমাব ছাড়া আর কে কে রয়েছে?'

'আছে জনা পাঁচ-ছয়। গোবিন মিস্তিরি, হঠাৎ মুর্মু, বাঁশি বাউরি, তিল্‌কা বাউরি, হাঁদা মুর্মু ..., আর...।'

'আর কে?' হরবল্লভ তেরচা চোখে তাকান রতিকান্তর দিকে। রতিকান্ত বার-দুই ঢোক গেলে। বলে, 'আর, বোধ লিচ্ছে, অনাথ ডাক্তারও রয়্যেছে উয়াদ্যার পিছনে।'

থমথম করতে থাকে হরবল্লভের মুখ। দু'চোখে থিকথিক করে বিষ। ভেতর মহল থেকে প্রভঞ্জন এসে দাঁড়ায়। কী একটা বলতে যাচ্ছিল বাবাকে, তার আগেই হরবল্লভ ক্রোধে ফেটে পড়েন, 'এই যে, অকাল কুষ্মাণ্ড, অত খর্চাপাতি করে বলকের লোকজনকে ধরে একখানা ক্লাপঘর গড়ে দিল্যম। কী লাভটা হইল্যাক? সারাদিন শুধু তাস-পাশা, ক্যারম আর ফিস্টি। আর, একটা চামড়ার বল্‌কে লিয়ে লাথানো। ইদিগে সুকুমার আচার্য্যি দলবল লিয়্যে আগুন দিয়ে বেড়াচ্ছে ঘরে ঘরে।'

প্রভঞ্জন বুঝতে পারে না বাবার এ হেন ক্রোধের হেতু। রতিকান্ত ওকে সংক্ষেপে বোঝায়।

'শুন্। এক্ষুনি ছুইট্যে যা থানায়। বড়বাবুকে সব খুলে বইল্বি। বইল্বি আজ-কালের মধ্যেই শালাদ্যার ওষুধ দিবা চাই। এ শালা নৈতন দারোগাটা আবার এক মেনি-মুয়া। অনেক গর্জনে এক ফোঁটা বৃষ্টি। শালার অজা যুদ্ধে আঁটুনি সার।'

প্রভঞ্জন পোশাক বদলানোর উদ্দেশ্যে পা বাড়ায় অন্দরের দিকে।

হরবল্লভ রতিকান্তর দিকে তাকিয়ে খুব তাচ্ছিল্য সহকারে বলেন, 'উয়াকে দুটা লম্বরি দিয়ে দাও। অনুরাগ বিনে গৌর আসবেক ক্যানে?'

ততক্ষণে ছন্নছাড়া কাকটা ফের এসে বসেছে বেলগাছের রোগাপানা ডালে। চিৎকার জুড়েছে অন্তহীন কর্কশ গলায়।

দু'খানা লম্বরি বৃথা যায় নি। বড়বাবু সেইদিনই সন্ধ্যায় চলে আসেন সিংহগড়ে। সঙ্গে চার-পাঁচ জন সেপাই।

হরবল্লভের দু'চোখে বিষাদ। বড়বাবুর খানাপিনার পাক্কা বন্দোবস্ত করে এক সময় আক্ষেপে ফেটে পড়েন। যা দিন কাল আইছে, আর তো এদেশে বাস করা যাবেক নাই। উয়ারাই থাকুক। আমরা তবে তল্পিতল্পা লিয়ে উদ্বাস্তু হয়্যে যাই। বড়বাবু বোঝেন, এ হল হরবল্লভের গাঢ় অভিমানের কথা। এতদ্দ্বারা বড়বাবুর অক্ষমতার ইঙ্গিতটাও পরোক্ষে দেওয়া হল।

গাওয়া ঘিয়ের লুচি ভাঙতে ভাঙতে বড়বাবু তাকান, 'উদ্বাস্তু হবেন? কোন দুঃখে?' ছোলার ডালে লুচির টুকরোখানাকে চেপে ধরে বলেন, 'আজ রাতেই ধরব শ্যালাদের। কালই চালান করে দেব কোর্টে। মাস তিনেক জামিন পাবে না। তদ্দিনে ফসল কাটা শেষ। পালের গোদাগুলিকে হাজতে পুরলেই আন্দোলন চৌপট।'

'ঠিক।' রতিকান্ত সুযোগ মতো একটি উপমার ফোড়ন দিতে চায়, 'গাছের গোড়া কাইট্লে আগা আপসেই ঝামর্যো যাবেক।'

'বলুন দিকি, কাকে কাকে ধরলে—।'

'জনা চার-পাঁচ। তার বেশি লয়। কিন্তু ধরবেন কী কইর্যে?'

'কেন? গভীর রাতে আচমকা রেইড করে।'

'আহ্, আমি উ কথা বইল্ছি নাই। বলি, কুন চার্জে ধইর্বেন? মজুরদ্যার বেশি মজুরি চাইতে বইল্ছে, তার জন্য কারুকে গ্রেপ্তার করা যায় নাকি?'

'ও—এই কথা?' বড়বাবু মোলায়েম হাসেন। এমনভাবে তাকান যেন কোনও শিশুর অবুঝ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। 'চার্জ বানাতে কতক্ষণ? এলাকায় কত চুরি-ডাকাতি হচ্ছে, আর কারো গায়ে তো স্ট্যাম্প মারা নেই যে, আমি ডাকাত নহি।'

যুক্তিটা মনঃপূত হয় না হরবল্লভের। বলেন, 'খালি খালি ডাকাতির কেসে লটকে দিয়া যায় নাকি? প্রমাণ কইরবেন কী কইর্যে?'

'প্রমাণ তো কোর্টে হবে। সে তো বহুদূরের কথা। আগে তো হাজতটা খাটুক কিছুদিন।'

রতিকান্ত সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরে, 'ঠিক। অধিবাসের গুঁতা সামলালে, বিয়া করা তো সামান্য ব্যাপার। পুলিশের হইল্যাক, আগে ফাঁসি, পরে বিচার।'

'যত দূরেরই হোক, প্রমাণ তো কইর্তে হব্যেক।'

'না করলেই বা। তখন ছাড়া পেয়ে যাবে। প্রমাণাভাবে খালাস।' হা-হা করে হাসেন বড়বাবু, 'কেস দিয়ে প্রমাণ করতে না পারলে পুলিশের কিছু হয় না।'

হরবল্লভ তাও গুম মেরে বসে থাকেন, 'একেবারে শূন্যে প্রাসাদ নির্মাণ হয়্যে যাচ্ছে। এলাকার একটা লোকও বিশ্বাস করবেক নাই।'

'আচ্ছা, ডাকাতির কেসে যদি নাও জুড়ে দিই, দেশে আইনের অভাব নাকি? কোনও কিছু না পেলে সর্ব ঘটের কাঠালি কলাটি তো পুলিসের হাতে মজুত।'

'কোন্‌টা?'

'কেন? ভারতরক্ষা আইন। চীন-ভারত যুদ্ধের পর এই আইনে তো কম্যুনিস্টদের যখন তখন ধরা যায়।' এবার নিখুঁতির বাটিটা টেনে নেন বড়বাবু।

ঠিক সেই মুহূর্তে সিংহগড়ে ঢোকে বুদ্ধদেব। ঢোকা মাত্রই চমক খায় সে। জলপাই রঙের থানার জীপ দাঁড়িয়ে রয়েছে মাঝ উঠোনে। আধো অন্ধকারে জীপখানাকে একখানা বাচ্চা হাতির মতো লাগে। বারান্দার এক কোণে জনা চার-পাঁচ সেপাই খইনি ডলছে বসে বসে। দেহাতি ভাষায় নিচুস্বরে গল্প জুড়েছে বতিকান্তর সঙ্গে। দেখতে দেখতে একটা বিজাতীয় গন্ধ পায় বুদ্ধদেব। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কিছু তাৎক্ষণিক খবর সরবরাহ করে ওকে। নিঃশব্দে পিছু হটতে থাকে বুদ্ধদেব। এক সময় পেরিয়ে আসে সদর দরজা। দ্রুত পা চালিয়ে দেয় বাউরিপাড়ার দিকে।

অঘ্রাণের মাঝামাঝি। আকাশ থেকে হিম ঝরছে অবিরাম। পথের দু'ধারের ঘাস ভিজে যাচ্ছে শিশিরে। সামান্য শীত শীত ভাব। কাঁকুরে ডিহির বুকে ঠাণ্ডা জমছে।

বাঁশি বাউরির উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায় বুদ্ধদেব। ডিবরি লম্ফ জ্বেলে সঙ্কীর্ণ বারান্দায় উবুর-ডুবুর খেলছে বাতাসীরা। উবুর-ডুবুর পানকৌড়ি, ঘ্যাচকলাতে ঘ্যাচ রৌরি/রায় রোম পাটের থোম/কুথা যাউরে শুয়াবনি পোক। গাছে, না পালায়...?

বুদ্ধদেব গিয়ে থমকে দাঁড়ায় ওদের পাশে। খুব নিচু গলায় শুধোয়, 'সুকুমারদা এসেছে?'

খেলায় বুঁদ বাতাসীরা মগ্নতা ভাঙতে চায় না। খেলার মধ্যে, আলগোছে দেখিয়ে দেয় কুঠরির দিকে। কুঠরির মধ্যে টিমটিমে আলো জ্বলছে। জনা কয় লোকের গুনগুনানি কথা।

বুদ্ধদেব নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে কুঠরির মধ্যে।

সেই রাতেই ঘর ছাড়ে সুকুমারের দল।

হাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে হাওয়া হয়ে যায় ওরা।

রাত জাগে নিশান বাউরি

নব্বই বছর বয়েসে নিশান বাউরি চোখে দেখে না, কানে শোনে না, হাঁটতে গেলে ছাতি ধড়ফড় করে। রাতে-ভিতে কাপড়ে-চোপড়ে পিসাব করে ফেলে। ধীরে ধীরে তার সর্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বার শিথিল হয়ে আসছে। কিন্তু মগজটা এখনো বেশ চনমনে। এখনও অশুভ ঘটনায় দুভার্বনা জমে তার বুকে। এখনও সংসারের হাজারো দুশ্চিন্তা তাকে বোলতার মতো ঘিরে থাকে। সারাক্ষণ লেপটে থাকে তার শরীরে। সে যেন একটি জলজ্যান্ত বোলতার চাক। নিজের জন্য কোনও দুশ্চিন্তা নেই নিশান বাউরির। নিজের কথা সে কদাচিৎও ভাবে না। তার ভাবনা অন্যদের তরে। শত্রুদের তরে। সংসারে, উপস্থিত, তার তিন শত্রু বর্তমান। একটি তার ঔরসজাত পুত্র। দ্বিতীয়টি পুত্রের একামাত্র সোহাগের ঝি। এবং

তৃতীয়জন গোরাচাঁদ। পরবর্তী তিন পুরুষ তার তিন কিসিমের শত্তুর। সারাক্ষণ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিল তার জীবন, তিনজনায় মিলে। একটা দিনের জন্যও শান্তি দিল না। পরীক্ষিতের ব্যাপার-স্যাপার আজীবনকাল একটু একটু করে, এখন তাও খানিক সহনীয়। উড়ন্ত পক্ষী সে, তাকে খাঁচায় রাখা মিছে। পরীক্ষিতের আশা ছেড়েই দিয়েছে নিশান বাউরি। এখন অগ্নিকে নিয়েই তার যাবতীয় দিগ্‌দারি। উড়নচণ্ডী বাপের রক্ত বইছে তার শরীরে, কাজেই ইদানীং সেও উড়তে শিখেছে। এই আছে তো এই নেই। এক্ষুনি ফিরব বলে বেরিয়ে গেল, তারপর সারা দিনমান কাটিয়ে দিল বাইরে। আরে মেয়া, দুনিয়া এক জঙ্গল। নিজের ঘরের বাইরে পুরোটাই এক লাগাতার সীমাহীন জঙ্গল। শালাকাঁকির ডাঙা এক জঙ্গল, হরিণমুড়ির পাড় এক জঙ্গল, ক্ষেত-মাঠ, পদমদীঘির পাড়, জয়রামপুরের মোড়, সব এক একটি গহীন জঙ্গল। আর, জঙ্গল মানেই বাঘ, বরা, হুঁড়ারের বিচরণভূমি। কখন কোন্ জানোয়ারের মুখোমুখি পড়বি তার ঠিক-ঠিকানা আছে?

আজ আড়াই পহর নাগাদ বেরিয়ে গিয়েছে মেয়েটা। বলে, শাক তুলতে যাচ্ছি নদীর পাড়ে। খাঁচার পাখিটা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে চেঁচাচ্ছিল, তাকেও বলে গেল, ফিরে এসে খাবাবেক। তারপর দুপুর গেল, বিকেল গেল তার দেখা নাই। পথের পানে ঠায় তাকিয়ে চোখের জল মরে যায় নিশান বাউরির। গাল পেড়ে পেড়ে আশ মেটে না তার।

এদিকে দিনকতক সে এক মহাঝঞ্ঝাট কাণ্ড ঘটে চলেছে পুরো এলাকা জুড়ে। মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল সুকুমারের দল। সিংহবাবুরা পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে। সুকুমাররা লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, আজ এ গাঁয়ে, কাল ও গাঁয়ে। ওদের ধরবার জন্য হরবল্লভের কুরিয়ার ঘুরছে পাড়ায় পাড়ায়। সুলুক-সন্ধান নিচ্ছে। প্রভঞ্জনরা চৌকি বসিয়েছে শালকাঁকির ডাঙায়। সুকুমাররা আসা মাত্রই ধরবে। রাতেভিতে পুলিশ ঘুরছে পাড়ায় পাড়ায়, নিঃশব্দে। এর-ওর আগড়ে লাঠি আছড়াচ্ছে। ভয়ে সিঁটিয়ে রয়েছে পুরো বাউরি, বাগদি, শিকারি, লোহার পাড়া। কখন কাকে বেঁধে নিয়ে যায় পুলিশ! এমন মুহূর্তে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছু মেয়া, তুয়ার কি জান-প্রাণের ডর নাই একতিল!

আসলে, ঘরখানা অগ্নির কাছে বিষ। ঘর তাকে একতিলও টানে না। ঘরে তার কে আছে! কী আছে! নিশান বাউরি তো বোঝে, ভেতরে ভেতরে আঙরার পাবা জ্বলছে মেয়েটা।

ইদানীং অগ্নি মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যায়। বাড়িঘর, সমাজ-সংসার থেকে নিঃশব্দে হারিয়ে যায় সে। বুড়ো নিশান বাউবি তার অন্ধিসন্ধি খুঁজে হয়রান হয়। কী যে এক ভূতে ধইর‌্ল্যাক মেয়াটাকে' আর অগ্নি বিহনে ওর সাধের টিয়েটা ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে গোকুল ভাসায়। রেগে-মেগে পাখিটাকেই গাল পাড়ে নিশান বাউরি। গোরাচাঁদ কাছে পিঠে থাকলে বলে, ও গোরা, যা না, দ্যাখ না, অত রাত অবধি কুথা নাঙ্ কইর‌্ছে তুয়ার মা।' নিশান বাউরির মুখখানাই এমনতরো।

উঠোনের সজনে গাছে কুঁড়ি এসেছে রাশি রাশি। একটু আগেভাগেই ফুল এসেছে গাছটায়। আর দিনকতক বাদে, মাঘের হাওয়া বইলে, ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা খইয়ের মতো ফুল ফুটবে গাছে। গেল-জ্যৈষ্ঠে সজনের ডালে যে মাটির হাঁড়িখানা শালিখদের ডিম পাড়বার জন্য তিলককে দিয়ে বাঁধিয়েছিল অগ্নি, সেটা এখনও অবধি ঝুলছে। ডিম পেড়েছিল শালিখ। বাচ্চা হয়েছিল। অগ্নি দিনের বেলায় পাহারা দেয়, কাগে না ঠোকরায়। বেশ কয়েক রাত ঢ্যামনাও এসেছিল বাচ্চাগুলোকে খেতে। অগ্নি, তিলক আর গোরাচাঁদ মিলে রাত জেগে পাহারা

দিয়েছে। সাপটাকে তাড়িয়েছে প্রতি রাতে। বাচ্চারা ডাগর হয়ে উড়ে গিয়েছে। আবার নেতিয়ে পড়েছে অগ্নি।

শেষ বিকেলে গোরাচাঁদ বেরোয় মাকে খুঁজতে। তারও তখন ক্লান্ত, অবসন্ন শরীর। এই মুহূর্তে সে শরীর খাদ্য চায়, শুশ্রূষা চায়। কিন্তু বেরোতেই হয় গোরাচাঁদকে। একটু বাদে সন্ধ্যে নামবে। চরাচর ঢেকে যাবে অন্ধকারে। আজ আর তিলককাকা নেই যে ওকে খবরটা দিলেই গুড়ম-দুড়ম বেরিয়ে পড়বে অগ্নিকে খুঁজতে। জগৎ টুঁড়ে খুঁজে আনবে ওকে। তিলকরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ধানকাটার মরসুমে লেবার ক্ষেপানোর অপরাধে পুলিশ ওদের ধরতে চায়। থানায় নিয়ে গিয়ে পেটাতে চায়। এমন সে পিটুনি যেন অন্তত ছ'মাসকাল চারপায়ে হাঁটে। উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা না থাকে। সিংহগড়ে বসে হরবল্লভের সঙ্গে বড়বাবুর তেমন শলাই হয়েছে। রামসেবককাকু সে সন্ধ্যায় হন্তদন্ত হয়ে খবরটা দিয়েছিল। তুমরা সব পালাও।

পালাচ্ছে তিলক। পালাচ্ছে সুকুমার। পালাচ্ছে মকবুল, হঠাৎ, বাঁশি... ।

কাজেই বেলা থাকতে গোরাচাঁদ আগল-বাগল হয়ে খুঁজতে বেরোয় মাকে।

গোরাচাঁদ চলে যেতেই পুনরায় একা হয়ে যায় নিশান বাউরি। একা হলেও একা হয় না সে। তাকে সর্বদা ঘিরে থাকে একরাশ ভাবনা। আপাতত গোরাচাঁদকে নিয়েই এক গভীর ভাবনায় ডুবে যায় সে। গোরাচাঁদ শিগগির চলে যাবে। শালতোড়ার ইস্কুলে ভর্তি হবে সে। বোর্ডিংয়ে থাকবে। তার সমস্ত খরচ-খরচা সবকারের তফশিলি-আদিবাসী দপ্তর দেবে। দীপমালা সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অগ্নি প্রথমে রাজি হয়নি। একমাত্র সন্তানকে দূর দেশে পাঠানোতে তাব প্রবল আপত্তি ছিল। স্বামীর ঘর ছেড়ে এক নিঃস্ব জীবন যাপন করে চলেছে মেয়েটা। গোরাচাঁদই এখন তার একমাত্র অবলম্বন। জীবনের ফাঁকা, ফাঁপা, কলসিটিকে বইতে বইতে যখন ক্লান্ত, অবসন্ন, তখন দিনান্তে নিজের ছেলে কাজকর্মের থেকে ফিরে যখন 'মা' বলে ডাক পাড়ে, অগ্নির প্রাণ জুড়িয়ে যায়। ঐটুকু থেকে সে নিজেকে কিছুতেই বঞ্চিত করতে পারবে না। এটুকু না পেলে সে বাঁচবে না। এই যৎসামান্য রসসিঞ্চন না পেলে বাঁচে না কোনও গাছ, লতা। অগ্নি গোরাচাঁদকে জড়িয়ে ধরে ডুকুরে কেঁদেছে। অবশেষে সবাই মিলে বুঝিয়েছে ওকে। সুকুমার বুঝিয়েছে, তিলক বুঝিয়েছে, বাতাসী বুঝিয়েছে, এমন কি নিশান বাউরি স্বয়ং পাখি-পড়া পড়িয়েছে। গরীবের ছা-র ভাগ্যে অমন সুযোগ আসে না। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই। সবশেষে গোরাচাঁদের মতামত নেওয়া হয়েছে। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে মনে হয়েছে, যে কোনও উপায়ে চুয়ামসিনা ছাড়তে চায় সে। চুয়ামসিনা যেন তার কাছে বিষ। শুনে অগ্নি আরও কাঁদে। ছেলে কেন ওকে ছেড়ে দূরে চলে যেতে চায়, ভেবে ভেবে ওর বুকখানা একেবারে ভেঙে যায়। গোরাচাঁদকে, নিশুত রাতে, কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল গলায় শুধোয়, ক্যানে আমাকে ছেড়ে যেইতে চাউ, গোরা? বল্? মাকে ছাড়া তুই থাইক্তে পারবি? গোরাচাঁদ জবাব দেয় না। মায়ের কোলে একখণ্ড ঠাণ্ডা পাথরের মতো শুয়ে থাকে সে।

অনেকদিন ধরে দীপমালা বলছিলেন, গোরাচাঁদকে লেখাপড়া শেখাও। ইস্কুলে ভর্তি করে দাও ওকে। অগ্নিও যে সে কথা ভাবে নি তা নয়। ইস্কুলে ভর্তিও হয়েছিল গোরাচাঁদ। কিন্তু বেশিদিন যায় নি। সংসারে তিন-তিনটি পেট। অগ্নি আর কত সামলায় একলাটি। পরীক্ষিত বাড়িতে থাকলে তাও নয় ভাবা যেত।

কিন্তু গোরাচাঁদ যে ইস্কুলে যায় নি, দারিদ্র্যই তার একমাত্র কারণ নয়। গোরাচাঁদ ইস্কুলে যেতে চায় না। তার প্রধান কারণ, তার গায়ের রঙ। ঐ ফর্সা রঙ নিয়েই হয়েছে তার

যত জ্বালা। ইস্কুলের ছেলেরা সব ক্ষেপিয়ে মারে। হাঁ রে গোরা, তুই কুন সাহেবের ব্যাটা? তুয়ার বাপ কে বটে? স্কুলে ইন্সপেক্টর এলেন, গোরাকে নাম শুধোলেন, নাম বলতেই তাঁর দু'চোখ তালগাছে। বাউরির ছেলে অত ফর্সা! খুব ছেলেবেলায় যদিও গোরা নিজেই জাঁক করে বলত, আমি রাজার ব্যাটা হে। কিন্তু বয়েস যত বাড়তে লাগল ততই এক ধরনের লজ্জা তাকে তিল তিল গ্রাস করতে থাকে। এমনিতে তো তার বাপকে বড় একটা কেউ দেখেনি চর্মচক্ষে। এমন কি গোরা নিজেও নয়। অগ্নিকে যখন তাড়িয়ে দেয় গজেন বাউরি, গোরা তখন পেটে। তারপর তো ফুলকুসমার গজেন বাউরি এ অঞ্চলে আসেই নি কোনও দিন। তার ওপর তার গায়ের অমন গৌরকান্তি বর্ণ। মানুষের আর দোষ কি! অবলীলায় বলতে পারে, সাহেবের না হলে তুই কুন্ বাউরির ব্যাটা, দেখাই দে উযাকে। গোরা তো সেটাই পারে না। গোরা তো সেইখানেই কাবু। সত্যিই তো, প্রত্যেকেই তার বাপ দেখাতে পারে, গোরা পারে না কেন? প্রশ্নটা তাকে নিরন্তর খুবলে খুবলে খায়। সেই'যাতনায় একদিন ইস্কুল ছাড়ে সে। ভর্তি হয়ে যায় প্রমথ গাঙ্গুলির বাখুলে। গাঙ্গুলিদের গরুগুলো নিয়ে যায় জঙ্গলে। দিনভর চরায়। দিনান্তে ফিরে আসে ঘরে। আর বেরোয় না। ইদানীং তাই বড় একটা কেউ বাপ দেখতে চায় না ওর কাছে। বাউরির ছেইলা ফর্সা কেন,—এমন প্রশ্নও বড় একটা কেউ শুধোবার ফুরসত পায় না। সকাল না হতেই সে গাঙ্গুলিদের বাখুলে চলে যায়। সেখান থেকে গরুর পাল নিয়ে সোজা জঙ্গলে। গরুরা ওকে কিছুই জিজ্ঞেস করে না। পথ ওকে কিছুই জিজ্ঞেস করে না। জঙ্গলের মধ্যে গাছ-গাছাল, পাখি, কেউ তাকে কখনও তার একান্ত বেদনার জায়গাটিতে খোঁচা দেয় না। জঙ্গলের মধ্যে আরও যারা গরু চরায়, গোরাচাঁদের সমবয়েসী, তারা কেউ কেউ কোনও চটুল মুহূর্তে হয়তো বা শুধিয়ে বসে, তবে, তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। সব মিলিয়ে জঙ্গলেই সে ভাল থাকে, শান্তিতে থাকে।

হাজার পীড়াপীড়িতেও এসব কথা অগ্নিকে মুখ ফুটে বলতে পারে না গোরাচাঁদ। অগ্নিও নাছোড়াবান্দা। বাধ্য হয়ে এক সময় অস্ফুট গলায় বলে, 'আমি দূরে গিয়ে পড়ালিখা শিখব।'

'পড়ালিখা শিখবি তো, এখানে থেকে শিখ্।' অগ্নি ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

'লয়।' গোরাচাঁদের গলায় চাপা জেদ, 'আমি দূরে গিয়ে পইড়্ব।'

অগ্নি গোরাচাঁদের মনের তল না পেয়ে হয়রান হয়ে যায়। এক সময় তাকে মেনে নিতেই হয় সকলের সমবেত সিদ্ধান্ত।

অন্ধকার দাওয়ায় শুয়ে শুয়ে নিশান বাউরি ভাবে, গোরাচাঁদ যদি সত্যি সত্যিই দূরদেশে চলে যায়, সব চেয়ে বেশি বিপন্ন হবে নিশানই। অগ্নির যা মতিগতি, যেভাবে ইদানীং হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যায় সে, গোরাচাঁদটা আছে বলেই নিশান ওকে এখানে-ওখানে পাঠাতে পারে। গোরাচাঁদ চলে গেলে কে এই ভর সন্ধ্যায় তাকে খুঁজতে বেরোবে? ইদানীং অগ্নি যে অন্তত প্রায় রোজদিন ঠিক সময়ে ঘরে ফিরছে, নিশান বাউরির মনে হয়, সেটা মূলত গোরাচাঁদেরই টানে। গোরাচাঁদ চলে গেলে সেই পিছুটানটাই তো থাকবে না অগ্নির। সে তখন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াবে, কে তাকে পিছু পিছু ধাওয়া করে খুঁজবে রোজ! নিশানের সাধ্য কি, এই নড়বড়ে শরীর নিয়ে ছুটন্ত হরিণীর পিছে দৌড়ে বেড়ায়।

গোরাচাঁদ যদি সত্যি সত্যিই চলে যায়, নিশান মনে মনে স্থির করে, এবারে পরীক্ষিত বাউরি এলে সে পষ্টাপষ্টি বলে দেবে, যাবার বেলায় যেন অগ্নিকে সঙ্গে নিয়ে যায়। নিজের

মেয়ের দায়-দায়িত্ব এবার বুঝে নিক সে। নব্বই বছর বয়েসে এ গুরুভার বহন করা নিশানের পক্ষে আর সম্ভব নয়। তার বলে নিজেরই জ্বালার অন্ত নেই। তার ওপর একখানা দুরন্ত আগুনের বেনিয়াকে সামলে-সুমলে রাখা তার পক্ষে অসম্ভব।

আচমকা ঝড় উঠল। ধুলুণ্ডি ঝড়। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। শীতের বৃষ্টি। প্রস্তুত ছিল না নিশান বাউরি। কাঁথা-কম্বল-তালাই তুলে নিয়ে ঝোপড়ির মধ্যে সেঁধাবার আগেই অর্ধেক ভিজে গেল। কুঠরির মধ্যে হি-হি কাঁপতে কাঁপতে তার শুধু বারংবার মনে হচ্ছিল, এই দুর্যোগের মধ্যে কোথায় গেল অগ্নিটা, তাকে খুঁজতে গিয়ে যে কোন্ আতান্তরে পড়ল গোরাচাঁদটা! ভাবতে ভাবতে চণ্ডাল-রাগ চাপিয়ে ওঠে মগজে। দুনিয়ার সব্বাইকে চিৎকার করে গাল পাড়তে শুরু করে। ভগবান, সিংহবাবুরা, পরীক্ষিত, অগ্নি, গোরাচাঁদ—কেউ বাদ পড়ে না। শত্তুর, শত্তুর, সবগুলি নিশানের আগের জনমের শত্তুর!

অনেক রাত্তিরে কাকভেজা হয়ে গোরাচাঁদ ফেরে। অগ্নিকে কোথাও পায় নি। রাত বাড়ে। শঙ্কা বাড়ে। দাদু-বাবার কাছে বসে বসে একসময় নেতিয়ে পড়ে গোরাচাঁদ। ঘুমের অতলে তলিয়ে যায়। নিশানের সারারাত বিনিদ্র কেটে যায়।

এক বোকা রাজকন্যার গল্প

পল্টু হাজরার নজর যে কুন্তীর ওপর পড়েছে এটা বুদ্ধদেব বুঝতে পাবে নি। সম্ভবত কনকপ্রভাও নয়। প্রাণের বন্ধু প্রভঞ্জনকে মনের ইচ্ছাখানি বলেছিল পল্টু। ফলত, যে প্রভঞ্জন পারিবারিক বৈরিতাবশত কনকপ্রভার মহলে কস্মিনকালেও যায় না, সে-ই একদিন পল্টুকে নিয়ে হাজির হয়েছিল কনকপ্রভার কাছে। মোটর-সাইকেল হুঁকুরে হাজির হয়েছিল পল্টু। প্রথম দর্শনে কিঞ্চিৎ সম্ভ্রম আদায়ের বাসনা। প্রভঞ্জনের মুখে পল্টুর পরিচয় পেয়ে খুব আদর করেই বসিয়েছিলেন কনকপ্রভা। সিদ্ধেশ্বর হাজরার ভাইপো সে। হেজিপেজি লোক নয়। কুন্তী ওর সামনে পয়লা চটকায় বেরোয় নি। পল্টুও খুব একটা হেদিয়ে পড়েনি সেজন্য। একটা উপলক্ষ বানিয়ে হাজির হয়েছিল পল্টু। প্রথম দিন সেটাই বলেছিল কনকপ্রভাকে। কনকপ্রভা তখন এন্তার জমি বেচছেন। সুদর্শন সিংহবাবু, কনকপ্রভার দাদাশ্বশুর, বিঘাটাক জমি কিনে রেখে গিয়েছেন বিষ্টুপুর শহরে। অ্যাদ্দিন জমিখানা বেচেন নি কনকপ্রভা। তবে কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে, উপযুক্ত খদ্দের নাকি খুঁজছেন। বিষ্টুপুরের ওমপ্রকাশ আগরওয়ালরা সিংহগড়ের ঘনিষ্ঠ লোক সেই ঠাকুর্দার আমল থেকে। সিংহগড়ের যা কিছু বেচাকেনা সবই এতকাল হয়ে এসেছে আগরওয়ালাদের আড়তে। ময়রাপুকুরে আগরওয়ালদের একখানা দোতলা বাড়ি রয়েছে। বাড়ির খালি দোতলাখানা ইদানীং হরবখত ব্যবহার করেন কনকপ্রভা। সেই সূত্রে ঘনিষ্ঠতা আরও চিটালো হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, ওমপ্রকাশ নাকি জমিটা কেনার জন্য হেদিয়ে রয়েছে। পল্টু হাজরার তাতে তিলমাত্র আপত্তি নেই। বিষ্টুপুর শহরে তাদের নিজস্ব জমি-জিরেত কম নয়। কিন্তু, উপস্থিত, কনকপ্রভার মহলে ঢোকার জন্য একখানা বাহানা চাই। জমিটাই সেই বাহানা। পল্টু বলে, 'খবরটা হাওয়ায় উড়ছে। ভাবলাম, হাতে পাঁজি মঙ্গলবারে কাজ কি? সরাসরি জিজ্ঞাসা করে লিয়াই ভাল। সত্যি নাকি মাসিমা? বিকবেন জমিটা?' কনকপ্রভা দোনোমোনো করছিলেন। বলেন, 'ভাবি। পরে জানাব।' সেটা পল্টুর পক্ষে আশীর্বাদতুল্য।

জমি বিক্রির ব্যাপারটা যতদিন ঝুলে থাকবে, পল্টুর মণ্ডকাণ্ড ততদিন। 'জমিনের ব্যাপারটা কী ভাবলেন, মাসিমা' বলে উজমুদ্দা ঢুকে পড়তে পারবে কনকপ্রভার গড়ে।

পল্টু ইদানীং ঘনঘন আসছে। জয়রামপুর থেকে চুয়ামসিনা, লোখেশোল হয়ে পাঁচাল অবধি রাস্তাটায় মোরাম পড়ছে। পল্টুই কাজটা পেয়েছে। দু'একদিন অন্তর চুয়ামসিনার লাল ধুলো উড়িয়ে তার রাজদূত হুঁক্‌রে ছুটে বেড়ায়। পেছনে, কখনও থাকে প্রভঞ্জন, কখনও করালী সোম, কখনও বা কেউই থাকে না। ইদানীং আর কনকপ্রভার মহলে ঢুকতে প্রভঞ্জনকে দবকার হয় না পল্টুর। সে রাজদূতে গর্জন তুলে সোজা সিং-দরজা পেরিয়ে ঢুকে পড়ে ভেতরে। সে আওয়াজে ইদানীং কখনও সখনও কুন্তী এসে দোতলার ঝুল-বারান্দায় দাঁড়ায়। এক ঝলক তাকিয়েই ঢুকে পড়ে সে। পল্টু সে জন্য ব্যথা পায় না অন্তরে। সে 'মাসিমা, চলে এলাম' বলতে বলতে রাজদূতের স্টার্ট বন্ধ করে।

কুন্তী ইদানীং মাঝে মাঝে দীপমালার কাছে যায়। কনকপ্রভা তাতে বাধা দেন না। দীপমালা তাঁদের আপনজন। তাঁর সঙ্গে কনকপ্রভাদের এক রহস্যময় বন্ধন। কনকপ্রভা খুশিই হন, কুন্তী মাঝে মাঝে দীপমালার কাছে গেলে। কিন্তু তাঁর আপত্তি অন্যত্র। মেয়ে বাসে চড়ে যাবে বিষ্টুপুর অবধি! ভাবতে গেলেই গা ঘিনঘিনিয়ে ওঠে কনকপ্রভার। আভিজাত্যের প্রশ্ন তো রয়েছেই। চুয়ামসিনার সিংহবাবু-বংশের মেয়ে বাসে চড়ে সর্বসাধারণের সঙ্গে গা ঘসাঘসি করতে করতে চলেছে, ভাবতে গেলেই লজ্জায় হেঁট হয়ে আসে মাথা। তাছাড়া, ইদানীং বাসে কে না উঠছে। বামুন, কায়েত, শূদ্র-বাউরি, বাগদি, চামার-মেথর... যার পকেটে পয়সা সেই চড়ে বসছে বাসে। আজ থেকে বছর দশ-পনের আগেও কেবল বাবুভায়ারা চড়তেন বাসে।এখন তো ছাগল-মুরগি-বরা অবধি বাসের মাথায়। তেমন বাসে সবাইয়ের সঙ্গে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে যাবে কি না সিংহবাবু বংশের মেয়ে। যারা একদিন পায়ের দিকে তাকাবার সাহস পেত না, তারা গায়ে গা ঘসবে বাসের মধ্যে। কনকপ্রভা বলেন, পালকিতে যা। কুন্তী তো হেসেই খুন। পালকি চড়ে যাব বিষ্টুপুর! আমি কি বিয়ার কনে নাকি? তো, গরুর গাড়িতে যা। ধুস, দিনভর ঠুকুস্ ঠুকুস, এক ঘড়ির পথ এক বেলা। কত মেয়াই যাচ্ছে মা। দীপামাসিও তো এভাবেই আসে। তা বাদে, বলকের দিদিমনিরা, মল্লিকাদি...। দিনকাল বদলাচ্ছে, মা। কুন্তী সেজেগুজে, সারা শরীর গয়নায় মুড়ে রওনা দেয় জয়রামপুরের দিকে। বাস যায় জয়রামপুরের গা ছুঁয়ে।

তেমনি একদিন, জয়রামপুর মোড়ে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল কুন্তী। আচমকা লাল ধুলো উড়িয়ে পল্টুর রাজদূত ছুটে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। এবং কুন্তীর দিকে ধাঁ করে প্রস্তাবটা ছুঁড়ে দিয়েছিল পল্টু। যতখানি আপত্তি আসবে ভেবেছিল পল্টু, ততখানি আপত্তি আসে নি কুন্তীর দিকে থেকে। সামান্য ইতস্তত করে সে চড়ে বসেছিল রাজদূতের পেছনে। চারপাশের উপস্থিত মানুষজনকে হতচকিত করে ঝড়ের বেগে চলে গিয়েছিল পল্টুর হাজরার হাওয়া-গাড়ি। সিংহবাবু পরিবারের মেয়ের সিল্ক-শাড়ির আঁচলখানি পতপতিয়ে উড়তে উড়তে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল হরিণমুড়ির পুলের বাঁকে।

বুদ্ধদেবের কানে যখন পুরোপুরি গেল সে কাহিনী কুন্তী তখন পুরোদমে উড়ছে। পল্টু হাজরা তখন একটু একটু করে গিলছে ওকে। বোকা মেয়েটা বুঝতেই পারছে না।

পড়ন্ত দুপুরে বিষ্টুপুর থেকে ফিরছিল বুদ্ধদেব। সিংহগড়ে ঢোকার মুখে দেখে, কনকপ্রভার মহলের সামনে খান-দশেক গরুর গাড়ি সারবন্দী দাঁড়িয়ে।

সঙ্গে ছিল গোরাচাঁদ। সে গিয়েছিল দীপমালার বাসায়। দীপমালা ওকে দেখতে চেয়েছিলেন। অনেকদিন গোরাচাঁদকে না দেখলে এখনও মনে মনে অধীর হয়ে ওঠেন দীপমালা। তার ওপর একটা ভারি দরকারি কথা ছিল গোরাচাঁদের সঙ্গে। শালতোড়ার ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন দীপমালা। আজ ভর্তির তারিখটা চূড়ান্ত হল। সামনের মাসের তিন তারিখেই ভর্তি হবে গোরাচাঁদ।

গোরাচাঁদ বুঝতে পারে, আবার কর্তামা বেরোচ্ছেন পর্যটনে। কনকপ্রভার পর্যটনের জাঁকজমক গোরাচাঁদের ভালই জানা আছে। খুব ছেলেবেলায় একবার মাও কর্তা-মায়ের সঙ্গে পুরী গিয়েছিল। গোরাচাঁদও সঙ্গে গিয়েছিল। আসলে অগ্নি ছিল সেই পর্যটনে কর্তা-মায়ের পর্যটনদলের সদস্যা। কর্তা-মা নিজেই আগ বাড়িয়ে বলেছিলেন অগ্নিকে, চল্ অগ্নি! তোকে একবার পুরী দেখিয়ে আনি। কনকপ্রভার স্বামী প্রিয়ব্রতকে ছোটবাবু বলে ডাকত অগ্নি। ছোটবাবুর নিদারুণ অসুস্থতার সময়ে অগ্নিই ওঁর কাছে থাকত দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা। গোরাচাঁদ তখন কোলের শিশু। যক্ষ্মা রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন প্রিয়ব্রত। সাবেক সিংহগড়ের একতলার একখানা ঘরে শুয়ে থাকতেন তিনি। কনকপ্রভার পীড়াপীড়িতেও দোতালায় ওঠেন নি। ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে অষ্টপ্রহর খক্‌খক্ করে কাশতেন প্রিয়ব্রত। মাঝে মাঝে কাশির সঙ্গে রক্ত উঠত। পরীক্ষিত বাউরি, অগ্নির বাবা, প্রিয়ব্রতর আজীবনকালের ছায়াসঙ্গী, সে সময় অগ্নিকে বহাল করেছিল প্রিয়ব্রতর সেবাযত্নের জন্য। অগ্নি তখন সবেমাত্র স্বামীর ঘর থেকে বিতাড়িত হয়ে বাপের বাড়িতে বসবাস করছে।

স্বামীর নিদারুণ অসুস্থতার দিনে প্রাণ ঢেলে সেবা করেছে বলেই সম্ভবত অগ্নির প্রতি কিঞ্চিৎ সদয় মনোভাব ছিল কনকপ্রভার। প্রিয়ব্রত এক রাতে ঘর ছাড়লেন। চলে গেলেন গোরাবাড়িতে, জলডুবি আন্দোলনে যোগ দিতে। আর ফেরেন নি তিনি। অগ্নিরও পাট চুকেছে কনকপ্রভার মহল থেকে। কিন্তু মাঝেমধ্যেই ওর খোঁজখবর নিতেন কনকপ্রভা। ওকে ভালবাসতেন তিনি।

কনকপ্রভার সঙ্গে যখন পুরী গিয়েছিল গোরাচাঁদেরা সেটা ছিল আষাঢ় মাস। দশ-বারোখানা গরুর-গাড়িতে করে বিষ্টুপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল পুরো দল। একটা গাড়িতে ছিলেন কনকপ্রভা ও কুন্তী। সঙ্গে ছিল পান্নালাল, সস্ত্রীক নিকুঞ্জপতি, নন্দ সরকার এবং তার বউ,—সব মিলিয়ে জনা দশ-বারো ভদ্দর-সজ্জন। তাদের জন্য তিন-চারখানা গাড়ি বরাদ্দ ছিল। এছাড়া, রাঁধুনি, বামুন-মাসি, কনকপ্রভার খাস-ঝি তরঙ্গ, চপলা, বাজার-সরকার প্রদ্যুম্ন ঘোষ। মদন শীটের বাপ পচু ধোপা, কাপড় চোপড় কেচে দেওয়ার জন্য। ঝি-চাকর আরও জনা পাঁচেক। পাখা করবে, পা টিপে দেবে, ফাইফরমাস খাটবে, তাগড়া জোয়ান জনা পাঁচ-ছয়। তারা মাল বইবে। হাজার হ্যাপা সামলাবে। আর, সঙ্গে ছিল গোরাচাঁদ এবং অগ্নি। রাঁধুনি, বামুন-মাসি, তরঙ্গ চপলা আর প্রদুম্ন ঘোষ গরুর গাড়িতে চড়ে গিয়েছিল। বাকিরা পায়ে হেঁটে। অবশিষ্ট গাড়িগুলোতে গিয়েছিল সরু চাল, হিংচিলেবু ধানের চিড়ে, ফুল-বাতাসা, আখের গুড়, বাসন-কোসন, পোশাক-পরিচ্ছদভর্তি তোরঙ্গ তিন-চারখানা, মাদুর, শতরঞ্জি, হাতা-খুন্তি, হ্যাজাক লাইট, বিছানা-বালিশ-তাকিয়া, শিল-নোড়া, পায়খানার গাড়ু, মায় পা ঘসবার ঝামা অবধি।

দু'ঘড়িটাক বেলায় গরুর গাড়ির মিছিল গিয়ে থামল অবন্তিকা গাঁয়ে, দ্বারকেশ্বরের পাড়ে। সেখানে জলখাবারের বিরতি। গাড়ি থেকে শতরঞ্জি নামিয়ে পেতে দেওয়া হল মউলগাছের তলায়। কনকপ্রভারা বসলেন। ঝি-চাকরেরা বালতি-ভরে জল নিয়ে এল নদী থেকে। গাড়ু-গামছা সাজিয়ে দিল। কনকপ্রভারা মুখ-হাত ধুলেন। ঘিয়ে ভাজা লুচি, আলুভাজা আর সুজির হালুয়া আনা হয়েছিল প্রচুর পরিমাণে। সবাই পেট ভরে খেয়েও কিছু বেশি হয়ে গেল। আচমকা এতগুলো সুসজ্জিত গরুর গাড়ি নিয়ে এতগুলি মানুষ..., আশেপাশের পাড়াগুলোর থেকে কৌতূহলী মানুষেরা ছুটে আসে। তাদের প্রাথমিক ধারণা, কোনও অপেরা দল গাওন সেরে ফিরছে, কিংবা গাওনে চলেছে। কাছে এসেই ওদের ভুল ভাঙে। অপেরাদল নয়, তীর্থে চলেছেন চুয়ামসিনার সিংহবাবু-বংশের বউ কনকপ্রভা। বড়রা সবিনয়ে প্রণাম-টুণাম জানিয়ে ফিরে যায়। বাচ্চারা আশেপাশেই ঘুরঘুর করতে থাকে। ডেঁয়ো পিঁপড়ের মতো। কনকপ্রভার আদেশে অবশিষ্ট লুচি-হালুয়া ওদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়।

বিষ্টুপুরে গাড়ির মিছিল পৌঁছায় দুপুর নাগাদ। ওমপ্রকাশ আগরওয়ালকে আগাম খবর দেওয়াই ছিল। সে তার ময়রাপুকুরের খালি পড়ে থাকা বাড়িব দোতলাখানা সাফ-সুতরো করেই রেখেছিল। কনকপ্রভারা সদলবলে সেখানেই উঠলেন। ওমপ্রকাশ আগরওয়ালার সঙ্গে সিংহবাবুদেব বহুদিনের সম্পর্ক। সেই সুদর্শন সিংহবাবুর আমল থেকেই ওদের সঙ্গে লেনদেন। সিংহগড়ের যাবতীয় ধান ও রবিশস্য আগরওয়ালার গদিতে গিয়েছে চিরকাল। পরিবর্তে কাপড়-চোপড়, তেল-মসলার বারমেসে খদ্দের ছিলেন সিংহবাবুরা। ওমপ্রকাশের বাবা যুমনাপ্রসাদের সময় থেকেই চলেছে এমন ব্যবস্থা । ব্যবসায়িক সম্পর্কটা একসময় পারিবারিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছে।

আগরওযালার ময়রাপুকুরের বাড়িতে সারাদিন বিশ্রাম নেন কনকপ্রভা। পান্নালাল, নিকুঞ্জপতি, প্রদ্যুম্ন ঘোষেরা নুন-মসলা, তেল-ঘি, ময়দা-সুজি ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসাব মতো কেনাকাটা করে। রান্না চড়িয়ে দেয় রাঁধুনি। জোগাড়দারেরা ছুটোছুটি জুড়ে দেয়। সোনামুগের ডাল দিয়ে খিঁচুড়ি, গাওয়া ঘি, বেগুনভাজা, আলুভাজা, এবং আচার। খেতে খেতে বিকেল গড়িয়ে আসে। সন্ধের শো'তে সিনেমা দেখতে যান সবাই। রাঁধুনি ও জোগাড়দারেরা কেবল থেকে যায়।

আগরওয়ালার দোতলায় রাত্রিবাস করে পরের দিন ভোবের ট্রেনে চড়ে বসে পুরো দল। সঙ্গে চলে যাবতীয় সম্ভার।

খড়্গপুরে কনকপ্রভার বাপের বাড়ি। সেখানে গিযে ওঠে পুরো দল। বাড়ির সামনে সামিয়ানা খাটানো হয়। কেবল পান্নালাল, নিকুঞ্জপতির পরিবার এবং কনকপ্রভারা মা-মেয়ে খাওয়া-দাওয়া করেন ভাইয়ের বাড়িতে। অন্যদের জন্য উনুন পেতে রান্না চড়ানো হয়। কনকপ্রভা প্রচুর পবিমাণে শাক-সবজি, মাছ আনিয়ে দেন বাজার থেকে। ভাইদের প্রত্যেকের জন্য ধুতি-গেঞ্জি, ভাই-বউদের জন্য শাড়ি-শায়া-ব্লাউজ, আলতা ও সিঁদুর কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন কনকপ্রভা, ভাইপো-ভাইঝিদের জন্যও পর্যাপ্ত পোশাক-আশাক। সেগুলো একে একে তুলে দেন সবাইয়ের হাতে।

রাতের পুরী-প্যাসেঞ্জারে চড়া হয়। সঙ্গে চলেন কনকপ্রভার বিধবা মা এবং দু'টি মেয়েকে নিয়ে বড় ভাজ। যে কামরায় ওঠেন ওঁরা সবাই বিস্ফারিত চোখে দেখতে থাকে

বিশাল দলটিকে। তাদের সঙ্গের বিশাল লটবহরে কামরা ভরে যায়। কৌতূহলী মানুষেরা অল্প সময়ের মধ্যেই জেনে যায় বাঁকুড়া জিলার চুয়ামসিনার সিংহগড়ের বউ চলেছেন তীর্থে। মানুষজন সবিস্ময়ে তারিফ জানায়, হ্যাঁ, বনেদী মানুষের তীর্থযাত্রাই বটে এটা। এমনটাই হওয়াই বিধেয়।

পুরীতে কনকপ্রভাদের তিনপুরুষের পাণ্ডা লোকনাথ দ্বৈতপতির লোকজন মজুত ছিল স্টেশনে। মালপত্তর, লটবহর নামিয়ে তারা পুরো দলটিকে নিয়ে চলে আগে থেকে ঠিক করে রাখা বাসাবাড়িতে। নামেই বাসাবাড়ি, আসলে সেটা একখানা ছ'সাত কামরার দো'তলা বাড়ি। কনকপ্রভা এলে প্রতিবারই এই বাড়িতেই রাখা হয় তাঁকে। দোতলার কোন্ ঘরটিতে তিনি থাকেন তাও সবাইয়ের জানা। হাতাহাতি করে তাঁর যাবতীয় তোরঙ্গাদি পৌঁছে দেওয়া হয় সে ঘরে। ঝটিতি আনাজ-বাজার সারতে বেরিয়ে পড়ে প্রদ্যুম্ন ঘোষের দল। রাঁধুনিরা জলখাবার বানিয়ে দিয়ে, রাতের রান্না চড়িয়ে দেয়। পচু শীট কনকপ্রভাদের পরে আসা কাপড় চোপড় নিয়ে কুয়াতলায় কাচতে বসে। স্নান সেরে কনকপ্রভা শুয়ে পড়েন বিছানায়। তরঙ্গ পা টিপে দেয়।

সে যাত্রা দিন-পনের-বিশ ছিল গোরাচাঁদেরা পুরীতে। সাজো, উল্টো, দুই রথই দেখে ফিরেছিল। যতদিন ওরা ছিল, সারাক্ষণ, চব্বিশ ঘণ্টা যেন মচ্ছব চলছিল বাড়িখানাতে। কনকপ্রভা দু'হাতে টাকা উড়িয়েছেন। কারোর কোনই অভাব রাখেননি। সবাইয়ের জগন্নাথ দর্শন ও পূজা-প্রণামীর খরচ বহন করেছেন। বিদায় কালে পাণ্ডার হাতে যা গুঁজে দিয়ে এসেছেন তা এক কথায় কল্পনাতীত। এছাড়া, পাণ্ডার চেলা-চামুণ্ডা লোকজনকেও হাত উপুড় করে বখশিস দিয়েছেন।

দেখেশুনে সেই বাচ্চা বয়েসেও গোরাচাঁদের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। কর্তা-মার একবার রথ দেখতে যাওয়ার খরচে যে একটা পুরো সংসারের এক বছরের খাওয়া-পরা হয়ে যাবে, সেটা ঐ বয়েসেই বুঝতে পেরেছিল সে।

বুদ্ধদেব অবাক নয়নে দেখছিল।

গরুর গাড়ির পাশে হাঁড়ি-বালতি, ডেকচি, কড়াই, বাক্স-বিছানা, মাদুর-শতরঞ্জি ইত্যাদি রাজ্যের সামগ্রী এনে ডাঁই করছে লোকজন। গরুগুলো সারবন্দী দাঁড়িয়ে বিচালি চিবোচ্ছে। পুরো কাজের তদারকি করছে নিকুঞ্জপতি।

কাকে যেন খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাঁক-ডাক করছিল নিকুঞ্জপতি। তার মধ্যেও ঘাড় ঘুরিয়ে বুদ্ধদেবকে এক ঝলক দেখে নেয়। আলগা হাসে।

কনক্প্রভার মহলের পুরো ইতিহাস সুকুমারের মুখে শুনেছিল বুদ্ধদেব। এখন আর তার কিছু অজানা নেই। লাটাই থেকে আচমকা সুতো ছিঁড়ে যাওয়ার দরুণ একজোড়া রঙিন ঘুড়ি আকাশে দিশাহীন উড়ে চলেছে। এলোমেলো লাট খাচ্ছে উদ্দাম হাওয়ায়। সুতোখানা চলে গেছে নাগালে বাইরে। ঘুড়িখানাকে আর সুস্থ শরীরে নামিয়ে আনা যাবে না। অথচ একদিন তাকে নামতে হবেই। লাটাই থেকে ছুটে যাওয়া শৃঙ্খলা ও শৃঙ্খলহীন ঘুড়ি অনির্দিষ্টকাল আকাশে থাকতে পারে না। মুখ থুবড়ে সে পড়বেই। কিন্তু কবে পড়বে, কত দূরে গিয়ে, তা কেউ আগাম জানে না। অবশ্য একথাটা ভালই জানে, যখন পড়বে, তখন ছেঁড়া-ফাটা, আহত, ক্ষতবিক্ষত ঘুড়িদুটি পুনরায় ব্যবহারের উপযুক্ত থাকবে না।

সহসা মনটা খারাপ হয়ে যায় বুদ্ধদেবের। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে আর তিলমাত্র ইচ্ছে করছিল না। খুব শোভনও নয় সেটা। বুদ্ধদেব গোরাচাঁদকে খুব অস্ফুট গলায় বলে, 'চল্।'

গোরাচাঁদের চোখে-মুখে রাজ্যের বিস্ময়, কৌতূহল। বলে, 'টুকচান দাঁড়ান, জেইনে আসি, কুথাকে যাচ্ছে কত্তা-মা।'

আসলে, বুদ্ধদেব একটা কথা বলতে এসেছিল কনকপ্রভাকে। খুবই গুরুতর সে কথা। খুব স্পর্শকাতরও বটে। বলবে কি বলবে না ভাবছিল ক'দিন। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বলে দেওয়াই উচিত। না বলাটা অন্যায়। তবুও মনে মনে খুব সঙ্কোচ ছিল ওর মনে।

বলবে বলবে করে দীপমালাকেও বলতে পারল না আজ।

কথাটা কুন্তী সম্পর্কে।

কুন্তী আর পল্টু হাজরাকে নিয়ে নানান কথা কানে আসছিল বুদ্ধদেবের। শিষ্টতা জ্ঞানে ঐসব কথা কখনই তোলে নি কনকপ্রভার কাছে। কিন্তু ক'দিন আগে স্বচক্ষে যা দেখেছে! বিকেল গড়তির মুখে সিনেমাহলের সামনে দিয়ে অফিসের কাজেই হনহনিয়ে হাঁটছিল বুদ্ধদেব। হঠাৎ দেখে, পল্টুর মোটরবাইক গাঁকগাঁক আওয়াজ তুলে ঢুকে গেল হল-চত্বরে। পেছনে কুন্তী। খুব ঘনিষ্ঠভাবে পেছন থেকে জড়িয়ে রয়েছে পল্টুকে। ওরা দেখতে পায়নি বুদ্ধদেবকে। মোটরবাইক থেকে নেমে ওরা গটগটিয়ে ঢুকে গেল হলে। বুদ্ধদেব বেশ খানিকক্ষণ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই।

কুন্তীকে সে চেনে। আরামে, বিলাসে বেড়ে ওঠা তার দেমাকী জীবন। নিজের বংশ-আভিজাত্য সম্পর্কে ষোল আনা সচেতন। ভীষণ আদুরে আর অভিমানী। বাস্তবের শক্ত মাটিতে তাকে এখনও অবধি পা রাখতে হয় নি। এখনও সে কল্পনায় ভাসে। এখনও অবধি বিশ্বাস করে, নাচ-গান, ফুর্তি, জলসা আর জাঁকজমকপূর্ণ ভ্রমণই জীবন। নিজের চেয়ে ধনেমানে খাটো মানুষকে সে ঘৃণা করতেই অভ্যস্ত এবং নাকের ওপর সামান্য একটুখানি ভাঁজ ফেলেই বেশ ফুটিয়ে তুলতে পারে সেই তাচ্ছিল্য। ইদানীং নিজের রূপ সম্পর্কেও খুব সচেতন হয়েছে কুন্তী। বয়ঃসন্ধির যাবতীয় লক্ষণ ফুটে উঠেছে ওর শরীরে, মনে। সাজগোজের পারিপাট্য বেড়েছে। বদলেছে পুরুষের দিকে তাকাবার ভঙ্গিমাটিও। এক অচেনা সৌরভ জমেছে তার শরীর জুড়ে। সৌরভটাকে চিনতে পারছে সে নিজেও। তবে এমনিতে খুব সরল মনের মেয়ে, কোনও প্যাঁচপোঁচ নেই অন্তরে। পছন্দ হলে উচ্ছ্বসিত হয়ে সেটা বুঝিয়ে দেয়, অপছন্দ হলে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করে দেয় ঘৃণাটুকু। মানুষ সাধারণত ভয়, সঙ্কোচ থেকেই মনের কথা চাপে, সৌজন্যের খাতিরে একরকম মনে হলেও মুখে অন্যরকম বলে। এইভাবে তিলতিল কুটিলতা জমে তার শরীরে। কুন্তীর শৈশব থেকে সেসব বালাই নেই। কাউকে ভয় করতে হয় না তাকে। বরং চারপাশের সবাই ভয় করে তাকেই। কারও প্রতি কোনও সৌজন্য দেখাবার দায় নেই তার, চারপাশের সবাই তাকে সৌজন্য দেখাতে ব্যস্ত। কাউকে কিছু বলতে গিয়ে সঙ্কোচ হয় না তার, বরং চারপাশের সবাই ভয়ে, সঙ্কোচে তার সামনে প্রাণ খুলে কথা বলতে চায় না। শৈশব থেকে শুধু মা ছাড়া সবাই অধমর্ণ তার। সবাই খাটো। সবাই সারাক্ষণ ওকেই তোয়াজ করেছে। মনরাখা কথায় ভেজাবার চেষ্টা করেছে ওর মন। ওকে কখনও কারোর মন রাখতে তোষামোদি কথা বলতে হয় নি।

অন্যদিকে পল্টু হাজরাকেও ভাল করে চিনেছে বুদ্ধদেব। বিষ্ণুপুর শহরে তার কীর্তিব কথা কারোরই অজানা নেই। গুণ্ডা-মস্তান পরিবৃত হয়ে থাকে সর্বদাই। মানুষের ওপর জুলুম করে আনন্দ পায়। মদ-গাঁজা-ভাঙ্ কোনও নেশাই বাদ নেই তার। আর, তার মোটরবাইকের পেছনে সর্বদাই একটা মেয়ে থাকে ইদানীং। পেছনে মেয়ে না থাকলে তার রাজদূত বেজায় টাল খেতে থাকে। প্রতি মাসে অন্তত একটি মেয়েঘটিত কেলেঙ্কারির খবর পায় বিষ্ণুপুরের মানুষ। সবাই ভয় করে তাকে। এম এল এ'র ভাইপো। সচ্ছল পরিবারের সন্তান। ইদানীং কাঁচা পয়সাও প্রচুর পরিমাণে ঢুকছে সংসারে। একটা মারকুটে ছোকরাদের ক্লাব চালায় সে। শহরের তাবৎ বদ ছোকরা তার কথায় ওঠে বসে। সেই পল্টুর খপ্পরে পড়ে গিয়েছে কুন্তী। তার সুঠাম শরীর, বাবরি চুল, মোটরবাইক হাঁকিয়ে বেড়ানো, শহুরে কেতা, এ সবই কুন্তীর চোখ কেড়েছে। শহুরে ফাঁপা জৌলুষে ভুলেছে গ্রাম্য সরল এক কিশোরী। চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছে তার। শহুরে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গ্রামের ছেলেমেয়েদের এখানেই তফাৎ। অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হলেও কুন্তীর সেই ঠাটঠমক নেই। ভারি ভারি গয়না পরে থাকে, কিন্তু সব সাবেকি ডিজাইনের গয়না। দামি বিষ্ণুপুরী সিল্কের শাড়ি সে আটপৌরোভাবে পরে থাকে বাড়িতে। পাউডার, স্নো, সুগন্ধি, প্রসাধনে ভুরভুর করে না তার শরীর। শহরে একটা মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়েও তাকে আলগা জৌলুষে টেক্কা দিয়ে যায়। পাড়াগাঁয়ের একটা জমিদাবাড়ির ছেলেকেও আলগা জৌলুষে হারিয়ে দেবে শহরের এক মধ্যবিত্ত ছোকরা। কুন্তী ঐ ফাঁপা জৌলুষেই ভুলেছে। পবিণতির কথা তিলমাত্র না ভেবে, পোকা যেমন আলোর দিকে ছোটে, তেমনি করেই পল্টুর দিকে দৌড়তে চাইছে কুন্তী। পরিণাম নিয়ে তিলমাত্র ভাবছে না। অথচ বুদ্ধদেব দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে, পল্টু হাজরাকে গলায় বাঁধলে সর্বনাশ হয়ে যাবে কুন্তীর। পল্টু ওকে ছিবড়ে বানিয়ে ছেড়ে দেবে।

কুন্তী বুঝবে না, কিন্তু কথাটা কনকপ্রভাকে বলা দরকার। জেনেশুনে সে চেপে যেতে পারে না। ওদের ব্যাপারে দীপমালা তার ওপর অনেকখানি ভরসা করে রয়েছেন। কিন্তু কেমন করে বলবে, কনকপ্রভা কীভাবে নেবেন ব্যাপারটাকে, এইসব টানাপোড়েনে সে এ'কদিন নিরন্তর ভুগেছে। দীপমালাকে সবকিছু খুলে বলা যেত। কিন্তু সেখানেও সঙ্কোচ বুদ্ধদেবের। কুন্তীকে নিয়ে ওব সম্পর্কে কিছু কিছু কথা রটেছে। সম্ভবত প্রভঞ্জনই সেই বটনার মুখ্য ভূমিকায়। হয়ত বা হরবল্লভেরও প্রচ্ছন্ন সায় বয়েছে তাতে। কুকুরকে প্রথমে বদনাম দাও, তারপর মেরে ফেল, এমন নীতি থেকে ওরা সম্ভব-অসম্ভব রটিয়ে বেড়াচ্ছে তার সম্পর্কে। সম্ভবত, দীপমালার কানেও পৌঁছেছে সে কথা। এখন যদি পল্টুর সঙ্গে কুন্তীর মেলামেশি নিয়ে কিছু বলে বুদ্ধদেব, দীপামালা ওকে ভুল বুঝতে পারেন। ভাবতে পারেন, এক ধরনের ঈর্ষা থেকেই বুদ্ধদেব বলছে এসব।

এইসব নিয়ে এ'কদিন খুব মানসিক অস্থিরতায় কেটেছে বুদ্ধদেবের। শেষমেষ, কনকপ্রভাকে কথাগুলি বলা দরকার, এমন সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছে সে।

ভ্রমণে বেরোবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এবার কনকপ্রভাদের বেরোবার সময় হল। বুদ্ধদেব বোঝে, যে কথাগুলি বলবার জন্য সে এসেছিল, সেগুলো বলবার উপযুক্ত সময় নয় এটা। কনকপ্রভা ফিরে আসুন। তখন প্রয়োজন হলে বলা যাবে।

বুদ্ধদেব পায়ে পায়ে চলে আসে সিংহগড়ে।

চুয়ামসিনায় রামসেবকদের উপদ্রব

সেবার খুব হনুমানের উপদ্রব হল চুয়ামসিনা গাঁয়ে।

এত হনুমান যে কোথায় ছিল! গাছে গাছে শুধুই হনুমান। গেরস্থের শাক-সবজি লোপাট হয়ে যেতে লাগল রোজ। পথেঘাটে একা একা বেরোনো দায় হল। বাচ্চাদের দু'চারজন চড়-চাপড় খেল হনুমানের হাতে। এমন কি ফাঁকা পেলে গেরস্থের ঘরের মধ্যেও ঢুকে পড়তে লাগল হনুমানের দল। রান্নাঘরের সিক ধরে ঝুলতে লাগল যখন তখন। আতঙ্কিত মানুষজন ভেবে কুল পায় না, কোত্থেকে এল এতএত হনুমান! কেনই বা এল!

হরবল্লভ ইলচি করে বলেন, রামের সেবক ওরা। রামরাজ্য খুঁজে খুঁজে অদ্দুরে এসে পৌঁছেছে। বললেন, উয়াদ্যার লেতাটিকে দ্যাখ নাই তুমরা? তুমাদ্যার লৈতন রামসেবকবাবু। এক রামসেবকে লিস্তার নাই, এখন ডজনে ডজনে রামসেবক। ঠেলা সামলাও এবে!

হনুমানের জ্বালায় যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে চুয়ামসিনার মানুষ, যখন জ্যোতিষীর কাছে ভাষ নিতে যাওয়ার তোড়জোড় জুড়েছে, কাঁর যেন পরামর্শে রামযজ্ঞের প্রস্তুতি চালাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বুদ্ধদেব দিল প্রস্তাবখানা। হনুমান তাড়ানোর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। কিন্তু আমারও একটি শর্ত রয়েছে। যে কোনও শর্তেই তখন রাজি চুয়ামসিনার মানুষ। তাদের তখন বলে কাঁকতলিতে কাউর। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা। বলে, বলুন বলুন, শর্তটা বলুন। বুদ্ধদেব বলে, হনুমান তাড়ানোর পর তোমরা তোমাদের একখানা জমির একটুখানি কোণে ইউরিয়া আর বোনমিল ছড়াতে দেবে, মাত্র এক মবসুমের জন্য। —রাজি রাজি। একযোগে হই-হই করে ওঠে চুয়ামসিনার সম্পন্ন মানুষেরা, ধনে- প্রাণে মইর্‌তে বসেছি আমরা। গরুর হাড়, শুয়ারের হাড়, যা বলুন ছড়াব জমিনে। আপনি আগে এই মুখপুড়াদ্যার খেদান।

সরকারি হান্টার অবতার সিং বসে মহকুমা কৃষি অফিসারের অফিসে। সেখানেই তার চাকরি। চাকরি বলতে বসে বসে মাইনে খাওয়া। মাঝে মধ্যে অবরে-সবরে হাতিদের উপদ্রব বাড়ে। বিশেষত ফসল পাকবার মরসুমে ওরা দল বেঁধে বেরিয়ে আসে জঙ্গল থেকে। পাকা ধানের লোভেই আসে ওরা। তখন এস-এ-ও সাহেবের কাছে আর্জি জানালে অবতার সিং তার দোনলা বন্দুক নিয়ে চলে যায় অকুস্থলে। হাতির গায়ে ফায়ার করা বারণ। অবতার সিং গাঁয়ের লোকলস্কর নিয়ে ধামসা-মাদল সহকারে তাড়া করে হাতিদের। ফাঁকা ফায়ার করে ভয় দেখায়। হাতির দল জঙ্গলে ঢুকে গেলে ফিরে আসে অফিসে। মাঝে মধ্যে জঙ্গলের লাগোয়া গাঁগুলোতে বাঘের উপদ্রব হয়। গেবস্থের গরু-বাছুর তুলে নিয়ে যায় রাতের আঁধারে। চৈত্র-বৈশাখে, গাছেগাছে মউল পাকলে দলেদলে ভালুক আসে মউল খেতে। অবস্থা যখন গ্রামবাসীদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, তখন ডাক পড়ে অবতার সিংয়ের।

এছাড়া জেলার সাহেবরা মাঝেমাঝেই শিকারে বেরোন। শখের শিকার। অবতার সিংকে সাহেবদের সঙ্গে যেতে হয়। কোলকাতা, দিল্লী থেকে বড় বড় সাহেবরা আসেন। রাঢ়ভূমের অরণ্যকে প্রত্যক্ষ করতে চান। অবতার সিং ওঁদের সঙ্গী হয়।

বুদ্ধদেব প্রস্তাবটা দেওয়া মাত্রই তাচ্ছিল্যে বেঁকে যায় অবতার সিংয়ের মুখখানি। সে এই জেলায় নতুন এসেছে। এসে ইস্তক বাঘ, হাতি, ভালুক তাড়িয়েছে বটে, কিন্তু আজ অবধি বাঁদর মারবার ফরমায়েশ সে পায়নি। বলে, বন্দর! আরে ছোঃ। বন্দর মারনেওয়ালা হান্টার হাম নেহি ভয়ীল্‌ বা। বুদ্ধদেব যত বোঝায়, যত ভয়াল করে আঁকে পরিস্থিতিখানা, ততই মাছি

তাড়ানোর ভঙ্গিতে সবকিছু উড়িয়ে দেয় অবতার সিং। বুদ্ধদেব ওকে প্রাণপণে বোঝায়, বন্দর নেহি হ্যায়। পোড়ামুখো হনুমান হ্যায়। বলামাত্তর ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠে অবতার সিংয়ের মুখখানি। সীয়রাম সীয়ারাম, এ আপ ক্যা বোলতা, বুদ্ধুবাবু, হনুমানজীকো মারেঙ্গে হাম? হনুমানজী রামজীকো ভকত্ হোঁতে হ্যায়। হাম উনকো পূজা করতা হ্যায়। বুদ্ধদেব ক্ষেপে যায়, তাহলে, তুমি মাসে মাসে মাইনে খাবে, আর হনুমানের জ্বালায় গ্রামের মানুষের নাভিশ্বাস উঠবে? আমি কিন্তু এস-ডি-ও-কে জানাব। এস-ডি-ও'-র কথায় সামান্য ভয় পায় অবতার সিং। বলে, তুম্ তো আচ্ছা মুশিবত খাড়া কর দিয়া বাবু! আরে যাও যাও গাঁওবালে কো বলো, রামজীকা পূজা করে। উনকো খুশ করে। রামজীনে উন লোগোকো ভেজা, উন্‌হেই ওয়াপস্ কর লেঙ্গে।

'রামজী নে ভেজা?' বুদ্ধদেব ক্ষেপে যায়, 'ডজন ডজন হনুমান কো রামজী নে এক গাঁয়েই ভেজা? কিঁউ ভেজা?'

'জরুর কুছ মতলব হোগা।' অবতার সিংয়ের নিরাসক্ত জবাব, 'তুম ক্যায়সে সমঝেগা। তুম ক্যা যোগী হো, মুনি হো, মহাত্মা হো—?'

বাধ্য হয়ে এস-এ-ও সাহেবের কাছে দরবার করতে হয় বুদ্ধদেবকে। দাখিল করতে হয় চুয়ামসিনার মানুষের সই করা গণদরখাস্ত। এস-এ-ও সাহেবের হাজার পীড়াপীড়িতেও টলানো যায় নি অবতার সিংকে। ধমক-ধামক, চাকরি খেয়ে নেবার ভয়, সবই বৃথা হয়ে যায়। সে নোকরি ছেড়ে দেবে, তবুও হনুমানের অঙ্গে সামান্য আঘাত হানতে পারবে না। তাহলে প্রভু রামজী তার আগামী চোদ্দপুরুষকে সাগরের জলে ডুবিয়ে মারবেন। অবশেষে অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর, 'অপারেশনের শেষে রামজীর পূজো করে তাঁর মার্জনা ভিক্ষা করবার যাবতীয় খরচ বহন করা হবে' এমন অঙ্গীকার করবার পর কেবল শূন্যে গুলি ছুঁড়ে হনুমানদের ভয় দেখাতে রাজি হয় অবতার সিং। এবং একদিন দোনলা বন্দুকখানি কাঁধে নিয়ে গলায় টোটার মালা ঝুলিয়ে সে চুয়ামসিনা গাঁয়ে বীরদর্পে প্রবেশ করে। গাঁয়ের বাচ্চারা কেবল পালাগানের আসর ছাড়া এমন সুসজ্জিত বীর আর দেখে নি কখনও। তারা কাতারে কাতারে অবতার সিং-এর পিছু নেয়। দূর থেকে ওকে অনুসরণ করতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে ওকে নিয়ে অনেক গল্পগাথার জন্ম দেয়। অবতার সিং লম্বা লম্বা পা ফেলে সদর্পে সিংহগড়ে প্রবেশ করে।

সিংহগড়ে হাতে পাকানো মোটা রুটি, ডাল, সবজি, উচিত পরিমাণে গাওয়া ঘি এবং ঘন দুধ পান করে সে রাতটুকু কোনও গতিকে কাটায় অবতার সিং। কিন্তু সিংহগড়ের টানা পাঁচিলের টিনের চালে রাতভর বিশ-পঞ্চাশটা হনুমানের দাপাদাপিতে কান ঝালাপালা হয়ে যাওয়ার দরুণ তিলমাত্র ঘুম হয় না রাতে। পরদিন সকালে উঠে বন্দুকসহ গ্রাম পরিক্রমায় বেরিয়ে চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যায় অবতার সিংয়ের। একটা মাত্র গাঁয়ে এমন বিশাল সংখ্যক হনুমান থাকতে পারে, সেটা তার কল্পনাতেই ছিল না। আর দলবদ্ধ হয়ে থাকলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী এমন কি মানুষও বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল, কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে। তার ওপর গলায় টোটার মালা, দোনলা বন্দুক হাতে, ঝাঁকড়া মোচওয়ালা দশা-সই একটা মানুষকে ভারি ভারি পা ফেলে হাঁটতে দেখে তাদের মধ্যে যুগপৎ আশঙ্কা ও ক্রোধের সঞ্চার ঘটে। এমন পরিস্থিতিতে দু'একটা গাছ লক্ষ করে বন্দুকের দু'একটা ফাঁকা আওয়াজ করায় তার ফল হয় মারাত্মক। পরিণতি স্বরূপ, বৈকালিক গ্রাম পরিক্রমার সময় একদল হনুমান আচমকা গাছ

থেকে ঝাঁপ দিয়ে ওকে আক্রমণ করে বসে। আঁচড়ে কামড়ে ওকে ধরাশায়ী করে দেয়। গ্রামের লোকজন লাঠিসোটা নিয়ে চড়াও হয়ে কোন গতিকে অবতার সিংকে হনুমানের কবল থেকে বাঁচিয়ে সিংহগড়ে নিয়ে আসে। কিন্তু হনুমানে দ্বারা বেইজ্জত হয়ে সে আর মুখ তুলে কারও দিকে তাকাতে পারে না।

সারা সন্ধ্যা বুদ্ধদেব ওকে নানাভাবে বোঝায়। রামের বালিবধের গল্প শোনায়। বেয়াদব হনুমানকে যে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রও সহস্তে নিধন করেছিলেন সেটা জলবৎ তরলম্ করে বোঝাতে প্রায় অর্ধেক রাত কাবার হয়ে যায় বুদ্ধদেবের। কিন্তু তার ফল হয় মারাত্মক। সকাল হতে না হতেই অবতার সিং রুদ্ররূপ ধরে এবং ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বন্দুকের গুলিতে প্রায় আধ ডজন হনুমানকে ধরাশায়ী করে। ভীষণ ভয় পেয়ে হনুমানের দল প্রাণভয়ে পালাতে থাকে যেদিকে দু'চোখ যায়। এবং প্রায় হপ্তাটাক থেকে প্রায় ডজন-দুই হনুমান বধ করে অবশেষে অবতার সিং চুয়ামসিনা গ্রামকে পুরোপুরি হনুমানমুক্ত করে। হনুমানরা সব প্রাণভয়ে বৈদ্যার জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

চুয়ামসিনার মানুষ বুদ্ধদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা পায় না। ধন্যধন্য রব ওঠে চতুর্দিকে। বুদ্ধদেব শর্তখানি মনে করিয়ে দেয়, 'এবার চাষের মরসুমে কিন্তু ইউরিয়া আর বোন-মিল ছড়াতে দিতে হবে জমিতে।'

জলে নামে অগ্নি

ঘড়িটাক বেলায় ফিরে এসেছিল অগ্নি। তখন ডালে-পতরে বেলা। নিশান বাউরি হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে। সারা রাত ধরে তার স্নায়ুর ওপর কি পরিমাণ ধকল গেছে সেটা বুঝিয়ে দেয় অগ্নিকে অশ্রাব্য গালিগালাজের মাধ্যমে। বলে, কুথাকে নাঙ্ কইর্‌তে গেছ্‌লু রে? রাতভর কুথায় কাটাই এলু?

অগ্নি নিশান বাউরিকে চেনে। এই গালিগালাজ তার অপরিসীম দুর্ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ। অগ্নি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। নিশান বাউরি দুয়োরে বসে সমানে চিল্লাতে থাকে অগ্নির উদ্দেশে। অগ্নি জানে, খানিকবাদে ঠাণ্ডা হবে নিশান বাউরি। আর একপ্রস্থ কাঁদবে। তারপর নিজেই শুধোবে। হাজার প্রশ্ন শুধিয়ে তত্ত্ব-তালাশ নেবে অগ্নির। অগ্নি পাকশাল থেকে কোমরে তুলে নেয় মাটির কলসি। পায়ে পায়ে হরিণমুড়ির দিকে রওনা হয়। আর তখনই ঘটনাটা ধীরে ধীরে ভুট্‌ মারতে থাকে মনে।

শালকাঁকির ডাঙায় ভরদুপুরে জমে উঠেছিল ভাসুর-বুয়াসিনির পূজা। ঝটপট মোরগ বলি দিচ্ছিল সুদাম বাগদি। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছিল মোরগের গলা দিয়ে। অগ্নি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল জমায়েতের মধ্যে। আচমকা তার খেয়াল হয়, সূর্য মধ্যগগন থেকে হেলে পড়েছে অনেকখানি। চটজলদি ঘরের পথ ধরেছিল সে। উঠোনে সের-দুই ধান শুকোতে দিয়ে এসেছিল। ওগুলো কুটে ফেলতে হবে ঢেঁকিতে। সন্ধের মুখে চড়িয়ে দেবে ভাত। গোরা ফিরে আসবে ততক্ষণে। আজ বাবাও আসতে পারে। সকালে উঠেই অগ্নি জোড়া শালিখ দেখেছে। জোড়া শালিখ দেখলে ঘরে কুটুম আসে। কুটুম আর কেই বা আসবে অগ্নিদের বাড়িতে। আজ বিশ বছরে জাত-কুটুমেরা ওদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। কেবল লুকিয়ে চুরিয়ে সম্পর্ক রাখত ফুলকুসমার মাসিটা, সেও ধীরে ধীরে ভুলে গেছে। আসলে মাসিই তো দেখে শুনে অগ্নির বিয়ে দিয়েছিল গজেনের সঙ্গে। গজেন তো ওদেরই গাঁয়ের ছোকরা। জেনে

শুনেও এমন এক জাত-লম্পটের গলায় অগ্নিকে কেন বেঁধে দিয়েছিল মাসি, সেটা এখনও অবধি অগ্নির কাছে এক মহারহস্য। অগ্নিকে গজেন মেরে তাড়িয়ে দেওয়ার পরও দু'চারবার শালকাঁকিতে এসেছে মাসি। স্বচক্ষে দেখে গেছে অগ্নির অবস্থা। যে ক'টা দিন থাকত মাসি সারাক্ষণ হা-হুতাশে ভরিয়ে রাখত বাড়ি। অগ্নির এই দুরবস্থার জন্য সদা-সর্বদা নিজেকেই দায়ী করত সে। অগ্নি যদিও কানাঘুষোয় শুনেছিল, গজেনের সঙ্গে অগ্নির বিয়েটা লাগিয়ে দেওয়ার জন্য মেশো নাকি মোটা টাকা পেয়েছে গজেনের থেকে, কিন্তু অগ্নির সেটা বিশ্বাস হয় না। যদিও ফুলকুসমার মেশোটি আকাট চালবাজ, গাঁজা-মদ সব কিছুতেই দড়, তবুও নিজের শালির মেয়ের অতখানি সর্বনাশ করবে ক'টা টাকার লোভে, এমনটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না অগ্নির। তা সে যাই হোক না কেন, অগ্নির এমন দুরবস্থা দেখে একেবারে মরমে মরে গেছে মাসি। হয়ত বা লজ্জায়, অনুতাপে অগ্নির মুখোমুখি হতে তার পাহাড়প্রমাণ সঙ্কোচ হয়। আজ পাঁচ-ছ'বছর এদিকমুখো হয় নি মাসি। তাহলে আর কেই বা আসতে পারে? ভেবে ভেবে কুল-কিনারা পায় নি অগ্নি। অবশেষে তার মনে হয়েছে বাপের কথা। পরীক্ষিত বাউরি কখন আসে, কখন যায়, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। অগ্নির মনে হয়েছিল বাবাই আসতে পারে আজ।

পা চালিয়ে হাঁটছিল অগ্নি ঘরের পানে। সহসা তার খেয়াল হল, বাড়িতে একদানাও নুন নেই। ঝটিতে দিক বদলেছিল সে। পদম পুকুরের পাড় ধরে চলে গিয়েছিল চুয়ামসিনায় রাসবিহারীর দোকানে। রাসবিহারী রেশন-ডিলার, একই দোকানে মুদিখানার ব্যবসাও চালায়। নুন কিনে অগ্নি দৌড়চ্ছিল ঘরের পানে। আচমকা পদম পুকুরের পাড়ে অভিলাষ চৌকিদারের সঙ্গে দেখা।

অভিলাষ অগ্নিকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। বলে; 'এই অগ্নি, শুন্।'

অগ্নি দাঁড়ায়। তার ভয় করে। অভিলাষ চৌকিদার ষোলআনাই হরবল্লভের লোক। হরবল্লভের ব্যাটা প্রভঞ্জনের গায়ে এই দিনকয় আগে পেত্যা ছুঁড়ে মেরেছে ও । হরবল্লভরা ফুঁসছে। যত্রতত্র হুমকি দিচ্ছে। অগ্নিকে নাকি পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে, এমন রটনা সাতমুখ ঘুরে তারও কানে এসেছে। অভিলাষ চৌকিদারের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায় অগ্নি। ওকে কি দিন-দুপুরে পাকড়াও করতে চায় অভিলাষ!

অভিলাষ চৌকিদাব চোখ চারিয়ে চারপাশটা দেখে নেয়। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে অগ্নির দিকে। অগ্নি মনে মনে কুঁকড়ে যায়। জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অর্জুন গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে। সহসা কু-গাইতে থাকে মন।

অভিলাষ ওর এক্কেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। চারপাশটা পুনরায় নজর করে দেখে নেয়। তারপর ফিসফিস করে বলে, 'সুকুমার, তিলক আর হঠাৎ আজ রাতে কুথায় মিটিং কইর্‌বেক জানু?'

অগ্নির বুকখানা নিমেষে কেঁপে ওঠে। আজ রাতে কোথায় মিটিং হবে বিলক্ষণ জানে সে। অভিলাষ কেন সে খবরটা পেতে চায় তাও তাব অজানা নয়। একটা ষড়যন্ত্রের আঁচ পায় সে। মুখ-চোখ যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করে। বলে, 'আমি সেটা কেমন কর‍্যে জানব বটে? ছেইলা-পুইলা কে কুথায় মিটিন কচ্ছে—।'

'আমি জানি।' অভিলাষ খুব নিশ্চিত গলায় বলে ওঠে, 'রাধালগরের বাগদি পাড়ায়।'

অগ্নির শরীর পুনর্বার কেঁপে ওঠে অজ্ঞাতে। রাধানগরেই তো মিটিং করবে ওরা। কিন্তু অভিলাষ চৌকিদার সেটা জানল কেমন করে?

'শুন্' অভিলাষ আরও একটুখানি ঘন হয়।' 'আইজ রেইতে উয়াদ্যার ধইরে ফেলাবেক পুলিশ। উয়াদ্যার হাল-হদিশ কেমন কইরে যেন জেনে ফেলেছে উয়ারা। বেবস্তা সব পাক্কা। এই মাত্তর শুইনে এল্যম্ থানায়।'

মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠেছে অগ্নি। কিন্তু অভিলাষের সুমুখে সেটা প্রকাশ করছে না কিছুতেই।

বলে, 'আমাকে উসব বলে লাভ কি? যাদের মিটিন, উয়ারা বুঝে লিব্যাক। আমাকে ক্যানে?'

অভিলাষ চৌকিদার বেশ খানিকক্ষণ থির পলকে তাকিয়ে থাকে অগ্নির দিকে। বলে, 'আমার যা বইল্‌বার বলল্যম। ইবার তুয়ার যা কইর্‌বার করিস। পরে-পচ্চাতে আমাকে যেন দুষবি নাই।' বলেই হনহনিয়ে হাঁটা দেয় অভিলাষ সিং। অগ্নি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে অর্জুন গাছের তলায়। তিলেকের তরে গাছের সঙ্গে গাছ হয়ে যায় সে।

একসময় সম্বিত ফিরে পায় অগ্নি। আকাশের পানে চোখ চারিয়ে ঠাহর করে বেলা। বিকেল গড়িয়ে আসছে। একটু বাদেই সন্ধে নামবে। শুরু হবে সুকুমারদেব মিটিং। কী করা উচিত, ভেবে পায় না অগ্নি। অভিলাষ কি ঠিক ঠিক বলল? নাকি অগ্নিকে কোনও নতুন প্যাঁচে ফেলবার কৌশল এটা! অগ্নি এক নিদারুণ সংশয়ের মধ্যে পড়ে যায়। তিলকের মুখখানা চোখের সুমুখে ভাসতে থাকে অবিরাম। সুঠাম, স্বাস্থ্যবান যুবক তিলক বাউরি শক্তপোক্ত পেশীবহুল শরীর। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল। আর হাসিখানা বড় মন কাড়ে। এমনিতে খুব শক্ত মনের মানুষ তিলক । কিন্তু ওর যত কিছু গোপন কথা অগ্নিব কাছে চেপে রাখতে পারে না। অগ্নিকে মনে মনে খুব বিশ্বাস করে তিলক। খুব সম্ভ্রম ফুটে ওঠে কথা বলবার বেলায়। কোনও কারণে পাগলামো শুরু করলে কেউই যখন ওকে থামাতে পারে না, তখন অগ্নি এক ধমক দিলেই মুহূর্তে যেন জোঁকেব মুখে নুন পড়ে। মনে মনে হেসে একসা হয় অগ্নি। বয়সে ওর চেয়ে দু'এক বছরের ছোটই হবে তিলক। কিন্তু শরীরের এমন বাড় ওর, মনে হবে যেন আকাট জোয়ান। তিলকও আজ মিটিং-এ থাকবে। ওব মুখেই সেটা শুনেছে অগ্নি। সিটেলমেন্টেব কাজ শুরু হতে চলেছে এই তল্লাটে। এটাই আসল সময়। বর্গাদারবা নিজেদের নাম বেকর্ডভুক্ত কবাবে। বেনামী জমিন ধরা পড়বে খানাপুরী-ভোজারতের মাধ্যমে। প্রতিটি জমিনের আলে দাঁড়িয়ে বাবুরা হাঁক পাড়বে, এ জমিনের মালিক কে, বর্গাদাব কে, দখলদার কে, সামনে এস, কাগজ দেখাও, প্রমাণ দাও। এমন সুযোগ হেলায় হারানো মুর্খামি। কিন্তু গবীবের তো হাজার-একটা দোষ। যখন তেড়ে-ফুঁড়ে ওঠার সময়, তখনই ভয়ের তানে মুষার মতো গর্তে সেঁধাবে। সুকুমাররা তাই উঠে পড়ে লেগেছে। পাড়ায় পাড়ায় অতি গোপনে মিটিং করছে গভীর রাতে। সাহস জোগাচ্ছে ভীরু মানুষগুলোর মনে, যাতে নির্দিষ্ট দিনে সাহসে বুক বেঁধে যে যার দখলি জমিনের আলে গিয়ে দাঁড়ায়। যেন সবাই মিলে সাক্ষী দেয় একজনের পক্ষে। মানুষগুলো এক-পা এগোয় তো তিন-পা পেছোয। বোবা চোখে তাকিয়ে থাকে সুকুমারদের মুখের দিকে। ভাজাভাজা মুখে শুনতে থাকে সুকুমাবদের অগ্নিবর্ষী ভাষণ। মুরুব্বিরা বলে, কে জানে বাবু, কী সব উল্টা কথা শুনাচ্ছিস তুয়াবা। বারোমাস-তিরিশদিন

যাদের দুয়ারে খাটাবাটা কইরে পেট পাইলত্যে হয়, উয়াদ্যার সাথ কাইজ্জ্যা কইর্‌ব? তারপর যদি গরমেন্টের লোক চল্যে গেলেই আর জমিনে নাইম্‌তে না দেয়? যদি দাদন লিতে গেলে খেদাড়্ দেয়? যদি পুলুশ দিয়ে বাঁধে? যদি কাচারি-ঘরে টাঙায়? সুকুমার এদের বোঝাতে বোঝাতে আলা হয়ে যায়। হাজার উপায়ে ওদের বুকে একটুখানি সাহস সঞ্চয় করতে চায়। বলে, তুয়াদ্যার দাদন দিবেক নাই ত কাদের দিবেক বটে? বাবুদ্যার জমিন তবে চইষ্‌বেক কে? বাবুরা বাপের জন্মে হালের বোঁটা ধরেছে? এও ভি ঠিক। তবুও জমায়েত থম মেরে বসে থাকে। সুকুমার যেভাবে বলছে, তেমনটা করতে তো মনটা চায়। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে নাভিমূলে সুড়সুড়ি জাগে যে! সুকুমার সবাইকে শেষ বারের মতো সবাধান করে দেয়। খিয়াল রাখ সবাই, এ সুযোগ বারবার নাই আসে। দীর্ঘদিনের পাকা ঘুঁটিখান কাঁচাই লিবার এই হইল্যাক মোক্ষম সময়। মানুষগুলো নিদারুণ দোটানায় পড়ে কেবলই হাপুচুপু খায়।

ওদিকে হরবল্লভের কিছুই অজানা নেই। সুকুমারদের তাবৎ গতিবিধি বিশ্বস্ত লোক মারফৎ ঠিকঠাক পৌঁছে যাচ্ছে যথাস্থানে। ইতিমধ্যেই এলাকার তাবৎ জোতদারদের নিয়ে একাধিক বৈঠক করেছেন হরবল্লভ। এবারের সেটেলমেন্ট অপারেশনটা যে অতখানি নিরুপদ্রবে কাটবে না সে ব্যাপারে সবাই একমত। যদিও অফিসাররা সবাই উঠেছেন হরবল্লভেরই গড়ে। হরবল্লভও সেবা-যত্নের ত্রুটি রাখছেন না একতিল, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বেঁধে তৈরি রয়েছেন সর্বদা, তবুও সুকুমারদের বজ্জাতিতে ভুলে যদি দলে দলে লোক হাজির হয় যে-যার জমিনের আলে? যদি পরস্পর সাক্ষী-সাবুদ দিয়ে বসে? অফিসাররাও নাচার হবেই। তাদেরও তো চাকরিটা রাখতে হবে। শেষ অবধি হরবল্লভই নিয়েছেন সুকুমারকে শায়েস্তা করবার ভার। জোতদারদের যে-যার 'নিজের ঘর সামলাবার' পরামর্শ দিয়েছেন। সেই অনুসারে, জোতদাররা সব হুঁকুরে বেড়াচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়। এখন বটে সাপের পাঁচ পা-দেখতিছু সব, দাদনটি লিবার ব্যালায় যাবি, ধার-কর্জের লেইগ্যে দুয়ারখান মাড়াবি, পাকা কলাটি ছাঁড়াই দুবো তখন। যে যে শালা মিটিনে যাচ্ছে, সক্কলের নামের লিস্টি তিয়ার কচ্ছি আমরাও। ঠিক টাইমে দেখা যাবেক। ভয় পেয়ে গেছে বেশ কিছু মানুষ। সুকুমারদের এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে ওরা। তবুও ঢের মানুষ এখনও নাচছে। খোয়ারখান এখনও অবধি কাটে নি ওদের। গভীর রাতে সুকুমারের মিটিংয়ে গুটিগুটি হাজির হচ্ছে ওরা।

অগ্নি ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠে। যদি অভিলাষেব কথা ঠিক হয়, তবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের হাতে ধরা পড়বে তিনজনেই। অগ্নি আর সামলে রাখতে পারে না নিজেকে। অভিলাষ চৌকিদার চোখের আড়াল হতেই সে দৌড় লাগায় মাঠ পথে পথে রাধানগরের উদ্দেশ্যে। হরিণমুড়ি খাল পেরিয়ে ছুটতে থাকে জমিনের আলে আলে। কখনও বা নতুন হাল দেওয়া হুড় ম-দুড়ম জমিন বরাবর।

কানশিকড়ার শ্মশানের কাছে পৌঁছুবার আগেই শুরু হয় ধুলুণ্ডি ঝড়। চড়চড়িয়ে বৃষ্টি নামে। হাওয়া বয় উথাল-পাথাল। চতুর্দিক ঝাপসা হয়ে আসে। অগ্নি একটা ঝাঁকড়া আশথের তলায় আশ্রয় নেয়। সারা শরীর ভিজে যায় ওর। মাথার চুল বেয়ে টপটপিয়ে জল ঝরতে থাকে সর্বাঙ্গে। কিন্তু তখন তার পা' বাড়াবার উপায় নেই। না এদিকে, না ওদিকে। ঝড়-বৃষ্টিতে তখন চরাচর কাঁপতে লেগেছে।

ঝড়-বৃষ্টি থামে প্রায় ঘণ্টাটাক বাদে। তখন সন্ধের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। তখনই

বাড়ির দিকে দৌড় দিলে সন্ধেয় সন্ধেয় পৌঁছে যেত। কিন্তু অতদূরে গিয়ে নিষ্ফলা ফিরে আসতে মন চাইল না। বারংবার চোখের সুমুখে ভেসে উঠল তিলক বাউরির মুখখানি।

অন্ধকারে পথ হাল্‌টে হাল্‌টে এক সময় রাধানগর বাগদিপাড়ায় হাজির হল অগ্নি। সোজা গিয়ে ঘা দিল রাধিকা বাগদির ঘরের আগড়ে। সুকুমাররা ঘরের মধ্যে ছিল। আগড়খান সামান্য খুলেই তারা তো অবাক। এ যে একটা মেয়া-ছেইলা বটে! কুপির আলোয় অগ্নিকে দেখে অবাক হয়ে যায় সুকুমারের দল। অগ্নি সংক্ষেপে জানায় ওদের বিপদের কথা। কোত্থেকে জানল খবরটা, সেটাও বলে। সুকুমারের কপালে ভাঁজ পড়ে দুশ্চিন্তায়। সংশয়ে দোলে সে। তাও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঝুঁকি না নেবার সিদ্ধান্তই নেয়। ওরা বাড়ির দিকে ফিরলে অগ্নিও ফিরতে পারত ওদের সঙ্গে। কিন্তু বাড়ি ফেরার ঝুঁকি নিতে চায় না ওরা। রওনা দেয় দাপানজুড়ির জঙ্গলের দিকে। তিলক ফিসফিসয়ে বলে, 'মা'কে বলিস, য্যান্ চিন্তা না করে।'

তখন প্রায় দু'ঘড়ি রাত। ঘুটঘুটে আঁধার, পথের মধ্যে কানশিকড়ার মহাশ্মশান, আর মনের মধ্যে হরবল্লভদের হুমকি, সুযোগ পেলে অগ্নিকে দেখে নেবার হুমকি, এই সবকিছু মিলেমিশে অগ্নির ফেরার পথ আগুলে দাঁড়ায়।

সুকুমার বলে, 'তুই ইখন ফিরবি কী কইরে?'

অগ্নি মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলে। রাধানগর বাউরিপাড়ায় সম্পদ বাউরির বউ কুসুম তার 'মউল পাতা'। অনেক দিন দুই-সইতে দেখা নাই। অগ্নি বলে, 'আমি 'মউলপাতা'র ঘরেই কাটাই দুবো রাত। তুমরা যাও।'

তাও অগ্নিকে একা একা ছাড়ে নি সুকুমার। সম্পদ বাউরির দোড়গোড়ায় ওকে পৌঁছে দিয়ে তবেই মিশে গেছে আঁধারে।

এ্যাদ্দিনবাদে অগ্নিকে দেখে তো কুসুমের চোখের পাতনি পড়ে না। সূয্যিদেব কুন গগনে উইঠেছেন আজ!

অগ্নি বলে, 'আজ ভাবি আইস্‌ব, কাল ভাবি আইস্‌ব, আসা আর নাই হয়। আইজ ভাবল্যম, মউলপাতার দোর আজ যাবই যাব। তো, মাঝপথে কী ঝড়, কী জল! ঝড়-জল যদি বা থামল্যেক, ঘুটঘুট্যা আঁধারে পথ চিনা দায়।'

কুসুম বলে, 'বহুৎ দিন বাদে বিষ্টি লিয়ে আইলু তুই।'

হরিণমুড়ির ঘাটে পৌঁছে কলসিখানা পাড়ে রেখে জলে নামে অগ্নি। নদীতে সামান্যই জল। বাঁকের মুখে কোমরটাক। পায়ে পায়ে কোমর সমান জলে পৌঁছে সারা শরীরের ভার নামিয়ে দেয় জলে। শীতল হয়ে আসে শরীর। তিলকের কথা মনে পড়ে যায় অকস্মাৎ। কোথায় যে লুকাল ওরা, কেমন যে আছে, কী যে খাচ্ছে! ভাবতে ভাবতে মনটা সহসা ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

হরিণমুড়ির ঘাটেই খবরটা পেল অগ্নি। গেল-রাতে রাধানগরের বাগদিপাড়ায় পুলিশ বাহিনী সারারাত তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে গেছে। ধরে নিয়ে গেছে রাধিকা বাগদিকে।

আচমকা অভিলাষ চৌকিদারের কথা মনে পড়ে যায় অগ্নির। লোকটা কেনই বা ফাঁস করে দিল অমন গুহ্য কথা অগ্নির সাক্ষাতে? অভিলাষকে সহসা ভারি রহস্যময় লাগে।

কনকপ্রভার মহলে সিঁদেল চোর

কনকপ্রভার মহলে আজ হপ্তাটাক বাজনা-বাদ্যি বন্ধ। হইচই কলরব, ঠাট্টা-মস্করাও শোনা যাচ্ছে না। অকস্মাৎ যেন শ্মশানপুরী হয়ে গেছে পুরো মহলটা।

হরবল্লভ গত সন্ধ্যায় শুধিয়েছিলেন রতিকান্তকে, 'কী ব্যাপার হে? উয়ারা সব আছে-টাছে ত? কুনো সাড়াশব্দ পাই না যে।'

ব্যাপারটা রতিকান্তকেও ভাবিয়েছিল। আজ সকালে পরিষ্কার হয়েছে সব কিছু । সকালবেলায় রতিকান্ত ফিরছিল আদায়পাতি সেরে। তাঁতীপুকুরের বাঁকটা না পেরোতেই নিকুঞ্জপতির সঙ্গে দেখা। নিকুঞ্জপতিকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল রতিকান্ত। নিকুঞ্জপতিই পথ আগুলে আগ বাড়িয়ে কথা বলল।

'রতিদা, সক্কালব্যালায় কুনদিগে?' নিকুঞ্জপতি এমনভাবে বলল কথাটা, যেন রতিকান্তর সকাবেলায় কোথাও যাওয়াতেই ওর আপত্তি।

'এই টুকচান মাঝের পাড়ায়।' রতিকান্ত এমনভাবে জবাব দিল, যেন মাঝের পাড়ায় যাওয়াটা তার একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

নিকুঞ্জপতি এদিক ওদিক তাকায়। তারপর গলাটি অনেক খাদে নামিয়ে বলে, সইন্‌ঝাব্যালায় একটিবার যেও তো।'

'ক্যানে?' রতিকান্ত এমনভাবে তাকায় যেন ধর্মপ্রাণ হিন্দুকে নমাজ পড়তে ডাকা হয়েছে মসজিদে।

নিকুঞ্জপতি গলাখানি খাদে নামিয়ে বলে, 'বৌদি তুমায় ডেকেছেন।'

'আমাকে ? আমাকে ক্যানে ডাকবেক ?'

'আহা, আসকা খায়, ফোড় গুনে নাই! বৌদি তোমাকে ফের একখান আসকা পিঠা খাবাবেক।'

রতিকান্ত আড়চোখে তাকায়। পরখ করবার চেষ্টা করে নিকুঞ্জপতির হালহদিশ। মুখে বলে, 'দেখি, যেদি সময় কইর্‌তে পারি।'

'না, না। যেইও যে কুনো গতিকে।' মুখখানি রতিকান্তর কানের কাছাকাছি নিয়ে আসে নিকুঞ্জপতি, 'জরুরি কথা আছে।'

জরুরি কথাটা আগাম আন্দাজ করে নিতে তিলমাত্র অসুবিধে হয় নি রতিকান্তর। আবার কোনও একটা চাকের জমিন বিক্রি হবে। সেই কারণেই অতখানি হামড়ে পড়া। পুরো মহলটা যে কদিন ঠাণ্ডা মেরে রয়েছে তার কারণটাও মালুম হয় এতক্ষণে। ট্যাঁকে টান পড়েছে। মাস খানেক আগে দেবীগেড়িয়ার আটবিঘার চাকখানা বিক্রি করে হাজার চারেক টাকা পেয়েছিলেন কনকপ্রভা। সে সব বোধ করি এ্যাদ্দিনে শেষ। দেবীগেড়্যার চাকখানা রতিকান্তই কিনেছে। খানিকটা স্ত্রীর নামে, বাকিটা বড় মেয়ের নামে। এবারেও তাই রতিকান্তকেই ডাক পড়েছে পয়লা নম্বরে। এই বছর খানেকের মধ্যে কনকপ্রভার সিকি এস্টেট বেরিয়ে গেছে। রতিকান্ত সব খবরই রাখে। কিছু কিনেছে বিষ্টুপুরে ঘোষেরা, কিছু কিনেছে দাপানজুড়ির দত্তরা। রতিকান্তও কিনেছে বিঘে বিশেক। অবশ্য স্বনামে নয়, সর্বদাই বেনামে। হয় ভাগনের নামে, নয় তো জামাইয়ের নামে, মেয়ের নামে, বউয়ের নামে...। রতিকান্ত মনে মনে হিসেব কষতে থাকে। 'বি' ফরমে ওদের জমি বেরিয়ে গেছে শ'পাঁচেক

বিঘা। আটকে রাখবার চেষ্টাই করে নি কেউ। কনকপ্রভার চারপাশে সদা-সর্বদা ঘুরঘুর করছে এতগুলো পুরুষ মানুষ। নিকুঞ্জপতি, কৈলাস মণ্ডল, জ্ঞান আচার্য, পান্নালাল, কিন্তু সব এক-একটি সুখের পায়রা। সবাই সুযোগ বুঝে লুটেপুটে নিচ্ছে। গানে-বাজনায়, হই-হল্লোড়ে, ভ্রমণে-পর্যটনে সঙ্গে আছে সবাই। অথচ বিধবা মানুষটার সম্পত্তিগুলো কী করে বাঁচে সে ব্যাপারে কারোরই তিলমাত্র মাথাব্যথা নেই। বর্তমানে সব ছেড়ে-ছুড়ে, বেচে-টেচে কনকপ্রভার আড়াইশো বিঘে মতো ধানী জমিন এবং অকৃষি ও পুকুর মিলে শ'দুয়েক বিঘা। কিন্তু যে হারে বিক্রিবাটার ধূম পড়েছে, ক'দিন থাকে তা, রতিকান্তর ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে তাতে। সংসার বলতে দুটি মাত্র প্রাণী, তাও মেয়েমানুষ। কত খরচ করলে যে এত-এত জমিন বিক্রির টাকা পলকে ফুরিয়ে যায় তার বুঝি আন্দাজ পায় না রতিকান্ত। মানুষ যে অতঅত টাকা খোলামকুচির মতো ছড়াতে পারে চতুর্দিকে, শিমূল তুলোর মতো উড়িয়ে দিতে পারে হাওয়ায়, স্বচক্ষে না দেখলে বুঝি প্রত্যয় হয় না তা। হাতে টাকা না থাকলে বুঝি দুনিয়াটাকে শূন্য অসার বলে মনে হয় কনকপ্রভার। তখন বাতাবাতি খদ্দের চাই। আর খদ্দের সংগ্রহের জন্য নিকুঞ্জপতি তো এক পায়ে খাড়া। কারণ, জলের দামে জমিনটা করে দিতে পারলে খদ্দেবের কাছ থেকে সে মোটা টাকা সেলামি পায়। জলের দামেই বিকিয়ে যাচ্ছে জমিগুলো। কনকপ্রভার তিলমাত্র মমতা নেই ওগুলোর প্রতি। তার কেবল যে কোনও দামে জমিগুলো বেচে দিয়ে নগদ টাকা চাই হাতে। প্রচুব, অপর্যাপ্ত টাকা। টাকাটা কোনও গতিকে হাতে এলেই শুরু হয়ে যায় খরচ করবার ধূম। তখন কনকপ্রভার মহলে পার্বন শুরু হয়। হ্যাজাক জ্বলে, খাসি টাঙানো হয়, জাল পড়ে পুকুরে। রঙিন বোতল আসে বিষ্টুপুর থেকে। চারপাশের গাঁ-গঞ্জ থেকে, বিষ্টুপুর থেকে, বাঁকুড়া থেকে ছুটে আসে মধুলোভী বশংবদ মধুকর মানুষ। দিনরাত হল্লোড় চলে, রাতভর গান-বাজনার জলসা চলে। খানাপিনার বন্যা বয়ে যায়। অনেক রাতে নিকুঞ্জপতির দল জড়ানো গলায় চিৎকার কবতে থাকে। তাদেব সমবেত চিৎকারে চুয়ামসিনার নৈশ বাতাস খানখান হয়। এ মহল থেকে রতিকান্ত সবই শুনতে পায়। মাঝে মাঝে খুবই কষ্ট হয় রতিকান্তর। কষ্টটা দ্বিমুখী ফলার মতো। প্রথম কষ্টটা কনকপ্রভার এবং কুন্তীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে। যেভাবে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে সম্পত্তিগুলো...। এভাবে ওড়াতে থাকলে সমুদ্রের বালিও একদিন না একদিন শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় কষ্টটা নিজের জন্য। এমন একটা শাঁসাল মহলে ঢোকাব সুযোগ পেলে সে যে এ্যাদ্দিনে বহু কিছু করে নিতে পারত তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার বাবা কৃষ্ণদাস গোস্বামী ছিলেন কনকপ্রভার মহলের আজীবন গোমস্তা। কনকপ্রভার শাশুড়ি লাবণ্যপ্রভার বাবা প্রবল প্রতাপান্বিত সুদর্শন সিংহবাবুর আমলে ওদের পুরো এস্টেটখানাই ছিল কৃষ্ণদাসেরই দায়িত্বে। সুদর্শন সিংহবাবু গত হওয়ার পর কৃষ্ণদাস ঐ মহলের গোমস্তাগিরি ছেড়ে দেয়। কৃষ্ণদাসের বয়েসও হয়েছিল ঢের। একটা এস্টেটের ভার পুরোপুরি বহন করবার ক্ষমতা তার শরীরে ছিল না। সুদর্শনেব ঘরজামাই শঙ্করপ্রসাদ মহাপাত্র অকালে মারা গেলেন। তাঁর ছেলে প্রিয়ব্রত মহাপাত্র আজীবনকাল পালিয়ে বেড়াল এস্টেট থেকে। লাবণ্যপ্রভা নিয়ে এলেন ভাসুরের ছেলে নিকুঞ্জপতিকে। কিছুদিন বাদে কনকপ্রভা নিয়ে এলেন তাঁর দূব সম্পর্কের ভাই পান্নালালকে। ওদের ব্যূহ ভেদ করে রতিকান্তর ঐ মহলে সেঁধাবার উপায় ছিল না। কারণ, ওরা ততদিনে বেশ শক্তপোক্ত হয়ে বসে গিয়েছে।

কনকপ্রভার মহলের ওপর নিজেদের দখল পাকাপাকিভাবে কায়েম করে ফেলেছে। বাধ্য হয়ে রতিকান্তকে প্রতাপলালের এস্টেটে ভর্তি হতে হল। প্রতাপলাল ঝানু জমিদার, তার ছেলে হরবল্লভও কম চতুর নন। এদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে যেটুকু অর্থসম্পদ সরানো যায়, তা নেহাতই অপ্রতুল। অথচ লাগোয়া মহলেই দিবারাত্র যেন অর্থ সম্পদের হরিরলুট চলছে। মাঝে মাঝে খুব করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রতিকান্ত। দীর্ঘশ্বাসগুলি কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না সে। আহা রে, কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সন্তান হিসাবে কনকপ্রভার মহলের প্রথম দাবিদার তো সে-ই ছিল। মাঝপথে নিকুঞ্জপতি আর পান্নলাল ঢুকে পড়ে হকের মৌরসিপাট্টাটুকুর দখল নিয়ে ফেলল। রতিকান্ত মনে মনে হিসেব করে দেখে, এখন কনকপ্রভার যতটা ভূ-সম্পত্তি রয়েছে এই হারে ওড়ালে বছর তিনেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এবং ঐ সম্পত্তির সিংহভাগ নিকুঞ্জপতি, পান্নালাল এবং তাদের জ্ঞাতিগুষ্টির খপ্পরে চলে যাবে। রতিকান্ত নিশ্চিত, আর বড়জোর বছর তিনেক।

সন্ধ্যেবেলায় কাজকাম সেরে রতিকান্ত কনকপ্রভার মহলের দিক পা বাড়ায়।

সদর দরজা পেরোলেই একটা তেকোণা বেলগাছ, সন্ধ্যের আঁধারে গাছতলাটা কালো। আচমকা কালো বৃত্তখানি নড়েচড়ে ওঠে। গাছের তলা থেকে একজন কেউ বেরিয়ে আসছে ভূতের মতো। অল্প চমক খেয়ে থমকে দাঁড়ায় রতিকান্ত। লোকটা এগিয়ে আসতে থাকে রতিকান্তর দিকে।

একেবারে কাছে আসতে, চেনা গেল। নিকুঞ্জপতি।

'বৌদির পাশ যাচ্ছ তো?' নিকুঞ্জপতি ফিসফিসিয়ে বলে, 'তুমার সাথ, দাদা, একটা কথা আছে আমার।' বলতে বলতে আচমকা জড়িয়ে ধরে রতিকান্তর হাতদুটো। মিনতি মাখানো গলায় বলে ওঠে, 'বৌদি এবারে কপালভাতির চাক্‌খান বিকবেক। তুমি ত জানই, ডাইক্‌লে সাড়া দেয় সে জমিন। ফি-বচ্ছর হাতিঠেলা ধান । জমিনটা আমি কিনতে পাইর্‌লে বড় ভাল হইত্ত। তুমি যদি, দাদা, টুকচান সহায় হও।' বলতে বলতে ক্রমশ চরম হতাশায় ভেঙে পড়ে নিকুঞ্জপতি, 'আমার অবস্থা ত তুমি জানই, দাদা। আটআনার ফলার কইর্‌তে আইস্যে, দু'টাকার ঘটিখান হারাল্যম সারা জীবন। লচেৎ, মশিয়াড়ায় আমার বাপের কী নাই ছিল? লিহাৎ বংশের একটা ধারা, বিদেশ-বিভুঁয়ে ধ্বংস হইয়ে যায়..., বাবা বলল্যাক, যা নিকুঞ্জ, পাশে গিয়ে দাঁড়া। কিন্তু তার ফলটা কী হইল্যাক ভেবে দ্যাখ। আজ, আমার চাইতে অভাগা আর কোউ আছে? গাগরার জল, খেইয়ে খেইয়ে দুনিয়ার লোকের পেট ফুলে জয়ঢাক, আর আমার বেলায়? সেই বলে না, অভাগা চোর যিদিগে যায়, হয় কুত্তা ডাকে, নয় রাত পুহায়।' স ॥ নিকুঞ্জপতি অন্যমনস্ক হয়ে যায়, মনে মনে আরও একখানা উদ্ধৃতি প্রবচন খুঁজে বেড়ায় (।

নিকুঞ্জপতির আক্ষেপখানা কোথায়, বুঝতে অসুবিধে হয় না রতিকান্তর। তাও এমন মুহূর্তে ইলচি করবার লোভ সে সচরাচর সামলাতে পারে না। বলে, 'সে কি হে? লিজেকেই চোর বইল্‌ছ?'

'বইল্‌ছি। লিজেকেই বইল্‌ছি। অভাবে স্বভাব লষ্ট। কি করি দাদা? সেই বলে না, আপনার ভাল পাগলও বুঝে, ভোখ লাইগ্‌লে খাইতে খুঁজে। আমারও সেই বিত্তান্ত।'

রতিকান্ত বেশ মজা পাচ্ছিল মনে মনে। আর একটুখানি উসকায়, 'বাল্লাই যাট, চোর

ক্যানে হইত্তে যাবে তুমি? লিজের ঘরে কেউ চুরি করে? আপনার ধনে আপনি চোর, তুমার হইল্যাক দেখি সেই অবস্থা।'

'আপনার ধন?' ক্ষোভে ফেটে পড়ে নিকুঞ্জপতি, 'ভালা কথা বইল্‌লে বটে! সেই বলে না, আমার আমার যত কর, চিনির বলদ বয়ে মর। অর্থাৎ কিনা, আমি করি ভাই-ভাই, দাদার কিন্তু মনে নাই। লচেৎ, অতঅত জমিন জলের দরে বিকে দিচ্ছে একে-তাকে, কুনো দিনও কি বইল্‌থে পাইর্‌থ নাই যে, নিকুঞ্জ, তুমি আমার দেওর, সারা জীবন আমার ইস্টেটটাকে ঘাড়ে করে বেড়ালে, ইহকাল-পরকাল দুই খুয়ার কইর্‌লে, তুমার তিন-তিনটা ঝি, তার মধ্যে একটি ভাতারছাড়ী, অভাগী, লাও, আমার তো অগাধ রয়েছে, ভেস্টও হইয়ে যাবেক বুহুৎ, তো লাও, জমিনের এই চাকটা তুমাকে লিজ্যার ভেবে দিল্যম। বল, পাইর্‌থ নাই?'

'তা অবশ্যি পাইর্‌থ।' রতিকান্ত কাটা ঘায়ে সামান্য নুন ছেটায়, 'দিবেক হয়ত কালেকালে। তুমাকে তো খোব ভালবাসে। তুমার উপরেই ত ইস্টেটের পুরা ভার দিয়ে রেখ্যেছে। তুমার উপরেই তো সবকিছু।'

'সে আর বইল্‌তে হব্যেক নাই! মহলের মধ্যে আমার মান-মর্যাদা কতখানি, তা আমিই বুঝি।' নিকুঞ্জপতির গলা আচমকা ভারি হয়ে আসে। যখন তখন ইচ্ছেমতো গলাটিকে ভারি করে তোলা, —এটা সে পারে। বলে, 'কী আর বইল্‌ব, দাদা, আপনার মান আপনি রাখি, কাটাকানটি চুল দিয়ে ঢাকি। সেই বলে না, মাথায় বউয়ের জবর ঘোমটা, ঘোমটার চোটে পিছন ল্যাংটা।'

রতিকান্তর সময় বয়ে যায়। একসময় তাই আসল প্রসঙ্গে আসে সে। বলে, 'তো, তুমি কী কইর্‌তে চাও?'

নিকুঞ্জপতি একবার চারপাশটা দেখে নেয়। খাটো গলায় বলে, 'উই জমিনটা কিনতে পাইর্‌লে বড় ভাল হইত্ত, দাদা। তুমি যদি টুকচান সহায় হও—।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা পুরোপুরি বোধগম্য হয় রতিকান্তর। বলে, 'কার নামে কিনবে?'

'মোর বড় মেয়াটার নামে। তুমি তো উয়াকে দেইখেছ। মাঝে মাঝেই ত এইসে থাকে ইখ্যেনে। বড় আবাগী উট্যা। কচি বইসে বিধবা হইয়ে—।' বলতে বলতে চোখ মুখ করুণ হয়ে আসে নিকুঞ্জপতির।'

রতিকান্ত জবাব দেয় না। অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে। খানিকবাদে বলে, 'কপালভাতির' চাকে তো বহুৎ জমিন। অত জমিন কিনবার টাকা আছে তুমার?'

নিকুঞ্জপতি ভারি অস্বস্তি বোধ করে রতিকান্তর কথায়। বলে, 'মেয়াটার গহনাগাঁটি যা আছে, বিক্রি বাটা কইর্‌ো, ইধার-সিধার থিক্যে কিছো যোগাড়-যন্তর কইর্‌ো—!'

রতিকান্ত বুঝে ফেলে। তলে তলে বেশ পুঁজি করেছে নিকুঞ্জপতি। এবার গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করতে চায়।

বলে, 'আমি কী পাব বটে?'

পুনরায় রতিকান্তর হাত চেপে ধরে নিকুঞ্জপতি, 'দুবো। খুশি কইর্‌ো দুবো তুমাকে। তেবে বিধবা মেয়াটার কথা ভেবে টুকচান কমে সমে—।'

'পাঁচশো টাকা লাগবেক।' কাঠের মতো খটখটে গলায় উচ্চারণ করে রতিকান্ত।

নিকুঞ্জপতির দু'চোখ কপালে উঠে যায়, 'পাঁচ-শো!'

রতিকান্তকে অতিশয় নিস্পৃহ দেখায়। কোনকিছুতেই যেন গা নেই তার। চোখে যেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দৃষ্টি।

'আচ্ছা সিট্যাই হব্যেক।' রাজি হয়ে যায় নিকুঞ্জপতি। সে জানে, নেবু বেশি কচলালে তেতো হয়ে যায়। 'তবে দেখো ভাই, চারশো টাকা বিঘার উপরে যেন দাম না উঠে।'

রতিকান্ত ক্ষণকাল কী যেন ভাবে। বলে, 'ঠেকা কেমন?'

'জব্বর ঠেকা। কনকবৌদির মেজো ভাইয়ের বিয়া হবেক আসছে মাসে। তখন উঁয়ার সব বোনেরাই আইবেক বাপের ঘর। অন্য বোনগুলানও সব বড় বড় ঘরে পড়্যেছে। তেবে বৌদিই একমাত্র জমিদারের বউ।'

ব্যাপাটা পুরোপুরি প্রাঞ্জল হয়ে আসে রতিকান্তর কাছে। ভাইয়ের বিয়েতে দেওয়া-থোওয়ার বহরটা আগাম আন্দাজ করতে পারে সে। জমিদারি চলে গেছে বলে যে হীনমন্যতা গড়ে উঠেছে মনে, দু'হাতে খরচ করে সেটা পুষিয়ে দিতে চান কনকপ্রভা। অন্য মেয়ে হলে তাও কথা ছিল। এ হলেন কনকপ্রভা। এ দুনিয়ায় কেবল টাকার ঝনঝন আওয়াজ ছাড়া আর কোনও কিছুতেই নেশা হয় না যাঁর।

রতিকান্তকে সঙ্গে নিয়ে দু'চোখ দিয়ে আঁধার ঠেলতে ঠেলতে গড়ের ভেতরে ঢোকে নিকুঞ্জপতি, দু'হাতে সিঁদকাঠি বাগিয়ে।

অজ্ঞাতবাসের রূপকথা

ওরা টুসুগান গাইতে গাইতে এগোচ্ছিল মেঠো পথ ধরে।

জনা ছয়-সাত মেয়ে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় টুসু-ঠাকুর। সামনে অগ্নি, বাতাসী এবং সুখি। পদমপুকুরের পাড় ধরে হাঁটছিল ওরা। পুকুরের পাড়ে বিশাল প্রাচীন কুসুম গাছ। গাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে ওরা গাইছিল :

কুসুম গাছকে উঠলে টুসু, কষি কুসুম ভাইঙো নাই
কষি কুসুম ভাইঙো নাই—
পাকলে কুসুম সবাই খাবেক গো—
কাকেও বারণ কইর্‌ব নাই।

ওরা গাইছিল। পথচলতি মানুষের সঙ্গে চোখাচোখি হলে ফিকফিক হাসছিল।

লাল কাঁকরে ঢালা পথ। দু'পাশে শিয়াকুল, পলাশ, আঁকোড় আর কাদাজামের ঝোপ। সামনে জয়রামপুরের মোড়। আরও অনেক দূরে দাপানজুড়ির জঙ্গল, দিগন্তের গায়ে পরিপাটি করে আঁকা। ক্ষেতের ধান পুরোপুরি ওঠে নি। মাঠে মধ্যে মজুর-কামিনের দল কাজের ফাঁকে ফাঁকে মুখ তুলে তুলে দেখছিল ওদের। সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে টুসু গানের রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল ওদেরও মনে। কাস্তে অসাড় হয়ে থেমে যাচ্ছিল বারবার।

ওরা গাইছিল :

আমাদ্যার টুসু কাঁড়া চরাচ্ছে হরিণমুড়ির খালধারের
হরিণমুড়ির খালধারে
পানকাঁটা চুল মেলে দিয়ে লো—

বইসে আছে জলধারে।

জয়রামপুরের মোড় থেকে খানিক আগে একটা গাঁ-ছাড়া দিঘি। দিঘির চার পাড়ে অসংখ্য তালগাছ। জলের আরশিতে তাদের ছায়া পড়ে, স্থির।

একটা তালগাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি। অগ্নিদের গান শুনে বেরিয়ে এল সুমুখে। মেয়েটির বয়স ষাটের ওপর। চোখদুটো কোটরে ঢুকে গিয়েও ভারি উজ্জ্বল। খাঁচাসার শরীর। মাথার চুল শনের মতো সাদা।

বলে, 'কি গো, টুসু গাইতে গাইতে কুথাকে চইল্‌লি তুয়ারা?'

'টুসু যদ্দুর চালাবেক, তদ্দুর যাব গো।'

'চল, আমিও যাই তুয়াদ্যার সাথ।'

বলতে বলতে একটা গান ধরে মেয়েটি ঃ

জয়রামপুরের মোড়ে টুসু হনুমানের থানা লো—

হনুমানের থানা লো—

কালমুয়াদ্যার সুমুখ দিয়ে

টুসুর যাওয়া মানা লো—।

গানটি শোনা মাত্তরই থমকে দাঁড়ায় অগ্নি। বুড়ির চোখে চোখ রাখে নিঃশব্দে। বুড়ি কোনও জবাব দেয় না। নিঃশব্দে নেমে পড়ে আলপথে। অগ্নির ইঙ্গিতে সবাই অনুসরণ করে বুড়িকে ।

জয়রামপুরের মোড় থেকে অন্তত আধ মাইল তফাতে গিয়ে ওরা পীচ সড়কে ওঠে। রাধানগরের দিক থেকে একটা সরকারি জীপ ছুটে আসছে তীব্র বেগে। ওরা ঝটিতি মউল গাছটার তলায় টুসুর আসর সাজিয়ে নিয়ে বসে। গান ধরে :

এক সড়পে দু'সড়পে তিন সড়পে লোক চলে

তিন সড়পে লোক চলে—

আমাদ্যার টুসু মধ্যে চলে লো—

বিন বাতাসে গা দলে।

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায় জীপ। ওরা উঠে দাঁড়ায়। ছুটন্ত জীপের দিকে তাকিয়ে সহসা গান ধরে সুখি,

শালা, জলদি পালা,

তুয়ার গলাতে লাগাব বরহই দড়া—

শালা জলদি পালা।

পীচ সড়কের ওপারে গিয়ে আলপথে-পথে নাক বরাবর হাঁটলে দাপানজুড়ির জঙ্গল। কিন্তু ওরা নামে না। সড়কের পথে পথে হাঁটতে থাকে রাধানগরের দিকে। দু'ঠোটের ফাঁকে ফিনকি দিয়ে ছলকে পড়ে গানের কলি।

রাধানগরের খানিক আগে রাস্তার বাঁ দিকে উঁচু পাড়ওয়ালা দিঘি। দিঘিতে ফুটে থাকে হাজার হাজার শ্বেত পদ্ম। ওরা গাইছিল,

আঁচিরে, পাঁচিরে পদ্ম,

পদ্ম রৈ, আর ফুটে নাই

আমাদ্যার টুসুর পায়ে পদ্ম লো—

ভমর বৈ আর বসে নাই...।

গাইতে গাইতে ওরা সহসা বাঁয়ে বাঁক নেয়। ঝটিতি পথ বদলায়। পীচ সড়ক থেকে নেমে পড়ে আলে। পুকুরের পাড় বরাবর আলপথে-পথে হাঁটা দেয়।

দাপানজুড়ির জঙ্গলের পাশাপাশি এসে একটা মউলগাছের তলায় সামান্যক্ষণের জন্য দাঁড়ায় ওরা। জঙ্গল এখন হৃতশ্রী। শালের পাতায় হলুদ রঙ ধরেছে। কিছু কিছু শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে রোজ। শুয়া-চাকোল্‌তা গাছের পাতা প্রায় চোদ্দখানা ঝরে গিয়েছে। আর দিনকয়েকের মধ্যে পুরোপুরি ন্যাড়া হয়ে যাবে গাছগুলো। এখন জঙ্গলের কাছাকাছি এলে একটা খাঁ-খাঁ শূন্যতা ভাব। হাওয়ার শব্দও অত ভরাট নয়। ফোঁপরের ভেতর দিয়ে হাওয়া কাটার মতো পলকা আওয়াজ।

লাল কাঁকুরে মাটির একটা পথ জঙ্গলের ধার বরাবর চলে গিয়েছে পাশের আদিবাসী পাড়ায়। ঐ পথ ধরেই হাঁটতে থাকে অগ্নির দল, যেন ঐ আদিবাসীপাড়ার উদ্দেশ্যেই চলেছে ওরা। যেন ঐ পাড়াতে থাকে ওদের আত্মীয়-কুটুম, সই-বকুলফুল। যেন তাদের বাড়িতে টুসু নাচাতেই যাওয়া। একটুখানি এগিয়েই বুড়ো কেঁদ গাছটার তলায় থমকে দাঁড়ায় ওরা। গানের যে কলিখানা গাইছিল, মাঝপথেই থামিয়ে দেয়। চারপাশে ইতিউতি তাকায়। তারপর চকিতে পুরো দলটাই ঢুকে পড়ে জঙ্গলের মধ্যে। এ বুদ্ধিটা ঐ শন-মাথা বুড়ির। দূর থেকে কেউ যদি এদের লক্ষ করে থাকে তো ভাববে, কেঁদ গাছের তলায় বসে জিরোচ্ছে বুঝি।

পায়ের তলায় শুকনো পাতার মচমচানি আওয়াজ। বুড়ি থেমে গিয়ে ঘন হয় সঙ্গীদের পাশে।

ফিসফিসিয়ে বলে, 'শুকনা পাতায় পা নাই ফেইল্‌বি তুয়ারা। ফাঁকা জমিনে পা ফ্যাল্‌।'

সন্তর্পণে এগিয়ে চলে ওরা বুকের নিঃশ্বাস চেপে।

এই জঙ্গলের পথ-ঘাট কিছুই জানা নেই অগ্নিদের। সে জানে ঐ বুড়ি। ওই পথ দেখিয়ে চলেছে।

প্রায় আধঘন্টাটাক হাঁটার পর ওবা নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় এক বৃদ্ধ বটের তলায়। বহুকালের প্রাচীন বট। জটায়-ঝুরিতে ছেয়ে রয়েছে। চারপাশে মোটা মোটা ঝুরিগুলো থামের মতো আকার নিয়েছে। থামগুলোর মাথার ওপর ঘন ডালপালার চাঁদোয়া। দিনে বেলাতেও গাছের তলাটা প্রায় অন্ধকার থাকে।

গাছ থেকে সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে খুব মিহি গলায় ডাক পাড়ে বুড়ি. 'টুসু দেইখ্‌বি. আয় গো। বেলা চইলে যায়।'

নিমেষের মধ্যে অজস্র ঝুরির থাম দিয়ে গড়া অন্ধকার প্রকোষ্ঠগুলি থেকে বেরিয়ে আসে তিন-চারজন মানুষ। গাছের ঝাঁকড়া ডালগুলো থেকে ঝুপঝুপ করে নেমে আসে আরও তিন-চার জন। সুকুমার, তিলক, হঠাৎ. বাঁশি...।

সুকুমার একগাল হেসে শুধায়. 'অত দেরি হইল্যাক ক্যানে গো খুড়ি?'

বুড়ির চোখেমুখে নিদারুণ বিরক্তি। বলে, 'জয়রামপুরের মোড়ে পুলিশ-চৌকি

বইসেছে। কত পথ ঘুইরে ঘুইরে আইল্যম্। রাধালগরের পথ ধরে, পদ্মপুকুরের পাড় বরাবর, এক চিঁড়ার বাইশ ফের, বাপ।'

তিলক বাউরি এসে দাঁড়িয়েছে সুকুমারের পাশটিতে। ক্ষেপে উঠে বলে, 'হ-হ, বুঝ্যেছি। কটক ঘুইর্যে পাকশালে আইছিস তুয়ারা। ইবার, কী এনেছিস দে দেখি। ভোখে পরান যায়।'

ছেলের দিকে সস্নেহে তাকায় মাঘীবুড়ি। পরক্ষণে কপট রোষ ফুটে ওঠে সারা মুখে। মুখ ঝামটা দিয়ে বলে ওঠে, 'হ-হ। আর রোষ দেখাতে হব্যেক নাই। বড় পাহাড় একখান উল্টাচ্ছু তুয়ারা! আমাদ্যার যত জ্বালা।'

গাছের তলায় থাবড়ে বসে ওরা। টুসু-ঠাকুরের মাগন-ঝুড়ির ওপর ঢাকনা দেওয়া কাপড়ের টুকরো সরিয়ে ফেলে অগ্নিরা। বের করে আনে আটার রুটি, ভেলি গুড়, বিড়ি, দেশলাই, মতিহার আর শুকনো চিঁড়ে। দেখতে দেখতে সবাইয়ের মাগনঝুড়ি ফাঁকা হয়ে যায়।

গেল দু'দিন কিছুই পেটে পড়ে নি। হাভাতে মানুষগুলোর তর সইছিল না আর। একখানা করে রুটি নিয়ে চিবোতে থাকে তৎক্ষণাৎ । অগ্নি গুড় ভেঙে ভেঙে দেয় সবাইকে।

খেতে খেতে সুকুমার শুধোয়, 'হাঁ রে, তুয়াদ্যার ডর লাইগল্যাক নাই?'

'কিসের ডর?' অগ্নিরা ফিকফিক হাসে। চোখগুলি ঝিলিক মারে নিঃশব্দে।

'যদি ধরা পইড়ে যেতিস? যদি মাগন-ঝুড়ি খুইলে দেইখ্তো পুলিশ?'

'খুইল্যে দেইখ্ব্যে কি, আমরা পুলুশের থিক্যে মাগন আদায় করথম্।' বলতে বলতে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে বাতাসী। তিলকের বোন। চোখদুটো চিক্চিক্ করে ওঠে ওর।

কথা না বাড়িয়ে ওরা গোগ্রাসে খেতে শুরু করে। খেতে খেতে গাঁ-ঘরের খবরাখবর নেয়। মাঘী বুড়ি বলে, 'গোবিন-মিস্তির গেল-রাতে গা-লুকাঁই আইছিল। সে বইল্ছে পুলুশ নাকি রাইতের বেলায় সিংহগড়ে ডেরা লিচ্ছে। রাতভর পাড়ায় পাড়ায় সুড়ুক-সন্ধান লিচ্ছে।'

'তুমাদ্যার ঘরে আসে নাই?'

'লয়। কেবল, পরশু দিন রতিয়া শুধাচ্ছিল, তিলক কুথায়? তো, আমি বলি, তিলক তো নাবালে গেল গো ধান কাটতে। উযার সাথ ভেট কইর্তে হইলে মাঘের মাঝামাঝি আইসো।'

হেসে লুটিয়ে পড়ে সুকুমারের দল— খুড়ি, তুমার মস্করা কইর্বার বাতিকটা গেল নাই।'

খেয়ে দেয়ে মনে খুব ফুর্তি হয়েছে তিলকের। বুড়ো বটের একখানা ঝুরিতে ঝুলে দোল খেতে থাকে সমানে।

সবাই যখন ঠাট্টা মস্করায় মত্ত, অগ্নি অপলকে দেখতে থাকে তিলকের দোল খাওয়া। দেখতেই থাকে। দেখতে দেখতে একটু একটু করে চলে যায় স্বরচিত এক রূপকথার রাজ্যে।

বোনমিল ইউরিয়া

গ্রামসেবকদের মাসিক বৈঠক শুরু হল সাড়ে-তিনটেয়।মল্লিকা আগে থেকেই বলে রেখেছিল, মিটিংয়ের পর দু'জনে যাবে দীপমালার বাসায়, সেখান থেকে মল্লিকাদের বাড়িতে।

প্রথমেই এলাকার খবরাখবর নেন বিডিও সাহেব। হাঁস-মুরগির ছানা, নারকোল-সুপুরির চারা ইত্যাদি বিলি-বন্দোবস্তর চিত্রখানি একে একে আঁকে সবাই। সব সামগ্রীরই বিলি-বিতরণ শেষ। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টরা সব প্রধান হয়েছেন। কাজে-কর্মে বড়ই উৎসাহ ওঁদের। তার ওপর, এসব কাজে তিলমাত্র বিলম্ব করেন না। চটপট লিস্ট তৈরি, ঝটপট বিতরণ

শেষ। যাদের পর্যাপ্ত বাস্তুভিটে রয়েছে, প্রশস্ত ফলের বাগিচা, তারাই পেয়েছে গাছের চারাগুলো। যাদের নিজস্ব ভিটে নেই, থাকলেও দু'পাঁচ ডেসিমেলের বেশি নয়, তারা চারা নিয়ে লাগাবে কোথায়? এলাকার জন্য বরাদ্দ হওয়া চিজ তো আর ফেরৎ যেতে পারে না, তাই জমিনওয়ালা মানুষেরাই পেয়ে গেছে সে-সব। আর, হাঁস-মুরগীর বাচ্চাও তো তাদের দেওয়া চলে না, যারা সকাল বেলায় ঘর থেকে খাটতে বেরোয়, দিনভর অন্যের বাড়িতে খাটালি করে সন্ধেবেলায় ঘরে ফেরে। হাঁস-মুরগীদের তারা দেখাশোনা করবে কখন? শুধু-দেওয়া তো নয়, তার সু-ব্যবহার তো হওয়া চাই। ফলে, সে সব সামগ্রীও দিতে হয়েছে তাদের, যাদের সকাল থেকে সন্ধে অবধি খাটতে বেরোতে হয় না। এবং বলাই বাহুল্য, তালিকা তৈরির বেলায় হরবল্লভের বশংবদ ব্যক্তিরাই আনুকূল্য পেয়েছে। মোট কথা, যাদের কিছুই নেই, তাদের কিছুই দেওয়া যায় নি। সবকারি খয়রাতি পেয়েছে তারাই, যারা সবদিক থেকে সম্পন্ন। কিছু কুয়া মঞ্জুর হয়েছিল, প্রত্যেকটি এলাকায়। শর্ত ছিল, কুয়ার জন্য আধ ডেসিমেল জমি দান করতে হবে সরকারকে, সরকার জমি কিনে নিতে পারবে না। যদি পাওয়া যায় তেমন জমি, যদি কেউ পরহিতার্থে দান করে, তবেই তার ওপর সরকার কুয়া গড়ে দেবে। যাদের নিজস্ব ভিটেই নেই, জমিদারের জমিতে অনুমতি-দখল, তাদের তো দান করবার প্রশ্নই নেই। যাদের দু'পাঁচ ডেসিমেল ভিটে রয়েছে, তাদের অবস্থা হল, চাঁদুরে চাঁদু, তুয়ার কপ্‌নিটার থিকে টুকচান কাপড় দিবি? চাঁদু বলে, লিবি ত লে। পিছন থিক্যে লিলে পাছা-উদোম, আর সামনের থিকে লিলে নুনু খোলা। কাজেই সম্পন্ন মানুষেরা তাদের ভিটের চৌহদ্দির কিনার ঘেঁসে লিখে পড়ে দিয়েছে আধ-ডেসিমেল জমি। কুয়া হওয়ার পর কিছুদিন মানুষকে জল নিতেও দিয়েছে, তারপর 'বেড়া আলগা থাকলে গরু-ছাগল লাফাবেক, চোব-ছ্যাঁচড় ঢুকবেক' এই যুক্তিতে পুনরায় বেড়া দিয়ে দিয়েছে। গ্রামসেবকবা অত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যায় না। তারা তোতা পাখির মতো আউড়ে যায় পরিসংখ্যান। অমুক সামগ্রী এতগুলি বরাদ্দ হয়েছিল, এতজন মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়েছে, ব্যালান্স নিল্। কেবল বুদ্ধদেবই উলটো গাইতে শুরু করেছে প্রতিটি মিটিং-এ। যাদের কথা ভেবে সরকারি সাহায্যের বন্দোবস্ত, তারা পাচ্ছে না কিছুই। হরেক রকম আইনের প্যাঁচে এবং তালিকা-তৈরির কারচুপিতে সে সব সামগ্রী পেয়ে যাচ্ছে সম্পন্ন মানুষেরা। এই সময়টা হল বিডিও সাহেবের কান খোঁচাবার সময়। বুদ্ধদেব এলাকা জুড়ে এই সব অসঙ্গতির কথা বলতে শুরু করলেই তিনি কান খোঁচাতে শুরু করেন এবং ঘনঘন হাই তুলতে থাকেন। সবশেষে বলেন, তোমাগো কথা শ্যাষ, এবার আমাগো কথা শুরু। শোন, আমরা গভর্নমেন্টের চাকর। কী? চাকর। গভর্নমেন্টের কিসু আইন-কানুন আসে, প্রোসিডিযোর আসে, সেসব মাইন্যাই আমাগো কাম করতে হইব। উই-দ্য গভর্নমেন্ট সারভেন্টস্ গো বাই জি-ও অর্থাৎ কিনা গভর্ণমেন্ট-অর্ডার। সরকারি অফিসটা বিপ্লব করবার জা'গা নয়। মাল এসেছে, আমরা সাব-অ্যালট কইর‍্যা দিসি, জনপ্রতিনিধি লিস্ট বানাইয়া দিসেন, গ্রামসেবক বিলি কর্‌সে। গভর্ণমেন্টের পার্‌পাস সার্ভড্। এখন তোমার যদি মনে হয়, প্রধান ঠিক তালিকা বানায় নাই, তো তুমি ইলেকশনে কনটেস্ট কইর‍্যা প্রধান হইয়া যাও গা। কিন্তু তোমার আবদারে আমি তো 'জি-ও'র বাইরে গিয়া প্রধানের বদলে তোমাগো লিস্টি বানাইবার ভার দিতে পারি না। হেটা একটা সোভারিন ড্যামক্রেটিক রিপাবলিক। অই দ্যাখ, কি লেখা? উই—দা পিপুল অফ্ ইন্ডিয়া...। ড্যামোক্রেটিক কান্‌ট্রিতে জনপ্রতিনিধিকে বিশ্বাস করতেই হইব।

চেয়ারে শরীরখানা এলিয়ে জানলা দিয়ে একমনে আকাশ দেখছিলেন বিডিও সাহেব। সহসা এক ঝাঁকুনিতে সোজা হয়ে বসেন। বলেন, 'এবার আসল কথায় আসি। বোনমিল আর ইউরিয়ার ডেমনেস্ট্রশন, কার কত হইসে?'

প্রায় প্রত্যেকেই যে-যার হিসেব পেশ করে। কারুর পুরো কোটা শেষ, কারুর বা সামান্য বাকি। কেবল বুদ্ধদেবই মাথা নিচু করে কবুল করে, সে একজনেব ক্ষেতেও বোনমিল অথবা ইউরিয়া ছড়াতে পারে নি।

বিডিও সাহেব চমকে ওঠেন, 'সে কি! ক্যান? পারো নাই ক্যান?'

বুদ্ধদেব বলে, 'কেউই রাজি হচ্ছে না স্যর। জমি নাকি অপবিত্র হয়ে যাবে।'

আচমকা খাপ্পা হয়ে ওঠেন বিডিও সাহেব, 'সব এলাকার চাষীই বাজি হইল, তোমার এলাকার চাষী রাজি হইল না ক্যান?'

বুদ্ধদেব মাথা নিচু করে বসে থাকে। সে জানে, কোনও এলাকাতেই এক দানাও বোনমিল কিংবা ইউরিয়া জমিতে পড়ে নি। সবাঁই ওগুলো নয়ানজুলিতে ফেলে দিয়ে প্রধানের থেকে একখানা সার্টিফিকেট এনে ধরিয়ে দিয়েছে স্বদেশ কুন্তুর হাতে। গাই-বাছুরে মিল থাকলে নাকি বনে গিয়েও দুধ দেয়। ত্রিভঙ্গর বচন। কিন্তু বুদ্ধদেবেব পক্ষে এটা সম্ভব নয়। সত্যি সত্যি জমিতে না ছড়ালে হরবল্লভ কোনও সার্টিফিকেটই দেবেন না। তাছাড়া, কেনই বা সে এমন কাজ করতে যাবে? লাভ কি এতে? যে কারণে এই ডেমনেস্ট্রেশন, সেটাই যদি না হয় .।

হনুমান তাড়াবার আগে চুয়ামসিনার মানুষ একযোগে কথা দিয়েছিল, বোনমিল - ইউরিয়া ছড়াতে দেবে জমিতে। বিপদটা কেটে যেতেই তারা সব এড়িয়ে যাচ্ছে একে একে। বুদ্ধদেব বুঝতে পারে না, কী ভাবে এগোলে কাজটাতে সফল হবে সে।

বিডিও সাহেব স্থির পলকে তাকিয়ে ছিলেন ওর দিকে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকেন, 'কাজে-কামে মন নাই তোমার। শুনতে পাই, এলাকার সব বদ লোকের সঙ্গে তোমার দহরম-মহবম। অকারণে মানী লোকের সঙ্গে ঝঞ্ঝাট বাধাইতেছ। মনে রাইখ্যো, ইয়াব নাম এক্সটেনশন ওযার্ক। এ হইল গিয়া গ্রাসরুট লেভেলের কাজ। সক্কলের কাছে তোমাকে অ্যাকসেপ্টেবুল্ হইতে হইব। তা নয়, তুমি সক্কলের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইবাব তাল কর্‌স।'

চরম অপমানে কানদুটো নিঃশব্দে পুড়ছিল বুদ্ধদেবের। তাও খুব নিচু গলায় জবাব দেয়, 'আমি তো বোঝাচ্ছি, স্যার। কেউ যদি না শোনে—।'

'শুনব না ক্যান?' বিডিও সাহেব প্রায় খেঁকিয়ে ওঠেন, 'অন্যাদেব কথা শুনসে কী কইর‍্যা?' সামান্যক্ষণ গুম মেরে বসে থাকেন তিনি। তারপর বলেন, 'মনে রাইখ্যো, গাধা পিটায়ে ঘোড়া বানানোর নামই এক্সটেনশান ওয়ার্ক।'

সেদিন শেষ কথাগুলো এইভাবেই বলেছিলেন বিডিও সাহেব। 'শোন বুদ্ধদেব, বিকল্প সারের ব্যবহার গভর্ণমেন্টের পয়লা নম্বর প্রোগ্রাম। ডি-এম অবধি ইনটারেস্টড। তুমি অনেক কাজেই বাগরা দিত্যাস, আমি সইসি। বাগরা দিয়া কৃষি-ঋণ বিলি করলা না, আমি কিস্যু কই নাই। টি-আব স্কীমে চুরি হইসে বইল্যা চিল্লাইলা, আমি এ্যাকশন লই নাই। কিন্তু এই বোনমিল আর ইউরিয়ার ডেমোনেস্ট্রেশন প্রোগ্রামে তুমি যদি দু'হপ্তার মইধ্যে তোমাগো কুটা পূরণ করতি না পার তো আমার চাইতে বুরা আদমি কেউ হইব না। আমি সব কথা ডি-এম্‌রে রিপোর্ট করুম্। দিস ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্নিং।'

বিধ্বস্ত মনখানি নিয়ে বেরিয়ে আসে বুদ্ধদেব। সর্বাঙ্গে অজস্র বিছের কামড়। ব্যক্তিগত অপমানবোধকে ছাপিয়ে যায় আরও এক বেদনাকর অনুভূতি। যে স্বপ্নের টানে ব্যক্তিগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে দু'পায়ে মাড়িয়ে সে ছুটে এসেছিল দেশ গড়বার কাজে, সেই স্বপ্নখানা ভেঙে চুরমার হতে বসেছে। দেশ গড়বার কারিগররা সারাদেশ জুড়ে বিছিয়ে রেখেছে একটি সমবেত জটিল ফাঁস। চারপাশ থেকে সেই ফাঁসে একটু একটু করে আটকে গিয়েছে বুদ্ধদেব। অবিরাম প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে বিডিও, করালী সোম, স্বদেশকুণ্ডু, হরবল্লভ সিংহবাবু,—সবাইয়ের বিরাগভাজন হয়ে গিয়েছে । তারা এখন প্রত্যেকেই ফাঁসের এক-একটি প্রান্ত ধরে নিয়েছে হাতে। টান মারছে একটু একটু করে। এক শ্বাসরূদ্ধকর পরিস্থিতিতে পড়ে হাঁসফাঁস করছে বুদ্ধদেব। আলাপ হওয়ার পরপরই সতর্ক করে দিয়েছিল মল্লিকা। বড জোরে দৌড়চ্ছেন আপনি। সব্বাইকে বড় জলদি চটিয়ে দিচ্ছেন। এরা কিন্তু ভয়ঙ্কর জীব। ব্যক্তিগত স্তরে এরা একে অন্যকে দেখতে পারে না। কিন্তু যৌথ স্বার্থে আঘাত লাগলে ওরা নিমেষের মধ্যে এককাট্টা হয়ে যায়। একটু সাবধানে এগোন।

বুদ্ধদেব বিরক্ত হয়েছিল মল্লিকার কথায়। সাবধানে এগোবার প্রশ্ন ওঠে কেন? গামিরতলা থেকে আদিবাসীপাড়া অবধি মোরাম-রাস্তা বানানোর স্কীমখানাতে ওভাসিয়ার করালী সোমের নেতৃত্বে লুট হয়ে গেল। সে চুপ করে থাকবে? কৃষি-সামগ্রী, কৃষিলোন, এগুলো বিলি করতে গিয়ে কৃষি-অফিসার স্বদেশ কুণ্ডু এন্তার লুটছে। সে সয়ে যাবে? মানুষের অভাবের দিনে পাছে নিজস্ব দাদনবিলিব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেই কারণে একটাও মাটি-কাটার স্কীম হতে দেয় না হরবল্লভ সিংহবাবু। নিজের মুনিশ-মাইন্দার, বশংবদ মানুষজনের নামে কৃষিঋণ মঞ্জুর করিয়ে পুরো টাকা নিজের পকেটে ভরে নেয় শ্রাবণ মাসে। সেই টাকা ভাদ্র-আশ্বিনে দাদন-কর্জ হিসেবে বিলি করে চড়া সুদের বিনিময়ে। সরকারি সাহায্য, খয়রাতি, যেটুকু আসে, সব বিলি করে দেয় অনুগত বশংবদ মানুষের মধ্যে। এ সব দেখেও না দেখার ভান করে থাকবে বুদ্ধদেব? মুৎসুদ্ধিবাবুর মতো, সিংহগড়ের দাদন-বিলির সময়, দাদনের খাতা নিয়ে বসে যাবে? হরবল্লভের হয়ে এলাকায় এলাকায় কর্জ আদায় করে বেড়াবে। সিংহগড়ের উৎসবে-পার্বনে হ্যাজাকে, ডেলাইটে ঘনঘন পাম্প দিতে থাকবে? এই জন্যেই কি সে সর্বস্ব ত্যাগ করে যোগ দিয়েছে এই চাকরিতে!

মল্লিকা মৃদু হেসে বলেছিল, 'আপনি বড্ড আবেগপ্রবণ।'

বুদ্ধদেবের মনে হয়, বোন-মিল এবং ইউরিয়া বিলির ব্যাপারে সম্ভবত স্বদেশ কুণ্ডু বিডিওর কাছে নালিশ করে থাকবে। আর, বিকল্প সারের ব্যবহার কৃষি-দপ্তরে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী যে স্বয়ং জেলাশাসকও এই কর্মসূচী সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছেন হপ্তায় হপ্তায়। সেই কর্মসূচী বুদ্ধদেবের এলাকায় পুরোপুরি বানচাল হতে বসেছে এমন অভিযোগ পেলে বিডিওর পক্ষেও স্থির থাকা মুশকিল।

বেশ কিছুদিন আগেই স্বদেশ কুণ্ডুর বিরাগভাজন হয়েছে বুদ্ধদেব। হরবল্লভের তৈরি কৃষিঋণপ্রাপকদের তালিকাটা মেনে নিয়েছিল স্বদেশ। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিল বিডিও সাহেবের কাছে। সেই তালিকায় সত্যিকারের চাষীর নাম ছিল না বললেই চলে। যাদের নাম ছিল, তারা হরবল্লভ, প্রমথ গাঙ্গুলি, মহাদেব কয়াল, ঝাড়েশ্বর নায়ক, কামদেব দত্তদের মুনিশ-মাইন্দার, বশংবদ অনুগতজন। বুদ্ধদেব মেনে নেয় নি সে তালিকা। লিখিতভাবে

অভিযোগ করেছিল বিডিও সাহেবের কাছে। অন্য কেউ হলে বিডিও সাহেব হয়ত বা উড়িয়েই দিতেন যাবতীয় অভিযোগ, কিন্তু বুদ্ধদেবের দৃঢ়তা দেখে তিনিও পিছু হটেন। হরবল্লভ রচিত এবং স্বদেশ কুণ্ডু সমর্থিত কৃষিঋণের তালিকার তলায় লিখেছিলেন, প্লিজ রিভিউ দ্যা লিস্ট ওয়ান্স এগেন। লিস্টখানা ফেরৎ গিয়েছিল হরবল্লভের কাছে। আর ফেরৎ আসে নি ব্লক অফিসে। কিন্তু হরবল্লভের গোমস্তা রতিকান্ত গোস্বামী বুদ্ধদেবকে একলা পেলেই শোনাতে শুরু করেছিল, 'পিপীলিকা পক্ষ ধরে মরিবার তরে।' লিস্ট না পাওয়ায় কৃষিঋণ বিলি হল না চাষের মরসুমে। স্বদেশ কুণ্ডু এবং হরবল্লভ যৌথভাবে এলাকাময় প্রচার করল, তালিকা যথাসময়ে পাঠানো হয়েছিল ব্লকে, বুদ্ধদেব গিয়ে আটকে দিয়েছে।

স্বদেশ কুণ্ডুর গোঁসা হওয়ার, ত্রিভঙ্গর মতে, আরও একটি কারণ রয়েছে। কারণটা নাকি, মল্লিকা।

মল্লিকা একান্তে বলেছিল, 'তুমি বিপদে পড়ে যাবে বুদ্ধদেব। একটু সমঝে চলা উচিত তোমার।'

বুদ্ধদেব ভীষণ রেগে গিয়েছিল। তাই দেখে খুবই বিব্রত বোধ করেছিল মল্লিকা, 'তোমার ভালর জন্যই বলছি এসব। তোমার জন্য আমার ভাবনা হয়।'

মিটিংয়ের পর মল্লিকার সঙ্গে দীপমালাদির বাসায় যাওয়া কথা ছিল বুদ্ধদেবের। কিন্তু বিডিও সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে সে সটান সাইকেলে চড়ে রওনা দেয় চুয়ামসিনার দিকে। মল্লিকা জানতেই পারে না।

অবিরাম বর্ষণের দিন

কাল থেকে অঝোরে ঝরছে। এক মুহূর্ত বিরাম নেই। পাকা জামের রঙ নিয়েছে আকাশ। অগ্নি দিনভর ঘর-গেরস্থালির যাবতীয় কাজকাম করেছে। রান্নাবান্না। তার ফাঁকে বত্রিশভাগীর জঙ্গলে গিয়ে খুঁজে এনেছে মৌডাল ছাতু। গোরাচাঁদ খুব ভালবাসে। সারা সন্ধে বসে বসে আসকাপিঠা বানিয়েছে। গোরাচাঁদ ভালবাসে। গোবাচাঁ'দের কাপড়-চোপড়গুলো সারা সকাল ধরে পরিপাটি করে কেচেছে। ডোবার জলে ধুয়েছে। শুকিয়েছে। সব কিছুর মধ্যে সারাক্ষণ অঝোরে ঝরেছে।

নিশান বাউরি বিছানায় শুয়ে শুয়েও সবকিছু নজর করে যায় নিঃশব্দে। বুঝতে কিছুই বাকি নেই তার। অগ্নিকে যথাসাধ্য প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে তো জানে, সন্তানকে দিনের পর দিন চোখের আড়ালে রাখা, বাপ-মায়ের বুকের কোনখানে বাজে সেটা। সেও তো ভুক্তভোগী। ছেলেবেলায় মা হারিয়েছিল পরীক্ষিত বাউরি। সেই থেকে নিশান বাউরিই ওর মা-কে মা, বাপ-কে বাপ। তবুও নিশান হল পুরুষ মানুষ, আর অগ্নি হল মেয়ে। সে ছিল, যতই হোক, বাপ। আর, অগ্নি হল মা। আকাশ-পাতাল তফাৎ। বাপ মানে, সে পুরুষ, সন্তানের বীজটি একটি নারীর গর্ভে স্থাপন করেই সে মনে করে তার যাবতীয় কর্তব্যের ইতি। এরপরের যাবতীয় করণীয় সবই মায়ের। সব ঝঞ্ঝাট, সব দিগদারি তাকেই ভোগ করতে হয়। নিজের অস্থি থেকে অস্থি, রক্ত থেকে রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা সবকিছু দিয়ে তিলতিল গড়ে তুলতে হয় শিশুটি শরীরপ্রতিমা । তার বুকে ঢালতে হয় প্রাণবায়ু, চোখের মণি থেকে দৃষ্টি, মন থেকে নিংড়ে নিংড়ে পুলক...। একদিন সে পৃথিবীর আলো দেখে, কিন্তু তাতে করে মায়ের দায়িত্ব কিছুই কমে না, বরং বাড়ে। এতদিন সে ছিল মায়ের জঠরের নিরাপদ আশ্রয়ে, এবার

সে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। এখানে তার অনেক শত্রু, অনেক প্রতিকূলতা। পৃথিবীর তাপ-উত্তাপ, রোগ-ব্যাধি, ধুলো-ময়লা রোদ-বৃষ্টি, সবই ছোট্ট শরীরটাকে ঘিরে ধরবে চারপাশ থেকে। সকলেই ঐটুকু এক শিশু-শরীরের দখল নিতে চাইবে। তখন মা, কেবলমাত্র মা-ই, তার রক্ষাকর্ত্রী। সেবা দেবে, শুশ্রূষা দেবে, আড়াল, নিরাপত্তা দেবে। হাসি, ঘ্রাণ, নিজের শরীরের যাবতীয় রস নিংড়ে দেবে ওর মুখে। বাপও তাকে আদর দেবে, স্নেহ দেবে, কিন্তু নিজের শরীরকে সর্বস্বান্ত করে সন্তানকে কিছু দান করবার সাধ্য বাপের নেই। নিশান বাউরি তো, যত হোক, বাপ। সে কী করেই বা বুঝবে একমাত্র সন্তানকে দূর দেশে পাঠিয়ে দিতে হলে মায়ের বুকের ঠিক কোনখানে বাজে। তাও যথাসম্ভব ওকে প্রবোধ দেবার প্রয়াস চালিয়ে যায় নিশান বাউরি। কিস্তিতে কিস্তিতে অগ্নিকে বুঝ দিতে থাকে। বলে, কী কইর‍্বি দিদি, ছেইলাকে ত মানুষ কইর‍্তে হবেক। এমন অভাগা জাত আমরা, জন্তুর মতন জনম লিই, জন্তুর মতন মরি। চারপাশে অত ইস্কুল, হ্যানাত্যানা, এ বাউরি জাত্তের জীবনটা বাবুদ্যার ঘরে খাটালি দিতে দিতে আর বরা চরাতে চরাতেই খুয়ার হইয়েঁ যায়। বাউরি সমাজে ক'টা ছগরা আর পড়ালিখা শিখেছে! অদ্দিন বাদে একটা সুযুগ যখন আইছে, মন শক্ত কর্, তুই, ছেইড়ে দে উয়াকে, যদি লল্লাটে থাকে উয়ার, পড়ে শুনে মানুষ হোক। তুই মায়ের কম্মই কচ্ছিস ইট্যা। মনকে শক্তই করেছে অগ্নি, মাকড়া পাথর চাপিয়েছে বুকে, নচেৎ দীপমালা যখন প্রস্তাবটা নিয়ে এল, পত্রপাঠ 'না' করে দিতে কি পারত নাই? শেষ অবধি রাজি ত হল সে। মনে মনে ভাবে বটে এসব, কিন্তু চোখদুটি সে কথা শোনে কই? বোঝে কই? সে তো কাল থেকে অঝোরে ঝরিয়েই চলেছে। কোনও কথাই তো শুনছে না ওরা, কোনও প্রবোধই তো মানছে না।

আঁচল দিয়ে নিঃশব্দে চোখ মোছে অগ্নি। গোরাচাঁদের জন্য আগড়ের দিকে তাকায়। বেরোবার মুহূর্তে আবার কোথায় দৌড় মারল ছেলেটা!

দীপমালা দিনক্ষণ স্থির করে চলে যাবার পর থেকেই কেমন যেন আচমকা গুম মেরে গেছে ছেলে। সর্বদাই এক ধরনের পাথর-পাথর ভাব। মুখে একবারও বলে নি, আমি তুয়াকে ছেইড়ে অত ধুরে যাব নাই, মা। বললে পরে অগ্নি নিজেকে শেষ অবধি কতখানি শক্ত রাখতে পারত বলা মুশকিল। কিন্তু ছেলে যেন সে ব্যাপারে বোবা। বরং অগ্নিই ওকে একান্তে শুধিয়েছে, কী রে, যাবি ত? দীপামাসি বেবস্থা কইরেছে, উখ্যেনে বিনা পইসায় থাকবি, খাবি, পড়ালিখা শিখবি.., যাবি ত? গোরাচাঁদ খুব নিরুত্তাপ গলায় বলেছে, যাব। অগ্নি প্রস্তুত হয়েছে একটু একটু করে। নিশান বাউরির মত নিয়েছে। সুকুমারকে জানিয়েছে। তিলককে সঙ্গে যাওয়ার জন্য বলেছে। সেসব দেখতে দেখতে দিনদিন পাথর হয়ে গেছে গোরাচাঁদ। দিন ক্রমশ এগিয়ে এসেছে একটু একটু করে। ক্রমশ একটা আনচান ভাব এসেছে ওর মধ্যে। পরপর কয়েক রাত অগ্নি ওকে বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে শুয়ে থেকেছে সারারাত। ঘুমের মধ্যে রাতভর কতকিছু বিড়বিড় করে বলেছে গোরাচাঁদ। অগ্নি তার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারে নি।

গতকাল সারাদিন ঘরে ছিল না ছেলে। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছে। দিনভর। বনে গিয়ে প্রিয় ফলপাকুড়টি খেয়ে এসেছে। প্রিয় গাছগুলির গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে এসেছে। প্রিয় জায়গাগুলিতে গিয়ে বসেছে। বন্ধু-বান্ধব, সমবয়েসী সখা-স্যাঙাৎ যে ক'জন রয়েছে তার, সবাইয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে এসেছে। তার যেসব প্রিয় খাদ্য-খাবার, আসকা পিঠা, মৌডাল ছাতুর ঝোল, কাঁটা বেগুন আর পুঁই-মেচড়ি দিয়ে ঝাল-ঝাল শুঁটকি

মাছ, একে একে সব রেঁধে রেঁধে খাইয়েছে অগ্নি। চটের থলিতে তার যৎসামান্য পোশাক-আশাক গুছিয়ে গাছিয়ে রেখেছে। আর, ঘুমিয়ে পড়বার আগে বারংবার মনে করিয়ে দিয়েছে, কাল সকাল সকাল রওনা দিতে হবে। কিন্তু তবুও সকালটি হতে না হতে আবার কোথায় দৌড় মারল ছেলে।

ভোরে উঠে সিনান করে নিয়েছে অগ্নি। ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়েছে তিনজনার মতো। নিশান বাউরি বেলায় খাবে। তার জন্য আলাদা করে ঢাকা দিয়ে রেখেছে ভাত। এবার মা-ব্যাটায় দু'গাল খাবে একপাতে বসে, তা ছেলের এখনো অবধি দেখা নেই।

অগ্নি যাবে। তিলকও যাবে সঙ্গে। সে এসে বসে রয়েছে দাওয়ায়। নিশান বাউরির সঙ্গে গল্প জুড়েছে। ডালে-পাতায় বেড়ে যাচ্ছে বেলা। তিলক ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠে। তিলকের সঙ্গে গল্পগাছার ফাঁকে ফাঁকে অগ্নিকে নানা উপদেশ দিয়ে চলেছে নিশান বাউরি। পথে-ঘাটে তার কোন্ কোন্ সাবধানতা অবলম্বন করা সঙ্গত, গোরাকে সারাপথ ধরে কী কী কথা আচ্ছা করে বুঝিয়ে দিতে হবে, একে একে বকে চলেছে ঐ সব। কিস্তিতে কিস্তিতে। যখন যেটা মনে আসছে। অগ্নি বুঝতে পারে, ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়েছে বুড়া। মুখে সেটা ভাঙছে না। আর একজনের পুরোপুরি অজ্ঞাত রয়ে গেল ব্যাপারটা। পরীক্ষিত বাউরি। সে জানলই না, তার অজান্তে তার আদরের নাতি চলে যাচ্ছে দূর প্রবাসে। ওর সঙ্গেই তো ইদানীং ভাবসাব হয়েছিল পরীক্ষিতের। ওর সঙ্গেই তো যত গুজুর-গুজুর প্রাণের কথা হত। এরপর যেদিন ঘরে ফিরবে মানুষটা, শোনামাত্তর পাথর হয়ে যাবে।

দুপুর নাগাদ যখন শাল তোড়ায় পৌঁছুল ওরা, স্কুল তখন পুরোদমে চলছে।

সাবা রাস্তা গোরাচাঁদ একটাও কথা বলে নি। পাশটিতে বসে অগ্নি ওকে সারাপথ কত কিছু বুঝিয়ে এসেছে। গোরাচাঁদ রা কাড়ে নি একবারও। স্কুলে পৌঁছেও সে একই রকম নির্বিকার।

স্কুলঘরের পেছনেই হোস্টেল। মাটির দোতলা বাড়ি। একতলার একটি ঘরে ঠাঁই হল গোরাচাঁদের। থলি থেকে একটি একটি জিনিস বের করে অগ্নি। দেখিয়ে বুঝিয়ে দেয়। আরও কিছুক্ষণ থাকতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু অতখানি পথ ফিরতে হবে অগ্নিদের। বাঁকুড়া থেকে বাস বদল করে পৌঁছুতে হবে জয়রামপুরের মোড়ে। রাত হয়ে যাবে। অগ্নি এক সময় উঠে দাঁড়ায়। পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। ধরে আসা গলায় উচ্চারণ করে, 'গোরা, যাই?'

তিলক হাঁটা দেবার জন্য প্রস্তুত। অগ্নিও পা বাড়াতে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তে গোরাচাঁদ ওকে ডাকে। অগ্নি ফিরে তাকায়। গোরাচাঁদ এতক্ষণে মুখ খোলে। বলে, 'একটা কথা আছে তুয়ার সাথ।'

'কী কথা?' অগ্নির চোখদুটো ডিমের কুসুমের মতো নরম হয়ে আসে।

'ইখ্যেনে নাই বলব। উদিগ্ চল্।'

গোরাচাঁদ ওকে টেনে নিয়ে যায় নিরাপদ দূরত্বে। কিছুই না বুঝতে পেরে অগ্নি ভ্যাবাচ্যাকা। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে গোরাচাঁদের দিকে, 'কি?'

গোরাচাঁদ সামান্য ইতস্তত করে। একসময় বিড়বিড় করে বলে ওঠে, 'বলছিল্যম কি, তিলক-কাকা খোব ভাল।'

চমকে তাকায় অগ্নি। পেছন ফিরে এক ঝলকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা তিলককে দেখে

নেয়। তারপর ছেলের চোখে চোখ রাখে। পড়তে চায় তার আপাতসরল কথার মধ্যেকার গোপন ব্যঞ্জনাটিকে। চিনতে চায় তার মনটাকে। সহসা সারা শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। গোরাচাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতেও বুঝি নিদারুণ সঙ্কোচ জাগে মনে। সহসা খুব বয়স্ক লাগে গোরাচাঁদকে। খুবই পরিণত বলে মনে হয়। শরীরের মধ্যেকার যাবতীয় উথালপাথাল ঢেউগুলিকে শান্ত করবার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যায় অগ্নি। গোরাচাঁদের দৃষ্টির থেকে নিজেকে আড়াল করতে গোরাচাঁদকেই প্রাণপণে টেনে নেয় বুকে। বুকের মধ্যে ওকে সজোরে চেপে ধরে হু হু করে কেঁদে ওঠে।

বুদ্ধদেবের পেছনে টিকটিকি

ঘুরঘুট্টি নিশুত রাতে মানিকভাসার চাকের আলপথ ধরে নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে বুদ্ধদেব।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। আকাশে পাতলা মেঘ। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর আধখাওয়া চাঁদ সেই মেঘের আড়ালে প্রায় ডুবে গিয়েছে। সারা সন্ধে গুমোট ছিল। রাত বাড়তেই শনশন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এখন, মাঝমাঠে, উথালপাথাল হাওয়া।

একখানি দু'ব্যাটারির টর্চ রয়েছে বুদ্ধদেবের হাতে। ব্যাটারিগুলো পুরোনো। টিমটিমে আলো। পায়ের তলায় সেই আলো ফেলে ফেলে শম্বুক গতিকে এগিয়ে চলেছে বুদ্ধদেব। তার দু'কাঁধে দুটো ঠাসবোঝাই কাপড়ের ব্যাগ। ডানহাতে একখানা লাঠি।

লম্বা লম্বা ঘাসে-ঝোপে ভরে গিয়েছে আলগুলো। হাঁটু অবধি ডুবে যায় ঘাসের জঙ্গলে। পাগল শিকারি বলে, এই সব ঘাসের মধ্যেই নাকি সংসার পাতে খরিশ আর বাঁশমুগরা সাপেরা। আচমকা ওদের শরীরে পা পড়লে আর দেখতে হবে না। বুদ্ধদেব আগে আগে লাঠিখানা আছড়াচ্ছে সমানে। খস্‌খস্‌ আওয়াজ উঠছে আশেপাশে। থপ্‌থপ্‌ শব্দে সোনা ব্যাঙগুলো লাফিয়ে পড়ছে ক্ষেতের মধ্যে।

আলের দু'ধারের জমিতে ধানের চারাগুলো সবেমাত্র সবুজ রঙ ধরেছে। চারাগুলোর মাথা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে হাওয়া। জমিগুলোতে সামান্য জল, থিকথিকে কাদা। চারপাশের গাঁগুলো নিঃশব্দে ঘুমোচ্ছে। হরিণমুড়ির দিক থেকে ভেসে আসছে দলবদ্ধ শেয়ালের ডাক। বত্রিশভাগীর জঙ্গলে থেকেথেকে ডেকে উঠছে হুঁড়ারের দল। সামনে, চার আলের সঙ্গমস্থলে, একটা ঝাকড়া মউল গাছ। তার তলায় জমাট অন্ধকার। গাছের ডালেডালে পাখি-পাখালের বসবাস। মাঝে মধ্যে কুঁচকুঁচ করে ডেকে উঠছে ওরা। অন্ধকারে বড় একটা নজর চলে না যখন, তখন কানদুটো বেশি মাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব হাঁটছিল আর দু'কান দিয়ে শিকার করছিল- চারপাশের যাবতীয় স্পষ্ট অস্পষ্ট আওয়াজ।

সহসা বুদ্ধদেবের মনে হয়, পেছনে কেউ অনুসরণ করছে ওকে। যেন কার অস্পষ্ট পায়ের আওয়াজ, পেছনে। বুদ্ধদেব থমকে দাঁড়ায়। পেছন ফিরে তাকায়। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। জমির আলগুলোতে এখানে ওখানে পাথরের চাঙড়, কোথায় কোথাও ভরাট উই ঢিবি। অন্ধকারে বসে থাকা, মানুষের আকার নেয় ওগুলো। বুদ্ধদেবের মনে হয়, ক্ষেতের মধ্যে এখানে ওখানে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে কিছু মানুষ। কিন্তু বুদ্ধদেব জানে, ওগুলো মানুষ নয়। পাথরের চাঙড় অথবা উইঢিবি। একটু আগেই ওদের দু'একটাকে সন্তর্পণে পেরিয়ে

এসেছে সে। তাও এক-আধটার ওপর টর্চের আলো ফেলে নিশ্চিত হতে চায় সে। পায়ের আওয়াজখানা থেমে গেছে। বুদ্ধদেবের মনে হয়, নিছকই মনের ভুল। নিশুত রাতে শুনশান মাঠের মধ্যে অসংখ্য নিশাচর প্রাণী খাদ্য সংগ্রহে বেরিয়ে পড়েছে। মাঠময় ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। ভাম, সাটনা, শেয়াল খরগোস, সাপ, ব্যাঙ...। কালোডানায় সাঁইসাঁই আওয়াজ তুলে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক বাদুড়। বুদ্ধদেব আবার হাঁটতে থাকে।

দু'পা এগোতে না এগোতেই পুনরায় পায়ের অস্পষ্ট আওয়াজ! বুদ্ধদেব থমকে দাঁড়ায় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো ফেলে পেছনে। ক্ষয়া ব্যাটারির টিমটিমে আলো বেশি দূর পৌঁছায় না। কিন্তু যতদূর পৌঁছায় তার মধ্যে কাউকেই দেখতে পায় না সে, অথচ, তার মনে হয়, পায়ের আওয়াজখানা অলীক নয়, ভরাট ঘাসের জঙ্গলে হাঁটলে যে রকম সড়সড় আওয়াজ ওঠে, ঠিক তেমনই আওয়াজ একটু আগেই শুনতে পেয়েছে সে। মানুষ, নাকি মনুষ্যেতর কোনও প্রাণী। শেয়ালেরা মানুষের পিছু নেয় না এভাবে। ওরা মানুষকে ভয় পায়। হুঁড়ারেরা সাধারণত জঙ্গলেই থাকে। ক্ষেতের মধ্যে একেবারে নিশ্চিত শিকারের সন্ধান না পেলে, ওরা সাধারণত আসে না। এলেও সর্বদাই দল বেঁধে আসে। এটা পাকা মউলের মরসুমও নয় যে মউলতলাটাকে নিশানা করে ভালুক আসতে থাকবে ওর পেছন পেছন। তবে? বুদ্ধদেবের ভয় করে। শহরের ছেলে সে। আজীবনকাল কংক্রিটের জঙ্গল আর বিজলি বাতিতে অভ্যস্ত। রাঢ়ভূমির ডাঙা-ডহর নদী-ক্ষেত ও জঙ্গলের সঙ্গে তার অল্পবিস্তর পরিচয় ঘটলেও এমন দুঃসাহসিক নৈশ অভিযান তার জীবনে এই প্রথম। গভীর নিশাকালে রাঢ়প্রকৃতির এমন ভয়াল রূপ তার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। আলের ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে দু'চোখ দিয়ে চারপাশটাকে ছিন্নভিন্ন করবার চেষ্টা চালায় বুদ্ধদেব। মনের মধ্যে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। এক অপরিচিত অলৌকিক জগতের বাসিন্দা বলে মনে হয় নিজেকে। পায়ের শব্দটা আবার থেমে গেছে। বুদ্ধদেবের মনে হয় পুরোটাই ওর কানের ভুল। মনের বিভ্রম। পায়ে পায়ে ফের হাঁটতে থাকে। এক সময় মউল গাছটার কাছে এসে থামে। এতক্ষণে সাইডব্যাগের ভেতরে হাত ঢোকায় সে। বের করে আনে মুঠোভর্তি হাড়ের গুঁড়ো, ইউরিয়া। ছড়িয়ে দেয়, একে একে, চারপাশের জমিগুলোর এক-একটি কোণে। ততক্ষণে মন থেকে অচেনা ভয়টা কখন জানি উধাও হয়ে গেছে। বুদ্ধদেব মউল গাছটার চতুর্দিকে পাক খেতে থাকে। মুঠো মুঠো হাড়ের গুঁড়ো আর ইউরিয়া ছড়িয়ে দিতে থাকে চারপাশের জমিগুলোর কোণ ঘেঁসে। একটু একটু করে বৃত্তখানি বাড়াতে থাকে সে। একটু একটু করে নিঃশেষ হতে থাকে ব্যাগের সার। একটু একটু করে গাঢ় হতে থাকে রাত। কী এক নেশার ঘোরে বুদ্ধদেব একটু একটু করে তলিয়ে যেতে থাকে। রহস্যময় প্রকৃতির একটা অংশ হয়ে যায় সে।

প্রায় আধঘন্টাটাক বাদে সে যখন গাঁয়ের দিকে পা বাড়ায়, তখন মনের মধ্যে এক অচেনা পুলক। যেন ক্রন্দনরত শিশুর মুখে সে ভরে দিতে পেরেছে সুস্বাদু প্রাণরস। একটু বাদেই মিষ্টি স্বাদ পেয়ে যাবে বাচ্চাটার জিহ্বা। তখন তাৎক্ষণিক বিস্ময়ে থমকে থেমে যাবে কান্না। জিভ, ঠোঁট, টাকরা সক্রিয় হয়ে উঠবে। এক সময় বাচ্চাটা পুরোপুরি মজে যাবে মিষ্টি রসের মায়ায়। বাস্তবিক, দু'চার দিনের মধ্যেই ধানের শিকড়গুলো পেয়ে যাবে মাটির মধ্যে দ্রবীভূত বোনমিল আর ইউরিয়ার স্বাদ, শতশত মুখ দিয়ে চুষতে থাকবে রস। গাছের শরীর গাঢ় সবুজ হয়ে যাবে এক হপ্তার মধ্যে। গাছ হবে পুরুষ্ট। জমির মালিক অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করবে এই পরিবর্তন। কিন্তু

কিছুতেই কারণটা বোধগম্য হবে না তার। তখন, ধীরেসুস্থে, সুযোগ বুঝে, বুদ্ধদেব ফাঁস করে দেবে আসল রহস্য। নিজেকে খুব হালকা মনে হয় বুদ্ধদেবের। একটা গোপন যুদ্ধে জিতে যাওয়ার অনুভূতি। পেছনে রাধানগর গাঁ থেকে ভাদু গানের অস্পষ্ট সুর ভেসে আসছে হাওয়ায়। সেই সুরেলা বাতাসে স্নান করতে করতে বুদ্ধদেব এক সময় পৌঁছে যায় শালকাঁকির ডাঙায়।

ডাঙার পশ্চিম কিনারে একটা ঝাঁকড়া কুসুম গাছ। পায়ে চলা পথটি ঐ গাছতলা দিয়ে চলে গেছে চুয়ামসিনার দিকে। কুসুম গাছের সামান্য তফাতে পৌঁছে আচমকা বিষম চমক খায় বুদ্ধদেব। গাছের তলায় কেউ একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুদ্ধদেব থমকে দাঁড়ায়। দু'চোখ বিঁধিয়ে দেয় গাছের তলার অন্ধকারে এবং ষোলআনা নিশ্চিত হয়, একজন কেউ নির্ঘাৎ দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছের তলার অন্ধকারে শরীরখানিকে ডুবিয়ে। বুদ্ধদেবের সারা শরীর সহসা অচেনা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। কে বসে রয়েছে এত রাতে, এমন গাঁ-ছাড়া নির্জন জায়গায়! চোর-টোর, নাকি অন্য কেউ, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করছে কারোর জন্য! বুদ্ধদেবের জন্য নয় তো? এই ক'মাসে এই এলাকার এক শ্রেণীর মানুষের শত্রুতা অর্জন করে ফেলেছে সে। প্রথম দু'একমাস হরবল্লভ সিংহবাবু ওকে অনেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। যখন বুঝেছেন, বুদ্ধদেব শক্ত ধাতের মানুষ, এর-ওর কাছে মন্তব্য করেছেন, উয়াকে বুঝানো বেকার। অন্ধকে দর্পণ দান। উয়ার চোখ কুনোদিনো খুলবেক নাই। এবং তখন থেকেই ওর পিছু লাগতে শুরু করেছেন। নানাভাবে ওকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছেন। এমন কি মল্লিকা মারফত যতটুকু শুনেছে বুদ্ধদেব, খুন করে ফেলতে চেয়েছিলেন। বিডিও সাহেবের 'প্রফেশন্যাল কোড অফ্ কনডাক্ট' কিংবা অন্য কোনও সুক্ষ্মতর অঙ্ক বুদ্ধদেবকে সে যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গত কারণও রয়েছে। এই ক'মাসে হরবল্লভদের অনেক ক্ষতি করে ফেলেছে বুদ্ধদেব। কৃষিলোনের টাকাগুলো অহেতুক ফিরে গেছে। ফি-বছর পুরো বরাদ্দকৃত টাকা মজুর-কামিনদের নামে তুলে নিতেন হরবল্লভ। তারপর ঐ টাকা চড়া সুদে দাদন-কর্জ দিতেন এলাকার অভাবী মানুষদের। বুদ্ধদেবের কারণেই, এই প্রথম, সেই টাকা সিংহগড়ে ঢুকল না। হাঁস-মুরগী, গাছপালার বিলি-বিতরণ, কুয়া কাটানো, এলাকার যাবতীয় রিলিফ বিতরণ, মাটি কাটার কাজ, বুদ্ধদেব সব কিছু নিয়ে আপত্তি তুলেছে, অভিযোগ করেছে ব্লক অফিসে। ব্লকের লোকজনের মুখে মুখে ছড়িয়েছে সে সব কথা চতুর্দিকে। বিডিও সাহেবের দু'চারটে চোরা প্রশ্নের উত্তরও দিতে হয়েছে হরবল্লভকে, উদ্গত রোষকে কোনও গতিকে গিলে ফেলতে হয়েছে। নতুন ইনস্পেক্টরের কাছে গিয়ে যে ভুয়ো ছাত্রের ব্যাপারটা বুদ্ধদেবই জানিয়ে এসেছিল, হরবল্লভের সেটা আজ আর অজানা নেই। তার ফলে তিনপুরুষের বাঁধা মাইন্দারের ব্যাটা মাকুন্দ শিকারিকে ইস্কুল পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন হরবল্লভ। কনকপ্রভার জমিনগুলো জলের দরে বিকিয়ে যাচ্ছিল। হরবল্লভ অবশ্যি কিনছিলেন না, কিন্তু রতিকান্ত কিনছিল, নিকুঞ্জপতি কিনছিল, কামদেব দত্ত, মহাদেব কয়ালরা কিনছিল, সব চেয়ে বড় কথা, কনকপ্রভার মতো জ্ঞাতিশত্রুটি ধ্বসে যাচ্ছিল দ্রুত। বুদ্ধদেব আর দীপমালা মিলে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে চলেছে। কাজেই হরবল্লভের, হরবল্লভদের তো গোঁসা হবেই। সবচেয়ে বড় কথা, সিংহগড়ের শত্রুপক্ষদের সঙ্গে সর্বক্ষণ ওঠাবসা করে

বুদ্ধদেব হরবল্লভের প্রবল আত্মমর্যাদায়ও বড়সড় ঘা মেরেছে। সরকাবি যাবতীয় সম্পদ, সে মানুষই হোক অথবা সামগ্রীই হোক, সর্বদা সিংহগড়ের মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ থাকবার কথা। চিরকাল এমনটাই ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন হরবল্লভ। হাতের মুঠো থেকে পুবোপুরি বেরিয়ে গিয়ে বুদ্ধদেব হরবল্লভের সেই মালিকানাবোধে নিদারুণ আঘাত করেছে। সুকুমার আচার্যর নেতৃত্বে চারপাশে যে হরেক আন্দোলন গড়ে উঠেছে, খানাপুরী ভোজাবতের সময়ে যে এত মানুষ অফিসারদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, হরবল্লভের কোনই সন্দেহ নেই, এর পেছনে বুদ্ধদেবেরও প্রচ্ছন্ন উস্কানি ছিল। সব মিলিয়ে হরবল্লভ যে এই মুহূর্তে মোটেই স্বস্তিতে নেই, তিনি যে যে-কোনও উপায়ে বুদ্ধদেবের ক্ষতি করতে বদ্ধপরিপর সেটা বুদ্ধদেব ভাল করেই জানে। আর, মানুষকে জব্দ করবার সামন্ততান্ত্রিক উপায়গুলোও হরবল্লভের অচেনা নয়। থানা-পুলিশ আইন-আদালতের তোয়াক্কা না করে সামন্ত প্রভুরা চিরকালই ওদের নিজস্ব তরিকায় শত্রুপক্ষকে শাস্তি দিতে অভ্যস্ত। হরবল্লভের মানসিক গঠন গ্রামীণ সামন্তপ্রভুদের চেয়ে বেশি দূর এগোয় নি। এখনও, যে কোনও অজুহাতে পেশীশক্তির ওপরই এদের মান্যতা বেশি। শুধু হরবল্লভই নয়, বুদ্ধদেবের প্রতি সিংহগড়ের বিদ্বেষ একটু একটু করে চারিযে গিয়েছে এলাকার তাবৎ জোতদার ও সম্পন্ন মানুষের মধ্যে। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে এরা নিজেদের মধ্যে সাবাক্ষণ বাদ-বিসংবাদে মত্ত থাকলেও শ্রেণীগত শত্রুর ক্ষেত্রে ওরা চিবকালই এককাট্টা হয়ে যায়। ঝাড়েশ্বর নায়ক, মহাদেব কয়াল, প্রমথ গাঙ্গুলি, কামদেব দত্ত, —এরা এই মুহূর্তে সকলেই বুদ্ধদেবের ওপর খড়্গহস্ত। যে কোনও মুহূর্তে বুদ্ধদেবের চরম ক্ষতি করে দিতে ওরা তিলমাত্র কুণ্ঠিত হবে না। বিডিও সাহেবের সামান্য ধমককে এরা বেশিদিন গ্রাহ্য করবে, এমনটা মনে হয় না বুদ্ধদেবের। গাছের তলাকার ছায়ামূর্তিটিকে দেখে মুহূর্তে এতগুলি কথা চরে বেড়ায় মগজে, খুবই সন্ত্রস্ত বোধ করে বুদ্ধদেব। লক্ষ করে, লোকটি ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছের তলার অন্ধকার ঘেরাটোপে। ওকি একলা? নাকি গাছের তলার নিকষ আঁধারে গা লুকিয়ে রয়েছে আরও মানুষ? সহসা বুদ্ধদেবের ভেতর থেকে আকুল পরামর্শ আসে, আর এগোনো ঠিক হবে না। বরং পিছু হটতে হটতে দৌড় মারাই উচিত। বুদ্ধদেব যেমন চিনতে পারছে না লোকটিকে, লোকটিও নিশ্চযই অতখানি তফাতে দাঁড়িয়ে চিনতে পারে নি বুদ্ধদেবকে। আচমকা পেছনে দৌড় দিলে, বুদ্ধদেবেব পবিচয ওর কাছে অজানাই থেকে যাবে। নিজের এই নৈশ অভিযানের কথা পুবোপুরি গোপন রাখতে চায় বুদ্ধদেব। মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কারের বিরুদ্ধে গিয়ে যা সে করে বসল একটু আগে, গাঁয়ের মানুষ কোনও গতিকে জানতে পারলে তার প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হবে। এবং বুদ্ধদেব নিশ্চিত, যতই ইউরিয়া আর হাড়ের গুঁড়ো চালু করবার জন্য চাপ দিন বিডিও সাহেব, বুদ্ধদেব ঐ নিয়ে কোনও জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে গেলে, তিনি ওব পাশে তো দাঁড়াবেনই না, বরং সুযোগটাকে ব্যবহারও করতে পারেন। এখন তাই পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখতে চায় বুদ্ধদেব। হাড়ের গুঁড়ো আর ইউবিয়া ছড়ানো জায়গাগুলোতে অবশ্যই ধানের গাছগুলো অনেক বেশি পুষ্ট হবে। ঐ অংশে ফসলও ফলবে অনেক বেশি। তখন যদি এলাকার মানুষেব মধ্যে আন্তবিক কৌতূহলেব সৃষ্টি হয়, তবে না হয়

একটু একটু করে ভাঙা যাবে পুরো ঘটনাটা। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে একটু একটু করে পিছু হটছিল বুদ্ধদেব, ঠিক মুহূর্তে গাছের তলা থেকে ভেসে আসে পরিচিত কণ্ঠ, 'জমিনে সার ছড়ানো শেষ হইল্যাক?'

পাগল শিকারি!

বুদ্ধদেব থমকে দাঁড়ায়। টর্চের আলো ফেলে পাগল শিকারির ওপর। পাগল মিটিমিটি হাসছিল। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে বুদ্ধদেবের দিকে।

একেবারে কাছে আসতেই বুদ্ধদেব বলে, 'তুমিই তবে এতক্ষণ ধরে পিছু নিয়েছিলে?'

'লিব নাই?' অন্ধকারের মধ্যে কালবোস মাছের মতো নড়েচড়ে বেড়ায় পাগল শিকারি, 'নিশুত রাতে কুথায় চইলেছেন একলাটি, সাপ- খোপ, ভূত-পেরেত, বরা—হুঁড়ার, আমি ত ভয়েই আধমরা।'

'মাঠের মধ্যেই সাড়া দিলে না কেন?'

'বা-রে! আপনি লুকাঁই লুকাঁই সার ছড়াচ্ছেন, আমি কেন সাক্ষী থাকি আপনার কাজের?'

'সাক্ষী তো রইলেই।'

'আমি কিছোই দেখি নাই।' আধো অন্ধকারে রহস্যময় হাসে পাগল শিকারি।

বুদ্ধদেব ঘনিষ্ঠ হয়। বলে, 'কথাটা কাউকেই যেন বলো না পাগলদা।'

'তায় কখনো বলি?' পাগল শিকারি অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে, 'কিন্তু আমার উই কথাটার কী হইল্যাক?'

'কোন কথা?'

'উই যে, সুধন্য নামটার মানে?'

বুদ্ধদেবের মনে পড়ে যায় সেই আলাপ-পরিচয়ের মুহূর্ত থেকেই পাগল শিকারি সমানে শুধিয়ে চলেছে কথাটা। সুধন্য নামের মানে কি?

বুদ্ধদেব প্রতিবারেই বলেছে, পরে বলব। আজ একেবারে নাছোড়বান্দা মনে হল পাগলকে। গলায় রাজ্যের ক্ষোভ জড়ো করে বলে, 'আপনারা পড়ালিখা মানুষ, একটা কথার মানে যদি নাই বইল্‌তে পারেন—।' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল পাগল শিকারি, ঠিক সেই মুহূর্তেই পাশের উই ঢিবিটার আড়ালে অস্পষ্ট আওয়াজ ওঠে। বুদ্ধদেব ঝটিতি টর্চের আলো ফেলে ঢিবির ওপর। এবং দেখতে পায়, একজন মানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাচ্ছে চুয়ামসিনার দিকে।

লোকটার দিকে পলকহীন তাকিয়ে ছিল পাগল শিকারি। অস্ফুটগলায় বলে, 'ইন্দ্র বাগদি।'

'ইন্দ্র বাগদি!' বুদ্ধদেবের দু'চোখে গাঢ় বিস্ময়।

পাগল শিকারি অন্ধকারে হাসে। বলে. 'আপনার পিছে অনেকদিন ধরে টিকটিকি লেইগেছে রামসেবকদা। সাবধান।'

অগ্নির চোখে জল

সেবার চুয়ামসিনা গাঁয়ে বাবা কপিলেশ্বর শিবের গাজনের মেলাটা জমেছিল দারুন। আর সেই মেলাতেই অগ্নির নতুন করে বোধোদয় ঘটেছিল, মানুষ যে পথেই হাঁটুক না কেন তার কপালখানাও সঙ্গে যায়।

গাজনের দিন-পনের আগে থেকে কপিলেশ্বরের মন্দিরের সামনে নিয়ম করে রামায়ণ-গান চলেছিল রোজ সন্ধ্যায়। ভক্তরা গোল হয়ে বসতো। গায়েনরা সুর করে গাইত রামায়ণের গান। গাঁয়ের বুড়া-থুড়া, ধর্মপ্রাণ মানুষজন অনেকরাত অবধি ভক্তিভরে শুনেছে সেই গান।

গেল-রাতে 'কামাখ্যা তোলা'র কাজও শেষ হয়েছে নির্বিঘ্নে। আশুতোষ সর্দার হল পাটভক্তা। জনা কয়েক ভক্তাকে সঙ্গে নিয়ে সে রাতের আঁধারে চুপিচুপি চলে গিয়েছিল হাজরাপুকুরে। তার সঙ্গে ছিল নতুন মাটির কলসী। ডুব দিয়ে সিনান করেছিল ভক্তারা। আশু সর্দার কলসীসহ ডুব দিয়েছিল জলে। শেষ ডুবে কলসীখানি ভরে নিয়ে মাথার ওপর নতুন গামছা বিছিয়ে ঐ জলভরা কলসীখানি বসিয়ে দিয়েছিল তার ওপর। তারপর নিঃশব্দে ফিরে এসেছিল গাঁয়ে। গাঁয়ের মুখে দাঁড়িয়েছিল হীরালালের ব্যান্ড পার্টি। ঢাক-ঢোল-সানাই-লাকড়া...। দাঁড়িয়েছিল গাঁয়ের বহু মানুষ। গাঁয়ে ঢুকেই বোল দিল আশু সর্দার। বাবা—কপিলেশ্বর—মাহাদেব—। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠেছিল বাদ্যি। সারা গাঁয়ের প্রতিটি মানুষ যে যার ঘরে শুয়েই বুঝেছিল, কামাখ্যা তোলা সাঙ্গ হল।

ব্যাণ্ডপাটি এবং শোভাযাত্রা সহকারে কপিলেশ্বরের মন্দিরের সামনে পৌঁছে যায় ভক্তারা। আশু সর্দার মাথায় কলসী নিয়ে ঢুকে যায় মন্দিরের ভেতর। বাবা কপিলেশ্বরের মাথার ওপর একখানা পাটের শিকে ঝুলছিল। ঐ শিকের মধ্যে কলসীটা বসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে। এ বড় পবিত্র জল। গাজনের শেষে বিলোনো হবে। দূর দূরান্তের কত মানুষ এই জল নিয়ে ফিরে যাবে যে যার গাঁয়ে। যত্ন করে রাখবে। এ জলের অশেষ গুণ। চৌষট্টি রোগ ভাল হয়!

গতকাল এ সব পাট চুকেছে। আজ সারাদিন গাজন। এমন কি রাতের বেলায়ও রাত-গাজন।

বাতাসীকে সঙ্গে নিয়ে পড়ন্ত বিকেলে অগ্নি গিয়েছিল মেলায়। ওদের সঙ্গে তিলকও ছিল।

জমে উঠেছে গাজনের মেলা। ভক্তারা উপোস করে রয়েছে দিনভর। পরনে হলুদ বসন। হাতে বেতের ছড়ি। গলায় শালফুলের মালা। মাথায় শালফুলের মুকুট। কারো কারো গলায় পাকানো বেতের মালা। চার পাশের গাঁ থেকে মাথায় মালসা নিয়ে আসছিল অনেকে। মালসার মধ্যে ধিকিধিকি জ্বলছিল শালকাঠের আগুন। মাঝে মাঝে ঐ আগুনে ধুনো ছুঁড়ে মারলেই দাউদাউ জ্বলে উঠছিল। এক ধরনের মানসিক শোধের ব্যাপার এটা। কী কারণে মানত করেছিল, কে জানে! দণ্ডী কেটে কেটে মানুষ আসছে বহু দূরের গাঁ-গঞ্জ থেকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পরমুহূর্তে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ছে। আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে, আবার সাষ্টাঙ্গ শয়ন। শয়নদণ্ডী। শুয়ে পড়েই দু'হাত টানটান করে দেয় সামনের দিকে। একজন পাশে পাশে হাঁটে বেতের ছড়ি নিয়ে। শুয়ে পড়ামাত্রই হাতের শেষ কিনারে বেত দিয়ে আকচিরা কেটে দেয়।

মানুষটি উঠে পড়েই ঐ দাগের ওপর গিয়ে দাঁড়ায়। আবার সাষ্টাঙ্গে শয়ন। চারপাশের গ্রামগুলো থেকে এমন কি বহু দূরের গাঁ-গঞ্জ থেকে বিভিন্ন পথ দিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকছে এরা। একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে বাবা কপিলেশ্বরের মন্দিরের দিকে। শয়ন-দণ্ডী ছাড়াও গড়ান্-দণ্ডী কাটতে কাটতেও এগিয়ে চলেছে বহু মানুষ। চিৎ থেকে উপুড়, আবার চিৎ, আবার উপুড়, ক্রমাগত পাল্টি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে মন্দিরের দিকে। রাঢ়ের কল্লাচ মাটি চৈত্রের অগ্নিবর্ষণে তেতেপুড়ে লাল। রাস্তার বালি, কাঁকর, মোরাম যেন আগুনের শ্লথগতি স্রোত। ঐ স্রোত দিয়ে পাল্‌টি খেতে খেতে, ঘসটাতে ঘসটাতে সারা অঙ্গে তীব্র জ্বলন, ফোস্কা পড়েছে এখানে ওখানে, ছড়ে-কেটে রক্ত ঝরছে। কিন্তু সেদিকে তিলমাত্র হুঁশ নেই, বোধি-বোধিশূন্য নির্বিকার মুখগুলি। শেষ বাত থেকে শুরু করেছে দণ্ডী কাটা, কেউ কেউ গতকাল সন্ধে থেকে। সারা রাত সমানে দণ্ডী কেটেছে। সারা সকাল, দুপুর..। কিন্তু তারজন্য কোনও আলাদা শ্রান্তি নেই মুখে। শুধু এক তীব্র আকুলতা, কখন পৌঁছব বাবা কপিলেশ্বরের থানে। কখন দর্শন পাব উঁয়ার। কখন। কখন।

দেখতে দেখতে সারা শরীর শিউরে ওঠে অগ্নির। আড়চোখে তিলকের দিকে তাকিয়ে নেয় এক ঝলক। তিলকও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে দণ্ডী-কাটা মানুষগুলোর দিকে। বিড়বিড়িয়ে বলে, গত জনমে কী না কী পাপ কইরেছিল্যাক, এ জন্‌মে তার প্রাচিত্তির কইর্‌ছে'

বিকেল গড়াতেই শুরু হল চড়কের উড়া। একটা লম্বা শালকাঠের পোতের ওপর আড়াআড়ি আর একটি শালবোল্লাকে শক্ত কবে বাঁধা হয়েছে রশি দিয়ে। বাঁশ দিয়ে ধাপে ধাপে বাঁধা হয়েছে সিঁড়ি। সিঁড়িখানি শেষ হয়েছে একেবারে শালপোতের চূড়োয়, একখানি মাচানের গায়ে। সিঁড়ি বেয়ে উড়া-ভক্তারা উঠে যাচ্ছে মাচানে। সেখানে তাকে শক্ত করে বাঁধা হচ্ছে আড়াআড়ি শালবোল্লার একপ্রান্তে। তার পায়ে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে থোকা থোকা ঘুঙুর। শালবোল্লার অপর প্রান্ত থেকে লম্বা রশি নেমে গেছে তলা অবধি। ঐ রশি ধরে শালবোল্লাখানিকে ঘোরানো হচ্ছে চারপাশে, আর তাতেই অপর প্রান্তে উড়া-ভক্তা শূন্যে ঘুরছে। ঘুরছে, দু'হাত মুখের কাছে এনে সজোরে কুলকুলি মারছে, ঘুঙুর পরা পা দু'খানি সজোরে ঝাঁকাচ্ছে। তার হলুদ বসন বাতাসে উড়ছে। সে তার গলায় পরে থাকা মালা থেকে ফুল ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে আকাশে। হাওয়ায় উড়তে উড়তে সে ফুল ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। তলায় দাঁড়িয়ে থাকা কাতারে কাতারে মানুষ পাগলের মতো ধরতে চায় সেই উড়ন্ত ফুলের একটিমাত্র পাপড়িকে। ঠেলাঠেলি, দৌড়োদৌড়ি চলে অবিরাম। এইভাবে কোনও গতিকে কেউ যদি পেয়ে যায় এক টুকরো পাপড়ি তো অতি সাবধানে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে রাখে, কেন কি, উড়া-ভক্তার শরীর থেকে ঝরে পড়া ফুলের অশেষ গুণ। ভিটায় রাখলে ভিটা শুদ্ধ হয়। রোগজারি হয় না। বেদনা-ওঠা পোয়াতির মাথায় ঠেকিয়ে দিলে নির্বিঘ্নে প্রসব হয়। খুবই শুদ্ধ পবিত্র বস্তু ওটা।

তিলক তত্‌ক্ষণ থেকে এক টুকরো উড়ন্ত ফুল ধরবার চেষ্টা করে যাচ্ছিল বারংবার। ঐ করতে করতে দু'বার ধাক্কা খেল অন্যের সাথে। হাওয়ায় ভাসন্ত ফুলের নাগাল পাওয়ার উদ্দেশ্যে পেছতে পেছতে কাঁটাবেড়ায় পড়েছে একবার। অবশেষে এক-টুকরো ফুল করায়ত্ত হয়েছে তার। ফুলখান' হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে সে বীরের মতো হাসতে হাসতে ফিরে আসে অগ্নিদের কাছে।

অগ্নি ফিকফিক করে হাসছিল, 'বাব্বা, উড়া-ফুলের লেইগে অত। দেখি।'

তিলক মুঠো খোলে। টুকরো নয়, প্রায় একটা আস্ত শালফুল। অগ্নি দেখে।

উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তিলকের সারা মুখ। বিশ্বজয়ীর হাসি হাসতে থাকে অগ্নির দিকে তাকিয়ে। মুঠোখোলা হাতখানা ফুলশুদ্ধ এগিয়ে দেয় অগ্নির দিকে।

'কি ?' অগ্নি ডাগর চোখে তাকায়।

'লাও।' তিলক উদার হাসে।

সহসা অগ্নির সারা মুখে এক ধরণের পরিবর্তন আসে। লজ্জায়, সঙ্কোচে, কপট রাগে ঘনঘন বদলে যেতে থাকে সে মুখের রঙ। সে জানে, ঠাকুর-দ্যাবতার ফুল কোনও ছেইলা যদি দেয় কোনও মেয়াকে, তো তার মানেটা কী দাঁড়ায়। অস্ফুট গলায় অগ্নি বলে ওঠে, 'না।'

'ক্যানে?' তিলক যেন জেদী হয়ে ওঠে, 'দিচ্ছি, লাও।'

'আমি এ ফুল লিয়ে কী কইর্‌ব? 'বলতে বলতে ঠোঁটজোড়া অজান্তে কেঁপে কেঁপে ওঠে অগ্নির।

তিলক নাছোড়বান্দা। দামাল হয়ে উঠেছে ইদানীং। অগ্নির ওপর জোব খাটাতে চায় কথায় কথায়। অগ্নির কথা কানেমাত্র না তুলে সে একরকম জবরদস্তি ফুলটি গুঁজে দেয় তার ডান হাতে। ফুল হাতে নিয়ে পাথব হয়ে যায় অগ্নি। থির পলকে তাকিয়ে থাকে তিলকের দিকে। চোখের কোণা অজান্তে চিকিয়ে ওঠে। পরক্ষণে ঠোঁটের ডগায হাসি ফোটায় সে। ফুলটি শাড়ির খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে খুব অস্ফুট গলায় বলে, 'সব কিছোতেই গুণ্ডামি।'

ভিড়েব মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছে বাতাসী। এতক্ষণে হুঁশ হয় অগ্নিব। ইতিউতি খুঁজতে থাকে। তিলক বলে, 'যাগ্‌গা। একলা ঘুরুক। তুমার পিছে পিছে ঘুইরে উয়ার কুনো মজা আছে?'

'আরে, সে কথা লয়।' অগ্নি উচাটন হয়, 'পইসাপাতি কিচ্ছোটি লিল্যাক নাই যে। কিছো কিনে খেইতে ইচ্ছা হইলে—?'

তখন সন্ধে হয় হয়। পাটে বসেছেন সূয্যিদেব। বেলা লি-লি। চাকি ডুবুডুবু। পাখ-পাখাল ঘরে ফিরছে। তিলক অগ্নিকে নিষ্পলক দেখছিল। অগ্নির উচাটন ভাবখানি তাকে একেবারে মোহিত করে তোলে। হাতখানি আলতো ধরে অগ্নির। বলে, 'হু-ই বাণ ফুঁড়ার পাশে বয়েছে লির্ঘাৎ। চল, যাই।' যেতে যেতে বলে, 'উখ্যেনে না থাইক্‌লে রাত-গাজনের থানে অবশ্যই মিলবেক উয়াকে।'

তিলকের ধরে থাকা হাতখানিব দিকে আড়চোখে এক ঝলক তাকায অগ্নি। পবক্ষণেই চোখ রাখে তিলকেব মুখের ওপর। ভ্রূ-সঙ্গমে তীক্ষ্ণ ভাঁজ ফেলে তীব্র দৃষ্টিতে তাকায। ঠোঁট জোড়া থরথরিযে কাঁপতে থাকে রোষে। তিলক বুঝি অস্বস্তি বোধ করে অগ্নির রুদ্ররূপ দেখে। আলগোছে ছেড়ে দেয় হাতখানা। অগ্নি তাও সরায না চোখ। তিলকের মুখের ওপর দৃষ্টিখানি একটু একটু কবে পুঁতে দিতে থাকে। তিলক সামান্য যন্ত্রণা বোধ করে। দু'চোখে পলক পড়ছিল না অগ্নির। মণিজোড়াও স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল একঠাঁই। নাকেব পাটা ফুলে ফুলে উঠছিল। তিলক ভয় পেয়ে যায়।

সহসা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে অগ্নি। হাসতে হাসতে সামনে পেছনে দুলতে থাকে উৎফুল্লা সর্পিণীর মতো। হকচকিয়ে যায় তিলক। বোকা বোকা হাসতে থাকে সে-ও।

বহুকষ্টে হাসি থামিয়ে অগ্নি বলে, 'আবে, খুড়ি তুয়ার তরে মেয়া দেখছে, তুয়ার খিয়াল নাই সিট্যা?' বলতে বলতে ফের হাসতে থাকে অগ্নি।

তিলক ততক্ষণে অনেকখানি সামলে নিয়েছে। এবার অগ্নির হাতখানিকে শক্ত করে ধরে। বলে, 'ইদিগ মদো-মাতালের ভিড় বাড়ছে। চল, উদিগ যাই।'

তিলকের টানে টানে বাধ্য মেয়ের মতো হাঁটতে শুরু করে অগ্নি।

বাগলাপুকুরের পাড় ধরে, মানুষজনের ভিড় বাঁচিয়ে হাঁটছে দু'জনে। খানিক আগেই এই পুকুর থেকে 'পাট' তোলা হয়েছে। দিনের বেলায় ভক্তারা পুকুরের 'গাবায়' ফেলে এসেছিল একটি পাঁচ-হাত লম্বা পাটাতন। তার শরীরে অসংখ্য গজাল পোঁতা। রাতের বেলায় পুকুর থেকে পাটাতনটি তুলে মাথায় নিয়ে ওরা নাচতে নাচতে ফিরেছে। ভক্তারা জিভে বাণ ফুঁড়েছে এই পুকুরের পাড়েই। পাটাতনটিকে নাট-মন্দিরে রেখেছে ওরা। আগামীকাল এখানে 'পাট-ঝাঁপ' হবে। ভক্তারা ঝাঁপ দেবে গজালের ওপর।

বাতাসীকে একযুগ বাদে খুঁজে পায় অগ্নি। সে ছিল বান-ফুঁড়ার কাছে। এতক্ষণ বাদে খুঁজে পেয়েও হামলে পড়ে না সে। বান-ফুঁড়ায় মজে গিয়েছে। অগ্নি বোঝে।

পিঠের চামড়া ফুটো করে তার মধ্যে নারকোল-দড়ি সেঁধিয়ে দিয়েছে। এক দড়িতে দশ-বার জনা। দু'পাশে দড়ি ধরে খাড়া রয়েছে দু'জন। খিঁচে রেখেছে দড়িখানি। ওরা সমবেত নাচছে। ওদের সামনে ঢাক-ঢোল-লাকড়া বাজাচ্ছে ঢাকিরা। বাদ্যির তালে তালে উদ্দাম নাচছে ওরা। দড়িতে বারংবার ঘসা খেতে খেতে ফুঁড়ুনির জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে নাগাড়ে। পিঠ দিয়ে গড়িয়ে নামছে নিচে। দেখতে দেখতে গা গুলিয়ে ওঠে অগ্নির। ঐ দলে হঠাৎ ও রয়েছে। হঠাৎ-এর সঙ্গে চোখাচোখি হয় অগ্নির। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর কোনই হুঁশ নেই। অগ্নিকে সে চিনতেই পারে না। কী এক ঘোরের মাথায় নেচে চলেছে তালে তালে।

সামান্য তফাতে দু'বাহুতে দুটো লোহার শিক গেঁথে নাচছে বজ্র লোহার। জিভে লোহার তার ফুঁড়েছে পরশুরাম বাউরি। ঝরঝরিয়ে রক্ত ঝরছে। কোনও হুঁশই নাই সেদিকে। ওদের ঘিরে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে শয়ে শয়ে মানুষ। বাতাসীর পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ায় অগ্নি আর তিলক। দেখতে থাকে বান-ফুঁড়া লাচ। মানুষগুলো বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়ে নেচে চলেছে।

দৃশ্যখানা ভাল লাগছিল না অগ্নির। এক সময় বাতাসীর মাথায় হাত ছোঁয়ায় সে। 'দেখবি, না যাবি?' 'বাতাসী মাথা সরিয়ে নেয়। যাবে না। অগ্নি নরম গলায় বলে, 'খাবি নাই কিছো? পইসা লিবি?'

বাতাসী থেকে যায়। তিলক আর অগ্নি বেরিয়ে আসে বাইরে। ততক্ষণে বাগলীপুকুরের পাড় ঘেঁসে শুরু হয়ে গিয়েছে রাত-গাজনের মহড়া।

রাত-গাজন জমে উঠেছে বাবা কপিলেশ্বরের থানে। পঞ্চাশ-ষাটজন ভক্তা উপস্থিত। সারাদিন উপোসী রয়েছে ওরা। পরণে গেরুয়া-হলুদ ছৈতা। গলায় শালফুলের মালা। মাথায় শালফুলের মালা দিয়ে বানানো পাগড়ি। কারও কারও গলায় বেতের পাকানো মালা। হাতে বেতের দণ্ড। নাচতে নাচতে সবাই এগিয়ে চলেছে বাবা কপিলেশ্বরের মন্দিরের দিকে। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাজছে ঢাক, ঢোল, ধুমসা, লাকড়া, সানাই, কাঁসি। বাজি পুড়ছে হরদম। দশ-বারোটা মশালের আলোয় মানুষগুলোকে অলৌকিক অশরীরী লাগে।

মশালই জ্বলছে রাত-গাজনের থানে। সেটাই রীতি। অন্য কোনও আলো জ্বালানো নিষেধ। স্বয়ং বাবা কপিলেশ্বরই নিষেধ করেছেন।

এবারে প্রভঞ্জনের নেতৃত্বে ক্লাবের ছেলেরা জেদ ধরেছিল, গাজনের থানে হ্যাজাক জ্বালাবে। শুনে হাঁ-হাঁ করে ওঠেন মুরুব্বির দল। কেন কি, বহুকাল আগে, তখন দেশে সদ্য হ্যাজাক এসেছে, চুয়ামসিনার ছেলে-ছোকরারা বিষ্ণুপুর থেকে হ্যাজাক আনাল ভাড়া করে। মুরুব্বিরা মানা করেছিলেন অনেক। অবোধ ছোকরার দল শুনল না। সে দলে হরবল্লভও ছিলেন। খুব একটা বাধা সেই কারণেই দিতে পারে নি চুয়ামসিনার মানুষ। হ্যাজাক জ্বলল। রাত-গাজন হল সেই আলোয়। ফলটা ফলেছিল হাতেনাতে। সে বছর বাবার কোপে চুয়ামসিনা গাঁয়ের প্রায় আধখানাই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সেই প্রথম, সেই শেষ। এখন মশালই জ্বলে রাত-গাজনের থানে।

মন্দিরের থেকে সামান্য তফাতে বসেছেন কথক ঠাকুর। বাবা কপিলেশ্বরের মহিমা কীর্তন করছেন তিনি। কোনও এক কালে চুয়ামসিনা গাঁয়ে ঘোষেদের বাড়িতে এক কপিলা গাই ছিল। রোজ চরতে গিয়ে উধাও হয়ে যেত গাইটা। সবার চোখ এড়িয়ে একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত ঠায়। তখন হাজার খোঁজাখুঁজি করেও গাইটাকে খুঁজে পেত না কেউ। খানিকবাদে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলেই সবাই দেখতে পেত ওকে। বাগালরা চোখে চোখে রাখল ওকে নাগাড়ে ক'দিন। একদিন গাইটা ঝোপের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বাগালরাও পা টিপে টিপে সেখানে গিয়ে হাজির। দেখে, ঝোপের মধ্যে একখানা প্রাচীন উইঢিবি। ওর ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে গাইটি। তার বাঁটের থেকে অঝোর ধারায় দুধ পড়ছে ঢিবির ওপর। বাগালদের চোখে পলক পড়ে না। তৎক্ষণাৎ দৌড় লাগায় তারা। গ্রামে গিয়ে খবর দেয়। খবর পেয়ে সারা গাঁ ধেয়ে আসে। উইঢিবিখানা খোঁড়া হয়। খানিক বাদেই বেরিয়ে পড়ে এক শিব-লিঙ্গ। শিবলিঙ্গের চারপাশের মাটি খুঁড়তে থাকে গ্রামের মানুষ। যতই খোঁড়ে ততই বেরোয় লিঙ্গর শরীর। একেবারে গহীন পাতাল অবধি পৌঁছে গিয়েও লিঙ্গর অন্ত মেলে না। বিধি-নিয়ম মেনে লিঙ্গটিকে প্রতিষ্ঠা করে চুয়ামসিনার মানুষ। কপিলা গাইয়ের নাম অনুসারে বাবার নামকরণ করে, কপিলেশ্বর। উইঢিবিখানা খুঁড়বার বেলায় লিঙ্গর গায়ে শাবলের ঘা পড়েছিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরেছিল লিঙ্গর শরীর থেকে। চুয়ামসিনার মানুষ স্তম্ভিত হয়ে প্রত্যক্ষ করেছিল সে দৃশ্য। রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল খানিক বাদে, কিন্তু দাগখানা আর মিলালো না। আজও লিঙ্গর গায়ে সেই দাগ দেখে শিহরিত হয় দূর দূরান্ত থেকে আসা ভক্তের দল।

কথক ঠাকুর সুর করে বর্ণনা করছেন বহু যুগ আগের সেই কাহিনী। সামনে বিশাল জমায়েত মন্ত্রমুগ্ধর মতো শুনছে আর মাঝে মাঝে দু'হাত জড়ো করে কপালে ঠেকাচ্ছে বাবা কপিলেশ্বরের উদ্দেশ্যে।

ইতিমধ্যে মন্দিরের সামনে আগুন-ঝাঁপের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ। পাশাপাশি দশ-বারো-খানা নালা কাটা হয়েছে। প্রত্যেকটা লম্বায় দশ-বারো হাত। কুচো শালকাঠ দিয়ে ভরে দেওয়া হয়েছে নালার বুক। আগুন দেওয়া হয়েছে কাঠে। ধিকিধিকি জ্বলছে। আগুন নিভে গেলে ঐ গনগনে তরল আগুনের নালা দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে পার হবে ভক্তার দল। বারবার পার হবে আগুনের নদী। অগুণতি মানুষ জমেছে সেখানেও। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে অলৌকিক দৃশ্যখানি প্রত্যক্ষ করবার অভিলাষে। ওদিকে, বাগদীপুকুরের ওপাড়ে গাজনের মেলা জমে উঠেছে। অগ্নি আর তিলক ভিড় ঠেলে পায়েপায়ে হাঁটা দেয় সেদিকে।

জমে উঠেছে গাজনের মেলা। ফুলুরি-তেলেভাজার দোকান অজস্র। তা বাদে, মিঠাই, পাঁপর ভাজা...। চা বানিয়ে বিক্রি করছে হরিহর তুঙ্গ। চুড়ি-কাঁটা-ফিতের দোকানও অনেক।

লোহার বঁটি, খুন্তি, ছানতা, বেড়ি, বড়বড় লোহার কড়াই, এনামেলের হাঁড়ি, ডেকচি, শিল-নোড়া...। লাল ধুলোয় ভরে গিয়েছে পুরো তল্লাট।

একটা চুড়ি-ফিতের দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সহসা থমকে দাঁড়ায় তিলক। এক জোড়া চুড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে নিঃশব্দে। জমিটা সোনালি, দুধারে গাঢ় লাল রঙের বর্ডার।

অগ্নি ঠোঁট টিপে হাসে, 'চুড়ি কী হবেক? পর্‌বি নাকি তুই?'

তিলক গম্ভীর মুখে তাকায় দোকানদারের দিকে। 'কত দাম হে?'

'দু'আনা।'

চুড়িদুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অগ্নির দিকে তাকায় তিলক, 'রঙটা ক্যামুন?'

'রঙ তো ভালই। সোনার পারা বরণ, দুধারে লাল সূতার মতোন বেড়। বেশ খুইলেছে। কিন্তু পরবেক কে?'

তিলক সহসা অগ্নির ডানহাতখানি টেনে নেয়। 'দেখি, এ চুড়ি তুমার হাতে ক্যামুন লাগে?'

কিন্তু অগ্নি বিস্মিত হওয়ারও সময় পায় না। তার আগেই তিলক ওর হাতে পরাতে শুরু করে চুড়িখানা।

সারা শরীর শিরশির করছিল অগ্নির। কিন্তু বাধা দেবার কথাটা ভুলেই যায় সে। তিলক হাতে হাত ছোঁয়াতেই অগ্নির চোখে জল।

কুমীরের প্রণয় পর্ব

দুপুর নাগাদ কথাটা কানে আসে বুদ্ধদেবের। হঠাৎ মুর্মুই বয়ে আনে খবরখানা। চুয়ামসিনা ও লোখেশোলের তাবৎ সম্পন্ন মানুষ আজ সন্ধেয় জড়ো হবে সিংহগড়ে। আজ সারা সকাল প্রভঞ্জন দলবল নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে দুটো গাঁয়ের চাষীদের ঘরে ঘরে। বুদ্ধদেব আর মকবুল শেখ যে সাঁট করে গোপনে রাতের অন্ধকারে এই এলাকার প্রায় সব জমিনে গরুর হাড়ের গুঁড়োজাতীয় নিষিদ্ধ সামগ্রী ছড়িয়ে দিয়েছে, এই খবরখানা ওরা তুলে দিয়ে এসেছে প্রতিটি মানুষের কানে। শুনেই মানুষজন তাৎক্ষণিকভাবে উত্তেজিত। বেলা যতই বেড়েছে, উত্তেজনার পারদখানি ততই চড়েছে। শুধু যে সম্পন্ন মানুষজন তাই নয়, ছোটছোট চাষী, এমন কি গরীব বর্গাদাররাও এমন সর্বনাশা খবরে ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত। গরুর হাড়ের তুল্য নিষিদ্ধ বস্তু ত এ দুনিয়ায় আর কিছুই নেই। সেই হাড়ের গুঁড়ো থেকে রস শোষন করে যে ধান ফলবে, ঐ ধানের ভাত হিন্দু হয়ে কী করেই বা মুখে তুলবে ওরা! এ যে একেবারে মানুষের জাত-ধর্ম নিয়ে টানাটানি। আরো সর্বনাশের কথা এই যে, বাবা কপিলেশ্বর, মা সিংহবাহিনী, দশভূজা, রাধামাধব ও রাধাবল্লভ জীউর নামে যেসব দেবোত্তর সম্পত্তি রয়েছে, যে সম্পত্তির ধান থেকে সম্বৎসর ভোগ চড়ে এদের মন্দিরে মকবুলের সঙ্গে যোগসাজশ করে সেইসব দেবোত্তর জমিতেও নিষিদ্ধ সার ছড়িয়ে দিয়েছে বুদ্ধদেব নামক হটকারী ও অপরিণামদর্শী মানুষটি। এখন, প্রশ্ন হল, গরুর হাড়ের নির্যাস থেকে পুষ্ট হওয়া ধান থেকে ঠাকুরের ভোগ তৈরি করা যাবে কিনা? যে শোনে, সে-ই ভিজ কাটে। ঐ ধান থেকে ঠাকুর-দ্যাবতাকে ভোগ দিলে, গাঁয়ের চরম সর্বনাশ কেউ ঠেকাতে পারবেক নাই! প্রভঞ্জনরা ওদের ভয়টাকে আরও গাঢ় করে তোলে অন্য একটি সর্বনাশা সম্ভাবনার কথা উত্থাপন করে। বলে, যদি মনে কর, সব ধান বাজারে বিকে দিয়ে অন্য ধান কিনে লিবে,

সিট্যাও হবার লয়। চারপাশে যখন রটে যাবেক কথাটা, চুয়ামসিনা আর লোখেশোলের একদানা ধানও কিনবেক নাই আশেপাশের কোনও ধান-চালের ব্যাপারী। প্রভঞ্জনের কথাগুলো নিমেষের মধ্যে ক্রিয়া করতে শুরু করে মানুষের মগজে। দু'গাঁয়ের এত জমিনের ধান তবে পুরোপুরি অব্যবহার্য হয়ে যাবে। কী করে তবে বাঁচবে চাষীবাসীর দল। প্রভঞ্জনরা ভাবনাটাকে আরও উসকে দেয়। বলে, শুধু এ বচ্ছরের ফসলের কথা বল কেন? উই সব জমিন ঘি পুড়িয়ে শুদ্ধ না কইর্‌লে সামনের বচ্ছরের ফসলও কি মুখে তুলবেক মানুষ। এলাকার সমস্ত জমিনকে ঘি পুড়িয়ে শুদ্ধ করতে হবেক। সহসা চণ্ডাল রাগখানা উথলে ওঠে। উ শালা রামসেবককে কড়িকাঠে টাঙিয়ে জল-বিছাতি দিতে হবেক। এত এত জমিনের পুরা ফসলের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবেক উয়ার থিকে। ঘি-পুইড়্‌বার যাবতীয় খরচ-খরচা সব আদায় করতে হবেক। আর মকবুল মিএ্যাকে তার গুষ্টিসহ ঝাড়েবংশে নিকাশ কইর্‌তে হব্যেক। প্রভঞ্জনরা আয়োজনের কোনও ত্রুটি রাখে নি। সদাসর্বদা সঙ্গে রেখেছে ইন্দ্র বাগদিকে। সে ঘরে ঘরে গিয়ে জোরগলায় কবুল করেছে, রাইতের বেলায় ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে রামসেবকবাবুকে হাড়ের গুঁড়া আর ইউরিয়া ছড়াতে স্বচক্ষে দেখেছে সে। শুধু সে নয়, পাগল শিকারিও দেখেছে। কিন্তু সে কবুল করবেক কিনা সেটা ইন্দ্রর জানা নেই।

হঠাৎ মুর্মু সঙ্গোপনে জানায়, দুটি গাঁয়েই এখন উত্তেজনা তুঙ্গে। প্রায় ধর্মনাশের পর্যায়ে পড়ে গেছে ব্যাপারটা। ম্লেচ্ছ-যবনও যে কাজ করতে কুণ্ঠিত হবে, একটা হিন্দুর ছেলে হয়ে পুরো এলাকার লোকের জাত-ধর্ম নষ্ট করবার ষড়যন্ত্রে কীভাবে লিপ্ত হতে পারল, সেটা ভেবে ওরা যার-পর-নাই বিস্মিত। হঠাৎ মুর্মু বলে, আপনি যেন ভুলেও গাঁয়ের মধ্যে ঢুকবেন নাই। সোজা চল্যে যান বিষ্টুপুর। মাইন্‌ষের ভাব-গতিক মোটেই ভাল লয়। যে কোনও মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটাই দিতে পারে।

শুনতে শুনতে বুদ্ধদেবের বুকের মধ্যে দুর্ভাবনা জমছিল। কেমন জানি মনে হচ্ছিল, একটা সঙ্কটের মধ্যে পড়তে চলেছে সে। এমন মুহূর্তে সুকুমারেব কথাই মনে পড়ে প্রথমে। পোড়খাওয়া মানুষ, এলাকার চরিত্রটাকে চেনে নিজেব হাতের তালুর মতো। এ সময়টা সুকুমাব থাকলে একটুখানি বুদ্ধি-ভবসা পাওয়া যেত। কিন্তু সুকুমাব এখন জেলে। চুয়ামসিনা এলাকায সেটেলমেন্টেব কাজ শুরু হওয়াব প্রাক্কালে মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়াস দেখে প্রমাদ গুনেছিল হববল্লভের দল। থানাব বড়বাবুব শবণাপন্ন হতেই তিনি একরাতে ধরে নিয়েছিলেন সুকুমাব আর তিলককে। হঠাৎ আব মকবুলকে ধবতে পারেন নি। ওবা পালিয়ে যেতে পেরেছিল। এখন এদেশে কম্যুনিষ্টদের খুব সহজে ধরে জেলে পুরে দেওয়া যায। চুরি-ডাকাতির কেসে জড়িয়ে দেওযা যায় সহজেই। সবকার থেকে পুলিশকে এই অলিখিত অধিকাব দেওয়া হয়েছে। সুকুমাব নেই। বুদ্ধদেব ভেবে পায় না, এই পবিস্থিতিতে তার কী করা উচিত। হঠাৎ মুর্মু ওকে বেশিক্ষণ এলাকায় থাকতে দিতে নাবাজ। প্রায় জোব করেই রওনা করিয়ে দেয় বিষ্টুপুরের পথে।

বিডিও সাহেব পুরো ঘটনাটা মনোযোগ সহকারে শোনেন। ক্রমশ কঠিন হয়ে আসে ওঁর মুখ। বলেন, 'তোমারে এ কাজ করতে বলল কেডা? রাইতেব বেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে ক্যান ছড়াতে গেলে সার? দেখ দেখি, কী ঝঞ্ঝাট একখান পাকায়ে তুললে। ধর্ম হইল গিয়া মাইন্‌ষের ডিলিকেট ফিলিং। সেই ফিলিংকে কদাপি হার্ট কবতে নাই। বুঝায়ে সুঝায়ে মাইন্‌ষের

মনের পরিবর্তন ঘটানো, ইয়ারেই কই এক্স্‌টেনশন ওয়ার্ক। ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষকে কিসু গিলানোর চেষ্টা করলে সে ভমিট কইর‍্যা দিব গা। তুমি তো দেখি এক্সটেনশন ওয়ার্ক-এর এ-বি-সি জান না।'

বুদ্ধদেব গুম মেরে বসে থাকে। বিডিও সাহেব থামলে পরে খুব বিধ্বস্ত গলায় বলে, 'আসলে, বুঝিয়েসুঝিয়ে কিছুতেই রাজি করানো যাচ্ছিল না তো—।'

'রাজি করানো যাচ্ছিল না বলে তুমি রাইতের বেলায় চোরের মতো মাঠে নামলা?' বুদ্ধদেবকে ধমকে থামিয়ে দিয়ে বলে ওঠেন বিডিও সাহেব, 'মাইন্‌ষের রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্টকে আঘাত করলা! তুমি ত একখান্ ফার্স্টক্লাস ইডিয়ট হে। অহন কোথাকার জল কোথায় গিয়া ঠ্যাকে। দেখতে থাক সেটা। রায়ট-ফায়ট না বাইধ্যা যায়।' একখণ্ড কঠিন পাথরের মতো মুখ করে বসে থাকেন বিডিও সাহেব। খানিক বাদে গলা ফাটিয়ে হাঁক পাড়েন, 'অ ভবানী, স্বদেশ কুণ্ডুরে ডাক।'

বলতে বলতে ঘরে ঢোকে করালী সোম। বিডিও সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দমে যায় সে। একখানা কঠিন, নির্মম, পাথরের মুখ, রোষে, বিরক্তিতে প্রায় হিংস্র হয়ে উঠেছে।

'এই যে, করালী, বস।' খুব নিষ্প্রাণ গলায় বলেন বিডিও সাহেব। করালী সোম বসে। বিডিও সাহেব একঝলক তাকান বুদ্ধদেবের দিকে। তারপর করালীর চোখে চোখ রেখে বলেন, 'মর্কট দেখ্‌ছস্?'

করালী সোম খুব অনিশ্চিত চোখে তাকায়। বুদ্ধদেবের চোখে-মুখের বিপন্নতা দেখে সে আগেই কিছু অনুমান করেছিল, এখন বিডিও সাহেবের প্রশ্নের সঙ্গে নিজের আগাম আন্দাজকে জুড়ে দিয়ে একটা ঝাপসা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। সম্ভবত বুদ্ধদেবই এমন কিছু করেছে, যার ফলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যা বুদ্ধদেবের পক্ষে সুখকর নয়, প্রশাসনের পক্ষেও না।

বিডিও সাহেব বলেন, 'দেখ নাই তো? অই দ্যাখ,' বলতে বলতে তিনি আঙুল তাক করেন বুদ্ধদেবের দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢোকে স্বদেশ কুণ্ডু। বিডিও সাহেব তখন স্পষ্টতই রাগে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন।

স্বদেশ কুণ্ডুকে পুরো ঘটনাখানা সংক্ষেপে বলেন বিডিও সাহেব। বলেন, 'এক্সটেনশন ওয়ার্ক কারে কয়, এ্যাক্কেরে দেখিয়ে ছেরেছে। তোমাগো ডিপার্টমেন্টের উচিত, অরে একটা সোনার ম্যাডেল দেওয়া।'

এমন গম্ভীর পরিস্থিতিতেও বিডিও সাহেবের কথার ধরনে নাভিমূল থেকে কুলকুলিয়ে হাসি ওঠে স্বদেশের। বহু কষ্টে হাসি চাপে সে।

বিডিও সাহেব বলেন, 'ম্যাডেল-ফেডেল পরে হইব গা, আগে তুমি চুয়ামসিনায় যাও দিহি। কাল সকালেই। পরিস্থিতিটা সরজমিনে দেইখ্যা আইসো। বাই ইলেভেন আমারে রিপোর্ট দিবা।' স্বদেশ কুণ্ডু মাথা নেড়ে সায় দেয়। বিডিও সাহেব বলেন, 'শুন্‌সি, খুবই টেনশন রইসে এলাকায়। সাবধানে কাম লিবা। ট্যাক্‌ট্‌ফুল্লি ট্যাকেল করবা।' বলতে বলতে করালী সোমের দিকে এক ঝলক তাকান বিডিও সাহেব, 'করালী, তুম্মো, স্বদেশের সঙ্গে যাও। অরে একলা পাঠানো ঠিক হবে না। রাগের ত গুরু নাই, কী করতে কী কইর‍্যা ফ্যালে মানুষ।' শেষ কথাটি এভাবেই উচ্চারণ করেন বিডিও সাহেব, 'মনে রাইখ্যো, তোমাদ্যার থিক্যা রিপোর্ট পাইলে,

তবে আমি এস-ডি-ও, ডি-এম' রে রিপোর্ট করুম।'

ওরা দু'জন চলে যাবার পরও বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকে বুদ্ধদেব। কানদুটো নিঃশব্দে পুড়ছিল তার। সারা শরীর জুড়ে দহন। লজ্জা, অপমান, ঘৃণা, তার সঙ্গে আশঙ্কাও। বিডিও সাহেবের একটি বাক্য মনের মধ্যে ক্রিয়া করতে শুরু করেছে। দ্যাখ, কোথাকার জল কোথায় গিয়া ঠ্যাকে! কিছু কি ইঙ্গিত দিলেন বিডিও সাহেব? মন যেন তেমনই কিছু ইশারা করে। এলাকায় উত্তেজনা প্রশমিত হলেই এই পর্বের শেষ হবে না এমন ধারণা পল্লবিত হতে শুরু করেছে বুদ্ধদেবের মনে। বিডিও সাহেবের আরো একটি কথা বারংবার ভেসে উঠছে স্মৃতিতে। ঘটনাটা এস-ডি-ও এবং ডি-এমকে জানাবেন তিনি। এস-ডি-ও এবং ডি-এম সাহেব রিপোর্ট পেয়ে কী করবেন? তবে কি সাসপেণ্ডেড হয়ে যেতে পারে বুদ্ধদেব! মানুষের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করা, মানুষকে হিংসাত্মক হয়ে উঠতে প্ররোচিত করা, এলাকা জুড়ে বিদ্বেষ ও সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করা এবং এই সবকিছুর মাধ্যমে জনমানসে সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করা...। ভাবতে ভাবতে তার সারা শরীর কেঁপে ওঠে সহসা। না, চাকরি খোয়াবার ভয়ে সে তিলমাত্র ভীত নয়। আর্থিক প্রয়োজনে চাকরি করবার কোনও দরকারই নেই বুদ্ধদেবের। কিন্তু যেভাবে আত্মীয় স্বজনের মতের বিরুদ্ধে, গ্রাম গড়ে তোলাব সংকল্প নিয়ে, সবাইয়ের মতামতকে অগ্রাহ্য করে সে দৃপ্ত মুখে হাজির হয়েছিল ব্লক অফিসের সামনে, আজ সেখান থেকেই তাকে নত মস্তকে, শত্রুপক্ষের হাজারো টিটকিরির মধ্য দিয়ে পথ করে করে ফিরে যেতে হবে দেশের বাড়িতে, মাথায় একরাশ অভিযোগের বোঝা বহন করে .. ভাবতে ভাবতে একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে বুদ্ধদেব। তার দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছিল অঝোর ধারায়, বহু কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করে সে। খুব অস্ফুট গলায় বলে, 'স্যার আমি এখন কী করব?'

পাথরের মূর্তির মতো কঠিন মুখে বসে ছিলেন বিডিও সাহেব। বুদ্ধদেবের কথা শেষ না হতেই বোমার মতো ফেটে পড়লেন, 'কি করবা? আমার মাথার উপর উইঠা নাচো।' মাথাটা সামান্য কাত করে দেন বিডিও সাহেব। পরমুহূর্তে দু'চোখ দিয়ে একরাশ আগুন ঝরিয়ে দেন বুদ্ধদেবের মুখের ওপর। গলাখানি ভয়ানক খাদে নামিয়ে বলেন, 'অহন হেড কোয়ার্টার ছাইর‍্যা কোত্থাও যাবা না তুমি। কাউকে কোনও ইস্টেটমেন্ট দিবা না। অহন যাও।'

বুদ্ধদেব অতি ধীরগতিতে উঠে দাঁড়ায়। শরীরখানাকে বুঝি একশো মন ভারি লাগছিল তার। ঘর থেকে পা বাড়াবার মুহূর্তেই ওকে ফের ডাকেন বিডিও সাহেব, 'শোন—।' বুদ্ধদেব ঘুরে দাঁড়ায়। গলাটা অসম্ভব খাদে নামিয়ে বিডিও সাহেব বলেন, 'পার তো, যেভাবেই হোক গা, হরবল্লভ সিংহবাবুকে ম্যানেজ কর। সে হইল গিয়া এলাকার মস্তক। অর কথায় বিষধর সর্পেও ফণা নামাইয়া ল্যায়। দ্যাখ, যদি, এ্যাট এনি কস্ট, হরবল্লভের সিমপ্যাথি আর্ন কত্তি পার।' বুদ্ধদেবের চোখেমুখে বুঝি মুহূর্তের তরে ফুটে থাকবে হরবল্লভের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা, সেটা বুঝি নজর এড়ায় না বিডিও সাহেবের। চোয়াল শক্ত হয়ে আসে তাঁর। দু'চোখ আকাশে তুলে দিয়ে বলেন, 'নচেৎ জল কিন্তু বহুৎ দূর গরাইব। যা শুনলাম তোমাগো মুখে, সিচুয়েশন কিন্তু যে কোনও মোমেন্টে গ্রেভ হয়্যা উঠতে পারে। ইয়ারে আমরা কই, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টারময়েল। আইসো গা।'

বিডিও সাহেবের ঘর থেকে বেরোনো মাত্রই চোখাচোখি হয় মল্লিকার সঙ্গে। বুদ্ধদেব হড়বড়িয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, মল্লিকা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'এখানে নয়। বাইরে চল।'

মল্লিকা এই প্রথম প্রকাশ্যে হাত ধরে বুদ্ধদেবের।

মল্লিকার সঙ্গে দীপমালার বাসায় পৌঁছুল বুদ্ধদেব। দীপমালা বাড়িতেই ছিলেন। বুদ্ধদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখে-মুখে আশঙ্কা জমে। বলেন, 'কী হয়েছে বুদ্ধদেব? তোমার শরীর ভাল তো?'

ঘরের মধ্যে গিয়ে বসে বুদ্ধদেব। একটু একটু করে পুরো ঘটনাটা দীপমালাকে খুলে বলে। শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে যান দীপমালা। এক ধরনের তিক্ত হাসি ফুটে ওঠে ওঁর মুখে। বলেন, 'কোন্ দেশে জন্মেছ, বুঝতে পারছ? দেশটাকে কি একটুখানি হলেও চিনতে পেরেছ এ্যাদ্দিনে? এই দেশের অভাগা মানুষগুলোর জন্য কিছু করতে যাওয়া যে কত কঠিন, কী বিষম বিড়ম্বনা, সেটা বুঝতে পেরেছ আশা করি। তিমি-হাঙরদের দু'চোয়ালের মধ্যিখানে বসবাস করছে এই দেশের কোটি কোটি মানুষ। তাঁদের গ্রাস থেকে কাউকে বের করে আনতে গেলে তোমার হাতখানিই কাটা পড়বে।' নিজের মনে বিড়বিড় করতে থাকেন দীপমালা।

বুদ্ধদেব আকুল গলায় বলে ওঠে, 'কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন দীপাদি, আমি এলাকার সব জমিতেই হাড়ের গুঁড়ো আর ইউরিয়া ছড়াইনি।' দীপমালা মুখের কথা কেড়ে নেন, 'হাড়ের গুঁড়ো আর ইউরিয়া ছাড়া আজ উন্নত দেশগুলির চাষবাস অচল হয়ে যায়। আর সেই কারণে এদেশের একটি এলাকায় বাধতে চলেছে কম্যুন্যাল রায়ট।' নিজের কপালখানিকে দু'হাতে চেপে ধরেন দীপমালা। একটু একটু করে নিজেকে সংযত করেন। ধীর গলায় বলেন, 'আসলে এসব কিছু নয়। হরবল্লভরা অনেকদিন ধরেই সুযোগ খুঁজছিল। এ্যাদ্দিন বাদে একখানা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেছে। তোমাকে ওরা সহজে ছাড়বে বলে, মনে হয় না। মকবুল কোথায়?'

—তার সঙ্গে আজ হপ্তা-দুই আমার দেখাই হয় নি।

—আমার কাছেও আসে নি। কিন্তু আমার মনে হয়, ওকে এক্ষুনি খুঁজে বের করে সতর্ক করা দরকার। শেখপাড়া গাঁয়ের মানুষজনকেও সতর্ক করে দেওয়া দরকার। ওরা ব্যাপারটাকে একটা সাম্প্রদায়িক রূপ দেবার চেষ্টা করছে।

—আমি এখন কী করব দীপাদি?

দীপমালা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। ভাবেন। তারপর বলেন, 'আমার মনে হয়, তোমার এখন এলাকাতেই ফিরে যাওয়া উচিত। মকবুলকে সতর্ক করতে হবে সবচেয়ে আগে। ওরা ব্যাপারটাকে কোন্দিকে কতদূর নিয়ে যেতে চাইছে, সেটাও জানতে হবে। পারলে একবার অনাথদার সঙ্গে দেখা করো রাত্তিরে। তিনি তোমায় কিছু উপায় বাতলাতে পাবেন। এলাকায় তাঁর কিছু প্রভাব তো আছেই। তবে যা করবে, খুব সাবধানে করো। এলাকায় যেন তোমাকে কেউ দেখে না ফেলে। মনে রেখো, জাত-ধর্মের ভয় দেখিয়ে ওরা সহজ, সরল নিরক্ষর মানুষগুলোকে উত্তেজিত করছে। আর ধর্মীয় সুড়সুড়ির মতো বিষ-সর্ষে আর কিছুই হয় না এদেশে। উত্তেজনায় অন্ধ মানুষগুলো ক্ষণিকের হিংস্রতায় তোমার ক্ষতি করে দিতে পারে।' প্রায় নিজের সঙ্গে কথা বলবার ভঙ্গিতে বলেন দীপমালা, 'সুকুমারটা এই সময়ে এলাকায় থাকলে, তোমাকে আজ কিছুতেই ঐ এলাকায় যেতে দিতাম না...।'

—হরবল্লভ সিংহবাবুর সঙ্গে কি কথা বলব?

দীপমালা তৎক্ষণাৎ কোনও জবাব দিতে পারেন না। একটুক্ষণ সময় নেন তিনি। সম্ভবত গুছিয়ে নেন নিজেকেও। বলেন, 'বিডিও সাহেবের ইঙ্গিতটা অতি পরিষ্কার।

হরবল্লভের কাছে সারেণ্ডার করলে হয়ত বা সমস্ত ব্যাপারটা থিতিয়ে যাবে মুহূর্তের মধ্যে। কিন্তু তার অর্থ হবে এই যে, ভবিষ্যতে, যে ক'দিন তুমি ঐ এলাকায় থাকবে, হরবল্লভের হাতের পুতুল হয়েই থাকতে হবে তোমায়।' দীপমালা এবার সরাসরি তাকান বুদ্ধদেবের দিকে, 'এই সিদ্ধান্তটা তোমাকেই নিতে হবে বুদ্ধ। আমার পক্ষে কিছু বাতলে দেওয়াটা সমীচীন হবে না।'

—আমার মাথা কাজ করছে না দীপা দি! সবকিছু অসাড় লাগছে। আপনিই বলে দিন, কী করব।

—আমার পক্ষে বলে দেওয়াটা সত্যিই খুব কঠিন, বুদ্ধ। দীপমালার চোখেমুখে গাঢ় অস্বস্তি, আমার কোনও পরামর্শ মানতে গিয়ে যদি তোমার কোনও ক্ষতি হয়ে যায়!

বুদ্ধদেব চুপ করে বসে থাকে। দীপমালা ওদের প্লেটে করে কিছু খাবার দেন। স্পর্শ করে না বুদ্ধদেব। এক সময় উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আমি চুয়াসিনার দিকেই রওনা দিচ্ছি। যদি পারি আজ রাতেই ফিরে আসব। নয়তো কাল সকালে।'

দু'জনে রাস্তায় নামে। সূর্য ততক্ষণে অস্ত গিয়েছে। মল্লিকা বলে, 'তুমি একা একা যাবে ওখানে?'

—উপায় কি?

—আমার খুব ভয় করছে।

বুদ্ধদেব নীরব থাকে। ভয় না পাওয়ার পরামর্শটুকুও দিতে ইচ্ছে করে না ওর। ধীরে ধীরে সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখে।

পেছন থেকে মল্লিকা বলে, 'যত রাতই হোক, ফিরে এসো। আমি জেগে থাকব।'

বিড়াইয়ের পুল না পেরোতেই সন্ধে নেমে আসে। অন্ধকারে ধীরে ধীরে সাইকেল চালাচ্ছিল বুদ্ধদেব। অনেক ভাবনা, অনেক কথা' মগজের মধ্যে কিলবিল করছিল। একটা বিষম সঙ্কটের মধ্যে আচমকা পড়ে গিয়েছে সে। সঙ্কটখানাকে একটু একটু করে দেখতে পাচ্ছিল মনশ্চক্ষে। বিডিও সাহেবকে যতই চিন্তিত দেখাক, বুদ্ধদেবের সন্দেহ হয়, মনে মনে ব্যাপারটাকে উপভোগ করছেন তিনি। যে দু'জনকে আগামীকাল তদন্তের জন্য পাঠাচ্ছেন তারা দু'জনেই বুদ্ধদেবের শত্রুপক্ষ। করালী সোম আর স্বদেশ কুণ্ডুর অনেক কুকীর্তি সে ফাঁস করে দিয়েছে। স্বদেশ কুণ্ডুর সম্ভবত অন্য একটি কারণেও রাগ রয়েছে বুদ্ধদেবের ওপর। কারণটি হল, মল্লিকা। সবাই বলাবলি করে, স্বদেশ নাকি পেতে চেয়েছিল মল্লিকাকে। এরা যে আগামীকাল সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে, তাতে কোনও সন্দেহই নেই বুদ্ধদেবের। এবং এদেরই রিপোর্টের ভিত্তিতে এস-ডি-ও এবং ডি-এম' এর কাছে রিপোর্ট পাঠাবেন বিডিও সাহেব। পরিণতিটা দিব্য চক্ষে দেখতে পায় বুদ্ধদেব।

দ্বারকেশ্বর পেরিয়ে জয়কৃষ্ণপুরের মোড়ে হরিবোল দাসের চায়ের দোকান। দোকানে টিমটিম ডিবরি জ্বলছে। প্রায় জনা দশ-বারো মানুষ উত্তেজিত আলোচনায় মত্ত। পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওদের টুকরো টুকরো কথা কানে আসে বুদ্ধদেবের। আলোচনা চলছে চুয়াসিনার মাঠে হাড়ের গুঁড়ো ছড়ানো নিয়েই। বুদ্ধদেবকে ততখানি নয়, ওরা ভিলেন বানিয়ে ফেলেছে মকবুলকেই। ওই যে নাটের গুরু, ও-ই যে বুদ্ধদেবকে উসকানি দিয়ে এ হেন পাপ কাজে নামিয়েছে, এ ব্যাপারে দেখা গেল, কারোরই কোনও সন্দেহ নেই। এবং যেন তেন প্রকারেণ

হিন্দুদের জাত মারাই যে মুসলমানদের উদ্দেশ্য, এ বিষয়েও সবাই একপ্রকার নিশ্চিত। ওদের গাঢ় আশঙ্কা, ধীরে ধীরে এ দেশটারও দখল নিয়ে নেবে মুসলমানরা। হিন্দুদের বাঁচা দায় হবে এদেশে। চার-চারটা বিয়ে করতে পারে এরা। মাত্র একটা করে বউ নিয়ে হিন্দুরা ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে কী ভাবে। একদিন এদেশে ওরাই হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখনই যদি শালাদের এদেশ থেকে না তাড়ানো যায় তো একদিন হিন্দুদের কাঁদতে হবে।

বুদ্ধদেব ধীরে ধীরে প্যাডেলে চাপ দেয়। এমন জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। এই পাড়াটাতে প্রায় পঞ্চাশ ঘর মানুষেব বাস। পূর্ববঙ্গ থেকে সর্বস্ব হারিয়ে এদেশে চলে আসা উদ্বাস্তু এরা। মুসলমানদের প্রতি এদের অপরিসীম জাতক্রোধ। এতদিন বাদেও তা তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছে। সুযোগ পেলেই প্রকাশ পেয়ে যায় সেই গুপ্ত আগুন। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। উপস্থিত, বক্তাটির শেষ কথাগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মানুষগুলোর চোখে-মুখে। মুসলমানদের সম্ভাব্য সংখ্যাবৃদ্ধিতে দ্বিতীয়বার উদ্বাস্তু হওয়ার আশঙ্কায় মানুষগুলো যুক্তি, তর্ক, বিচারবোধ হারিয়ে ফেলছে একটু একটু করে। কে যেন চিৎকার করে বলে ওঠে, আইজ রাতেই শেখপাড়ায় চরাও হই, চল। শালাদ্যার কচুকাটা কইর‍্যা দ্বারকেশ্বরের জলে ভাসাইয়া দিমু।

শুনতে শুনতে সাইকেলের গতি বাড়িয়ে দেয় বুদ্ধদেব। তার শরীর জুড়ে তখন কেবলই ভয়। নাভিমূল থেকে একটা কালকেউটে সাপ যেন পাক দিয়ে দিয়ে বুকের দিকে উঠছে।

অতি সন্তর্পণে শেখপাড়া গাঁয়ে ঢোকে বুদ্ধদেব। মকবুলদের আগড়ে মৃদু ঘা মারে। ঘরের ভেতরে গুনগুনিয়ে কথা বলছিল কেউ। টিমটিমিয়ে ডিবরি বাতি জ্বলছিল। ঘুলঘুলি দিয়ে তার আলো দেখতে পাচ্ছিল বুদ্ধদেব। আগড়ে আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুনগুনানি থেমে যায় পুরোপুরি। ঝপ করে নিভে যায় আলো। অকস্মাৎ স্তব্ধতা নেমে আসে মকবুলদের ঘরে।

বুদ্ধদেব পুনরায় দরজার আগড়ে ঘা মারে। মৃদু স্বরে ডাক দেয়, মকবুল—। ভেতর থেকে চাপা গলায় কেউ বলে ওঠে, 'কে? কে বটে?'

আমি। গ্রামসেবক বাবু। দরজাটা খোল।

সামান্য সময়ের জন্য শুনশান হয়ে যায় ঘরখানা। একসময় খুট করে আওয়াজ ওঠে দরজার খিলে। একটা পাল্লা সামান্য ফাঁক হয়। তারপর পুরোপুরি খুলে যায়।

ডিবরি-আলোখানি আবাব জ্বেলে দেয় কেউ। বুদ্ধদেব সন্তর্পণে ঘবের মধ্যে ঢোকে। দেখে, মকবুল নাই। ঘরের মধ্যে বসে রয়েছে মকবুলের দু'দাদা এবং পাড়ার দু'তিন জন মানুষ। সকলেই বুদ্ধদেবের চেনা। মানুষগুলোর মুখে কে যেন এক পোঁচ করে কালি মাখিয়ে দিয়েছে। এলাকার উত্তেজনার খববটা তাহলে পেয়ে গিয়েছে এরা। বুদ্ধদেব ওদের পাশটিতে গিয়ে বসে। ভয়ে, ভাবনায়, শঙ্কায় কালো হয়ে আসা মুখগুলি নীরবে তাকিয়ে থাকে বুদ্ধদেবের দিকে। মকবুলের বড়দা রশিদ শেখ বিধ্বস্ত গলায় বলে ওঠে, 'মকবুল আপনার সাথ ছিল নাই বুদ্ধদা, উয়ার নামে দোষ দিচ্ছে ক্যানে ইয়ারা?'

বুদ্ধদেব সহসা কোনও জবাব দিয়ে উঠতে পারে না। এক সময় ভাঙা গলায় বলে, 'এরা ব্যাপারটাকে নিয়ে ঘোঁট পাকাতে চাইছে। মকবুল নয়, ওরা আমাকেই জব্দ করতে চায়। মকবুলকে জড়িয়ে দিয়ে ওরা পুরো ঘটনাটাকে একটা জবরদস্ত সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে চায়। মকবুল কোথায়?'

ওরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। রশিদ শেখ খুব নিচু গলায় জবাব দেয়, 'উয়াকে আমরা সরাই দিছি।'

—খুবই ভাল করেছ। বুদ্ধদেব সামান্য আশ্বস্ত হয়, 'দিনকতক ও বাইরেই থাকুক। তোমরাও একটু সাবধানে থাক।' বলতে বলতে বুদ্ধদেবের গলা ধরে আসে, 'আমার জন্যই বিপদে পড়েছ তোমরা।'

ওরা সহসা এর জবাব দিয়ে উঠতে পারে না। কেবল রশিদ শেখই বিড়বিড় করে বলে, 'জলে বাস কইর‍্যে কুমীরের সাথ কাইজ্যা করাটা ঠিক নয় বুদ্ধদা। কম বইসে তুমাদ্যার রক্ত গরম, কিন্তু আমরা বুঝি, উয়াদ্যার সায়েস্তা করা তুমাদ্যার কম্ম লয়।'

একটু বাদেই উঠে পড়ে বুদ্ধদেব। অন্ধকারে সাবধানে পেরিয়ে যায় উঠোন। এখন ওকে যেতে হবে চুয়ামসিনা। হঠাৎ মুর্মুর খবর যদি সত্যি হয়, তবে আজ সন্ধেয় মিটিং বসবার কথা সিংহগড়ে। কী সিদ্ধান্ত হল মিটিং-এ জানা দরকার। রশিদ শেখরা জনাকয় ওর সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। বুদ্ধদেব বহুকষ্টে নিরস্ত করে।

পদমপুকুরেব পাড়ে, অর্জুনগাছের গাঢ় ছায়া থেকে আচমকা বেরিয়ে আসে একজন মানুষ। বুদ্ধদেবের সাইকেলের সামনে এসে দাঁড়ায়।

পাগল শিকারি।

পাগল শিকারি ওকে টেনে নিয়ে যায় অর্জুন-গাছের গাঢ় ছায়ায়। ফিসফিসিয়ে বলে, 'সিংহগড়ে একশো মানুষের জমায়েত। ছোটচাষী, বর্গাদার সক্কলেই জুইটেছে। জোর কথা কাচাকাচি চইল্‌ছে!'

—কী চায় ওরা?

—বহুৎ। তুমার জবর সাজা। ক্ষতিপূরণ। ঘি পোড়াবার খরচ। আর, মুসলমানদের উচিত শিক্ষা দিতে চায়।

—মিটিং কি এখনো চলছে?

—এই ভাঙল্যাক।

—কী সিদ্ধান্ত হল?

— বড় কর্তা বইল্‌ল্যাক, আগামী কাল মিছিল কইর‍্যে যাব্যেক সবাই বিষ্টুপুরে। নালিশ করবেক এস-ডি-ওর কাছে। যদি কুনো ফল না হয়, তখন রক্তগঙ্গা বহানো হবেক এলাকায়।

নীরবে শুনতে থাকে বুদ্ধদেব। শুনতে শুনতে পাথর হয়ে যায় সে।

সম্বিৎ ফেরে অনেক মানুষের কোলাহলে। জয়রামপুরের দিক থেকে যারা মিটিং-এ গিয়েছিল, ফিরে আসছে। জনা বিশেক মানুষ ধপধপিয়ে হাঁটছে। উচ্চস্বরে আস্ফালন করছে। সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে আসে উত্তেজিত মানুষগুলি। এরা অনেকেই বুদ্ধদেবকে ভালবাসে, মান্য করে, কিন্তু আজ এক বিশেষ পরিস্থিতিতে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বসেছে। পাগল শিকারি বুদ্ধদেবকে সন্তর্পণে টেনে নেয় গাছের গুঁড়ির দিকে। সেখানে অন্ধকারটা নিকষ। বুদ্ধদেবের শরীরখানি ঢাকা পড়ে যায় অন্ধকারের ঘেরাটোপে।

ওরা চলে যাওয়ার পর, পাগল শিকারি শুধোয় 'তুমি ইখন কুথায় যাবে?'

বুদ্ধদেব স্থির করতে পারে না, কোথায় যাওয়া সঙ্গত হবে। অনাথবন্ধুর মুখখানি

চোখের সামনে ভাসতে থাকে তার। বলে, 'একটু অনাথদার কাছে যাব।'

'সব্যলাশ!' পাগল শিকারি আঁতকে ওঠে, 'উয়াঁর ঘর যেতে হইলে পুরা গাঁখানাই পারাতে হবেক তুমাকে। প্রভঞ্জনের দল টহল দিচ্ছে গাঁ'ময়। তুমি ধরা পইড়ে যাবে।'

মহাভাবনায় পড়ে যায় বুদ্ধদেব। রাতখানা দ্রুত বাড়ছে। বিষ্ণুপুরে ফিরে যাওয়ায় কোনও উপায় নেই আর।

আজ রাতে সিংহগড়ে ফেরার প্রশ্নই ওঠে না। বুদ্ধদেব গভীর ভাবনায় ডুবে যায়।

এমন অবস্থায় পাগল শিকারিই সক্রিয় হয়। বলে, 'চল, তুমাকে এক জা'গায় লিয়ে যাই। রাতটা উখ্যেনেই কাটাও।' পাগল শিকারি হাঁটতে থাকে অন্ধকারে। বুদ্ধদেব বিনা বাক্যব্যয়ে ওর পিছু নেয়। পদমপুকুরের ঈশান কোণ দিয়ে, শালকাঁকির ডাঙাকে বাঁয়ে রেখে মণ্ডলদের আমবাগানের ভেতর দিয়ে সে হাজির হয় কনকপ্রভার মহলের খিড়কির দুয়োরে। ভাঙা পাঁচিলের ভেতর দিয়ে গলিয়ে দেয় শরীর। বুদ্ধদেবকে বাইরে খাড়া রেখে ঢুকে পড়ে ভেতরে।

বেশ খানিক বাদে খিড়কির দরজা খুলে যায়। বুদ্ধদেব দেখতে পায় চোখের সামনে লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুন্তী। তার দু'চোখে জমাট বেঁধে রয়েছে দুর্ভাবনা।

কুন্তীর সঙ্গে নিঃশব্দে দোতলায় উঠে যায় বুদ্ধদেব। চাপাগলায় শুধোয়, 'রতিকান্ত, পান্নাদা এরা কোথায়?'

—তারা সব পাশের মহলে। মিটিং কচ্ছে।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন কনকপ্রভা। বুদ্ধদেব তাঁর দিকে এক ঝলক তাকিয়েই নামিয়ে নেয় চোখ।

দৃষ্টির ফ্রেমে তিলকের অনুপ্রবেশ

বেশি রাতে ঘরে ঢোকে পরীক্ষিত বাউরি।

আগড় ঠেলে উঠোনে পা রাখে। পা দোলে। সারা শরীরে উৎকণ্ঠা জাগিয়ে ক্ষণ গুণছিল নিশান বাউরি ।পায়ের আওয়াজ শুনে বেসামাল বলে ওঠে, 'অগ্নি আইলু? অগ্নি?'

'লয়। আমি পরীক্ষিত।'

অন্যদিন হলে, এই তথ্য জানবার পর নিশান বাউরির মধ্যে পরবর্তী প্রতিক্রিয়াগুলি হত এইরকম। প্রথমে ফোঁস করে লম্বা নিঃশ্বাস ফেলবে। তারপর 'হুম' গোছের আওয়াজ তুলবে। তারপর। 'সূয্যি আইজ কুন গগনে উইঠেছ্যান! এত লোকের মরণ হয়, আমার মরণ হয় না। জনমভর শ্মশান জাইগ্যতে জাইগ্যতে উম্বরটা কাটল্যাক! সাত জনমের মাহাপাপের ফলে অমন ব্যাটা পায় মানুষ।' অনেকক্ষণ ধরে আক্ষেপ অভিসম্পাত চলতে থাকবে। তারপর 'অগ্নি ত ঘরে নাই, কলসিতে জল আছে, গড়াই খা, গলাটা ভারি লাইগ্যছে ক্যানে, থাণ্ডা লাইগ্যল্যাক নাকি, কাল রাইতে কুথা শুয়েছিলি' গোছের মলম লাগাতে থাকবে অনেকক্ষণ। কিন্তু আজ এসব কোনও গৌরচন্দ্রিকাই নয়, পরীক্ষিত বাউরি এসেছে বুঝতে পারামাত্তর নিশান বাউরি একেবারে হামলে কঁকিয়ে একসা। অগ্নি যে এখনো অবধি ফেরে নি, সারা তল্লাটে যে পুলিশের তাণ্ডব চলছে, সন্ধ্যাটি নামলেই যে ঐ হুঁড়ারবাহিনী নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায়

আদিবাসী পাড়াগুলোর পথে পথে, চপল লোহারের বউকে যে একদিন ধরেছিল সইন্ধা পহরে, এসব তথ্য এক নিঃশ্বাসে উগরে দিয়ে হাঁফাতে থাকবে বুড়ো। পরীক্ষিত বাউরির এসব তথ্য মোটামুটি জানা। নিশানের অত বিতাং করবার দরকার ছিল না। আসলে, পরীক্ষিত বাউরির মনে অগ্নি সম্পর্কে উদ্বেগ পয়দা করতে চায় বুড়া, যাতে সময় নষ্ট না করে সে খুঁজতে বেরোয় অগ্নিকে। যাতে রাত পোহাতেই উড়ে না পালায়। যাতে অগ্নির সুরক্ষার দায়িত্ব তুলে নেয় নিজের হাতে। কিন্তু এসবের কোনও দরকারই ছিল না। এমনিতেই অগ্নিকে নিয়ে পরীক্ষিতের এক ধরনের স্থায়ী উৎকণ্ঠা রয়েছে দীর্ঘকাল। ইদানীং বিভিন্ন কারণেই বাড়ছে সেটা। অগ্নি যত বদলে যাচ্ছে, উৎকণ্ঠা ততই বাড়ছে। আসলে, ঐ উৎকণ্ঠার ফাঁসে দম আটকে যাওয়াতেই পরীক্ষিত ছুটে এসেছে তড়িঘড়ি। মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলনের হাওয়া তুলে আচমকা এলাকাকে উত্তপ্ত করে তুলেছে সুকুমারেরা। সে উত্তেজনা এখনও অবধি চলছে। আসলে, পুলিশ ইদানীং যেন তেন প্রকারেণ কম্যুনিস্টদের তুলে নিতে চায়। একটা অজুহাত পেলেই তার সদব্যবহার করে। বাঁধগাবার লড়াইয়ের পর থেকে এ জেলার পুলিশ বাহিনী কম্যুনিস্টদের সম্পর্কের বড়ই সিরিয়াস। ১৯৪৯-এর ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের সকালে আচমকা বিষ্ণুপুর শহরে দশ হাজার সশস্ত্র মানুষ। প্রশাসন হতচকিত, বিহ্বল, সাধারণ মানুষ বিস্মিত। ইয়ারা কারা হে? ইয়ারা বটে কম্যুনিস্ট। তেভাগার লড়াই লড়ছে ইয়ারা। সেই ঐতিহাসিক মহামিছিলের পর তৎকালীন ডিভিশনাল কমিশনার তদন্তে এসে প্রথম কথাটি যা বলেছিলেন, প্রশাসনে তার মূল্য লাখ টাকা। বলেছিলেন, শোবার ঘরের কোণে বোলতারা ছোট্ট চাক বাঁধল। এত আসবাবের মধ্যে গেরস্থের চোখ এড়িয়ে গেল তা। নজরে যখন এল, তখন পুরো কোণটি অধিকার করে জাঁকিয়ে বসেছে চাকখানি।... তখন সেটা ভাঙতে গেলে তাণ্ডব বাধাবে ওরা সারা ঘরে। যে চাক একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ফেলে দেওয়া যেত এক নিমেষের মধ্যে, সেই চাকখানিকে ভাঙতে বৃহৎ আয়োজন, অর্থব্যয়, আহত হওয়ার ঝুঁকি । ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র সাবধানে বের করে এনে ঘরটিকে পুরোপুরি ফাঁকা করে নিয়ে, হয়ত বা আগুন লাগাতে হবে চাকে। তাতে পুড়ে যেতে পারে দরজা জানলার অংশবিশেষ, কালি হয়ে যেতে পারে ঐ পাশের দেয়াল.. । মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি, দিবাকর দত্ত, মানিক দত্ত, বিমল সরকারের মতো জনা কয়েককে ফিনিশ করে দিলে যেখানে পুরো এলাকা রাতারাতি ঠাণ্ডা হয়ে যেত, তাব জনা আজ হাজার মানুষকে মারবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কথাটি প্রাঞ্জল করে বুঝিয়েছিলেন তৎকালীন ডিভিশন্যাল কমিশনার। পুলিশ প্রশাসন সেই থেকে কথাটিকে ফ্রেম দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেছে মগজে। রোগ, রিপু আর আগুন, অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হয়। দেরি হলে নিজেরই বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই বোলতার চাক তো দূরের কথা, চাকের ইঙ্গিত পেলেও তারা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দিতে কোনও চেষ্টারই ত্রুটি রাখে না।

ক'দিন ধরে পরীক্ষিতের মনটা ভারি অস্থির লাগছিল। ভেতর মহলে কু গাইছিল কেউ, অহরহ । বড় উচাটন বোধ করছিল ক'দিন। অগ্নির মুখখানা ভেসে উঠছিল বারবার। প্রভঞ্জন সিংহবাবুর গায়ে পেত্যা ছুঁড়ে মারবার পর থেকে সে অগ্নিকে নিয়ে সর্বদাই দুর্ভাবনায় ভোগে। কখন কী হয়ে যায় তার, সেই ভাবনায় মনটা সর্বদাই আনচান করে। দুর্ভাবনাটা ওকে ছেড়ে যায় না এক মুহূর্তের তরে। এমন কি ঘুমের মধ্যেও অগ্নির মুখখানা তার মগজের মধ্যে ভেসে বেড়ায়।

পরীক্ষিত শুধোয়, 'কুথায় গেছে অগ্নি? কখন গেছে?'

'গাজনের মেলায় যাচ্ছি, বলে তো বারাঁই গেল্যাক সাঁঝের ব্যালায়।' নিশান বাউরির গলায় যুগপৎ রোষ এবং আশঙ্কা, 'বইল্ল্যাক, জলদি জলদি ফির্‌ব। এই তার জলদি আসা। সাত-ভায়া তারা হেইলে পইড়্‌ল্যাক আকাশে।' নিশান বাউরি আপন মনে হা-হুতাশ করে চলে, আজকাল 'পূজাপার্বনে বাইরের থিক্যে কত বদ্ ছেইলার আমদানি হয়। পুলুশ ঘুরছে সাদা পুষাকে। কখন কী হয় কিছো বলা যায়! লোকের গলা অবধি ডুইবে যায়, তুয়ার বিটির পায়ের কড়ি আঙুল অবধি নাই ডুবে। আর আমাকেই বেশ পেয়েছু তুয়ারা! আমার ঘাড়ে যাবতীয় দায়-দায়িত্ব চাপাই দিয়ে বেশ মজাসে আছু। একজন তো কলাটি দেখাঁই চইলে গেলেন ইস্কুলের বোড়িংয়ে। কিনা লাটসাহেব হব্যেক!' নিশান বাউরি সমানে গজগজ করতে থাকে।

এখন আর বসলে উঠতে ইচ্ছে করে না। শরীরটা খুব অবসন্ন লাগে। পরীক্ষিত সহসা আবিষ্কার করে, ভেতরে ভেতরে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। শরীরে ও মনে এখন একটুখানি বিশ্রাম চাই তার।

'দেখি, কুথা গ্যালাক মেয়াটা,--' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় পরীক্ষিত বাউরি। উঠোনে পা নামায়। পায়ে পায়ে উঠোনটা পেরিয়ে যায়। আগড় ঠেলে এক সময় অন্ধকারে মিশে যায়। তখন নিশুত হচ্ছে রাত। পাখি-পাখাল ঘুমিয়ে পড়েছে। পরীক্ষিত ভাবে, অগ্নিও তো এক জাতের পাখিই। রাতের বেলায় ঘরে না ফিরে সে যাবে কোথায়!

গাজনতলাটা তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ায় পরীক্ষিত। অগ্নি কোথাও নেই। এতক্ষণ মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা ভাসছিল। ভেবেছিল, যে কারণেই হোক অগ্নি গাজনতলাতেই কাটাচ্ছে এতখানি সময়। এবার তার মনে সত্যিসত্যি বাসা বাঁধে দুর্ভাবনা। কোথায় যেতে পারে অগ্নি! এত রাতে যাওয়ার জায়গা তার কোথায়! পরীক্ষিতের মনের মধ্যে সহসা প্রবল আনচান শুরু হয়। গাজনতলা থেকে বেরিয়ে সে হাঁটা দেয় শাঁলকাকির ডাঙার দিকে। সেখান থেকে ইস্কুল, ক্লাবঘর, হাটতলা।

তখন চুয়ামসিনার আকাশে অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। পদমদিঘির অর্জুনগাছ থেকে বাদুড়ের দল রওনা দিয়েছে লোখেশোলের দিকে। সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় অগ্নিকে খুঁজে খুঁজে থকে যায় পরীক্ষিত বাউরি। কোথাও পায় না অগ্নিকে। অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে ভয় জমছিল তার বুকে। ভয়টা এবার গাঢ় হয়। গাজনের মেলা দেখতে বেরিয়ে কোথায় চলে গেল অগ্নি! অনেক অশুভ চিন্তা ভিড় করছিল মনে। অগ্নি সম্পর্কিত অনেকানেক দুর্ঘটনা কল্পনা করছিল পরীক্ষিত। এতক্ষণে বুকের মধ্যে উথলাতে লেগেছে। নাভিমূল সুড়সুড় কর [illegible]। আগলবাগল হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে সে। চোখের মণিজোড়া বিঁধিয়ে দেয় ঝোপঝাড়ের ম[illegible], পুকুরের পাড়ে, রাস্তার কিনারে, গাছের তলায়...। আচমকা তার মগজের মধ্যে বিদ্যুতের চমক। মরণ-গাছের তলায় নেই তো অগ্নি! হরিণমুড়ির বাঁকের মুখে ঐ বাজপড়া তালগাছের তলায়। কানাঘুষোয় পরীক্ষিত বাউরিও এতদিনে জেনেছে, ইদানিং অগ্নি মরণ-গাছের তলায় মাঝে মাঝে গিয়ে বসছে। শোনামাত্রই আঁতকে উঠেছিল সে। অগ্নি কি তবে মরণ কামনা করে মনে মনে। এতখানি আশা-ভরসা হারিয়ে বসে রয়েছে নাকি মেয়েটা! পরীক্ষিত কল্পনাও করতে পারে না। সে স্বপ্নেও ভাবে নি তা। স্বামী সংসার ছেড়ে তার জীবনটা খাক হয়ে গিয়েছে

অবশ্যই। কোনও স্বপ্নই আর নেই তাব চোখে। পরীক্ষিতের চোখে অনেকদিন যাবৎ সে এক পরিপূর্ণ বিষাদপ্রতিমা। কিন্তু, তাই বলে, সে যে অতখানি নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে মরণের দিকে, পরীক্ষিত কল্পনাও করে নি। দিনান্তে 'মা' বলে ডাকবার মতো একটা ফুটফুটে ছেলে রয়েছে অগ্নির। কেবল তার টানেও তো তার বেঁচে থাকবার কথাটা মনে থাকা উচিত। অথচ সে নাকি মাঝে মধ্যে লুকিয়ে চলে যাচ্ছে মরণ-গাছের তলায়! তার তলায বসে মৃত্যুর জন্য আর্জি জানাচ্ছে নিয়মিত। মনে মনে যে অতখানি ভেঙে পড়েছে অগ্নি, পরীক্ষিতের বাস্তবিক অজানাই ছিল তা।

হরিণমুড়ির বাঁকের মুখে বাজপড়া তাল গাছের তলায় ঝটিতি চলে যায় পরীক্ষিত বাউরি। এবং আবছা অন্ধকারে গাছের তলায় তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ায় অগ্নিকে।

কিন্তু অগ্নি সেখানে নেই।

কী করবে, কোথায় যাবে, কিছুই বুঝতে পারছিল না পরীক্ষিত। ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশ ফাটিয়ে বৃষ্টি নামে। সোঁ-সোঁ হাওয়া বয়। মাথার ওপর মরণ-গাছটা অল্প অল্প দুলতে থাকে। চালতাফুলি জলের ফোঁটা হরিণমুড়ির জলে পড়ে কুব্-কুব্-কুব্ শব্দ তোলে। পরীক্ষিতের সারা মন হাহাকার করে ওঠে। ভর গ্রীষ্মের রাতে সহসা তার প্রবল শীত করতে থাকে।

এক সময় পরীক্ষিতের মনে হয়, তিলকের বাড়িতেই নেই তো অগ্নি? তিলকের বোন বাতাসী, অগ্নির চেয়ে সাত ছোট, তবুও তার সঙ্গে অগ্নির বন্ধুতা সবচেয়ে বেশি। বলা যায় না, হয়ত মেলাতে দেখা হতেই ওকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছে বাতাসী। গল্পগাছায় মজে গিয়েছে দু'জনে। হয়ত বা গল্প করতে করতে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে। যা ঘুম-ক্যাতর‍্যা মেয়া!

তিলকের বাড়িতে গিয়ে একেবারে ভেঙে পড়ে পরীক্ষিত। হাঁকডাকে তিলক বেরিয়ে আসে। অগ্নির কথা শুধোলে সে তো অবাক। অগ্নি তো বহুৎ আগে বেরিয়ে এসেছে মেলা থেকে। বলল ত, বাড়ি যাচ্ছি। তবে? হাতে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে আসে তিলক। বলে, 'চল্ ত, দেখি কুথা গেল।'

রাস্তায় পা দিয়ে তিলক হরিণমুড়ির দিকে মুখ ঘোরায়।

পরীক্ষিত বলে, 'কুন দিগে যেত্যে চাস?'

তিলক গুম মেরে যায়। একটুবাদে বলে, 'হরিণমুড়ির বাঁকের মাথায় যে বাজপড়া তালগাছ খান—।'

'মরণ-গাছ?' পরীক্ষিত খেই ধরে নেয়।

'উখেনে—।'

'অগ্নি মাঝে মধ্যেই চলে যায় ইদানিং। কিন্তু উই গাছের তলা আমি দেইখে আইছি। উ নাই সিখ্যেনে।'

এবার তিলকের কপালে মৃদু ভাঁজ পড়ে। কতরকম অশুভ সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে তার। গজেনের মুখ ভাসে। প্রভঞ্জনের মুখ ভাসে। থানার মেজবাবুর মুখ ভাসে। গাজনের মেলা উপলক্ষে চুয়ামসিনায় একদল সিপাইসহ থানা গেড়েছেন তিনি ক'দিন। অগ্নিকে মনে মনে গিলতে চাইছে অনেকেই। কে কোন্ সুযোগ কীভাবে কাজে লাগাবে বোঝা মুশকিল।

অকস্মাৎ তিলকের মনে বিদ্যুতের চকিত ঝলক।

বলে, 'আইস কাকা, একটা জায়গা দেইখে আসি।'

তিলক হাঁটতে শুরু করে। পিছু পিছু পরীক্ষিত বাউরি। শালকাঁকির ডাঙা পেরিয়ে, প্রাইমারি স্কুল, প্রভঞ্জনদের মিতালি সংঘকে পাশ কাটিয়ে ওরা হাঁটতে থাকে বত্রিশভাগীর জঙ্গলের দিকে।

চারপাশে সাঁ-সাঁ করছে রাত। হু-হু হাওয়া বইছে। দূরে গাজনতলা থেকে ভেসে আসছে উতরোল মানুষের হল্লার আওয়াজ, ভক্তাদের মুহুর্মুহু বোল, জয় বাবা কপিলেশ্বর—পাতালফোঁড়-মাহাদেব—। মাথার ওপর দিয়ে সাঁইসাঁই ডানা ঝাপটে উড়ে গেল এক ঝাঁক বাদুড়। নিশাচর প্রাণীর দল, যারা এই নিশুত রাতে খাদ্য সংগ্রহে বেরিয়েছে ক্ষুধার জ্বালায়, তিলকের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে তারা। গাছের ডালে ডালে, টিকরার আড়ালে তাদের পায়ের খুটখাট আওয়াজ কানে আসে।

একসময় বত্রিশভাগীর জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছে যায় ওরা। কালিঝুলি মেখে বসে রয়েছে পুরো জঙ্গলটা। সামনে একটা বিশাল ভাঙাচোরা ডাঙা। বর্ষায় জঙ্গলধোয়া জল ঐ ডাঙা দিয়ে গড়িয়ে যায়। অজস্র ভাঙাচোরা নালা বয়ে ঐ জল পড়ে হরিণমুড়িতে। ডাঙার মাঝবরাবর কুসুম গাছটা, যেন একটা কালো কাপড়ের পুঁটলি

গাছের তলায় আরও একটা ছোট্ট কালো কাপড়ের পুঁটলি। পুঁটলিটার গায়ে চোখ বিঁধিয়ে দেয় তিলক। অস্ফুট গলায় বলে ওঠে, 'উই ত বসে রইয়েছে।'

পুঁটুলিটার কাছে গিয়ে হতবাক হয়ে যায় পরীক্ষিত বাউরি। গাছের তলায় বসে কাঠ হয়ে গিয়েছে অগ্নি। এমন কি পরীক্ষিতের উপস্থিতিটাও টের পায় না সে। তিলক দেখে, অগ্নির হাতে এই কিছুক্ষণ আগে পরিয়ে দেওয়া কাচের চুড়িগুলো চাঁদের আলোয় ঝিলিক তুলেছে।

এতদিন বাদে অগ্নি এই প্রথম জিয়োন-গাছের তলায় এসে বসেছে। বাঁচবার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে মানসিক রসদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এই নিশুত রাতে এমন নির্জন গাছের তলায় দৌড়ে চলে এসেছে। পরীক্ষিত বুঝতে পারে না, অকস্মাৎ কী কারণে অগ্নির মনে বাঁচার বাসনা প্রবল হয়ে উঠল? সম্ভবত তিলকই সেটা আন্দাজ করতে পারে।

আস্তে আস্তে অগ্নির গায়ে মোলায়েম মাখন-হাত ছোঁয়ায় পরীক্ষিত। অগ্নির সারা শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। মুখ তুলে বাপের দিকে তাকায় অগ্নি। ঠিক সেই মুহূর্তে তিলকও তার দৃষ্টির ফ্রেমে ঢুকে পড়ে। তিলককে দেখতে দেখতে অগ্নির ঠোঁটের কোণে বারেকের তরে উঁকি মারে এক টুকরো হাসি। বুকের মধ্যে সহসা থোকাথোকা কুরচি ফুল!

অগ্নিকে তুলে নিয়ে প্রায় শেষ রাতে ঘরে ফেরে পরীক্ষিত।

শুকনো শিরীষ ফলের ঝনঝন আওয়াজ

নদী এক আশ্চর্য দর্পণ। স্থির জলে ঘোলাটে ছায়া পড়ে। নদীতে স্রোত থাকলে তার বুকে ছায়ামুখগুলি ভেঙে যায় বারবার। ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে ভেসে যায় স্রোতের টানে। ধুয়ে যায় মুখগুলি। স্থির জলেও যে ছায়া পড়ে, তাতে অনেক বাড়তি মাত্রা। ব্যঞ্জনা। অনেক রহস্যময়তা সেই দর্পণজাত প্রতিবিম্বে। চেনা মুখও অচেনা লাগে। এক মুখ ভেঙে ভেঙে অনেক মুখ হয়।

হরিণমুড়ির বাঁকের মুখে স্থির জল। তঁতু রঙের জলের বুকে বাজে-পোড়া তালগাছের ছায়া। চারপাশের ঝোপঝাড়ের ছায়া। গাছের তলায় বসে থাকা বুদ্ধদেবের ছায়া। তার হাতে

একখানা কাগজ। তাতে একখানা বিচারের রায় লেখা রয়েছে। রায়খানা হাতের মুঠোয় নিয়ে বুদ্ধদেব স্থির নিষ্কম্প। চোখদুটি জলের বুকে অনড়।

গত দু'রাত এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমোতে পারে নি বুদ্ধদেব। পরশু রাতে কনকপ্রভার মহলে, নরম বিছানায় শুয়ে খালি এপাশ ওপাশ করেছে। কনকপ্রভা অনেক খাবার সাজিয়ে দিয়েছিলেন সামনে। দু'এক টুকরো মুখে দিয়ে আর পারেনি। ক্রমাগত বমি আসছিল ওর। কনকপ্রভা অনেকরাত অবধি ওর ঘরে ছিলেন। কুন্তীও ছিল। বুদ্ধদেবকে অনেকভাবে সাহস দিয়েছেন কনকপ্রভা। কিন্তু বুদ্ধদেবের বুকের মধ্যে তখন ঝড় বইছিল। সারা এলাকা জুড়ে অকস্মাৎ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য বারবার নিজেকেই দায়ী করেছিল সে। যদিও জানে, কোনও অন্যায়ই করে নি সে। এই রাজ্যেরই অনেক এলাকায় হাড়ের গুঁড়ো আর ইউরিয়ার ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এইসব পিছিয়ে পড়া এলাকায় সেসব আলো এসে পৌঁছোয় নি, এই যা। দু'দিন বাদে এইসব এলাকাতেও হয়তো বা শুরু হবে পুরোদমে এই সব সারের ব্যবহার। তখন এই ঘটনা শুনে হয়তো বা হাসবে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ। তখন হয়তো বা কারও মনেই থাকবে না একখণ্ড জমাট পাথর বুকে নিয়ে বুদ্ধদেবের রাত্রি উজাগরের কথা। এক সময় বুদ্ধদেবের মনে হয়, জমিতে নিষিদ্ধ সার প্রয়োগের বিষয়টি নেহাতই উপলক্ষ। হরবল্লভরা তিলকে তাল বানিয়ে একটা পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চাইছেন। বেয়াড়া বুদ্ধদেবকে সারেস্তার করবার জন্যই এই আয়োজন। বিডিও সাহেব একটা মূল্যবান ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেটা মনে পড়ে যায় বুদ্ধদেবের। হরবল্লভের কাছে সারেস্তার করবার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ওখানেই বোধ করি আটকে রয়েছে পুরো ব্যাপারটা। হরবল্লভের কাছে আত্মসমর্পণ করলেই এক্ষুনি যাদুবলে সমগ্র পরিস্থিতিখানি বদলে যাবে। চাকাখানি উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবেন তিনি। তারপর থেকে ষোলআনা অনুগত হয়ে কাজ করতে হবে বুদ্ধদেবকে। হরবল্লভদের যা কিছু কুকীর্তিকে হজম করে যেতে হবে। তাই যদি করবে বুদ্ধদেব, তবে কেন এই ক্লেশ স্বীকার! মাঝপথে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে দু'পায়ে মাড়িয়ে কেন এই কষ্টকর জীবনটিকে বেছে নেওয়া! দুষ্কর্মের কাছে যদি মাথা নিচু করেই বাঁচতে হয় সততাকে, তাহলে আর কী রইল তার জীবনে! সুকুমার মাঝে মাঝেই একটা কথা বলে। প্রয়োজনে পিছু হটাও নাকি যুদ্ধের নিয়ম। আগামীতে এক পা এগোনের জন্য বর্তমানে দু'পা পিছু হটো। পিছুই হটবে নাকি বুদ্ধদেব? আপাতত হরবল্লভের সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসে পরিস্থিতিটাকে সামাল দেওয়াই কি সঠিক পথ হবে? প্রশাসনে ওর মাথার ওপর যিনি রয়েছেন, সেই বিডিও সাহেবের কাছ থেকে তিলমাত্র সুরক্ষা আশা করে না বুদ্ধদেব। বরং এলাকার মানুষকে ঠাণ্ডা করতে বুদ্ধদেবকেই হাড়িকাঠে চড়িয়ে দিতে দ্বিধা করবেন না তিনি। বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। বড় অসহায়।

পরশু সারারাত কনকপ্রভার মহলে শুয়ে শুয়ে এই সব ভাবনাই ভেবেছিল বুদ্ধদেব। দুই সত্তার মধ্যে লড়াই চলেছিল রাতভর। সততার পক্ষে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো অথবা হরবল্লভের কাছে আপাতত আত্মসমর্পণ করা, এই দুইয়ের মধ্যিখানে পড়ে সারারাত রক্তক্ষরণ ঘটেছে তার। বুকের মধ্যে দুই জুরিতে ঘোরতর বিচার বসিয়েছে সারারাত। এক সময় এ দুটোর মধ্যবর্তী একটা পথে এসে পৌঁছে গেছে জুরিরা। আত্মসমর্পণ নয়, অবিরাম প্রতিকূলতার মধ্যে লড়াই

করে রক্তক্ষরণও নয়, চাকরিটা ছেড়েই দাও তুমি, বুদ্ধদেব। ফিরে যাও নিজের বাড়িতে। হয়ত সবাই একে পিছু হটা বলবে। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে রফা করে বাঁচবার চেয়ে, এ ঢের ভাল। অন্তত এ কথা তো কেউ বলবে না, বুদ্ধদেব অন্যায়ের সঙ্গে সহবাস করে চাকরি করছে, বুদ্ধদেব অবশেষে ত্রিভঙ্গ পুরকায়েত হয়ে গিয়েছে। মাঝরাতে বিছানা থেকে উঠে একখানা পদত্যাগপত্র লিখে ফেলেছিল বুদ্ধদেব। সে স্থির করেই ফেলেছিল, সকাল হলেই সেটা পেশ করবে বিডিও সাহেবের কাছে। ওকে নিয়ে একটা জুতসই নাটক দেখবার জন্য যারা কাল থেকে মুখিয়ে রয়েছে তাদের আশায় জল ঢেলে দেবে সে। তারপর ফিরে যাবে নিজের বাড়িতে। সে রাতে সহসা মায়ের মুখখানি মনে পড়েছিল বুদ্ধদেবের। একটি অতি সাধারণ, স্নেহপ্রবণ মুখ, চোখদুটি জলভরা মেঘের মতো গভীর, আর সর্বক্ষণ বুদ্ধদেবের জন্য অধীর উৎকণ্ঠায় অস্থির। বুদ্ধদেবকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। অনেক কল্পনার জাল বুনেছিলেন। তাঁর যাবতীয় স্বপ্ন, আশা ও কল্পনাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল বুদ্ধদেব নিদারুণ উন্মাদনায়। আজ আবার মায়ের কাছেই ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে মন। যত শীঘ্র সম্ভব মায়ের কাছে পৌঁছোনো দরকার।

সারারাত বিছানায় ছটফট করতে করতে শেষরাতে উঠে পড়েছিল বুদ্ধদেব। কনকপ্রভার অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল । দিনের আলো ফোটার আগে সে এই এলাকার বাইরে চলে যেতে চায়। কনকপ্রভাও তাকে বাধা দেন নি। ঘুমঘুম চোখে কুন্তীও এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার মুখে। তার সদ্য ঘুমভাঙা মুখে উৎকণ্ঠা ছিল। শেষ মুহূর্তে কনকপ্রভা বলেছিলেন, ভেঙে পড়ো না বুদ্ধদেব, মনের শক্তি হারিও না। এখান থেকে সোজা চলে যাও দীপমালার কাছে। সে বুদ্ধিমতী, আজীবন লড়াকু মেয়ে, তোমাকে অনেক বুদ্ধি-পরামর্শ দিতে পারবে। নিজের সিদ্ধান্তের কথা কনকপ্রভাকে বলে নি বুদ্ধদেব। নিঃশব্দে বেবিয়ে এসেছিল কনকপ্রভার মহল থেকে। বাইরে তখনও শেষরাতের আঁধার। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে, মণ্ডলদের আমবাগানের ভেতর দিয়ে, পদমপুকুরের ঈশেন কোণে পৌঁছে দেখে, পাগল শিকারি বুদ্ধদেবের সাইকেলখানা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তেঁতুলতলায়। ঝটিতি সাইকেলে চড়ে বসেছিল সে। রওনা দিয়েছিল বিষ্টুপুরের দিকে।

বিষ্টুপুরে যখন পৌঁছায় বুদ্ধদেব তখন ডালেপালায় বেলা। দীপমালার ঘরে ঢুকেই চমকে ওঠে। ঘরের মধ্যে দীপামালার পাশটি ঘেঁসে বসে রয়েছে মল্লিকা। তার সারা মুখে রাত্রি উজাগরের ক্লান্তি। রাজ্যের উৎকণ্ঠার বাসা বেঁধেছে চোখদুটিতে। বুদ্ধদেবকে দেখে সোজা হয়ে বসেছে মল্লিকা। সব কিছু শোনার জন্য উদগ্রীব।

গতরাতের সব কথা সংক্ষেপে বলে বুদ্ধদেব। সবশেষে নিজের সিদ্ধান্তের কথাটা জানায়।

দীপমালা স্থির পলকে তাকিয়ে ছিলেন বুদ্ধদেবের দিকে। ধীরে ধীরে ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে চাপা রহস্যময় হাসি। বল্লেন, 'আমিও তেমনটাই আশা করেছিলাম। এ ছাড়া আর কীই বা করতে পারে তোমার মতো আবেগসর্বস্ব একটি ছেলে। বড়লোক বাপের একমাত্র ছেলে, পড়াশুনোয় ব্রিলিয়ান্ট, কিন্তু সব ছেড়েছুড়ে কেবল আবেগের বশবর্তী হয়ে কুড়ি বছর বয়েসে চলে এলে 'দেশসেবা'র চাকরি নিয়ে। দু'দিন বাদে, সামান্য সঙ্কটের মুখোমুখি হতে

না হতেই যাবতীয় আবেগ বাষ্প হয়ে উড়ে গেল।' শেষের দিকে দীপামালার উচ্চারিত কথাগুলোকে তিরস্কারের মতো শোনায়। দীপমালা শুধোন, 'আজই দেবে রেজিগনেশন?'

মেঝের দিকে মুখ নামিয়ে মাথা দোলায় বুদ্ধদেব।

বেশ খানিকবাদে টলোমলো উঠে দাঁড়ায় বুদ্ধদেব। পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসে। মল্লিকাও পেছন পেছন আসে। বলে, 'আগে তুমি আমাদের বাড়ি চল। চান-টান করে কিছু মুখে দাও। তারপরে ভাবা যাবে, কী করা উচিত। প্রণয়দাকে খবর পাঠিয়েছি। তিনিও সবকিছু তোমার মুখ থেকে শুনতে চান। তাঁকে যদি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারো, একটা ব্যবস্থা তিনি নেবেনই। তুমি তো প্রণয়দাকে ভালই চেন। সহজে ছেড়ে দেবার মানুষ তিনি নন।'

বুদ্ধদেবের কানে একবর্ণও ঢুকেছিল না মল্লিকার কথাগুলো। তার চোখের তারায় অস্থিরতা প্রকট হচ্ছিল ক্রমশ। বিড়বিড়িয়ে বলে, 'তুমি বাড়ি যাও মল্লিকা, এখন আমার যেতে ইচ্ছে করছে না তোমাদের বাড়িতে। চান, খাওয়া, কিছুই ইচ্ছে করছে না।' বলতে বলতে সাইকেলের প্যাডেলে পা রাখে সে। ধীরে ধীরে মল্লিকার চোখের সামনে থেকে একটু একটু করে অদৃশ্য হয়ে যায়।

গতকাল সকাল দশটা নাগাদ দীপমালার বাসা থেকে যখন বেরিয়ে এসেছিল বুদ্ধদেব, ততক্ষণে বুকের মধ্যে দুই জুরির কথার লড়াই শুরু হয়ে গেছে পুনরায়। সারারাত ধরে বিচার বিবেচনা করে তারা রায় দিল, তুমি পদত্যাগই কর বুদ্ধদেব, আপাতত এই মন্দের-ভাল সম্মানজনক পথটিই খোলা রয়েছে তোমার জন্য। বুদ্ধদেব সেই অনুসারে কনকপ্রভার মহলেই লিপিবদ্ধ করে ফেলেছিল সেই রায়। কিন্তু গতকাল দীপমালার শ্লেষমেশানো মন্তব্যগুলি আবার উসকে দিল জুরিদ্বয়কে। কথা ছিল বেরিয়ে সোজা ব্লক অফিসে চলে যাবে বুদ্ধদেব, সরাসরি বিডিও সাহেবের ঘরে ঢুকেই পদত্যাগপত্রখানা দাখিল করবে। কিন্তু ব্লক অফিসের দিকে দু'পা হাঁটতে না হাঁটতেই সব কিছু গুলিয়ে দিল বুকের মধ্যেকার দুই জুরি। কাজেই ব্লক অফিসে আর যাওয়া হল না তার। মল্লিকা খুব ছলছল চোখে ডেকেছিল ওকে, কিন্তু সেই মুহূর্তে মল্লিকার কাছেও ফিরে যেতে ইচ্ছে করল না। আসলে লোকালয়,মানে তার কলরব, অজস্র প্রশ্ন, বুদ্ধদেবেকে নিয়ে, চোরা হাসি, কটাক্ষ, সবধরনের অপমান যেন লোকালয়েই অপেক্ষা করছিল তার জন্য। চোখের সুমুখে ভাসছিল একেএকে প্রত্যেকটি মুখ, বিডিও সাহেব, করালী সোম, কৃষ্ণ নাগ, পল্টু হাজরা, সবাই ক্রুর হাস্যে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। আসলে, তখন কিছুই ভাল লাগছিল না। একা হতে চাইছিল তখন বুদ্ধদেব, গর্ভে শায়িত শিশুর মতো একান্ত। ফলে, সকলের অলক্ষ্যে শহর ছাড়ল বুদ্ধদেব। পাকা রাস্তা পরিত্যাগ করে গ্রামের পথে পথে, ক্ষেতের আল ধরে ধরে এসে পৌঁছুল দ্বারকেশ্বরের পাড়ে। বুকের মধ্যে দুই জুরি তখন প্রবল বাদানুবাদে মত্ত।

দ্বারকেশ্বরের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে দিনভর কোথা থেকে কোথায় চলে গেল বুদ্ধদেব। সারাদিন এলোমেলো ঘুরে বেড়াল। পকেটে পদত্যাগপত্রখানি খসখস আওয়াজ তুলে কতবার জানান দিল নিজের অস্তিত্ব। কত আজব ভাবনা এসে ভিড় করল মগজে। সুকুমার, তিলক, হঠাৎ, অগ্নি, কনকপ্রভা, কুন্তী, মল্লিকা, দীপমালা সকলেই এসে ভিড় জমাল বারংবার। সকলেই ওকে কাতর গলায় আহ্বান জানাল। কিন্তু বুদ্ধদেব কারোরই ডাকে সাড়া দিল না

একতিল। সিংহগড়ে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে হরবল্লভদের সদলবলে বিষ্টুপুরে যাওয়া কথা। গেল কি না, কী হল শেষ অবধি, কিছুই জানল না বুদ্ধদেব। এবং একটু একটু করে রাঢ়ভূমির বুকে অন্ধকার নেমে এল।

সকাল থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে অনাথবন্ধু এসেছেন বারবার। দূর থেকে কিছু বলতে চেয়েছেন। বুদ্ধদেবের বারবার ইচ্ছে করছিল একটিবার অনাথবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে। দিনমানে চুয়ামসিনায় ঢোকার সাহস ছিল না বুকে। অন্ধকার নামতেই রওনা দেয় বুদ্ধদেব। পায়ে পায়ে হাজির হয় অনাথবন্ধুর বাড়িতে। তখন টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল। ভাদ্রের প্রকৃতি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। বুদ্ধদেব দেখে, অনাথবন্ধু নেই। পাশের ঝোপড়িতে হঠাৎ মুর্মু ছিল। ডাক দিতেই বেরিয়ে এল। অনাথবন্ধুর কোনও খবরই দিতে পারে না সে। হরবল্লভদের কোনও খবরও জানা নেই তার। অনাথবন্ধু খুব ভোরে বেরিয়ে গিয়েছেন। কাউকে কিছু বলে যান নি। তবে, হঠাৎ মুর্মুর ধারণা যত রাতই হোক, তিনি ফিরবেন। বাড়ির বাইরে বড় একটা থাকেন না অনাথবন্ধু।

অনাথবন্ধু গেল-রাতে ফেরেন নি। বুদ্ধদেব রাত কাটিয়েছে অনাথবন্ধুর বাড়িতে। হঠাৎ মুর্মু গরম ভাত আর আলুসেদ্ধ এনে নামিয়ে দিয়েছিল সুমুখে, বুদ্ধদেব স্পর্শও করে নি। বুকের মধ্যে তখন অবিরাম ঝড়ের দাপাদাপি। ঘুম আসছিল না কিছুতেই। পকেট থেকে পদত্যাগপত্রখানি বের করে বারবার পড়েছে। আবার ভাঁজ করে রেখে দিয়েছে পকেটে।

শেষ রাতে সামান্য তন্দ্রামতো এসেছিল। ঐ আধো-আধো ঘুমের মধ্যে মা এসেছিলেন ক্ষণিকের জন্য। বড়ই ব্যাকুল গলায় বলেছিলেন, খোকা, ফিরে আয়। তোকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন। মায়ের মুখখানি বড় বিষন্ন লাগছিল। কেমন অচেনা লাগছিল মুখখানি। বারবার বদলে যাচ্ছিল মুখের.আদল। বুদ্ধদেবের ঘুম ভেঙে যায়।

আজ সারাদিন ধরে মায়ের মুখখানিকে নিয়ে ভাবছে বুদ্ধদেব। কে এসেছিলেন কাল রাতে? কোন্ মা? এমন অচেনা লাগছিল কেন মুখখানি? পরীক্ষিত বাউরি মাঝে মাঝেই বলে, গর্ভধারিণীও এক মা, দেশের মাটিও এক মা। আমি দু'লম্বর মায়ের তরে এক লম্বর মা'কে ছেইড়েছি। কোন মা এসেছিলেন কাল রাতে? গর্ভধারিণী, নাকি দেশের মা'টি? তিনি বারবার বলছিলেন, ফিরে আয় খোকা, তোকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন। বুদ্ধদেবের কাছে দু'মায়ের চাহিদা দু'রকম। প্রথম মায়ের কথা মানলে, পত্রত্যাগপত্রটি বিডিও সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে ফিরে যেতে হয় দেশের বাড়িতে। দ্বিতীয় মায়ের কথা মানলে পত্রত্যাগপত্রটি ছিঁড়ে ফেলে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে হয় পরিস্থিতির মুখোমুখি। কী করবে বুদ্ধদেব? জুরিরা কী বলেন?

আজ, ভোরের আলো ফোটার আগেই অনাথবন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল বুদ্ধদেব। চলে গিয়েছিল বত্রিশভাগীর জঙ্গলে। মাঝে পড়েছিল জিয়োন-গাছ। বুদ্ধদেব তার কাছে যায় নি। জঙ্গলের মধ্যে পোড়ামহুলের গাছ। তার তলায় ভৈরবের থান। অজস্র হাতি-ঘোড়া দিয়ে এক পাহাড়। ঐ পাহাড়ের আড়ালে বসে বসে সে কাটিয়ে দিয়েছে সারাটা দিন। বুকের মধ্যে যে কোনও ভয় রয়েছে, কোনও হামলা আক্রমণের ভয়, তা কিন্তু মোটেই না। আসলে, ভেতরে ভেতরে বড় অশান্ত হয়ে উঠেছে মন, লোকজনের সংস্পর্শ, জনপদের

আলো-বাতাস, কিছুই সইতে পারছে না সে। অস্থিরতাটা এজন্য নয় যে, তার চাকরিটা চলে যেতে পারে, কিংবা সে নিজেই ছেড়ে দিতে পারে। এমন কোনও আশঙ্কাও সে বোধ করছে না যে দেখামাত্র তার ওপর চড়াও হতে পারে মানুষ। লোকালয়কে নিয়ে সে ভয় পাচ্ছে না একতিল। সরকারি শাস্তিও তার কাছে তাচ্ছিল্যযোগ্য এক ব্যাপাব। এসবের চেয়েও অনেক গভীর ভাবনা তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। দেশ বলে যে ভূখণ্ডটির ছবি আশৈশব, আকৈশোর আঁকা ছিল তার বুকে, সেই ছবিখানাই বড় এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। দেশকে গড়ে তোলার যে স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে ঘর ছেড়েছে, স্বহস্তে তছনছ করে দিয়েছে প্রচলিত জীবনচর্যা, সেই স্বপ্নটাই যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে। এরপর যদি চাকরিটা করেও সে, কিংবা যদি বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার ভর্তি হয়ে যায় কলেজে, গড়ে তোলে নিজেব জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যত, কী লাভ হবে তাতে? মনটাই যে অসুস্থ হয়ে গেল তার। মায়াবী আরশিটাই যে ভেঙে গেল। ঐ ভাঙা আরশি দিয়ে যে আজীবনকাল পরিপার্শ্বের বিকৃত রূপখানি দেখে যেতে হবে! হায়, এই বয়েসে চোখদুটোই কি তবে পচে গেল তার!

দুপুর গড়তির দিকে, বুদ্ধদেব বত্রিশভাগীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে শুরু করেছিল হরিণমুড়ির দিকে। দু'পাশে উন্মুক্ত ডাঙা-ডিহি, সবুজ ধানেব ক্ষেত, মাথার ওপর শরতের আকাশ, দিগন্তের গায়ে গায়ে সাজানো বন, জঙ্গল, গ্রামগুলি. । বড় নিস্তব্ধ লাগছিল প্রকৃতিকে। বড় থমথমে লাগছিল চারপাশের সবকিছুই। সবুজ জমিনে হাঁটু অবধি ডুবিয়ে আগাছা নিড়োচ্ছিল মজুরের দল। তারা কেউ মুখ তুলে তাকিয়েছিল, কেউ তাকায়ই নি। কোনও অস্বাভাবিক আচরণ ছিল না চারপাশে। কেবল আবহাওয়া এতখানি স্থির, থমথমে, যে বড়ই অস্বস্তি লাগছিল বুদ্ধদেবের। এমন থমথমে আবহাওয়ার পরই তুমুল ঝড় ওঠে।

ডাঙার মধ্যে কুসুম গাছখানাও আজ বড় বেশি স্থির। জিয়োন গাছ। বুদ্ধদেব কিছুক্ষণ সেই গাছের তলায় গিয়ে বসেছিল। আর তখনই পাগল শিকারি তার সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল। পাগলের মুখেই শুনেছে বুদ্ধদেব, বিডিও, এস-ডি-ও, থানার বড়বাবু সবাই নাকি ওকে আতি-পাঁতি খুঁজছে। বুদ্ধদেব জিয়োন-গাছের তলা থেকে আবার হাঁটা শুরু করেছিল, হরিণমড়ির দিকে।

হরিণমুড়ির পাড়ে পাড়ে ঘুরতে ঘুরতে বিকেল হয়ে গেল। বুদ্ধদেব পায়ে পায়ে চলে আসে বাঁকের মুখে। চোখের সামনে বাজে-পোড়া তালগাছটি স্থির। মরণ-গাছ। বুদ্ধদেব মরণ গাছের তলায় বসে পড়ে। মরণগাছের ছায়া পড়েছে জলে। বুদ্ধদেব বসে বসে হরিণমুড়ির জলে নিজের ছায়াখানি দেখতে থাকে। নদী এক আশ্চর্য দর্পণ।

সুকুমার আচার্য বলেছিল, আবেগপ্রবণ মানুষেরাই এমন। আবেগ হল ফুটন্ত দুধের মতো। অল্পেতেই উথলে ওঠে। সামান্য একটু জলের ছিটে পেলেই চুপসে যায়। অনাথবন্ধু বলেছিলেন, তা হোক, তবুও আবেগই জীবনে আনে মহার্ঘ বেগ। আবেগই জীবনের সেই মহার্ঘ চালিকাশক্তি, যার টানে ব্যক্তিগত সুখ, আরাম, নিরাপত্তাকে দুপায়ে মাড়িয়ে ঝাঁপ দেওয়া চলে আগুনের নদীতে। হিসেবী মানুষদের তো হিসেব কষতেই জীবন কাবার হয়ে যায়। বুদ্ধদেব কি খুবই আবেগপ্রবণ? কেবল আবেগের টানেই কি সে এই চাকরিতে এসেছিল? কোনও স্থির বিশ্বাস কি কাজ করে নি এর পেছনে? আজও যে একটা সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েই

সে পদত্যাগ করতে চাইছে, সেও কি ওই উথলানো দুধে ঠাণ্ডা জলের ছিটে। কী ভেবেছিল বুদ্ধদেব? দেশটাকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সে কেবল হেঁটে যাবে যাবতীয় মসৃণ রাজপথ ধরে, আর, পথ আগলে পড়ে থাকা বিশাল বিশাল পাথরের চাঙড়গুলো নিজেরাই, স্বইচ্ছায় সরে যাবে দূরে। বহু শতাব্দী জুড়ে যা কিছু দখল করে রয়েছে এই দেশের মাটি, জল, আকাশকে, যাবতীয় অসঙ্গতি, অবিচার,— সবকিছুই তার হাতের অলৌকিক যাদুস্পর্শে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। সে কি এমনই এক জ্যোর্তিময় পুরুষ যে কেবল তার উপস্থিতিতেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বহু যুগের জমাট অন্ধকারগুলি! আলোয় আলোয় ভরে যাবে দশ দিক।

চোখের সামনে রঙ বদলাচ্ছে হরিণমুড়ির জল। পড়ন্ত বিকেলের নরম রোদ্দুর একটু একটু করে মুখে যাচ্ছে গাছগাছালির শরীর থেকে। পাখি-পাখাল ঘরে ফিরছে। শনশন হাওয়া বইছে। হরিণমুড়ির জলে মরণ-গাছসহ নিজের ছায়াখানিও বদলে যাচ্ছে দ্রুত। দেখতে দেখতে মনের মধ্যে এক ধরনের দম আটকানো অস্থিরতা। মস্তিষ্কের কোষে কোষে, শিরায় শিরায়, রক্তে, শুকনো শিরীষ ফলের মতো ঝনঝন আওয়াজ। সেই আওয়াজের লয় এবং তীব্রতা ক্রমশ বাড়ছিল। এক সময় বুদ্ধদেব খেয়াল করে, সে কখন জানি মুঠোর মধ্যে থাকা পদত্যাগ-পত্রখানিকে নিজের অজান্তে কুটিকুটি করে ছিঁড়ছে।